সচিত্র
ভারত-প্রদক্ষিণ

সচিত্র

ভারত-প্রদক্ষিণ।

শ্রীদুর্গাচরণ রক্ষিত

তৃতীয় সংস্করণ

(পুনঃ পরিবর্দ্ধিত)
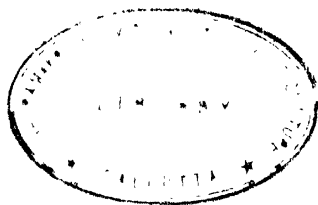
তিন টাকা।

প্রকাশক— শ্রীঅশোকচন্দ্র রক্ষিত,
- - বীতশোক বাটিকা, - -
১৮১, রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
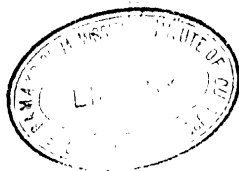
প্রিণ্টার—শ্রীসুরেশচন্দ্র মজুমদার,
- - শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস, - -
৭১।১ মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

দেওঘরের

ভূতপূর্ব্ব ও বর্ত্তমান প্রবাসী

শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বসু

যুগল বন্ধুকে

এই গ্রন্থ

উপহার স্বরূপ

উৎসর্গ

করিলাম।

(১৩১০ বঙ্গাব্দ)

প্রথম সংস্করণের

বিজ্ঞপ্তি।

বিষয়ান্তরে দীর্ঘকাল ব্যাপৃত থাকায় রচনা-সমাপ্তির আশা সুদূরে গিয়াছে। ভারতী, নব্যভারত, বান্ধব, নবজীবন, দাসী ও সাহিত্যে প্রকাশিত প্রবন্ধগুলি দৈনন্দিন-লিপি সহযোগে একত্রিত করিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশিত করিলাম। আপনার কার্য্য যে স্বয়ং না দেখিতে পারে, তাহার গ্রন্থে ওড্র স্থলে ঔড্র ইত্যাদি ভ্রম সহজে প্রবেশলাভ করিবে, ইহা নিশ্চিত। নব-বার্ষিকী ও ভারতী হইতে গৃহীত কোন স্থান উদ্ধৃত করার চিহ্ন বর্জ্জিত হইয়াছে, সে জন্য আমি অনুতাপ করিতেছি। অষ্টাদশ বর্ষের মধ্যে বার-চতুষ্টয়ে ভ্রমণ শেষ করি। বঙ্গোপ-সাগর হইতে আরম্ভ করিয়া অন্যপথে পুনর্ব্বার তথায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলাম, এই কারণে প্রদক্ষিণের ভাব উপলব্ধি হয়। উৎকল ভ্রমণ প্রথমে সম্পন্ন হইয়াছিল, কিন্তু তদ্‌বৃত্তান্ত দক্ষিণাপথ দর্শনান্তে পরিস্ফুট হইয়াছে।

শ্রীকাশী
ফল্গুৎসব
সম্বৎ ১৯৫৯

শ্রীদুর্গাচরণ ভুতি।

আভাস।

দ্বিতীয় সংস্করণে, গ্রন্থের রচনাসমাপ্তির সন্দর্ভগুলি, সাহিত্য, হিন্দু-পত্রিকা, জন্মভূমি ও নব্যভারত হইতে গ্রহণ করিয়া প্রকাশিত হইল। শেষোক্ত পত্রে সর্ব্বাগ্রে মুদ্রিত 'বাঙ্গালী বৈশ্য' পরিবর্দ্ধিত আকারে 'বঙ্গ' নামে, পুনঃ-পর্য্যটন-সম্ভূত প্রবন্ধত্রয়,—কামরূপ, নিবৃত্তিপথের হৃষীকেশ এবং কালাদিপল্লি, ইহাতে প্রকটিত হইয়াছে। কামরূপের প্রথমাংশ প্রবাসীতে প্রচারিত হইয়াছিল।

প্রাদেশিকধারাবাহিকতা রক্ষার্থ দুই স্থানে প্রকরণ সন্নিবেশ করিতে, ভ্রমণের সময়গত পর্য্যায় উপেক্ষিত ও দক্ষিণ-ভাগ সন্দর্ভে পরিণত করিতে বিলম্ব হওয়াতে, স্থলবিশেষ কিঞ্চিৎ নব ভাব প্রাপ্ত হইয়াছে। তজ্জন্য, অসামঞ্জস্য লক্ষিত হইতে পারে; কিন্তু তাহা অনুপযোগী হয় নাই।

লেখকের চক্ষে, কোনও বিশেষত্ব উপস্থিত হয় নাই বলিয়া, বাঙ্গালীর পরিচিত বারাণসী, কলিকাতা ও বঙ্গে, স্থানীয় প্রসঙ্গ দৃষ্ট হইবে না। শারীরক মীমাংসা ও তত্ত্বসভা সম্বন্ধে বক্তব্য বৃদ্ধি প্রাপ্ত হওয়ায়, উপযুক্ত স্থানে তাহার জন্য পৃথক্ পরিচ্ছেদ করিয়া দিতে হইল।

নানা কারণে, ভ্রমণকাহিনীতে কয়েকটি অপ্রিয় সত্য উক্ত হইয়াছে এবং অন্যবিধ অনবধানতা ঘটিতে দেখিয়া, রচয়িতা অনুতাপ করিতেছেন।

তৃতীয় সংস্করণে, তিনখানি নূতন চিত্র এবং নব্যভারতে অপ্রকাশিত 'কাশ্মীর' প্রবন্ধের অবশিষ্টাংশ দৈনন্দিন-লিপি হইতে প্রদত্ত হইল।

সাহায্য-লব্ধ পুস্তকের তালিকায় (আদের প্রবন্ধে) শ্রীগঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রণীত 'চিকিৎসাতত্ত্ব ও চিকিৎসা' প্রকরণের উল্লেখ করিতে অবশিষ্ট রহিয়াগিয়াছে।

মুদ্রাঙ্কণ সম্বন্ধে তত্ত্বাবধান করিয়া আয়ুষ্মান্ শ্রীমৎ বসুভূতি রক্ষিত বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন।

প্রবন্ধ-সূচী।

বিষয়।		পৃষ্ঠাঙ্ক।

পূর্ব্ব ভাগ।

উত্তর ভাগ।

পশ্চিম ভাগ।

বিষয়। পৃষ্ঠাঙ্ক।

দক্ষিণ ভাগ।

চিত্র-সূচী।

আপনার চিন্তা গোপন রাখা অপেক্ষা প্রস্তর-
মূর্ত্তির নিকট প্রকাশিত করা শান্তিপ্রদ।

—বেকন্।

(ভ্রমণের প্রদেশ ও রাজকীয় নির্দ্দেশানুযায়ী জাতিতত্ত্ব প্রদর্শক।)

ভারত-প্রদক্ষিণ।

ওড্র।*

গঙ্গা-সাগর-সঙ্গমে ঝড় উঠিল, নাবিকেরা পাল নামাইয়া ফেলিল! প্রকৃতির করাল মাধুরী দেখিবার জন্য জাহাজের ছাদে উঠিলাম। জাহাজ বে দুলিতেছে, শরীর যেন ঘুরিয়া আসিল। আমি ক্যাবিনে গিয়া শয়ন করিলাম। ক্রমে বমন আরম্ভ হইল। শরীর অসাড় হইয়া গেল। একজন কহিল, 'পথ হইতে হাত খানি সরাইয়া লও।' আমি কহিলাম, তুমি সরাইয়া দাও।' আমার হাত নাড়িবার ক্ষমতাও ছিল না। প্রভাতে মুদ্রের কি প্রশান্ত, মহান্ মধুর মূর্ত্তি! কবির বর্ণনায় চিরকাল সাগরের াম শুনিয়া আসিতেছি, আজ তাহা প্রত্যক্ষ দেখিলাম। রবিকিরণে নীলাম্বু তর তর করিতেছে। সমুদ্রের শ্যাম-রূপ দেখিতে কি সুন্দর!

"সুধা ছানিয়া কেবা, ও সুধা ঢেলেছে গো,
তেমতি শ্যামের চিকণ দেহা।"

ধিকক্ষণ সে সুখ-সম্ভোগ আর ঘটিল না। নদীত্রয়সহযোগে উৎপন্না মেরা' ও সাগরের ভিন্ন বর্ণের মিলনরেখা দৃষ্টিগোচর হইল। চাঁদবালীতে তরিণী পার হইয়া গো-যানে উঠিলাম। পদমপুরে একটী দেউল আছে, নির্ম্মাতা দবিসা ভবানী-শঙ্করের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তাঁহার যন বংশ না থাকে। কারণ, উত্তরাধিকারী থাকিলে সে দেবালয়ের ামী বলিয়া অভিমান করিতে পারে। মহানদী বা মহাবালুকা পার হইয়া,

* (১) উড়িষ্যার ইতিহাস—শিবচন্দ্র সোম প্রণীত।

কটক নগরের মধ্য দেশ অতিক্রম করিয়া, কাটযুড়ীর পরপারে পান্থনিবাস পাওয়া গেল। সহর দেখিতে পুনর্ব্বার এ পারে আসিতে হইল। জল-প্লাবন বা শত্রুভয়নিবারণের জন্য নির্ম্মিত মর্কট কেশরীর প্রাচীর অদ্যাপি দণ্ডায়মান রহিয়াছে। বারবাটী নামক দুর্গ কেবল ভগ্ন উপল ও ভগ্ন-গৃহের স্তূপ। কিন্তু এখনও তথায় বৃটিশ প্রহরী পদচারণা করিতেছে। ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে তৈলঙ্গী তন্তুবায়দিগের একটি পল্লী দেখিতে পাইলাম। বাঙ্গালা ও তৈলঙ্গের মধ্যস্থলে উড়িষ্যা। উড়িয়ারা দেখিতে দক্ষিণী, ব্যবহারে বাঙ্গালী। উৎকল-রাজগণ হয়ত দক্ষিণী ছিলেন; বাঙ্গালার সেন-রাজ-বংশের সহিত কর্ণাটের সংস্রব আছে। এই কটকের পথে দ্রাবিড়-সভ্যতা বঙ্গে যায়। বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের গুম্ফহীনতা ও গোক্ষুর-শিখা তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। আমাদের দেশে একটি শ্রেণীর নাম আছে, দাক্ষিণাত্য বৈদিক।

যে তীর্থ পার হইয়া ভ্রমণে আসিয়াছিলাম, সে পথে না গিয়া আর এক ঘাটে পার হওয়া গেল। তখন সন্ধ্যা হইয়াছে, ভাবিলাম ঠিক যাইতেছি; কিন্তু অনেকক্ষণ চলিয়াও পরিচিত স্থানে উত্তীর্ণ হইতে পারিলাম না। আমার দিক্‌নির্ণয়ে ভ্রম হইয়াছিল। প্রবল বাতাস বহিতেছে। অন্ধকারে আবৃত বিজন পথে লতা-গুল্ম গাত্র

(২) Orissa by W. W. Hunter.
(৩) Purushottam Chandrika. (based on Temple Chronicle) by Bhawani Charan Bandopadhayay.
(৪) Anthropological Essay in Bharati by Sarat Chandra Mitra.
(৫) Journey from Madras through the Countries of Mysore, Canara and Malabar. by F. Buchanan.
(৬) Jagannath Mangal (Utkalkhanda) by Bissambhar Das.
(৭) পুরুষোত্তম মাহাত্ম্য।

স্পর্শ করিতে লাগিল। কদাচিৎ লোকের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। একজনও জিজ্ঞাসিত হইয়া আলাপ করিল না। সঙ্গে টাকা আছে,—লোকে আগন্তুক জ্ঞান করিবে, এজন্য কাহাকেও উদ্দিষ্ট স্থান জিজ্ঞাসা করিতে সাহস হইল না। অবশেষে, অবিশ্বাস অপেক্ষা লোকের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন শ্রেয়স্কর বলিয়া বোধ হইল। দুইটি লোক মৎস্য ধরিতে যাইতেছিল, তাহাদিগকে সহায় করিয়া, যেখানে আমার ভৃত্য দ্রব্যজাত লইয়া অবস্থিতি করিতেছিল, তথায় উপস্থিত হইলাম। তাহাদের সহিত আর কখনও সাক্ষাৎ হইবে না, অথচ নাম ধাম জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হইল। হৃদয়ে কৃতজ্ঞতার সহিত তাহাদের প্রতি মমতার উদয় হইতেছিল।

প্রত্যুষে "মোকাম সহর" হইতে যাত্রা করিলাম। দুই প্রহরের সময় একাম্রকাননের মন্দিরসমূহ দৃষ্টিগোচর হইল। অসংখ্য দেবালয়, যেন "কাশী"। মনে অভূতপূর্ব্ব ভাবের উদয় হইতে লাগিল। বিন্দুসরোবরে স্নান করিয়া ভিখারী মহাপাত্রের সহিত কোটী-লিঙ্গেশ্বর দর্শন করিতে গেলাম। ভুবনেশ্বর দেখিতে প্রায় আমাদের কাশীর কেদারেশ্বরের মত; তবে অপেক্ষাকৃত উচ্চ। বাসায় আসিয়া পাণ্ডার প্রদত্ত 'কড়মাবায়ী ধূপ' আহার করা গেল। ব্যঞ্জন ও মিষ্টান্ন অতি কদর্য্য। পাণ্ডা আমার সহিত একপাত্রে আহার করিতে চাহিলেন। প্রসাদগ্রহণে বর্ণভেদ জনিত স্পর্শ-দোষ গ্রাহ্য নহে। কেন্দ্রাপাড়ায় দধি-বামন অর্থাৎ জগন্নাথদেবের প্রসাদসম্বন্ধেও ঐ নিয়ম। তৈলঙ্গে শেষ-গিরিস্থিত বেঙ্কটরামের অন্ন-প্রসাদ ভক্ষণের সময়েও পর্ব্বতের উপর বর্ণভেদ স্বীকার করা হয় না। দ্রাবিড়ে বিষ্ণুকাঞ্চী, শ্রীরঙ্গম ও মধুরাপুরীস্থ মীনাক্ষীর মন্দিরে ব্রাহ্মণে ভাতের পিণ্ড বিক্রয় করে। সুতরাং শ্রীক্ষেত্রে অন্ন-বিচার নাই দেখিয়া বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব কল্পনা করা অনাবশ্যক। যেমন নদী শুষ্ক হইলে তাহার দুই একখানি বাঁক "বামড়"-রূপে অবশিষ্ট রহিয়া যায়, তদ্রূপ

প্রাচীন প্রথা লোপ পাইলেও তাহার দুই একটি চিহ্ন ঘটনা-বিশেষে বা স্থান বিশেষে পরিস্ফুট থাকে। হিন্দু আর্য্যগণ পূর্ব্বে একবর্ণ ছিলেন, অদ্যাপি কাশ্মীরে তাহাই আছে। মানব-জাতির আদিম অবস্থায় বিবাহ ছিল না; এখনও মলয়ার প্রদেশে নাই। মনুতে একস্থানে লিখিত আছে;—ব্রাহ্মণ যেমন বিবিধ কুক্রিয়ান্বিত ব্যক্তির অন্ন গ্রহণ করিবেন না, তেমনি শূদ্রান্নও তাঁহার গ্রহণীয় নহে। আবার অন্য স্থানে বলিতেছেন; 'শূদ্র সূপ-কার্য্যাদি করিয়া ব্রাহ্মণের সেবা করিবে।' এই সকল দেখিয়া বোধ হয়, পূর্ব্বে সকল জাতির সহিত ভোজ্যান্নতা ছিল। এক্ষণেও স্থান-বিশেষে নৈবেদ্যস্থলে সেই প্রাচীন প্রথা রক্ষিত হইতেছে।

ভাল করিয়া ভুবনেশ্বর দেখিবার সময় না থাকায়, রৌদ্রের তাপ হ্রাস না হইতেই দেউলে প্রবেশ করিতে হইল। ভুবনেশ্বরের মন্দিরের গঠন কাশীর পঞ্চক্রোশী যাত্রাপথের চারি শত বৎসরের পুরাতন কর্দ্দমেশ্বরের মন্দিরের ন্যায়। কিন্তু বর্ত্তমান মন্দিরের তুল্য বিশাল ও উচ্চ আয়তনের মন্দির পশ্চিমোত্তর-ভারতে নাই। দক্ষিণাপথের পক্ষে ইহা বিশাল নহে; কেবল প্রারম্ভস্থানীয় বলা যাইতে পারে। দেবালয়ের প্রস্তর নিতান্ত কোমল। ভোগ-মণ্ডপের পাথরকে মৃত্তিকা বলিলেও ক্ষতি নাই। এজন্য বহুস্থান খণ্ডিত হওয়ায়, স্থূল চূর্ণের আবরণে বদ্ধ করিতে হইয়াছে। ১২১২ বৎসর হইল, রাজা ললাটেন্দুকেশরী ইহা নির্ম্মাণ করেন। মন্দিরসংলগ্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অলিন্দে একটি করিয়া কৃষ্ণ প্রস্তরের বৃহৎ বিগ্রহ আছে। বিগ্রহগুলি দেখিতে অতি সুন্দর। কোনও কোনটি এমনই সুকুমার যে, রক্তমাংস-গঠিত বলিয়া ভ্রম হয়। পূর্ব্ব কালের মনুষ্য-ব্যবহৃত বিবিধ বেশ ভূষা ক্ষোদিত করিয়া মূর্ত্তিগুলি সজ্জিত করা হইয়াছে। মন্দিরগাত্রে অসংখ্য দেব দানব ও মানবের লীলা ক্ষোদিত; তাহা সুগঠিত বটে, কিন্তু অনেকগুলি কুরুচিসম্ভূত তান্ত্রিক বা কাম-শাস্ত্রীয়
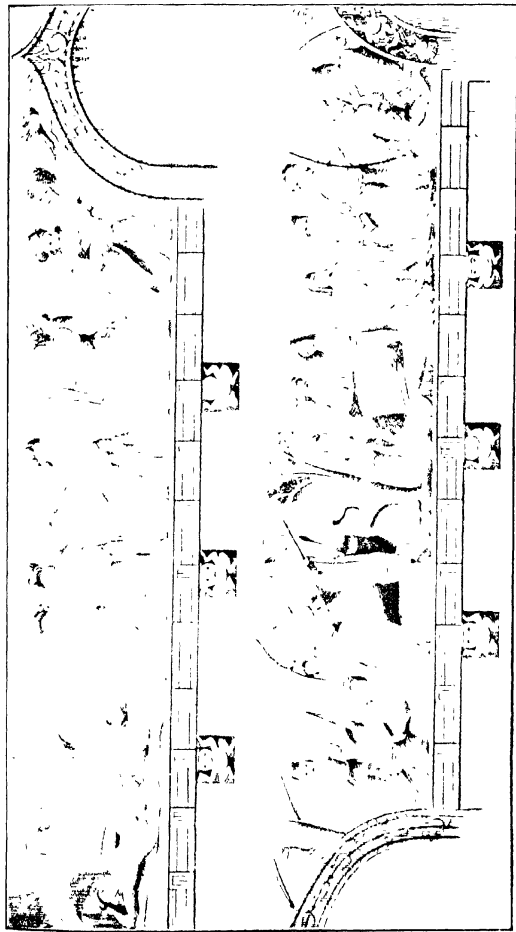
উৎকল—খণ্ডগিরি কাব্য

(ভারত প্রদক্ষিণ)

ভাবের প্রতিকৃতি দেখা গেল। তন্ত্র-শাস্ত্র নেপাল ও কামরূপ হইতে হিমালয়ে গিয়া বৌদ্ধ-ধর্ম্মের সহিত মিলিত হয়। কলিকাতার পরপারে স্থিত ভোটের বাগানের ভুটান হইতে আনীত বৌদ্ধ মহাকালের মূর্ত্তিও কুরুচি-কল্পিত। সেই জন্যই কাশীর নেপালী থাপ্রার কাষ্ঠনির্ম্মিত মন্দিরে অশ্লীল আসনের অভাব নাই।

প্রাতঃকালে ভুবনেশ্বর হইতে নীলাচল অভিমুখে যাত্রা করিলাম। বনের মধ্য দিয়া পথ। স্থানে স্থানে গৃহ-নির্ম্মাণোপযোগী পাষাণ আহরিত হইতেছে। দুই এক জন বন-চর কাষ্ঠভার বিক্রয়ের জন্য সহরের দিকে যাইতেছে। দুই ক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়া, পর্ব্বতপুঞ্জের পাদ-মূলে উপস্থিত হইলাম। সুন্দর বট-তরুর মূলে যান রাখিয়া শ্যামদাস বাবাজীর আশ্রমে গিয়া স্নিগ্ধ কূপোদকে স্নান করিয়া, তাঁহার সহিত পাহাড়ে উঠিতে আরম্ভ করিলাম। ক্ষুদ্র বলিয়াই হউক, অথবা খণ্ড জাতির আবাস বলিয়াই হউক, এই গিরির নাম 'খণ্ড-গিরি' হইয়াছে। ইহা দুই ভাগে বিভক্ত; উদয়-গিরি ও অস্ত-গিরি; আমরা প্রথমে উদয়-গিরিতে আরোহণ করিলাম। কতিপয় সোপান আরোহণ করিয়া দেহলী পাওয়া গেল, তাহার পার্শ্বে একটি গৃহ। গৃহ, অলিন্দ, স্তম্ভ সমস্তই পর্ব্বত-বক্ষে ক্ষোদিত। ঐরূপ আর কতকগুলি ঘর বা কন্দর অতিক্রম করিয়া, পর্ব্বতস্থ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলাম। সে অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিয়া একেবারে অদ্ভুত রসে ডুবিয়া গেলাম। পর্ব্বত খুদিয়া প্রকাণ্ড চতুঃশাল দ্বিতল বাটী নির্ম্মাণ করিয়াছে। গত কল্য চক্রক্ষেত্রে ভুবনেশ্বরের মন্দির দেখিয়া যে সুখ হইয়াছিল, তাহা পরিমিত; কিন্তু এ দর্শনসুখের তুলনা নাই। আমার ওড্রে আগমন সার্থক বোধ হইল। শ্যামদাস কহিলেন, এই বাটীর নাম "রাণীহংসপুর"। পর্ব্বতের অন্যান্য প্রকোষ্ঠ দেখিয়া হস্তীগুম্ফায় (গুহা) উপনীত হইলাম। অনেক লিপি উৎকীর্ণ রহিয়াছে।

লিপির আকার দেখিয়া এই অদ্ভুত স্থাপত্যের বয়ঃক্রম বুঝা গেল। মহারাজাধিরাজ শ্রীধর্ম্মাশোকের অনুশাসনলিপির অক্ষরে ইহা লিখিত। সুতরাং এই কীর্ত্তি অন্যূন ২০০০ বৎসরের প্রাচীন ; ইহার ভাষা পালি।

"দেবানাম্ পিয়ো প্রিয়দশি রাজা সবত ইচ্ছতি
সবে পাষণ্ডবংসেয়ু সবেতে সয়মঞ্চ ভাবসিদ্ধিম্ চ ইচ্ছতি।" *

দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে কথোপকথনে কি প্রকার ভাষা ব্যবহৃত হইত, অশোকের পর্ব্বতক্ষোদিত লিপি পাঠ করিলে তাহা অবগত হওয়া যায়। সংস্কৃত নাটকের প্রাকৃত দেখিয়া কোনও সিদ্ধান্ত হয় না ; প্রাকৃতের নামান্তর অপভ্রংশ আর্ষ, অর্থাৎ কোনও স্থানের মুনিগণের ভাষাকে পুরাণ প্রাকৃত কহে। স্থানবিশেষে মহারাষ্ট্রী, মাগধী ও শৌরশেনী নামে প্রাকৃত প্রচলিত ছিল। মাগধীর অপর নাম পালি। সমগ্র ভারত-ব্যাপী অশোক-লিপি তিন ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। প্রথম পাঞ্জাবী পালি, দ্বিতীয় উজ্জয়িনী পালি, তৃতীয় মাগধী পালি। ইহার অবান্তর ভেদ এই যে, কোনও ভাগের র-কারের স্থানে ল-কার, কোথাও বা বিভক্তিতে এ-কারের পরিবর্ত্তে ও-কার ব্যবহৃত হইয়াছে। খণ্ডগিরি হইতে ধৌলি পর্ব্বত দেখা যায় ; কিন্তু ধৌলির লিপি মাগধী শ্রেণীতে ও খণ্ডগিরির লিপি উজ্জয়িনীর বিভাগে স্থান পাইয়াছে। ধৌলি ওড্র দেশের অন্তর্গত ; খণ্ড-গিরির নিকট হইতে কলিঙ্গ আরম্ভ হইয়াছে।

আর কয়েকটি গুহা দেখিয়া আমরা অন্তগিরির শিখরে আরোহণ করিলাম। সাতবখুরা দালান নামক একটি প্রশান্ত গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখি,—অনেকগুলি বুদ্ধ মূর্ত্তি ধ্যানমগ্ন অবস্থায় ক্ষোদিত রহিয়াছে।

---

* দেবানাম্ প্রিয়ঃ প্রিয়দর্শিঃ রাজা সর্ব্বতঃ ইচ্ছতি সর্ব্বে পাষণ্ডবংশজাঃ সর্ব্বত্র সংযমঞ্চ ভাবসিদ্ধিম্ চ ইচ্ছতি (?) "রাজা প্রিয়দর্শী ইচ্ছা করেন, অন্যমতাবলম্বীরাও সুখে থাকুক।"

শাক্য-মুনি শেষ বুদ্ধ। তাঁহার পূর্ব্বে যাঁহারা বুদ্ধ হইয়াছিলেন, তাঁহারাও মায়া-দেবীর পুত্রের সহিত অর্চ্চিত হইয়া থাকেন। কিন্তু জিন ও বুদ্ধে ভেদ কি, ও কোনটি কাহার প্রতিকৃতি,আমি তাহা নির্ণয় করিতে পারিলাম না। দ্বিতীয়তলে কয়েকটি ক্ষোদিত প্রকোষ্ঠ ও কটকের একজন শ্রাবক কর্ত্তৃক নির্ম্মিত একটি আধুনিক জৈন মন্দির আছে। মাঘী সপ্তমীতে এখানে উৎসব হইয়া থাকে। বাবাজী এক স্থান দেখাইয়া কহিলেন এ দেবসভা। তিন খানি পাষাণ উপর্য্যুপরি রাখিয়া দাও, রাত্রির মধ্যে দেউল হইয়া যাইবে। আমি তাঁহাকে দেখাইলাম ;—অনেকে ঐরূপ করিয়া গিয়াছে, —দেখা যাইতেছে ; অথচ দেউল হয় নাই। অস্ত-গিরি হইতে অবরোহণ করিয়া আকাশ-গঙ্গা ও রাধাকুণ্ড দেখিলাম। বৃষ্টির জলে খাত পূর্ণ হয় বলিয়া বোধ হয় আকাশ-গঙ্গা নাম হইয়াছে।

আহারান্তে ভৃত্যকে রাণীহঁসপুরে মছলন্দ ও মাদুর রাখিয়া আসিতে কহিলাম। যেখানে রাজাধিরাজ ও রাজমহিষী শ্রমবিনোদন করিতেন, আমারও আজ সেই স্থানে বিশ্রাম! প্রদর্শক শীঘ্রই নিদ্রিত হইল। পুরাকালে কি প্রণালীতে বাটী নির্ম্মিত হইত, গ্রন্থ-পাঠে তাহা ঠিক বুঝা যায় না। ঘুণাক্ষরে বুঝায়, অনেক ভ্রম থাকিয়া যায়। এই পর্ব্বতক্ষোদিত ভবন ইদানীন্তন আদর্শের বাটীর মত, কিন্তু স্তম্ভের আকারে প্রভেদ আছে। বাড়ীটি পূর্ব্বদ্বারী, মধ্যস্থলে প্রাঙ্গণ। প্রাঙ্গণের তিন দিকে অলিন্দ-সংযুক্ত দ্বিতল গৃহশ্রেণী ; পূর্ব্বদিকে এখন কিছু নাই, বোধ হয় পূর্ব্বে তোরণ ছিল। প্রবেশের মুখে দক্ষিণে বামে দুইটি ঘর উত্তর-দক্ষিণ দিকে বিস্তৃত ; উহার দ্বার প্রস্থের দিকে, উহার সহিত একটি করিয়া দেহলী সংলগ্ন আছে ; তন্মধ্যে সশস্ত্র প্রহরী ক্ষোদিত হইয়াছে। উঠানের প্রায় শেষ সীমায় দরদালানের প্রহরীর পার্শ্বে বাটীর পশ্চিম দিকের গৃহশ্রেণী। চত্বরের নিম্নে উঠানের উভয় পার্শ্বে ক্ষুদ্র ছাদহীন দুইটি গৃহ ; তাহার বেধ

তিন হস্ত। এই গৃহ কি কার্য্যে ব্যবহৃত হইত, বুঝিতে পারিলাম না। আধুনিক বাটীতে উঠানে এ প্রকার ঘর থাকে না। তাহার পর দুই হস্ত প্রসর উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত চত্বর। চত্বরের উত্তর ও দক্ষিণ পার্শ্বে দুইটি গৃহ, উহার দ্বার দক্ষিণে ও উত্তরে। তাহার পর বাটীর পশ্চিম দিকের গৃহশ্রেণী; ঐ গৃহাবলীর সম্মুখে চৌতারা আছে, কিন্তু বারাণ্ডা নাই। দ্বিতীয় তলে পশ্চিম ও উত্তর দিকে ঘর আছে; তাহার সম্মুখে প্রশস্ত দালান। দক্ষিণ দিকের দ্বিতীয় তলে গৃহ নাই। পশ্চিম দিকের দ্বিতীয় তলের গৃহসম্মুখস্থ দালানের স্তম্ভগুলি একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে, কিন্তু তদুপরি যে ছাদ ছিল, তাহা এখনও অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। আমার পথ-প্রদর্শক পাণ্ডা কহিলেন,—পাঁচ ছয় বৎসর হইল, কথিত স্তম্ভগুলি ইংরাজেরা উড়াইয়া দিয়াছে।

রাণী-হংসপুরের সমুদায় গৃহের বহিঃপ্রাচীরে খিলানের উপরে ও পার্শ্বে বিবিধ মনোরম বৃক্ষ, লতা ও নরনারীর ভাব-শুদ্ধ মূর্ত্তি ক্ষোদিত আছে। একটি শিল্প অত্যন্ত কৌতুকাবহ। শিল্পী টাঙ্গী দিয়া কবিতা খুদিয়াছেন। উহার প্রতি যতবার নিরীক্ষণ করিয়াছি, হাস্য সম্বরণ করিতে পারি নাই। একদল মত্তহস্তীর সহিত কতকগুলি সুন্দরী যুদ্ধ করিতেছেন। একটা হস্তী শুণ্ড তুলিয়া আক্রমণ করিতে আসিতেছে। এক অবলা একগাছি ফুলের মালা লইয়া হস্তীকে প্রহার করিবার জন্য হাত তুলিয়া মালা ছুঁড়িতেছেন। কেবল তাহাই নয়, অপর এক নারী সেই শূরসুন্দরীকে পলায়নের জন্য হস্তধারণ করিয়া ইঙ্গিত করিতেছেন। এক সুকুমারী একটি সনাল কমলকোরক গ্রহণ করিয়া হস্তীকে তাড়না করিতেছেন। আর কয়েক জন রিক্ত-হস্তে যুদ্ধ করিতে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ অগ্রসর হইতেছেন, কেহ পশ্চাৎপদ হইতেছেন। এই সুন্দরীসমাজে একটি সাহসী পুরুষ নারীদিগকে সাহায্য

করিবার জন্য অগ্রসর হইয়াছেন। তাঁহার অস্ত্র একগাছি ছড়ি। এই বাটীর চিত্রাবলী দেখিলে পূর্ব্বকালের পরিচ্ছদ ও বেশভূষার বিষয়ে বিলক্ষণ অভিজ্ঞতা জন্মে। পুরুষে মাল-কোঁচা করিয়া কাপড় পরিয়াছে। তাহার উপর কটীদেশে আর একখানি বস্ত্রখণ্ড বাঁধা আছে; তাহার অগ্রভাগ কোঁচার মত ঝুলিতেছে। গায়ে কাপড় নাই। মস্তকে দীর্ঘ কেশ ধম্মিল্ল করিয়া বস্ত্রখণ্ডসহযোগে আবদ্ধ। মুখে শ্মশ্রু বা গুম্ফ নাই। গলায় হার, হস্তে বলয়, কাহারও বা কর্ণে কুণ্ডল। স্ত্রীজাতি চিরকালই অলঙ্কারপ্রিয়। পাষাণচিত্রেও সুন্দরীদের হার, চিক, কর্ণভূষা, বলয় ও মল দেখিলাম। স্ত্রীলোকের বস্ত্রপরিধানপ্রণালী ঠিক পুরুষের মত না হউক, তাহার সহিত অনেকটা সাদৃশ্য আছে। মাল-কোঁচার উপরে একখানি দু-মুখা কিংবা এক মুখা কোঁচা ঝুলান। উর্দ্ধ অংশুকের সবিশেষ ব্যবহার দেখিলাম না। মস্তকে নানাবিধ বেণী। চিত্রে ঢালের যে প্রতিকৃতি আছে, তাহার আকার সীঁতি-মৌড়ের মত। ছত্র-দণ্ডের গায়ে এক বৃহৎ সূত্রপুচ্ছ আলম্বিত। পুরুষের পদে পাদুকা নাই। এতগুলি মূর্ত্তির মধ্যে কেবল একটি দ্বাররক্ষকের জানুদেশ পর্য্যন্ত বৃহৎ উপানৎ দ্বারা আবৃত দেখিলাম। এই পাদাবরণ ধরিয়া গ্রীক-শিল্পাধিপত্য কল্পিত হইতে পারে।

অগ্রে একটা সিদ্ধান্ত স্থির করিয়া লইলে, উহার হেতু বা উদাহরণ সংগ্রহের জন্য কষ্ট পাইতে হয় না। সকল বিষয়েই স্বপক্ষ ও বিপক্ষ যুক্তি প্রদর্শন করা যাইতে পারে। সত্য নির্ণয় করিতে হইলে, বিশ্বাসী না হইয়া সন্দিহান হওয়া উচিত। হৃদয় নিরপেক্ষ করা আবশ্যক। ন্যায়াবয়বের পথে উঠিয়া সাধারণ ভূমির স্বরূপ উপযুক্ত প্রতিজ্ঞা না পাইলে সম্পাদ্য বাহির করা অবিধেয়। ফর্গ্‌সন সাহেব স্থির করিয়াছেন, ভারতীয় স্থপতি-বিদ্যা গ্রীকদিগের নিকট হইতে লব্ধ। রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় অতি দক্ষতার সহিত তাঁহার এই মত খণ্ডন করিয়াছেন।

আমরা অপরাহ্ণে বাসায় ফিরিলাম। কপিলেশ্বরের পুরোহিতগণ অত্যন্ত বিরক্ত করিয়া কিছু দক্ষিণা লইলেন। দ্বিতীয় দিন রাত্রিকালে হরেকৃষ্ণপুর পৌছি। সাগরের জীমূত-মন্দ্র শুনিতে শুনিতে ঘুমাইয়া পড়িলাম।

পুরীতে পৌছিয়া মন নিরতিশয় উদাস হইয়া উঠিল। আমার এই প্রথম বিদেশে আসা। যাহার সঙ্গলিপ্সা প্রবল নহে এবং আত্মাভিমান অধিক, তাহার পক্ষে বন্ধুতা ঘটা কঠিন ও তাহা ঘটিলেও সহজে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। মানুষ মানুষের পক্ষে যে কি প্রয়োজনীয় সামগ্রী, তাহা আমি এখন উপলব্ধি করিতেছি। পথে যদি একটি বাঙ্গালী দেখি, তাহার সহিত বিনীত ভাবে আলাপ করিতে ইচ্ছা হয়। এক দিন কোনও অপরিচিত ব্যক্তি কহিল,—"মহানন্দ বাবু আপনার খোঁজ করিতেছিলেন। তাঁহার মাতাঠাকুরাণী কহিলেন ;—তুমি বাজারে গিয়া থাক, সে বাবুটি—যিনি সে দিন আসিয়া কহিয়াছিলেন, তাঁহার এখানে কাহার সহিত পরিচয় না থাকায় বড় কষ্ট হইতেছে—তাঁহাকে কি দেখিতে পাও? তিনি এত দিন হয় ত চলিয়া গিয়াছেন, নহিলে আসিতেন।" ইহাতে আমার অকারণ দুঃখপীড়া-গ্রস্ত মন মাতৃস্নেহের শীতলতা অনুভব করিল। দেশভ্রমণে নিত্য নূতন স্থান নূতন বিষয় দৃষ্ট হয় বলিয়া আহ্লাদিত হইবার কথা, কিন্তু সঙ্গে একখানি রঙ্গিন কাচ থাকা চাই। তাহার মধ্য দিয়া না দেখিলে কিছুই বিচিত্র বোধ হইবে না। সেই রঞ্জিত উপনেত্রের নাম অনুরাগ। অনুরাগ না থাকিলে কিছুই সুন্দর দেখায় না। আমরা নিত্য যাহা দর্শন করি, তাহার সৌন্দর্য্য গ্রহণ করিতে পারি না; এজন্য তাহাতে মন মুগ্ধ হয় না। চেষ্টা করিয়া যদি নবীন প্রদেশে উপনীত হওয়া যায়, আগ্রহের সহিত দৃষ্টি নিক্ষিপ্ত হয় বলিয়া অতি সামান্য বিষয়টিও সবিশেষ সুন্দর বোধ হইবে; তেমন মনোরম আর যেন কোথাও

মিলিবে না। আমি বিদেশে আসিয়া রঙ্গিন কাচ খানি যখন হারাইয়া ফেলিয়াছি তখনই সুখের পথ রুদ্ধ হইয়াছে।

সমুদ্রের সহিত সম্ভাষণ করিবার জন্য প্রত্যহ সৈকত-পুলিনে বিহার করিতে যাইতে হয়। কর্কটী দৌড়িয়া গর্ত্তে পলায়ন করিতেছে দেখিয়া তরঙ্গের সহিত আমিও নামিয়া যাই। ঊর্ম্মি মস্তক অবনত করিয়া যেমন বেলাভূমিতে উঠিতে থাকে, আমি অমনি ছুটিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করি। কিন্তু ফেনিল নীলাম্বু পাদুকা স্পর্শ করিয়া ফেলিল দেখিয়া হাসি আসে।

সমুদ্র-কূলে সিকতা-পল্লীর একখানি বাঙ্গালায় বাবু নবীনচন্দ্র সেন বাস করেন। "পলাশীর যুদ্ধের" মোহনলালের উক্তি তাঁহার মুখে কেমন শুনায়, জানিবার জন্য অভিলাষ প্রকাশ করিলাম। কবির নিবাস পূর্ব্ব-বঙ্গে, ইহা জানাইয়া তিনি আরম্ভ করিলেন ;—

"কোথা যাও, ফিরে চাও, সহস্র কিরণ।
বারেক ফিরিয়া চাও ওহে দিনমণি!
তুমি অস্তাচলে দেব, করিলে গমন,
আসিবে ভারতে চির বিষাদ-রজনী।
এ বিষাদে অন্ধকারে নির্ম্মম অন্তরে,
ডুবায়ে ভারত-ভূমি যেও না তপন,
উঠিলে কি ভাব বঙ্গে নিরীক্ষণ ক'রে,
কি দশা দেখিয়া আহা! ডুবিছ এখন?
পূর্ণ না হইতে তব অর্দ্ধ আবর্ত্তন,
অর্দ্ধ পৃথিবীর ভাগ্য ফিরিল কেমন!"

ইত্যাদি।

পাঠকালে কবিকে অতি সুন্দর দেখাইতে লাগিল। শ্রোতা ও পাঠক উভয়েই রসোচ্ছ্বাসে ডুবিয়া গেলেন। গ্রন্থকার কহিলেন ;—ভূদেব বাবু

এই অংশ শুনিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন। কাব্যামৃত রসাস্বাদ যে সংসার-বিষবৃক্ষের দুইটী সরস ফলের অন্যতর, তাহা বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম হইল। অতঃপর নবীন বাবুকে এখানকার এক বিবাহসভায় দর্শন করি। তিনি যেন জীবন্ত কাব্য হইয়া বসিয়াছেন। কথাপ্রসঙ্গে বিবিধ ভাষার কবিতা আবৃত্তি করিতেছেন। গঞ্জম হইতে আগতা তৈলঙ্গী অন্নপূর্ণা একটি সংস্কৃত মঙ্গলাচরণ গাইয়া পৈশাচী ভাষায় সঙ্গীত আরম্ভ করিলেন। সারঙ্গী তবলা ও মন্দিরার সহিত ব্যাগপাইপের সঙ্গত হইতে লাগিল। একজন বাদক কণ্ঠ-সঙ্গীতে যোগ দিয়া আমাদের বিরক্তি উৎপাদন করিতে লাগিলেন। সভা-ভঙ্গ হইলে কর্ত্তার বাটীতে মহাপ্রসাদ গ্রহণের জন্য যাইবার প্রস্তাব হইল। আমি তীর্থের কোনও প্রকার অনুষ্ঠানে রত নহি সুতরাং সর্ব্বজনস্পৃষ্ট অন্ন ভোজন করা অনুচিত বিবেচনা করিতেছি। বর শিবিকারোহণে যাত্রা করিয়াছেন। সম্মুখে এক থাল তণ্ডুল রক্ষিত হইয়াছে। দুই পার্শ্বে তৈলঙ্গী নটী পাল্কী ধরিয়া যাইতেছে। এটী বোধ হয়, পার্শ্ববর্ত্তী অন্ধ্রদেশীয় প্রথা। সামান্য লোকেরা বরের অগ্রে তরবারি খেলিতে খেলিতে যায়।

স্নানযাত্রার দিন দেউলে পূর্ব্বপরিচিত কবিকে পাইলাম। তিনি রক্ত-পুষ্প-মালা শিরে ধারণ করিয়াছেন। একটি দালান দেখিয়া কহিলেন, ইহার নাম 'মুক্তি মণ্ডপ'। কিন্তু কেহ যেন দীনবন্ধু বাবুর 'মুক্তি মণ্ডপ' জ্ঞান না করেন!

শ্রীমন্দির হইতে জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রা ও সুদর্শনচক্রের মূর্ত্তি বাহির হইল। সুদর্শন ও সুভদ্রা নরস্কন্ধে মণ্ডপোপরি গমন করিলেন। জগন্নাথ বলরাম হাঁটিয়া যাইবেন। তাঁহাদের কটীদেশে ডুরী বন্ধন করিয়া সম্মুখে আকর্ষণ করা হইতেছে। পশ্চাদ্ভাগে অন্য ব্যক্তি সাম্য রক্ষা করিতেছে। ইহাতে দারুব্রহ্ম লম্ফ প্রদান করিয়া চলিতেছেন। এই গমনের নাম

পাণ্ডব-বিজয়। যাত্রিগণ তাঁহার অঙ্গ হইতে শ্রীকাপড়া লোহিত-বস্ত্র ছিন্ন করিয়া লইতেছে। স্থানে স্থানে আরত্রিক হইল। ধূনুচী দণ্ডধারী অগ্রে যাইতেছে। ভেরী তুরীর শব্দে জন-কোলাহল মিশ্রিত হইয়া প্রকাণ্ড দেবপুরী কম্পিত করিয়া তুলিতেছে। ছত্র ও আড়ানি উৎসবের সমৃদ্ধি ঘোষণা করিতেছে। পঞ্চাশ প্রকারের সেবক সমভিব্যাহারে যাইতেছে। একজন দুই খণ্ড স্থূল বেত্র হস্তে ধারণ করিয়া শব্দ করিতেছে। জিজ্ঞাসা করিলাম, এ কি? উত্তর;—এও এক প্রকারের সেবা। স্নান-মঞ্চ চন্দ্রাতপে আচ্ছাদিত হইয়াছে। দেবালয়ের অভ্যন্তরস্থ সর্ব্ব তীর্থ নামক কূপোদক এক শত আট স্বর্ণবালুকা-নির্ম্মিত কলসে পূর্ব্বদিন অধিবাসের সহিত উত্তোলিত হইয়াছিল। অদ্য তাহা ষোড়শোপচারে পূজিত হইল। মুদীরথ উপস্থিত আছেন। শিরোবস্ত্রবিহীন উড়িয়াদের দলে তাঁহাকে শ্বেত শিরস্ত্রাণ ও ধবল অঙ্গরক্ষা পরিহিত দেখিয়া সহজেই নির্দ্দেশ করিতে পারা যাইতেছে। রাজার প্রতিনিধিস্বরূপে যাত্রা-উৎসবাদি কর্ম্ম ইঁহা দ্বারা সম্পন্ন হইয়া থাকে। সর্ব্বপ্রথমে মুদারথ উক্ত জলদ্বারা জগদীশকে স্নান করাইলেন, অমনি হলহলা শব্দ উপস্থিত হইল। ভক্তগণ পুষ্প উৎক্ষেপণ করিতে লাগিলেন। তদনন্তর সকল পাণ্ডারা জলাভিষেক করিল। বৈরাগীরা চামর ব্যজন ও গান করিতে লাগিল।

দ্রাবিড় প্রণালী অনুসারে জগন্নাথদেবের মন্দির দুইটি উচ্চ প্রস্তর প্রাকারে বেষ্টিত। প্রাকারের দৈর্ঘ্য ৪৫০, প্রস্থ ৪৩৬ হস্ত। ত্রিচিনা-পল্লীর শ্রীরঙ্গম-নামক দেবালয় সপ্ত প্রাকার মধ্যে স্থাপিত। ওড্র দেউলের বিশেষত্ব তাহার পিরামিড তুল্য মণ্ডপ ও অধিক প্রসারযুক্ত আমলাশীলা। কাশী অঞ্চলের দেবালয়ে চূড়ার নিম্নে আমলকী ফলের ন্যায় বর্ত্তুলাকার পলবিশিষ্ট শিলাখানি এত বড় হয় না। মন্দিরের আকৃতির ন্যায় দেশকাল-ভেদে স্তম্ভের আকারগত পার্থক্য দৃষ্ট হইয়া থাকে। কোথাও চন্দ্রকাণ্ড,

কোনও স্থানে ব্রহ্ম বা শিবকাণ্ড পাওয়া যাইবে। দ্রাবিড় গোপুরমের সহিত জগন্নাথের অংশরপিণ্ড ও ভোগমণ্ডপের কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য আছে। মাদুরার মীনাক্ষী সুন্দরেশ প্রভৃতির স্বস্তিক মন্দিরের ন্যায় ইহার প্রধান দ্বার পূর্ব্বদিকে। তৎসন্নিকটে পদ্মক্ষেত্র (কণারক) হইতে আনীত অরুণস্তম্ভ দণ্ডায়মান রহিয়াছে। সিংহদ্বারে প্রবিষ্ট হইয়া চৈতন্য কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত পতিতপাবন দর্শন করিয়া দ্বাবিংশতি সোপান উঠিতে হয়। এখানে মিষ্টান্ন প্রসাদ বিক্রয় হইতেছে। দক্ষিণে স্নানমঞ্চ, বামে একটি কুণ্ড ও কাশীবিশ্বেশ্বরের মন্দির। পাকশালায় বৃত্তাকার মহানসের উপর মৃন্ময় স্থালীগুলি (আটিকা) একশ্রেণীর পশ্চাৎ আর এক শ্রেণী উর্দ্ধে সজ্জিত করিয়া অন্নপাক করা হইতেছে। আনন্দবাজারে ক্রেতৃগণ স্বাদ গ্রহণ করিয়া ভোগ মনোনীত করিতেছে। দ্বিতীয় প্রাচীরাভ্যন্তরে শতাধিক দেবগৃহ; নৃসিংহ, সূর্য্য, শিব, পার্ব্বতী, লক্ষ্মী সকলেই আছেন। সেবার আয়োজনের জন্য পত্নি-ঘর, ভেটমণ্ডপ, চুনা-কুটাঘর প্রভৃতি প্রস্তরনির্ম্মিত গৃহ দেখা যাইতেছে। অঙ্গনের মধ্যস্থলে বহুধ্বজশোভিত চূর্ণ প্রস্তরগ্রথিত নানা ক্ষোদিত-মূর্ত্তি-বিভূষিত বৃহৎ দেউল; দীর্ঘ ১০০, প্রস্থ ৪৫, উর্দ্ধে ১২৬ হস্ত। মন্দিরটি চারি অংশে বিভক্ত; গর্ভস্থান, অংশরপিণ্ড, জগমোহন ও ভোগমণ্ডপ। গর্ভস্থানে রত্নবেদী নামক কৃষ্ণ প্রস্তরবেদীতে শ্রীমূর্ত্তি বিরাজ করেন। মন্দিরের সম্মুখীন হইলেই একটি বৃহৎ অশ্লীল মূর্ত্তি দর্শন করিয়া মস্তক অবনত করিতে হয়। ৬৯২ বৎসর অতীত হইল, বীর শ্রীগজপতি গৌড়-কর্ণাট-উৎকল-বর্গেশ্বর অনঙ্গ-ভীম ইহা নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। তিনি কর্ণাটী ছিলেন। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ কর্ণাট হইতে ওড্রে আসিয়া রাজ্য স্থাপন করেন। তমলুক পর্য্যন্ত ইঁহাদের অধিকার বিস্তৃত ছিল, এজন্য ইঁহাদিগকে বাঙ্গালার গঙ্গাবংশীয় নৃপতি বলা হয়।

স্বহস্তে পাক করিয়া, আহারান্তে প্রত্যহ মধ্যাহ্নে জগমোহনের কৃষ্ণ-

পাষাণতলে আমি শয়নোপবেশন করিয়া যাপন করি। কত পাপী তাপী শ্রীমন্দিরে আসিতেছে। জগদীশ-সন্নিকটে আত্মনিবেদন করিয়া হৃদয়ের ভার অপনয়ন করিয়া যাইতেছে। যুক্তকর গরুড়মূর্ত্তির সন্নিকটে দণ্ডায়মান হইয়া গর্ভগৃহের দিকে দৃষ্টিপাত-পূর্ব্বক একজন ওড্রীয় "এ কলা শ্রীমুখ" সম্বোধন করিয়া করযোড়ে স্বকীয় কষ্ট জ্ঞাপন করিতেছে। মধ্যে মধ্যে পরিচারকের উচ্চ অথচ গম্ভীর আহ্বানধ্বনি বিমানের সুবৃহৎ প্রকোষ্ঠ তরঙ্গায়িত করিতেছে। কেহ বা যাত্রীদলের সহিত কথোপকথনে নিযুক্ত। অন্নস্থালী-বাহকগণ মুখ বদ্ধ করিয়া রন্ধনশালা হইতে প্রচ্ছন্ন পথে ভোগ-মণ্ডপে অবিরত ভার আনয়ন করিতেছে। লক্ষ লোক হইলেও প্রসাদের অকুলান হইবে না। বল্লভভোগ, খিচুড়ীধুপ, সন্ধ্যাধুপ ও বড়সিঙ্গার-ধূপের অপেক্ষা দুইপ্রহর-ধূপের আয়োজন অধিক। পুরী সহর বা উপ-কণ্ঠের কোনও অধিবাসীর বাটীতে ভোজ হইলে, ভোগ পাইবার জন্য তথা যাত্রিকগণও রন্ধনশালায় অগ্রে দ্রব্যজাত পাঠাইয়া থাকেন। এত অন্নের ব্যাপার আর কুত্রাপি দৃষ্ট হইবে না। শ্রীক্ষেত্র এ বিষয়ে অতুল। ত্রিবাঙ্কুরের পদ্মনাভের শয়ানমন্দিরে অন্নক্ষেত্র ইহা অপেক্ষা হীন। অক্ষয়বটতলে বন্ধ্যাগণ অঞ্চল বিস্তৃত করিয়া বসিয়া আছে;—যদি ফল পড়ে ভক্ষণ করিবে। দেবস্থানের চতুর্দ্দিকে পুরদ্বার আছে। উত্তরের অন্তর দ্বার পার হইয়া, দ্বিতীয় প্রাকারের মধ্যে আটিকা-বন্ধনের ঘর, উহার নাম বৈকুণ্ঠ। এ জন্য তাহা দ্বিতলের উপর স্থাপিত। নিকটে একটি ক্ষুদ্র তরুতলে দারুব্রহ্মের পুরাতন কলেবর পচিতেছে। যবন আক্রমণে বারদ্বয় শ্রীমূর্ত্তিকে নূতন কলেবর ধারণ করিতে হইয়াছিল। রক্তবাহুর আক্রমণ-কালে জগন্নাথ ভূ-গর্ভে প্রোথিত হন। কালাপাহাড় নামধেয় মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী ব্রাহ্মণজাতীয় রাজু চিতা প্রস্তুত করিয়া তাঁহাকে দাহ করে।

জগন্নাথদেবের পুরী যেমন দক্ষিণী আদর্শে নির্ম্মিত, সেবকের মধ্যে

তেমনি মান্দ্রাজী দেবালয়ের কঞ্চনী এখানে দেবদাসী নাম গ্রহণ করিয়া উৎসবকালে নৃত্য গীত করিয়া থাকে। জগন্নাথের চন্দন-যাত্রা মান্দ্রাজী উৎসব। সে দেশে যেমন ক্ষুদ্র ভোগমূর্ত্তিকে প্রতিনিধি করিয়া কার্য্য সম্পন্ন হয়, এখানেও সেই ব্যবস্থা। জগন্নাথের প্রতিনিধির নাম মদন-মোহন, রামকৃষ্ণ নৃসিংহ ও দোলগোবিন্দ। স্বর্ণনির্ম্মিত শ্রী ও রৌপ্যনির্ম্মিত ভূ-দেবী সুভদ্রার প্রতিনিধিত্ব করেন। সুভদ্রা বলিলে কৃষ্ণের ভগিনী বুঝায়, এজন্য তিনি জগন্নাথের ভগিনা বলিয়া উল্লেখিত হন; কিন্তু তাঁহার প্রতিনিধির নাম যখন লক্ষ্মী পাইতেছি, তখন যুগভেদে সুভদ্রাকে জগন্নাথের বনিতা কহিতে হয়। বৈশাখী শুক্লা তৃতীয়ায় প্রতিমূর্ত্তিগুলিকে বিমানে আরোহণ করাইয়া নরেন্দ্র নামক সরোবরে লইয়া গিয়া থাকে। বিংশতি দিবস তড়াগ মধ্যে বারিপরিবেষ্টিত গৃহে বা নৌকায় বিহার জন্য দেবতারা গতিবিধি করেন। অন্ধ্র, কর্ণাট, দ্রাবিড় দেশে শৈব বা বৈষ্ণব দেবালয়ের সম্মুখীন হইলেই, বিগ্রহের জলবিহার-উৎসবের জন্য উক্তপ্রকারের টেপ্প-কোলম্ অর্থাৎ সরোবর এবং অভিযানের জন্য একখানি উচ্চ রথ দৃষ্ট হইবে। অতএব জগন্নাথের রথযাত্রার সাদৃশ্য দেখিবার জন্য আমাদিগের ফাহিয়ানের সহিত খোটানে যাইবার প্রয়োজন নাই, এবং বৌদ্ধ দন্তোৎ-সবই রথযাত্রা, এরূপ বলিবারও আবশ্যকতা নাই। মান্দ্রাজী রথের গঠন-প্রণালী বৃন্দাবনের শেঠের কুঞ্জের তোরণ বা গোপুরম-সদৃশ। রথগুলি সম্পূর্ণরূপে খোদকারীতে পরিপূর্ণ। তাহাতে বহু দেবদেবীর লীলা প্রদর্শন করা হইয়াছে। কিন্তু উহাতে অশ্লীল চিত্রেরও অভাব নাই।

এক্ষণে জগন্নাথ, সুভদ্রা ও বলরামের মূর্ত্তিকে বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘ নামক বৌদ্ধযন্ত্র বা স্তূপত্রয়ের অনুকরণ বলা অন্যায় বিবেচনা করিতেছি। সত্য বটে, অনেক স্থলে দেখা গিয়াছে, বৌদ্ধ দেবালয় শৈব বা বৈষ্ণব দেবতার আশ্রয় হইয়াছে, কিন্তু তাহাতে বৈচিত্র্য কি? বৌদ্ধ ধর্ম্ম বিজাতীয় নহে,

তিব্বত চীনের অধিবাসীকে হিন্দু বলিতে পারা যায় না, এই জন্য এক্ষণে বৌদ্ধমতাবলম্বীদিগকে হিন্দুর সহস্র প্রকার সম্প্রদায়ের অন্যতর বলিয়া জ্ঞান হইতেছে না। এতদ্ভিন্ন বৌদ্ধ মত এই পদের পরিবর্ত্তে বৌদ্ধধর্ম্ম কথাটি প্রচলিত হওয়ায়, বিষম ভ্রমের কারণ হইয়াছে। ইহাতেই হিন্দুর দশাবতারে বুদ্ধের নাম শুনিলে আশ্চর্য্যান্বিত হই। আমাদের দেবতা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। বৈদিক, পৌরাণিক ও গ্রাম্য। জগন্নাথ, সুভদ্রা ও বলরামকে অধুনা পৌরাণিক শ্রেণীর অন্তর্গত দেখা যাইতেছে। আমার বোধ হয়, এই মূর্ত্তিত্রয় কলিঙ্গ দেশের পূর্ব্বতন গ্রাম্য দেবতা। নিকটবর্ত্তী জনপদের দ্রাবিড় ও কর্ণাটী গ্রাম্য দেবগণ এ বিষয়ে কি সাক্ষ্য প্রদান করেন, তুলনার জন্য তাহা গ্রহণ করা উচিত।

মনর-স্বামী ও তাঁহার মাতা পচুম্মা।—বটবৃক্ষমূলে অতি ক্ষুদ্র গৃহে অসম্পূর্ণ অবয়বের একখানি প্রস্তরের মূর্ত্তি, মুখে সিন্দূর মাখান, পরিধানে হরিদ্রারঞ্জিত বসন, ইঁহার নাম পচুম্মা। ব্রাহ্মণেতর জাতিতে ইনি রোগোপশমনের জন্য অর্চ্চিত হইয়া থাকেন। নীচ জাতি ইঁহার পূজারী। মৃন্ময় ঘোটক, হস্তী ও দানবের মূর্ত্তি উপহার স্বরূপ প্রদত্ত হইয়া মনর-স্বামীর সম্মুখে রক্ষিত হয়। কোনও স্থানে দীর্ঘাকার ভীষণদর্শন রঞ্জিত পিশাচ মূর্ত্তি দণ্ডায়মান আছে। মনর-স্বামী ও তাঁহার মাতা পচুম্মাও ভূতযোনি। কিন্তু ইঁহারা বলি গ্রহণ করেন না। বল, সেম, ধর্ম্মদ ও মৃত্যু নামক অনুচর পিশাচের জন্য বলির ব্যবস্থা আছে। মরিমা ও পুতলিমা বলিগ্রহণ করেন। কোথাও কাঠের কুঁদা দেবতার স্থান অধিকার করিয়াছে।

জগন্নাথ-স্বামী ও তাঁহার ভগিনী সুভদ্রা।—ইন্দ্রদ্যুম্ন প্রেরিত বিদ্যাপতি নীলগিরিনিবাসী বসু-শবরের গৃহে বাস করিয়া নীলকন্দরে বটবৃক্ষমূলে চণ্ডাল কর্ত্তৃক পূজিত নীলমাধব দর্শন করেন।

বসু-শবরের পুত্র দ্বৈতাপতি হইতে সেই বংশীয় লোকেরা, এক্ষণে দ্বৈতা এবং পতি, এই দুই পৃথক্ উপাধি ধারণ করিয়া, জগন্নাথের সেবাকার্য্যে নিযুক্ত আছেন। দ্বৈতা এখনও শবরজাতীয় বলিয়া পরিচিত। তাহারা শ্রীমূর্ত্তির অঙ্গরাগ করে। পতি ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছে। অঙ্গরাগকালে তাহার দ্বারা পূজাকার্য্য সমাধা হয়। শবর-শব্দবোধক শোঁয়ার নামধারিগণ বলভদ্রগোত্রীয় ব্রাহ্মণ বলিয়া খ্যাত। শোঁয়ার বড় পাক-শালায় বাসন রক্ষা করে। শোঁয়ার রন্ধন ও মহাশোয়ার পিষ্টক প্রস্তুত ও ভোগবহন করিয়া থাকে।

উল্লিখিত বিবরণের উপর নির্ভর করিয়া, নিম্নলিখিত মীমাংসায় উপনীত হওয়া যায়।—

(১) ব্রাহ্মণ যে দেবতার পুরোহিত নহেন, নীচ জাতি যাহার পূজক, তাহাকে গ্রাম্য দেবতা কহিতে হইবে।

(২) গ্রাম্য দেবতার অধিষ্ঠাত্রী প্রায়শঃ ভূতযোনি, এজন্য মূর্ত্তি বিকলাঙ্গ হইয়া থাকে।

(৩) শবরের দেবতা যখন বিষ্ণুত্ব লাভ করিলেন, তাঁহার ভগিনীকে সুভদ্রা নাম দেওয়া হইল। অপর সহচরটি বলভদ্র নামে আখ্যাত হইলেন। বৈষ্ণবগণ যুগলমূর্ত্তি ধ্যান করিয়া থাকে, অতএব কিছুকাল পরে সুভদ্রাকে কৃষ্ণের বনিতা করিয়া দিতে হইয়াছে। কিন্তু নামের মধ্যে একটা রহস্য রহিয়া গেল। মূর্ত্তিতে গ্রাম্যভাব লোপ পাইল না।

ভাস্করবিদ্যায় আদিম অবস্থায় ক্ষোদিত অবয়ব বিকটাকার হইতে পারে। পেরু দেশের টিটি-কাকা জলাশয়ের সন্নিকটস্থ টিয়াওয়ানেকোর প্রস্তরক্ষোদিত নৃমুণ্ডের চিত্র দর্শন করিয়া একটি শিশু জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, —"বাবা, ইহা কি জগন্নাথের মুখ?" দ্রাবিড় দেশে বৃহৎকায় অসুরের ব্যাঘ্র-দানব-সদৃশ রঞ্জিত মুখশ্রী দর্শন করিলে কলিঙ্গের ব্যাঘ্রদানব বা নৃসিংহ

জগন্নাথ সহসা স্মৃতিপথে উদিত হন। জগন্নাথের গুহ্য নাম দধিবামন। মহারাষ্ট্র-ভোঁসলে বংশীয় নাগপুরাধিপতির সহিত সন্ধিসূত্রে, বৃটিশরাজ জগন্নাথের কর্তৃত্ব প্রাপ্ত হন। খৃষ্টীয় ধর্ম্ম-প্রচারকদিগের তাড়নায়, তাঁহাদের উক্ত কার্য্য হইতে বিরত হওয়া আবশ্যক হওয়ায়, খুরদার রাজাকে মন্দিরের ভার দেওয়া হইয়াছে। সম্প্রতি নরহত্যাপরাধে সেই রাজবংশীয় 'চলন্তি-বিষ্ণু' যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরিত হইয়াছেন। জগন্নাথের সেবাদিকার্য্যে বার্ষিক দ্বাত্রিংশৎ সহস্র মুদ্রা ব্যয়িত হইয়া থাকে। রথ প্রস্তুত করণ প্রভৃতি নৈমিত্তিক কার্য্যে পুরুষোত্তমের মঠধারী মোহন্তেরা উপকরণসামগ্রী প্রদান করিয়া থাকে। ঐ কার্য্যের জন্য জগন্নাথের ভূসম্পত্তি মোহন্তেরা জমিদারীস্বরূপে ভোগ করিতেছেন। একবার পপরিয়া মঠের মোহন্ত নূতন কলেবর উপলক্ষে নিজ ব্যয়ে অযোধ্যা হইতে স্পেশ্যাল ট্রেণে তের শত রামানন্দী বৈরাগী সমভিব্যাহারে পুরী যাইবার জন্য কলিকাতায় আগমন করেন। এখানে ভারতীয় সমস্ত উদাসীন সম্প্রদায়ের মঠ আছে। পুরীতে মোহন্ত ও পাণ্ডা প্রধান অধিবাসীর মধ্যে গণ্য।

বিসূচিকা রোগের প্রাদুর্ভাব জন্য রথস্থ বামন দর্শন করিতে পাইলাম না। সামুদ্রিক পীড়ার ভয়ে বাষ্পীয় তরণীতে আরোহণ করিতে ইচ্ছা হইল না। গরুড়ধ্বজ, পদ্মধ্বজ ও নাঙ্গল-ধ্বজ রথ নির্ম্মিত হইতেছে দেখিয়া দোলমণ্ডপসাহী হইতে রাণীগঞ্জের দোতলা গো-শকট আরোহণে স্থলপথে যাত্রা করিলাম। কটকের পর বিরূপা পার হইয়া নূতন পথ আরম্ভ হইল। নীলগিরি শ্রেণীর বরুণী পাহাড়ে মেঘ ভ্রমণ করিতেছে। কবুযুতীরে শকট পার করিবার জন্য নৌকার প্রতীক্ষায় ধৈর্য্য শিক্ষা হইল। শ্রীক্ষেত্র হইতে কলিকাতার দূরতা ১৫০ ক্রোশ। বালেশ্বর অর্দ্ধ পথে অবস্থিত। রাজা সুখময়ের সৎপথে অন্ধ ও মহাব্যাধিতে গলিতপাদ ব্যক্তি একাকী পুরুষোত্তমে চলিয়াছে।

সুবর্ণরেখা নদী উৎকলের উত্তর সীমা। উহার কিঞ্চিৎ দক্ষিণ হইতে দৃষ্ট হইতেছে, পুরুষেরা দীর্ঘকেশ ধারণ করে না। জলেশ্বরে বাঙ্গালীর ন্যায় কর্ত্তিত কুন্তল দেখা দিল; কাহারও শিখা আছে। দাঁতন অভিমুখে অগ্রসর হইয়া দেখা গেল, স্ত্রীলোকেরা কেহ কেহ বাঙ্গালীর মত চুড়ি পরিয়াছে। অনেকে হস্তে শঙ্খ পরিহিত। শঙ্খের অনুকৃতি পিত্তল খাড়ুর ব্যবহার প্রায় ত্যক্ত হইয়াছে। এই সকল পরিবর্ত্তন দেখিয়া সবিশেষ আহ্লাদ হইল। স্থলপথে না আসিলে, দেশের সন্ধি নয়নগোচর হইত না। উড়িয়া যে কেমন শনৈঃ শনৈঃ বাঙ্গালীত্ব লাভ করিতেছে, তাহা উপলব্ধি হইত না। দাঁতনবাসীরা আপনাদিগকে মধ্যদেশী কহে। এখানে পাঠশালায় একবেলা উড়িয়া, অন্য বেলা বাঙ্গালা শিক্ষা দেওয়া হয়। উড়িয়া বর্ণমালা তেলুগু অক্ষরের ন্যায় গোলমাত্রা বিশিষ্ট, এবং উভয় লিপিই তালপত্রোপরি লৌহ শলাকা বিদ্ধ করিয়া লিখিত হইয়া থাকে। উড়িয়া বর্ণমালার উ-কার, ঠ, ড, ঢ তেলগু,—অপর বর্ণের সহিত বাঙ্গালা ও দেবনাগর অক্ষরের সাদৃশ্য আছে। উড়িয়া ঠ-কার অবিকল পালি অক্ষর, উহার সহিত কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য নাই। কলিঙ্গ অন্ধ্র দেশের পারিপার্শ্বিক; এ জন্য পুরী বিভাগের ওড্রনারী সীমন্তে সিন্দুর ধারণ করে না, এবং ধড়ার কচ্ছ লুকাইয়া সেই শাড়ীর দ্বারা উড়িয়ারা ঘের দিয়া থাকে। বালেশ্বরের উত্তর হইতে বস্ত্রপরিধান ক্রমে বাঙ্গালী রকম হইয়া আসিতেছে। দাঁতন হইতে যোজনদ্বয় অন্তরে বিম্বচটিতে আসিয়া দেখি—পরিচ্ছদাদি একেবারে বাঙ্গালী হইয়া গিয়াছে, ভাষা উড়িয়াই আছে; কিন্তু দুই-একটি বাঙ্গালা শব্দ ও ভঙ্গী ব্যবহৃত হয়। পাঁচ ক্রোশ দূরবর্ত্তী মকুরামপুরে তদ্বিপরীত দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। সেখানে ভাষা বাঙ্গালা, অথচ দুই-একটি উৎকল শব্দের ব্যবহার হইতেছে।

বারাণসী।

অগ্নিষ্টোম যজ্ঞ।

১২৮৬ সালে কাশীধাম রাজমন্দিরঘাটস্থ যজ্ঞশালায় শ্রীযুক্ত বালশাস্ত্রী সোমযাগ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, শুনিয়া সাহ্লাদে নববস্ত্র পরিধান করিয়া যজ্ঞস্থলে উপনীত হইলাম। এতদিনে আমার বহুকালপালিত একটি আশা পূর্ণ হইল। এই যাগের সার্দ্ধপক্ষব্যাপী অনুষ্ঠান আমি প্রথম হইতে দেখিতে পাই নাই, তন্নিবন্ধন পূর্ব্বে কি হইয়া গিয়াছে, তাহা অন্য দর্শককে জিজ্ঞাসা করিয়া লইতে হইল। তদ্দিন-সাধ্য ক্রিয়ার অবসানে ঋত্বিকগণ আহবনীয় অগ্নিকুণ্ডসমীপে বসিয়া প্রশান্তভাবে যখন সামগান করিতে লাগিলেন, তখন আমার বোধ হইল, যেন আমি বহু সহস্র বর্ষ পূর্ব্বে গিয়া পড়িয়াছি। সেই কালের গৃহ, মণ্ডপ, রথ, আচার, ব্যবহার, ক্রিয়া কলাপ সমস্তই যেন আমার সম্মুখে বিদ্যমান। সেই ঋষিগণ আমার সম্মুখে বসিয়া সামগান করিতেছেন। বেদি নির্ম্মাণ করিবার জন্য ঋত্বিক্‌গণ স্বয়ং যখন কাষ্ঠের প্রহরণ লইয়া ভূমি সমতল করিতে লাগিলেন, তখন ঠিক সেই বৈদিক কাল বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। যেন এখনও লৌহের ব্যবহার মানুষে তত শিখে নাই, বা লৌহ সুপ্রাপ্য হয় নাই, অথবা শ্রম-বিভাগ হইয়া নানা ব্যবসায়ের উৎপত্তি হয় নাই। যিনি ঋত্বিক্, তিনি স্থপতি এবং তাঁহাকেই তক্ষার কর্ম্ম সম্পাদন করিতে হইতেছে। আর্য্যজাতির শৈশব অবস্থা যেন উত্তীর্ণ হয় নাই। সভ্যতা উপস্থিত হয় নাই।

যজমান শ্রীমৎ বালশাস্ত্রী ও তাঁহার পত্নী সদা যজ্ঞশালায় বিদ্যমান। যজমান-পত্নীর মাথায় কাপড় নাই। মস্তকের কিয়দ্দেশ ক্ষৌমসূত্র-

নির্ম্মিত রক্তবর্ণ জাল দ্বারা আচ্ছাদিত। প্রাচীন কালে যে অবগুণ্ঠন প্রথা চলিত ছিল না, তাহা স্পষ্টই বুঝা যাইতে লাগিল। বালশাস্ত্রী বৃদ্ধ, কিন্তু পত্নী যুবতী। দ্বিতীয় পক্ষের সংসার। দক্ষিণাপথের কঙ্কণ-প্রদেশবাসী চিত্তপাবন ব্রাহ্মণ জাতির বর্ণ গৌর ও শরীর সুগঠিত,—ইহাতেই যজমান-পত্নীর সৌন্দর্য্য অনুমিত হইতে পারে। পত্নীর পাঠ্য মন্ত্র তিনি স্বয়ং বলিতে লাগিলেন, এবং দেখিলাম, তিনি বেদ বুঝেন। যেখানে তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া মন্ত্রে সুপুত্র কামনা করা হইতে লাগিল, সেই স্থলে তিনি হাসিতে লাগিলেন ও ঋত্বিক্‌ও হাসিতে লাগিলেন। যজ্ঞকালে মধ্যে মধ্যে যজমান-পত্নী বেদানা ও দুধ খাইতে লাগিলেন। যজমানকেও খাইতে দেখিয়াছি! ঋত্বিকেরাও অবশ্য খাইয়া থাকেন। অগ্নি-চয়ন অতি চমৎকার ব্যাপার। একখানি কাষ্ঠের উপরিভাগ কিয়ৎ পরিমাণ কাটিয়া একটি গর্ত্ত করা আছে, তদুপরি তুরপুণসদৃশ একটি কাষ্ঠখণ্ড বসাইয়া তাহার মাথায় আর একখানি অরণি রক্ষা করিয়া রজ্জু দ্বারা মধ্যবর্ত্তী দণ্ড চালনা করা হইতে লাগিল। ইহাতেই অধঃস্থিত অরণিতে অগ্নি জন্মিল। সেই অগ্নি বেদীবিশেষে স্থাপিত হইল। কয়েকটা ছাগ আনিয়া নানা অনুষ্ঠানের পর বধ করিবার জন্য গুপ্তস্থানে লইয়া যাওয়া হইল। শুনিলাম ছাগের মুখে সুপারি পুরিয়া, যাহাতে শব্দ করিতে না পারে, এমন ভাবে ধরিয়া রাখিতে হয় এবং গোয়ালাতে প্রহার করিয়া তাহার প্রাণ সংহার করে; কিন্তু সেখানে কি হইল, জানি না। বহুক্ষণ বিলম্বে কাষ্ঠিকাতে মাংস সংলগ্ন করিয়া অধ্বর্য্যু আসিলেন, তাহাতে ঘৃত দিতে লাগিলেন ও বেদির অগ্নিতে পাক হইতে লাগিল। ঠিক যেন কাবাব প্রস্তুত হইতেছে। পরে তদ্দ্বারা হোম হইল। তাহার পর যজমান, তাঁহার পত্নী ও ঋত্বিক্‌গণ শেষভাগ অতি সন্তর্পণে কণামাত্র আহার করিলেন। পঞ্চদ্রাবিড়েরা যদি মদ্য বা মাংস ভোজন করেন, তবে তিনি জাতিচ্যুত হন, কিন্তু

বৈদিক ক্রিয়া বলিয়া তাহার ব্যতিক্রম হইল। সোমাভিষবের দিন কাশীরাজ যজ্ঞ দেখিতে আসিলেন। তাঁহাকে একখণ্ড কণ্ডিত সোম আনিয়া দেখান হইল; দেখিতে যেন সজিনা-খাড়ার মত। কাশীতে কয়েক জন মহারাষ্ট্রিয়ের বাটীতে সোম পাওয়া যায়। তাঁহারা টবে গাছ বসাইয়া রাখিয়াছেন। কিন্তু ইহাতে পত্র জন্মে না। বেদে উক্ত হইয়াছে, পর্ব্বতের শিখরভাগে পাষাণ-সন্ধিতে সোম-বল্লীর জন্ম। তাহার অন্যথা ঘটিয়া গৃহে উৎপন্ন হওয়ায় বোধ হয় পত্রোদ্‌ভেদ হয় না। অথবা ইহা সে সোম নহে, অনুকল্প মাত্র। সোমরস-হবন সর্ব্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ। সকল অপেক্ষা যে বেদি বৃহৎ, তাহাই সোম আহুতি লইবার অগ্নি-বেদি। যজ্ঞে পৃথক্ পৃথক্ কর্ম্ম নির্ব্বাহের জন্য বহু ঋত্বিক্ আছেন, তাঁহারা এক্ষণে সকলে একত্র বেদির চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন করত দণ্ডায়মান হইয়া প্রত্যেকে সোমরসপূর্ণ পাত্র অর্থাৎ কাষ্ঠনির্ম্মিত গ্লাস গ্রহণ করিয়া বার বার হোম করিতে লাগিলেন এবং পুনঃ পুনঃ ঋত্বিক্‌গণ সেই পাত্র মুখে সংলগ্ন করিয়া সোমপান করিতে লাগিলেন। তাহা দ্বারাই বার বার হবন চলিতে লাগিল। অন্যান্য বস্তু দ্বারা হবন হইলে পর, শেষভাগ ঋত্বিক্‌গণ গ্রহণ করেন; কিন্তু সোমরসের হবনসম্বন্ধে সে নিয়ম নহে। ইহা মাদক দ্রব্য, তাই বোধ হয় এখানে তত বিলম্ব অসহ্য, উচ্ছিষ্ট পাত্রে হবনও দূষ্য নহে। দেখিয়া ভাবিতে লাগিলাম, ঋষিগণ কেমন মাতাল ছিলেন! মণ্ডীর রাজা বিবিধ বস্ত্র, এক থাল রৌপ্যমুদ্রা ও একখানি অভিনন্দনপত্র সমারোহের সহিত বাদ্য বাজাইয়া উপহার প্রেরণ করিয়াছিলেন। শাস্ত্রী মহাশয় যজ্ঞকালে সংস্কৃতমাত্র কহেন; কিন্তু এক্ষণে মুদ্রাবাহককে হিন্দিতে রাজার কুশল জিজ্ঞাসা করিতে হইল। বালশাস্ত্রী অসাধারণ পণ্ডিত, সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা; বেদ ও ব্যাকরণ উত্তমরূপ জানেন। উক্ত মণ্ডী-রাজের অনুরোধে কাশীর সংস্কৃত

রাজ-বিদ্যালয়ের অধ্যাপকতা ত্যাগ করিয়া অগ্নিহোত্র গ্রহণ করিয়াছেন। সেই জন্যই এক্ষণে অগ্নিষ্টোম যজ্ঞ করিতে সমর্থ হইলেন। অগ্নিহোত্রী না হইলে যজ্ঞ করা চলে না। কাশীতে কোন কোন রাজা আসিয়া যজ্ঞ করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু তিনি স্বয়ং তাহা করিতে পারেন না; একজন অগ্নিহোত্রী দেখিয়া তাঁহাদ্বারা কার্য্য সম্পাদন করান।

যজ্ঞশালার অনুষ্ঠানপদ্ধতি ঋক্‌বেদী হইলেও এস্থলে আনুপূর্ব্বিক বিবরণ যজুর্ব্বেদসংহিতা হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিতে হইল। যথা—যজ্ঞশালা প্রবেশ। যজমানের মস্তক ও শ্মশ্রু মুণ্ডন। স্নান। ক্ষৌমবস্ত্র (শণ বা অতসী-নির্ম্মিত) পরিধান। আপাদ-মস্তক নবনীত-মর্দ্দন। অঞ্জন ধারণ। উভয় হস্ত মুষ্টিবদ্ধ করিয়া প্রতিজ্ঞা। যজমান ও তৎ-পত্নীর উপবেশনার্থ কৃষ্ণাজিন। মেখলা-গ্রহণ। মেখলায় নীবি-বন্ধন। উষ্ণীষ ধারণ। উত্তরীয় বসনের দশাতে কৃষ্ণ-বিষাণ বন্ধন। ঔডুম্বর-দণ্ড গ্রহণ। ঋত্বিক্‌গণকে যজ্ঞানুষ্ঠানের আদেশ। আচমন। অ-মৃন্ময় পাত্রে সকলের দুগ্ধ পান। শয়ন। প্রবুদ্ধ হওয়া। যজ্ঞশালার দ্বার রুদ্ধ করিয়া কুশা-তৃণে সুবর্ণখণ্ড-বন্ধন। গো বা ছাগ বিনিময়ে সোমক্রয়। ক্রীত সোমের চারিভাগ করণ। মস্তকে উষ্ণীষ চতুর্গুণ করিয়া সোমবল্লী গ্রহণ। সোম মস্তকে করিয়া শকটে রক্ষা। অশ্ব বা বৃষভদ্বয় দ্বারা শকট চালন। সোমবাহী শকট যজ্ঞশালায় উপস্থিত হইলে আহ্লাদ-সূচক মৃগ বলি। আসন্দীতে সোমস্থাপন। সোমের পঞ্চ-বিংশতি অংশে বিভাগ। (অগ্নিচয়ন) একখণ্ড সোম বেদিতে গ্রহণ। অরণীদ্বয় মন্থন করত অগ্নি-উৎপাদন। মথিত অগ্নিসহ আহবনীয় অগ্নির যোগ। আহুতি। ব্রত-গ্রহণ। (সোমাভিষব) সোমবল্লী সকলে জলসেক। সোম ছেঁচন। তিন দিনে, তিন আহুতি। (উত্তর বেদি নির্ম্মাণ), নানা স্থাপত্য কর্ম্ম। (হবির্দ্ধান ক্রিয়া) সোম-শকট

রক্ষার্থ যে স্থানে মণ্ডপ প্রস্তুত করা হইবে তথায় হবির্দ্ধান অর্থাৎ সোমবাহী শকট লইয়া যাওয়া। যজমান-পত্নী কর্ত্তৃক শকটের অক্ষ-ধুর সিক্ত করা। খুঁটি পুতিবার জন্য ভূমি খনন। চাল দেওয়া। (উপরব) গর্ত্ত করা। হস্ত মার্জ্জনা। (ঔডুম্বর প্রয়োগ) সদোমণ্ডপের জন্য গর্ত্ত করা। তাহার চতুর্দ্দিকে যব বপন। ঔডুম্বরী প্রোথিত করা। ছদি আরোপণ। কুট্যবদারণ বা চাল ছাওয়া। (ধিষ্ণ্য প্রকরণ) নানা ধিষ্ণ্য প্রস্তুত করা। হস্ত দ্বারা সদোমণ্ডপ বা সভামণ্ডপ মার্জ্জিত করা। দ্বারপ্রদেশস্থিত স্তম্ভাদি ধৌত করণ। ঋত্বিগভিমন্ত্রণ। পৃষদাজ্য হোম। গ্রাব, দ্রোণ, কলশ ও সোম পাত্র রক্ষা। কৃষ্ণা-জিনের উপর চর্ম্মবদ্ধ সোমের গাঁইট স্থাপন। গাঁইট খুলিয়া প্রসারিত করণ। (যূপ প্রকরণ) তক্ষার সহিত বনে গমন করিয়া যূপ্য বৃক্ষ অভিমন্ত্রণ। বৃক্ষ ছেদন ও যূপস্তম্ভ নির্ম্মাণ। ঋত্বিক্‌গণ কর্ত্তৃক যূপকাষ্ঠ প্রোথিত করণ। (অগ্নি সোমীয় পশু প্রয়োগ) তৃণ দেখাইয়া পশুকে অভীষ্ট স্থানে আনয়ন। ত্বষ্টার প্রতি পশু বধের আদেশ। পশুর শৃঙ্গে নাগ-পাশ বন্ধন। যূপে বন্ধন। তৃণ ও জল দান। জল-পাত্র হস্তে যজমান-পত্নীর আগমন। পত্নী কর্ত্তৃক হত পশুর সর্ব্বাঙ্গ ধৌত করণ। উদর-ত্বচ ছেদন। স্রুবাসহযোগে ঘৃত মিশ্রিত মেদ অগ্নিতে দান। খণ্ডখণ্ডীকৃত মাংস প্রতিপ্রস্থাতা কর্ত্তৃক হরণ। (সোমাভিষবের শেষ ভাগ) অভিষবের জন্য নদী হইতে জল আনয়ন। কুটিবার পাথরের নিকট সোম লইয়া যাওয়া। সোম কুটা। সোমরস আহুতি। জলাশয়ে যাইয়া আহুতি প্রদান। সোমছেঁচা। (গ্রহ গ্রহণ প্রকরণ) (প্রাতঃসবন) সোমরস হবন। সোমরসে সক্তু মিশ্রণ। (মাধ্যন্দিন সবন) (দক্ষিণা) গাভী ও সুবর্ণ দান। বস্ত্র দান। অশ্বদান। মন্থ, ওদন এবং তিল প্রভৃতি দান। (তৃতীয়

সবন) সোমে দধি মিশ্রণ। যজমান-পত্নী কর্তৃক পুত্রভূত পাত্র দর্শন। ঋত্বিক্‌গণ কর্তৃক সবনীয় পুরোডাশ ইড়া ভক্ষণ। হবন। পত্নী কর্তৃক পুত্র কামনায় প্রজাপতি অর্থাৎ উদ্গাথার রেতঃ প্রার্থনা। সোমরস সহ ভৃষ্ট যব মিশ্রণ। (শেষ ক্রিয়া) সমস্ত ঋত্বিক কর্তৃক সোমরসে সিক্ত ভৃষ্ট যব ভক্ষণ। শাকল হোম। সমিষ্ট যজুর্হোম। (বিসর্জ্জন) যজমানের হস্তস্থিত কৃষ্ণবিষাণ ও কটিস্থ মেখলা ক্ষেপণ। (অবভৃথ ক্রিয়া) ঋত্বিক্‌গণপরিবেষ্টিত হইয়া যজমানের নদীতটে গমন। জলমধ্যে সমিৎ প্রক্ষেপ করিয়া আজ্য হোম। সোমের ছিবড়ে পূর্ণ কলস ভাসাইয়া রাখা। ঐ কুম্ভ মগ্ন করিয়া যজমানের নিমজ্জন। স্নান। যজ্ঞাগারে আসিয়া নিত্য স্থাপিত আহবনীয় অগ্নিতে সমিদাধান।

মানবজাতির যখন জ্ঞান বৃদ্ধি হয় নাই, তখন সৃষ্টিতে সকল ব্যাপার যে নিয়মাধীন, এ সংস্কার জন্মে নাই। তাহারা ভাবিত, মানুষ যেমন ইচ্ছা হইলে কিছু করে, নহিলে বিরত থাকে, সেই প্রকার নৈসর্গিক কার্য্যেরও স্থিরতা নাই। তাহারা কোনও ব্যাপার না করিলে যেমন কিছু নিষ্পন্ন হয় না, তদ্রূপ সৃষ্টিতে যে সকল অলৌকিক ঘটনা দৃষ্ট হয় তাহা (অবশ্য) করিবার কেহ আছে। পৃথিবীতে দেখিতে পাওয়া যায়, অগ্নির ক্ষমতা বিলক্ষণ। সূর্য্য দিবা করেন। চন্দ্র রাত্রিকালে আলোক দেন। ইঁহারা একবার চলিয়া যান ও পুনরায় আসেন। নভোমণ্ডলে মেঘ উঠে, বিদ্যুৎ দেখা যায় ও তাহাতেই বৃষ্টি হয়। বায়ুর বেগ মনুষ্যের পক্ষে কখন বা হিতকর কখন বা কষ্টদায়ক, এবং তাহার শক্তিও অসীম। সুতরাং উল্লিখিত কার্য্যসমুদয় যাঁহাদিগের দ্বারা নিষ্পাদিত হয়, তাঁহারা ত অবশ্য প্রাণী হইবেন। তাঁহারা মনে করিলে আমাদের মঙ্গল করণে বিরত হইতে পারেন অপিচ তাঁহারা যখন এতদূর

মহাক্ষমতাশালী, তখন আমাদিগের যে কিছু প্রয়োজনীয় বিষয় উদ্ধারে অপারগ হইবেন, ইহা এক প্রকার অসম্ভব। দেখিতেছি, আমাদের ক্ষমতা অতি সামান্য। ইচ্ছা হইলেই যে কোন কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া উঠিতে পারি, তাহা নহে। এ অবস্থায় চন্দ্র, সূর্য্য, অগ্নি, বরুণ বা মরুতের শরণ লওয়া নিতান্ত অসঙ্গত নহে। বৈদিক কালে সেই কারণেই আর্য্যগণ দেব-স্তুতি করিতেন। দেবতাগুলি, কেবল সূর্য্য লইয়া গঠিত নহে। একেশ্বরবাদ, পরবর্ত্তী। সমাজের সমৃদ্ধি বৃদ্ধি হওয়ায় সেই দেবস্তুতি মহা আড়ম্বরে পরিণত হইয়া যজ্ঞরূপে গঠিত হইল। সেই সমস্ত অনুষ্ঠান বহুল ও কবিত্ব পূর্ণ করিবার জন্য যাহা তাঁহাদিগের আয়ত্ত রহিয়াছে, তাহারও উদ্দেশে স্তোত্র রচনা করা হইল। সর্ব্ব প্রকার কার্য্যের জন্য মন্ত্র প্রস্তুত হইল। ক্ষুর, ক্ষৌম, অঞ্জন, কৃষ্ণাজিন, মেখলা প্রভৃতি সমস্ত ব্যবহার্য্য দ্রব্যকেই স্তব করিবার মন্ত্র আছে। কার্য্য যে প্রকার হউক না কেন, সকল স্থলেই মন্ত্রের প্রয়োজন। এমন কি মূত্রত্যাগের পর্য্যন্ত মন্ত্র আছে। মন্ত্ররচনা একটা ক্ষমতার কার্য্য। যিনি পরিশ্রম করিয়া রচনা করিয়াছেন, তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা দেখাইবার জন্য ও তাঁহার নাম স্মরণ রাখিবার উদ্দেশে প্রত্যেক মন্ত্রের আদিতে রচয়িতার নাম এবং সেই মন্ত্র কি ভাবে পড়িতে হইবে, তদ্বোধের জন্য কি ছন্দ, তাহা লিখিত থাকে। মন্ত্র সকল আলোচনা করিলে প্রাচীনকালের অনেক না হউক, কিছু বিবরণ পাওয়া যায় ও তাহাতেই অত্যন্ত আনন্দ জন্মে। যেন চক্ষের উপর বৈদিক কালের আর্য্যাবর্ত্ত উপস্থিত হয়। মন্ত্রের ভাষা এমনি নবীন, ভাব এমনি সরল যে, কোন কথা দৃঢ় করিয়া বলিয়া দিতে হইলে, একটি কথা তিনবার বলিবার রীতি আছে।

বৈদিক কালে সুবর্ণ (মুদ্রা নহে) ব্যবহার হইত বটে, কিন্তু

তাহা সুপ্রাপ্য ছিল না। সুবর্ণ-মূল্য স্থির করিয়া তৎপরিবর্ত্তে গো বা অজা দেওয়া হইত। অগ্নিষ্টোমে বিবৃত হইয়াছে, সোমবল্লী ক্রয়ার্থ যজমান বিক্রেতার নিকট উপস্থিত হইয়া তিনি যে মূল্য দিতে সমর্থ হইবেন, তৎপরিজ্ঞানের জন্য প্রথমতঃ গাভী আনিয়া প্রতিভূ দিতেন, তাহার পর সোমের মূল্য কত -পরিমাণের সুবর্ণ, তাহা স্থির করিয়া সেই মূল্যের ছাগ প্রদান করিয়া গো গ্রহণ করিতেন। সে সময়ে গোর গলদেশে বন্ধন-রজ্জু দিবার রীতি ছিল না। পায়ে বান্ধিয়া রাখা হইত। আর্য্যগণকে দস্যু ভয়ে সদা ব্যস্ত দেখা যায়। সর্ব্বোপরি একজন রাজা ছিল না। অগ্নিষ্টোম যজ্ঞে ইদানীং ছাগ পশুর ব্যবহার হয়। বৈদিক কালে গো ব্যবহার হইত। গোমাংস হবন করিয়া ঋত্বিক্‌গণ শেষভাগ ভক্ষণ করিতেন। বধ্য গো যদি গর্ভবতী থাকিত, তাহা হইলে প্রায়শ্চিত্ত করা আবশ্যক হইত। প্রায়শ্চিত্ত এই যে, গর্ভ বিদারিত করিয়া সেই বৎসের রক্ত ও মাংস দ্বারা অতিরিক্ত একটি হোম করা হইত।

কাশী—মণিকর্ণিকা

(ভারত প্রদক্ষিণ)
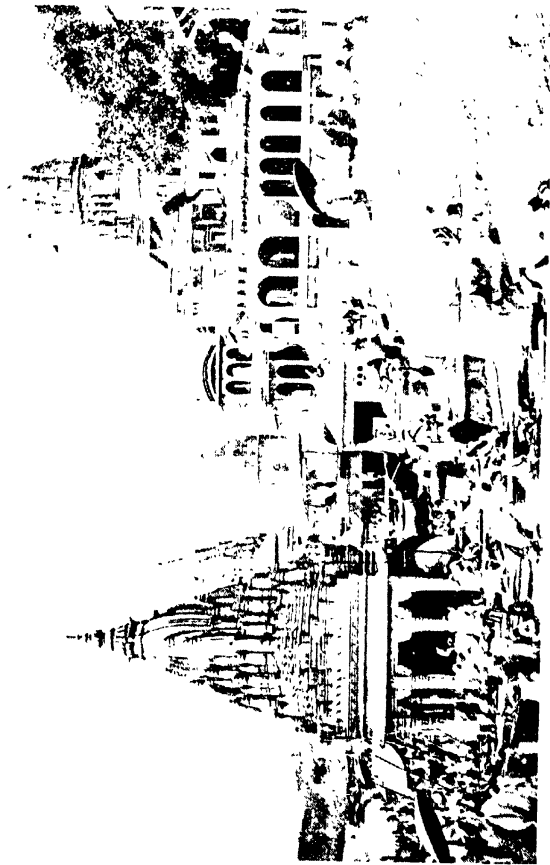
সুরধুনী। *

বারাণসী—বরণা ও অসি নামক সরিতের মধ্যবর্ত্তী স্থান বর্ত্তমান কাশী নগরী। পূর্ব্বে বরণার বাম পারে এক্ষণে যেখানে সারনাথ প্রভৃতি স্থান আছে, সেইখানে প্রাচীন কাশী ছিল। শাক্যমুনি প্রথমে এই খানেই আপন মত প্রচার করেন। নিজ জ্ঞানের উন্নতি করিয়া নির্ব্বাণ লাভ তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। কালক্রমে এই স্থানে মরিতে পারিলেই নির্ব্বাণ লাভ হইবে, ইহাই বিশ্বাস দাঁড়াইল। তখন বরণার দক্ষিণ পারে জনপদ হইয়াছে। পৌরাণিক সময় উপস্থিত, পাশুপত মন্দিরে নগর পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। স্কন্দপুরাণে কাশীখণ্ড যোজিত হইল। নানাদেশ হইতে কাশীধামে শরীর ত্যাগ করিবার জন্য বহুলোকের সমাগম হইতে লাগিল। কেহ কেহ বা ক্ষেত্র-সন্ন্যাস করিলেন। তাঁহারা কাশী ছাড়িয়া আর অন্যত্র যাইতে পারিলেন না। যাঁহার গ্রাসাচ্ছাদনের উপায় আছে, তিনি প্রতিগ্রহ করেন না। অন্যে যদি ভোজনের নিমন্ত্রণ করে বা কোনও উপহার দেয়, তাহা গ্রহণ করেন না। সর্ব্ববিধায়ে নিবৃত্তি মার্গ অবলম্বন করাই অভিপ্রেত হইয়া দাঁড়ায়। ডফরিণ সেতুর উত্তরে বরণা সঙ্গমের পর মাতাজীর আশ্রম। কলিকাতার বাবু কালীকৃষ্ণ ঠাকুর এই আশ্রমপদ

---

* ১। জীবিতের দেহতত্ত্ব (Human Physiology) শ্রীমহেন্দ্রনাথ ঘোষ প্রণীত।
২। গৌড়ীয় ভাষাতত্ত্ব—শ্রীপদ্মনাথ ঘোষাল প্রণীত।
৩। Sacred City of the Hindus by Rev. Sherring.
৪। Nabinchandra Pal on Yagna.
৫। Statistical Roport of Bengal (Bhagalpur Division)
৬। Rural life of Bengal by W. W. Hunter
৭। Science of Language by F. MaxMuller.

উত্তম পিল্পা দ্বারা বাঁধাইয়া দিয়াছেন। আমাদের নৌকা যখন ঘাটে পৌছিল, মাতাজী তখন গৃহ নির্ম্মাণ কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন। আগন্তুক দেখিয়া প্রসন্নমুখে তিরোহিত হইলেন। উপরে উঠিয়া দেখি, তিনি বৃক্ষমূলে নামাবলী গায়ে দিয়া জপমালা হস্তে বসিয়া আছেন। প্রবীণ বয়স, বিধবার বেশ, সৌম্যদর্শন এবং বচনে দাম্ভিকতা নাই। তিনি কহিলেন, যোগ এক্ষণে পণ্য দ্রব্যের মত সুলভ হইয়া পড়িয়াছে। কর্ণেল অলকট এই একটি উপকার করিয়াছেন, আমরা কহিলে দেশীয় ইংরাজি শিক্ষিত লোক স্বধর্ম্ম ও স্বদেশীয় শাস্ত্রের প্রতি অনুরাগী হইতেন না, কিন্তু কর্ণেল কর্ত্তৃক প্রণোদিত হইয়া তাহাতে আস্থাবান্ হইয়াছেন। মাতাজীর নাম মনমন বাঈ। তিনি গুজরাতী নাগর ব্রাহ্মণের কন্যা। আশৈশব কাশীতে আছেন। পিতার নিকট যোগ শিক্ষা করিয়াছেন। এই আশ্রম একজন পেশোয়া সন্ন্যাসী কর্ত্তৃক স্থাপিত হয়। মাতাজীর পিতা সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া তাঁহার শিষ্য হন। ইনি স্ত্রীলোক বলিয়া সন্ন্যাসের অধিকারী নহেন। এজন্য গুরুর চীবর চিত্রপার্শ্বে পুটবদ্ধ করিয়া রক্ষিত হইয়াছে। যোগমঠ শাস্ত্রীয় প্রণালীক্রমে নির্ম্মিত হইয়াছে। ভূগর্ভে পর পর তিনটি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ। সাধক অগ্রে প্রথমটিতে প্রাণায়াম অভ্যাস করেন, তদনন্তর প্রথমটির কবাট বন্ধ করিয়া দ্বিতীয়ে, ক্রমশঃ বায়ুধারণের ক্ষমতা বৃদ্ধি হইলে, নির্ব্বাত তৃতীয় কোষ্ঠে প্রবেশ করিয়া সাধন করেন। দেহতত্ত্ব-বিদ্যা অনুসারে জীবিতের শোণিত শরীরাভ্যন্তরে প্রবাহিত হইয়া আপন কার্য্য নির্ব্বাহ পূর্ব্বক দেহপোষণের অনুপযুক্ত হইয়া পড়ে। এবং নানা অপরিষ্কার পদার্থ ইহাতে আসিয়া উপস্থিত হয়। এই সকল অপরিষ্কার পদার্থ মধ্যে কার্বনিক অ্যাসিড্ নামক বায়ু অধিক পরিমাণে দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহাকে বহির্গত করিয়া অক্সিজেন বায়ু শোণিত মধ্যে আনয়ন করা শ্বাসক্রিয়ার একমাত্র উদ্দেশ্য। কুম্ভক করিলে ঐ কার্ব-

নিক বায়ু বহির্গত হইতে পারে না। এজন্য যোগীদিগকে এমন আহার বিহার অবলম্বন করিতে হয়, যাহাতে কার্বনিক অ্যাসিড্ অধিক পরিমাণে না জন্মে। আর কুম্ভকের অবস্থায় চৈতন্য রহিত হইয়া পড়ে ও শোণিত প্রবাহ স্থগিত হয়, সুতরাং তখন শ্বাস ক্রিয়া বন্ধ থাকায় সবিশেষ কোন ক্ষতি হয় না। কিন্তু যে সকল যোগী বহুদিন অচেতন অবস্থায় ছিলেন দেখা গিয়াছে, তাঁহাদের শরীর কোনও প্রকারে রক্ষা পাইয়াছে মাত্র; বল বা কান্তি লুপ্ত হইয়াছিল। কোন কোন পশু আছে, যাহারা ছয় মাস নিদ্রা যায়। মানুষেরও এমন পীড়া হইতে দেখা গিয়াছে, যাহাতে তিন মাস পর্য্যন্ত সে অনাহারে নিদ্রাভিভূত থাকে। যোগারূঢ় ব্যক্তি ঐরূপ অবস্থা আনয়ন করিতে পারেন। তাহা বলিয়া তাঁহাদের যে অমানুষিক ক্ষমতা জন্মে, এমন বিশ্বাস করিতে পারা যায় না। এই অভ্যাসের ফল এইমাত্র হয় যে, নিবৃত্তিমার্গের পথিকের পক্ষে চিত্তবৃত্তি নিরোধ সুখের বিষয় হয়। একজন থিয়সফিষ্ট কহিয়াছিলেন, মাতাজী তিব্বত দেশীয় এক মহাত্মা অর্থাৎ লামা। এক্ষণে স্ত্রী শরীর ধারণ করিয়া রহিয়াছেন।

গাজিপুর।—মাতাজীর আশ্রম হইতে ১৮ ক্রোশ দূরে "পবহারী" বাবার আশ্রম। ১৪ ক্রোশ দূরবর্ত্তী সমেনা গ্রাম-নিবাসী নারায়ণ দাস তেওয়ারি নিজ পিতৃব্য কর্ত্তৃক স্থাপিত রামানন্দী দেব কুটীরে আসিয়া কয়েক বৎসর কিঞ্চিৎ অধ্যয়ন করত তীর্থ পর্য্যটনে গমন করেন। সেতুবন্ধ রামেশ্বর, দ্বারকা প্রভৃতি স্থান অতিক্রম করত পাঁচ ছয় বৎসর পরে যোগ অভ্যাস করিয়া যখন তিনি প্রত্যাগত হন, তখন তাঁহার পিতৃব্য গতাসু হইয়াছেন। তিনি সেই পর্ণকুটীর খর্পর আচ্ছাদিত করিয়া তদভ্যন্তরে মৃত্তিকা-স্তূপের মধ্যে গুহা নির্ম্মাণ পূর্ব্বক সাধনা আরম্ভ করিয়া "পবহারী" বাবা নাম প্রাপ্ত হইলেন। এক্ষণে লক্ষ্মণ ঠিকেদার মঠসংলগ্ন প্রাচীর ও কয়েকটী চিম্‌নি শোভিত উচ্চ ইষ্টকালয় প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন।

বাবাজী দেখা দেন না। বদ্ধ দ্বারের ভিতর পিঠ হইতে বহিস্থ লোকের সহিত কথা কন—চিঠি দেন। রাত্রে পরিচারক পূজার দ্রব্য ও ফরহার রাখিয়া গেলে কবাট খুলিয়া লইয়া যান। যখন দেখা দেন, তখন মেলা লাগে; পুলিশকে শান্তি রক্ষা করিতে হয়। গোরক্ষপুরের নিকট পয়কৌলি গ্রামে অন্য পবহারীজী বৈরাগীর মঠ আছে। তাঁহারা শিষ্য পরম্পরায় ঐ উপাধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সম্প্রতি সেই পবহারী বহু অনুচর সহিত রামানন্দী সম্প্রদায়ের তীর্থ স্থান ভ্রমণে বহির্গত হইয়াছেন। তিনিও ফরহারী। পরপারে ইন্দ্রপুর নামক স্থানে বহুকাল পূর্ব্বে একজন রেশম ব্যবসায়ী গোসাঞি গঙ্গার উপর নৌকায় বজ্রাহত হইয়া প্রাণত্যাগ করায় সমাহিত হন। পঞ্চাশ বৎসর পরে একজনের স্বপ্ন হইল। তিনি চৌরা নির্ম্মাণ করিয়া দিয়া যথারীতি পীড়া হইতে মুক্ত হইলেন। সেই স্থান বিজলিয়া বাবা নামে পূজিত হইতেছে। যব, সরিষা প্রভৃতি ক্ষেত্রের পার্শ্বে পার্শ্বে গোলাপের চাস হইতেছে। ফাল্গুন, চৈত্র ব্যতীত এক্ষণে "সালিগুলাব" "সদাগুলাবের" মত হয় না। গঙ্গাতীর হইতে গাজিপুর দেখিতে কাশীর মত। ইহার ভাষাও তত্তুল্য। রামেশ্বর, চিতনাথ, খিড়কীঘাট প্রভৃতির মধ্যে রাজা গাধির কোঠ বা দুর্গ নামে উচ্চ পাহাড়ের উপর বউড়ইয়া সাহেব অঘোরির শ্বেত গৃহ দেখা যাইতেছে। কলিকাতা এখান হইতে কর্ড লাইন রেল পথে ৪৪৫ মাইল, স্থলপথে ৪৩১ মাইল, জলপথে ৭৮৪ মাইল হইবে।

বক্সর।—রামায়ণের তাড়কা বধ, বিশ্বামিত্রের তপোবন প্রভৃতি স্থান ও অহল্যা যেখানে মানবী হইয়াছিলেন, সেই সকল স্থান ইহার সন্নিকট। রামলেখা ঘাটে বৈরাগীদের মন্দির আছে। প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌ কেহ কেহ বলেন, রামায়ণের বিবরণ ঐতিহাসিক ঘটনামূলক নহে। রামচন্দ্র বৈদিক ইন্দ্র হইতে কল্পিত। জগদীশপুরের কুমার সিংহের দায়াদ কর্ত্তৃক

নির্ম্মিত মৃৎদুর্গ বক্সরে আছে। এখান হইতে ভোজপুর অধিক দূর নয়। "তস্‌লা তেরা কি মেরা"—সকলেই শ্রুত আছেন, পথিক অন্ন রন্ধন করিতেছেন, দস্যু আসিয়া উপস্থিত। যদি বলেন, পাকপাত্র আমার, তাহা হইলে ভূমে অন্ন নিক্ষেপ করিয়া সে পাত্র লইয়া যায়; যদি বলেন, তোমার, তবে কহে—খাইয়া পাত্র দাও। এক্ষণে সে কাল নাই, তথাপি কাশী হইতে কলিকাতার জলপথে এই প্রদেশটায় দস্যুভয় বিদ্যমান আছে। রাত্রে নাবিকেরা আমাদের নৌকা নঙ্গর করিয়া রাখিত, ভয়ে তীরে বাঁধিতে পারিত না। বলিয়া বা ভৃগুক্ষেত্রের এক মন্দিরমধ্যে বেদীর উপর ভৃগু যে মন্ত্র জপ করিয়া সিদ্ধি লাভ করেন, পদ্ম-যন্ত্রে সেই গায়ত্রী লিখিত আছে। তাহারই পার্শ্বে আবার তদীয় পদচিহ্ন ক্ষোদিত হইয়াছে। এখানকার বিষয়ে দর্দ্দূর-মাহাত্ম্য-নামক একখানি গ্রন্থ আছে। এদেশের মৃত্তিকা এমন কঠিন, যে গঙ্গার পাড় কাটিয়া সোপানাবলি প্রস্তুত করিয়া জলে নামিবার পথ করা হইয়াছে। এখান হইতে একখানি ষ্টীমার দ্রব্যজাত লইয়া বক্সর যাতায়াত করে। উপরে উঠিয়া দুইটি চিনির কারখানা দেখিয়া আসিলাম। ছাপরা নগরের দুই ক্রোশ পশ্চিমে সরযূ গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছেন। তেলকাঘাট নামক স্থানে আমাদের রাত্রিযাপন হইল। প্রভাতে এরূপ প্রগাঢ় কুজ্ঝটিকা দেখা গেল যে, দশ হাত দূরের বস্তুও দেখা যায় না। ভ্রমণ না করিলেই নয়, এই জন্য উপরে উঠিলাম। দেখিলাম সেই কুজ্ঝটিকা ভেদ করিয়া, বহুদূর হইতে ঢেঁড়ি (মটরসুঁটি) বাহিনী রমণীগণ আসিতেছে। তাহাদের আনাসিক সিন্দুর ও রঞ্জিত কুলবস্ত্র এবং লাক্ষাচূড় দেখা গেল। ভাষা-পরিবর্ত্তনের পূর্ব্বেই বিহারী বেশ দেখা দিয়াছে। এখান হইতে পাটনার ভাষা ভিন্ন প্রকার। বোধ হয় মুসলমানগণই অযোধ্যা হইতে সরযূর উত্তর পার দিয়া, পুরবী হিন্দীর দেশে পশ্চিমা হিন্দী প্রচারিত

করেন। বিহারে ভাষা পার্শ্ববর্ত্তী ভোজপুরী বা মধ্যদেশী হিন্দী নহে।

পাটনা।—দানাপুরে শোণ গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছে। বেঙ্গল নর্থ ওয়েষ্টার্ণ্ রেলওয়ে কোম্পানি শুখার সময় বালির উপর স্লিপার পাতিয়া পরপার হইতে মালসমেত গাড়ি জাহাজে তুলিয়া পার করেন। পাটলীপুত্র প্রাচীন নাম ও জনপদ সহ গঙ্গাগর্ভে স্থান লইয়াছে। এখানে গঙ্গার পরিসর প্রায় ৩ ক্রোশ। নদী অত্যধিক বিস্তৃত হইলে, মধ্যে চড়া পড়ে। পাটনার সম্মুখে গঙ্গার দুই ধারা মধ্যে বৃহৎ চর রাখিয়া আবার মিলিত হইয়াছে। গঙ্গার উপর হইতে পাটনা অতি সমৃদ্ধ বোধ হইল। পাটনদেবীর মন্দির দর্শন করিতে গেলাম। এক দালানে ক্ষুদ্র একটি দেউল আছে; তাহার অভ্যন্তর-ভাগ মৃত্তিকা দ্বারা পরিপূরিত। পূজারী কহিল, এই স্থান বায়ান্ন পীঠের এক পীঠ। এখানে সতীর বস্ত্র অর্থাৎ পাট পতিত হইয়াছিল বলিয়া পীঠাধিষ্ঠাত্রী দেবী পাটন-দেবী নামে অভিহিত হয়েন। সেই জন্য নগরের নামও পাটনা। কোথায় সেই অঙ্গাধিপ বংশ! এখন বিস্মৃতি-সলিলে নিমগ্ন রহিয়াছে। এখানকার বাটীতে প্রস্তরের পরিবর্ত্তে বিবিধ কারুকার্য্যখচিত কাষ্ঠ ব্যবহৃত হয়। প্রস্তরের এমনি অভাব যে পাটন-দেবীর মন্দিরে একটি শিবকে কাষ্ঠের গৌরীপট্টে আসীন দেখিলাম। একস্থানে শোণ নদীর কুল্যা গঙ্গায় আসিয়া পড়িতেছে। খালের জল বদ্ধ দ্বারের সুনির্ম্মিত ছিদ্র দিয়া মহাবেগে সমুদ্র নির্ঘোষে অতি সুন্দর দৃশ্য ধারণ করিয়া অনবরত নির্গত হইতেছে। প্রতিঘাত জন্য যে জলকণা উত্থিত হইতেছে, তাহার মধ্য দিয়া সূর্য্যকিরণ কুল্যার দ্বারের বামদিকের প্রাচীর-গাত্রে যেন ইন্দ্রধনু সৃষ্টি করিতেছে। বেলা সাড়ে এগারটার সময় আমরা বাঁকীপুর ত্যাগ করিয়া অনতিবিলম্বে গণ্ডকী নদীতে উত্তীর্ণ

হইলাম। খরস্রোতা গণ্ডকী বর্ষীয়সী গঙ্গার সহিত মিলিতেছেন। স্থানটি কিছু ভয়ানক। গণ্ডকীর স্রোতে তাহার দক্ষিণ পার্শ্বের মৃত্তিকা শিথিল হইয়া সশব্দে নদীগর্ভে পতিত হইতেছে। নাবিক কহিল, এখনও নদী অধিক প্রবল হয় নাই। প্রতি বর্ষে এই পূর্ণিমার দিন সঙ্গম স্থানের স্রোত অত্যন্ত প্রবল হয়। তখন বিপরীত দিকে নৌকাচালনা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য। আমরা হরিহর-ক্ষেত্রে পৌছিয়া (শোণপুর) হরিহরনাথ দর্শন করিলাম। তাম্র নির্ম্মিত শিবলিঙ্গ, তাহার সম্মুখে বিষ্ণুর মূর্ত্তি রহিয়াছে। পূর্ব্বে এই স্থানের নাম পুলহাশ্রম ছিল। একদা মহর্ষি দুর্ব্বাসা দেবরাজ ইন্দ্রের সভায় গন্ধর্ব্বশ্রেষ্ঠ হাহা ও হূহুকে গান করিতে অনুরোধ করেন। তাঁহারা আদেশ পালন না করায় অভিশপ্ত হন এবং গজ ও কচ্ছপ হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। কালক্রমে গজরাজ একদিন এই স্থানে জলপান করিতে আসিয়াছেন, এমন সময় কচ্ছপ তাঁহার হস্তধারণ পূর্ব্বক জল মধ্যে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। নিমজ্জন কালে হঠাৎ তাঁহার মুখ হইতে "হরিহর" শব্দ নির্গত হওয়ায়, বিষ্ণু ও শিব আসিয়া তাঁহাদিগের উদ্ধার সাধন করেন। হাহা ও হূহূ শাপমুক্ত হইলেন। তদবধি এই স্থান পুণ্যভূমি। এখানকার বিষয়ে "হরিহরক্ষেত্রমাহাত্ম্য" নামে এক পৌরাণিক গ্রন্থ আছে। বোধ হয়, পাণ্ডার উদ্যোগে ইহা অত্যল্প দিন মাত্র রচিত হইয়া লিঙ্গপুরাণের অংশ নামে প্রচারিত হইয়াছে। মেলার দোকান এবং বাসস্থান প্রভৃতি বস্ত্রদ্বারা প্রস্তুত করা হইয়াছে। অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি মেলায় আসিয়াছেন। প্রাতঃকালে ইংরাজের ঘোড়দৌড়, অপরাহ্নে পোলো নামক ক্রীড়া, রাত্রিকালে বল বা নৃত্য। এই মেলা ছাপড়া, পাটনা প্রভৃতি নিকটবর্ত্তী স্থানের সমৃদ্ধবিহারীদের বার্ষিক আনন্দোৎসবের ক্ষেত্র। তাঁহারা কেহ বস্ত্রাবাসে, কেহ বা নৌকায় থাকিয়া সঙ্গীত ও দ্যূতক্রীড়া প্রভৃতি আমোদে কালযাপন

করিতেছেন। শালগ্রামীতে স্নান করিয়া আর্দ্রবস্ত্র নগ্নোন্নত-দেহ কৃষ্ণমস্তক লোকারণ্য বদ্ধদ্বার হরিহরনাথের মন্দিরের সম্মুখে জলপাত্র হস্তে দণ্ডায়মান হইয়া অপূর্ব্ব দৃশ্য বিস্তার করিয়াছে। শালগ্রামীর তট হইতে আপন শ্রেণী আরম্ভ হইয়াছে। নানাবিধ দ্রব-সম্ভার দেশ বিদেশ হইতে আনীত হইয়া, যতদূর যাওয়া যায়, ততদূর জুড়িয়া রহিয়াছে। কাশী হইতে প্রস্তরের মন্দির, গয়ার পাথরবাটী, পাঞ্জাবের গজদন্ত নির্ম্মিত দ্রব্য, পিতল কাঁসার বাসন, পর্য্যঙ্ক, ডেস্ক, গাড়ি, পাল্কি, মেজ, চৌকী ও বিবিধ বাদ্যযন্ত্রে সহস্র সহস্র পণ্যবীথি সজ্জিত হইয়া, দর্শকের নয়নানন্দ বর্দ্ধন করিতেছে। এক একটা শ্রেণী উত্তমরূপে দেখিতে হইলে ক্লান্ত হইয়া পড়িতে হয়! তাহার পর হস্তিবিক্রয়ের স্থান,—শত শত চিত্রিত ভাল কুল্কী, গুণ্ডা ও পাট্ঠা নিগড়বদ্ধ হইয়া প্রশান্তভাবে ক্রেতার অপেক্ষা করিতেছে। নেপাল ও আসাম হইতে এখানে হস্তী আসে। আসিবামাত্র আরব বণিকগণ ক্রয় করিয়া লয় এবং মেলায় বিক্রয় করে। এবার কিছু আসে নাই, তথাপি অন্যূন এক সহস্র হস্তী আসিয়াছে। ঘোটক চারিসহস্র হইবেক। বলীবর্দ্দের বাজার সম্পূর্ণ দেখিয়া উঠিতে পারিলাম না; তাহারও সংখ্যা বোধ হয় চারিসহস্র হইবেক। সময়াভাবে মেষ, গর্দ্দভ ও কুকুরের হাট দেখা হইল না। নানাজাতীয় পক্ষীর বাজার দেখা হইল। এক সুচ্ছায় উপবনে নর্ত্তকীরা বায়নার প্রতীক্ষা করিতেছে। দানাপুরে যে হিন্দুরমণী বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করে, সে মুসলমান ধর্ম্মগ্রহণ করিয়া থাকে। হিন্দুসমাজে বেশ্যার সদ্গতির দ্বার রুদ্ধ; বোধ হয়, মুসলমান হইলে সে আশঙ্কা নাই মনে করিয়া তাহারা ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করে।

ফতুহা।—পুনপনা নদী গঙ্গায় সম্মিলিত হইলেন। প্রাতঃস্নান হইলে আমরা তরণী ছাড়িয়া দিলাম। দেড় প্রহর বেলা হইলে বায়ুর

গতি ফিরিল। নৌকা উজাইয়া যায় দেখিয়া মাঝিরা "গিরাবী" ফেলিয়া রাখিল। "উজনীয়া" "মেলহনী" "সলিনা" প্রভৃতি যে সকল নৌকা ফেরতা জলে "দোগার" অর্থাৎ একবার এপার একবার পরপার করিয়া অতি কষ্টে গুণ টানিয়া লইয়া যাইতে হইত, সেগুলি এক্ষণে পাল উড়াইয়া চলিয়াছে। আমাদের মাঝিরা অবকাশ পাইয়া স্বদেশাভিমুখী পরিচিত নৌজীবীদের সহিত আলাপ আরম্ভ করিল। সকলেই জিজ্ঞাসা করে, খিলান নৌকা ভাঁটি যাইতেছে কেন? একালে নৌকায় যে সওয়ারি যায় তাহা তাহারা কিরূপে বুঝিবে? তাহারা পশ্চিম হইতে ভুষামাল লইয়া যায়, পূর্ব্ব হইতে চাউল বা লবণ পাইলে আনে, নতুবা খালি আসে। পশ্চিম হইতে খালি নৌকা যায় না। আমার চিকিৎসক কহিয়াছিলেন, "ঔষধে উপকার হইতেছে না তবে উহা সেবন করিতেছ কেন? উপকার না হইলে সেই ঔষধ দ্বারা অপকার হয়।" তাঁহারই পরামর্শে নৌকা-যাত্রা করিয়াছি। দেওঘর বাস অপেক্ষা ইহা অধিকতর ফলপ্রদ হইয়াছে। নৌকার গতির সহিত শরীর চালনা হয়। যে দিন নৌকা অধিক চলে, সে দিন ক্ষুধাও অধিক হইয়া থাকে। দুগ্ধ আহরণ করিতে হয়। অন্যান্য বস্তু মধ্যে মধ্যে হাট পাইলে সংগ্রহ করা হয়। সামান্য গ্রামের দোকানে জনার ও তামাক মাত্র থাকে। আহার বিহার সমস্তই নৌকায়। নৌকা এক্ষণে আমাদের বাটী। বাটীতে বালমূষিকা, লূতা, গৃহগোধিকা, গাঙ্গোলী, প্রভৃতি যে সকল আততায়ীর সহিত বাস করিতে হয়, সকলই এখানে আছেন। বায়ু কিঞ্চিৎ অনুকূল হইলে পুনরায় নৌকা চলিতে লাগিল। অপরাহ্নে ঈশানে মেঘ দেখা দিল, তাহাতে বিদ্যুৎ খেলিতেছে, জলের উপর মেঘের ছায়া পড়িয়াছে। নাইয়াদের হৃদয় কাঁপিতে লাগিল— প্রবল ঝড় আসিতেছে। মাঝিরা প্রাণপণে কূলের দিকে ক্ষেপণী চালন করিতে লাগিল। কিন্তু বৃথা হইল, ঝড় আসিয়াছে, সেই সঙ্গে বৃষ্টিও

আগত-প্রায়—নাইয়ারা তটে নৌকা লাগাইতে পারিল না—বায়ুর ভরে দাঁড় কোনও কায করিতে পারিল না। একখানি পারঘাটের নৌকা বহু লোকপূর্ণ হইলেও, ছই না থাকায় বায়ুর আঘাত লাগিতে পারিতেছে না বলিয়া, অনায়াসে পারে আসিয়া লাগিল। আমাদের মাঝিরা উত্তম ছাড়িয়া 'নারায়ণ যাহা করেন' বলিয়া নিরস্ত হইল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম কি হইবে? উত্তর দিল—এ পারে আর লাগান যাইতে পারে না। ঝড়ের গতি অনুসারে পরপার অভিমুখে আপনি নৌ চলিল; কর্ণধার কেবল দিক নির্দ্দেশ করিয়া রহিল। নৌকা শীঘ্রই এক চরের নিকট উত্তীর্ণ হইল। তখন প্রধান কেয়ট্ নঙ্গর ফেলিতে কহিল। শীঘ্রই কিন্তু পবন শান্ত হইলেন, তবে ঘনঘটা রহিল। আজিকার মত আমাদের এই স্থনে বিশ্রাম। কিয়ৎকাল পরে দেখিলাম, বৃহৎকায় বাষ্পীয় তরি ঝঞ্ঝা তরঙ্গ না মানিয়া, বাণিজ্যদ্রব্য আনিবার জন্য মন্থর গতিতে পাটনা অভিমুখে চলিয়াছে।

বাড় —নৌকা লাগিলে, মালাকর সুরধুনীকে পুষ্পহার উৎসর্গ করিয়া গলুইয়ে পরাইতে আসে—দধি বিক্রেত্রী দর্শন দেয়—ভিক্ষুক মিলে।* বাঢ় নগরে দস্যু ফকিরদের দৌরাত্ম্যে পূর্ব্বে মাঝিরা নৌকা লাগাইতে চাহিত না। তাহারা যাহা কহিবে, তাহাই দিতে হইবে। এক-জন ছুরিকার আঘাতে আপন শরীর হইতে রুধির বাহির করিয়া, বাঞ্ছিত

* ব্রাহ্মণ পণ্ডিত 'ভিক্ষা' করিতে আসিলে প্রথমে ধনীকে কবিতা দ্বারা "মেস্মেরাইজ" করিয়া পরে প্রকৃত অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন।

"অর্দ্ধং দানববৈরিণা গিরিজয়াপ্যর্দ্ধং শিবস্যাহৃতং,
দেবত্থং জগতীতলে পুরহরাভাবে সমুন্মীলতি।
গঙ্গাসাগরমম্বরং শশিকলা নাগাধিপঃ ক্ষ্মাতলং
সর্ব্বজ্ঞত্বমধীশ্বরত্বমগমৎ ত্বাং মাঞ্চ ভিক্ষাটনম্।"

যাজ্ঞা পূরণ করিতে কহিল। রজনী প্রভাত হইলে, প্রাতঃস্নায়ীরা দেখা দিলেন। কেহ সীতারাম কহেন না, কেহ রাধাকৃষ্ণ শব্দ উচ্চারণ করিবেন না, তাহা লইয়া ঘাটে বিলক্ষণ আমোদ চলিল। প্রাতঃকালের কুয়াসার মধ্য দিয়া এক প্রকার অস্ফুট ধ্বনি শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। অনুসন্ধানে জানিলাম, কারণ্ডবযূথ ঐ শব্দ উৎপন্ন করিতেছে। নিস্তব্ধ পুলিনে রাজহংস মিথুন বসিয়া আছে। তাহারা একা থাকে না। বলাকাকুল আকাশে আলপনা দিয়া চলিয়াছে। তটোপরি শ্যামল ক্ষেত্র শস্যরাশি বক্ষে ধারণ করিয়া নয়নানন্দ বৃদ্ধি করিতেছে। মধ্যে মধ্যে উচ্চবৃক্ষে শুকবায়স উড্ডীন সংডীন হইতেছে। কোথাও বা কঙ্ক, গধ্র বিচরণ করিতেছে। ক্রমে আমরা মোকামার সন্নিহিত হইলাম। পরপারে ত্রিহুত ষ্টেট রেলওয়ে; পারপারের সুবিধার জন্য ষ্টীম্ ফেরি রহিয়াছে। খুটিহা বড়িহার পরপারে বিষণপুর বেগুসরায়। রামদিরি নামক স্থানে প্রত্যহ দুই শত মণ দুগ্ধ উৎপন্ন হয়। খুটিহায় চারণভূমির অসুবিধার জন্য গো পার হইতেছে। সূর্য্যগড়ে একটি পার্ব্বত্য তটিনী বৃষ্টিপাতে পাণ্ডুবর্ণ মৃত্তিকা লইয়া, সুরধুনীতে একটি ভিন্ন বর্ণের সুষমা টানিয়া বহুদূর চলিয়াছে।

মুঙ্গের।—গত বৎসর যেখানে বজরা লাগিয়াছিল, এবার সেখানে আর পটইলা লাগিতে পারিল না। জল সাত হাত নিম্নে পড়িয়াছে। বর্ষাকালে স্রোতোবেগে আনীত মৃত্তিকা "পাতর" ভূমিকে "কছাড়" করিয়াছে। কাশী কানপুর অঞ্চলে গঙ্গার ক্রীড়া এত দেখি নাই। গঙ্গা পাটনা হইতে প্রবলা হইয়াছেন। পূর্ব্বে শোণ সরযূ গণ্ডকের সাহায্য পান নাই। এখন তাহাদের বলে গঙ্গা কোথাও দ্বিধা কোথাও বা ত্রিধা মূর্ত্তি দেখাইতেছেন! সেই সঙ্গে নরভুক্ কুম্ভীর ও নৌভুক্ "মসিনার" আকর হইয়াছেন। মসিনা বালুকার এক প্রকার অতিদৃঢ় জলমগ্ন স্তর।

তাহাতে নৌকা আহত হইলে বানচাল হইয়া যায়। স্রোতোবেগে আনীত মৃত্তিকা উচ্চ হইয়া পড়িলে ভাগীরথী মুখ ফিরান। যে দিকে ভঙ্গুর মৃত্তিকা পান, ঘর বাড়ী, বৃক্ষাদি গ্রাস করিতে করিতে পথ পরিষ্কার করিয়া সেই দিকে ধাবিত হন। পূর্ব্বে যেখানে নদী ছিল সেখানে এক্ষণে গ্রাম বসিয়াছে, আবার কোথাও বা গ্রামের স্থানে নদী হইয়াছে। নৌকায় যদি পাড় ভাঙ্গিয়া পড়ে এই ভয়ে রাত্রিকালে মাঝিরা কাছাড়ের নিম্নে নৌকা রক্ষা করে না। বাঙ্গালার নবাব মীরকাসিম আলি সার নির্ম্মিত পরিখা মধ্যে ভগ্নাবশেষ দুর্গ, অধুনা সুন্দর দূর্ব্বাদল-শোভিত মাঠ ইংরাজের ধর্ম্মাধিকরণ ও সৌরভপূর্ণ বৃক্ষ-বাটিকামধ্যস্থ বাসস্থানে পরিণত হইয়াছে। একটি ঘাটের নাম কষ্টহরণী। তৎসন্নিধানে মৌদ্‌গল্য আশ্রম ছিল। এখানকার পীরপাহাড় জলপথে আট-ক্রোশ দূর হইতে দেখা যায়। তাহার নিকটেই সীতাকুণ্ড। কথিত আছে, ৭০ বৎসর পূর্ব্বে রামনবমী হইতে আষাঢ়ী পূর্ণিমা পর্য্যন্ত কুণ্ডের জল শীতল হইত, তখন বুদ্‌বুদ বা বাষ্প উত্থিত হইত না; তাহার পর কখন দুই চারি ঘণ্টা-কাল শীতল হইতে দেখা গিয়াছে। দুই বৎসরের কথা, দেড় মাসের জন্য একবার শীতল হয়। পাণ্ডারা ভাবিল, এইবার তীর্থ লোপ পাইয়াছে। সীতাকুণ্ডের জল এমত উষ্ণ নহে যে, তাহাতে অন্নপাক হইতে পারে; অন্তরুৎসেক বন্ধ হইলেই জল শীতল হয়। প্লীহা প্রভৃতিরোগে এই জলপানে বিশেষ উপকার দর্শে। মঙ্গলা বা বিক্রম চণ্ডীর আকার একখানি ক্ষুদ্র পর্ব্বত খণ্ড। তাহা মধ্যে রাখিয়া মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। "মধ্যদেশে মহামায়া" ইত্যাদি তন্ত্রোক্তি অনুসারে চণ্ডীস্থান নেত্রপীঠ নামে অভিহিত হয়। শতবর্ষ পূর্ব্বে রামগিরি নামক জনৈক সিদ্ধপুরুষ এখানে বাস করিতেন। এখানকার ভাষায় বাঙ্গালার গন্ধ পাওয়া যায়। এই স্থান হইতে ভূ ধাতুর পরিবর্ত্তে অস্‌ ধাতুর ব্যবহার আরম্ভ হইয়াছে। 'ভবতি'র

স্থানে 'অস্তি' ক্রিয়াপদের প্রয়োগ দেখা দিল। প্রাকৃত 'হোই' পদ হইতে উৎপন্ন 'হয়' শব্দের স্থানে প্রাকৃত 'অচ্ছি' শব্দ জাত বাঙ্গালা 'আছে'র মত 'ছে' ক্রিয়ার ব্যবহার হইয়া থাকে। তথাহি,—

পশ্চিমা হিন্দি—নাহি হয়।

পূরবী বা ভোজপুরী হিন্দি—নই থয়।

মধ্যদেশী হিন্দি—ন ছে।

হিন্দুস্থানী ও বাঙ্গালীর মধ্যবর্ত্তী বলিয়া মধ্যদেশ নাম হইয়াছে। হিন্দির মধ্যে দিল্লীর ভাষা সর্ব্বোৎকৃষ্ট। সেখানকার ভাষা আমার এমন মধুর লাগিয়াছে যে, কেবল তাহা শুনিয়া কর্ণ শীতল করিবার জন্য আর একবার তথায় যাইতে ইচ্ছা হয়।

জহঙ্গীরা।—পুটবন্ধের বাহুল্য বশতঃ মূলধারা পরিত্যাগ করিয়া কিছু দূরে বাঘমতী সঙ্গম অতিক্রম করিয়া পুনর্ব্বার আমরা গঙ্গায় আসিয়া পড়িলাম। ৩।৪ ক্রোশ দূরে গ্রাম। চড়ার উপর মহিষের বাথান। স্থানে স্থানে মহিষের যূথ জলে পড়িয়া রহিয়াছে। এ প্রদেশে এক একজন গোপের (মহতোর্) ২।৩ কুড়ি করিয়া গাভী থাকে। সুলতানগঞ্জে গঙ্গাগর্ভে দুইখানি গণ্ড শৈল আছে। একটির পার্শ্বে চড়া পড়িয়া গিয়াছে—তাহাতে মুসলমানের মস্জিদ আছে। পর্ব্বতগাত্রে হিন্দু মূর্ত্তি ক্ষোদিত দেখা যায়। অপরটিতে উচ্চ শিবমন্দির ও মহান্তের বাসস্থান এবং ক্ষোদিত বহুল দেবমূর্ত্তি ও শেষশায়ী এবং হরপার্ব্বতীর মূর্ত্তির উপর অর্দ্ধ দেবায়তন রচিত হইয়াছে। হরকে জহ্নুমুনি নাম দিয়া তীর্থজীবীরা জহ্নুক্ষেত্র আখ্যা স্থাপন করিতে চেষ্টা করিতেছে। মূর্ত্তিগুলির মধ্যে পাশুপত সম্প্রদায়ের সমসাময়িক কয়েকটি বৌদ্ধ বিগ্রহ আছে দেখা গেল। ইদানীং সরাউগীরা শেষশায়ীকে পার্শ্বনাথ বলিয়া পূজা করিতে আইসে। অন্য স্থান হইতে কয়েকটি স্তম্ভ ও পুত্তলি আনিয়া গৌরীনাথের

(গৌরীনাথ) সন্নিকটে যোজিত করা হইয়াছে। এখান হইতে দেবগৃহ ৩০ ক্রোশ। বৈদ্যনাথযাত্রীরা জহাঙ্গীরা হইতে গঙ্গাজল "কামরে" লইবে বলিয়া হাঁড়ি ও শিশির বাজার বসিয়াছে। শত শত লোক দলবদ্ধ হইয়া কামর উত্তোলন পূর্ব্বক "বোলো বম" শব্দের তরঙ্গ বিস্তারিত করিয়া চলিয়া থাকে। প্রত্যাবর্ত্তনের গীত "মাল খাজানা বাবা লেল ভর ভর কামর হিরা দেল্।" নৌকায় যাইতে যাইতে একখানি গ্রামের নাম পাওয়া গেল "দুধেল"। এদেশে ঘৃত দুগ্ধ যে অধিক পরিণামে জন্মে, স্থানের এই নাম তাহা প্রকাশ করিতেছে।

ভাগলপুর।—আমাদের দেশে যে দাতাকর্ণের কথা আছে, এখানে তাঁহার গড় ছিল। উক্ত গড় চম্পা নগরে অবস্থিত। বেহুলার উপাখ্যানে এই চম্পা নগরের উল্লেখ আছে। কর্ণগড়ে এক্ষণে কেবল রাজা কর্ণের উপাসিত মনোকামনানাথ শিব ব্যতীত তাঁহার আর কিছু স্মরণচিহ্ন নাই। জানপদগণ 'অভীষ্ট সিদ্ধি হইলে শত সহস্র কলস বারি দ্বারা শিবলিঙ্গ স্নান করাইবে' মানসিক করিয়া থাকে। ক্লিভ্ল্যাণ্ড সাহেবের স্মরণ চিহ্ন দেখিলে হৃদয় পুলকিত হয়। তাহাতে লিখিত আছে;—

"Without bloodshed or the terrors of authority, employing only the means of conciliation, confidence, and benevolence, he attempted and accomplished the entire subjection of the lawless and savage inhabitants of the Jungle Terry (forest frontier) of Rajmahal who had long infested the neighbouring lands by their predatory incursions, inspired them with a taste for the arts of civilised life, and attached them to the British Govt. by a conquest over their minds, the most permanent as the most rational mode of dominion."

ভাগলপুর বিস্তীর্ণ সহর। নগরের উপকণ্ঠে কিয়দ্দূর বিচরণ করিলে ধূলায় ধূসরিত হইতে হয়। বাষ্পীয় তরণী নিকটস্থ স্নানস্থানে যাত্রী লইয়া যাইবার জন্য নিযুক্ত আছে। কাহোল গ্রামের সন্নিধানে কহোল ঋষির আশ্রম। গঙ্গাগর্ভে যুগল শৈলখণ্ড অতিক্রম করিয়া শিলা-সঙ্গমের অনতিদূরে বটেশ্বরনাথের মন্দিরে উঠিবার উচ্চ সোপানশ্রেণী দেখা যাইতে লাগিল। নাতিদূরস্থিত শৈলমালা সুরধুনী ও তটভূমির সহিত একযোগে মোহনভাবে নয়নপথগামী হইতেছে। তাহার পর কুশী নদী গঙ্গার সহিত মিশ্রিত হইতেছেন। মণিহারীতে আসাম-বাঙ্গালা লৌহপথে বাষ্পীয় শকটশ্রেণী দণ্ডায়মান, সাহেবগঞ্জ হইতে জাহাজে পার হইয়া যাত্রী আসিতেছে।

রাজমহল।—বিন্ধ্য পর্ব্বতের একটি শাখা রোতস্‌গড় হইতে মুঙ্গেরের নিকট দিয়া গঙ্গার ধারে ধারে রাজমহলে আসিয়াছে। ভাগীরথী পার হওয়া যেন নিষিদ্ধ। রাজা মানসিংহ এই নগর পত্তন করেন—এই জন্য ইহার রাজমহল নাম হইয়াছে। ১৬৩৭ খ্রীঃ অব্দে সুবাদার সুলতান সুজার নির্ম্মিত "সঙ্গিদালান" জাহ্নবী তীরে অদ্যাপি দণ্ডায়মান রহিয়াছে। বাজারে সাঁওতাল নরনারী কাষ্ঠ বিক্রয় করিতে আসিয়াছে দেখিলাম। তাতার-জাতীয় পাহাড়িয়ারা কৃষ্ণকায় নহে। তাহাদের স্ত্রীলোকদিগকে "সুঁদরী" কহে। ইহারা মিথ্যা কথা কহে না। দামিনী-কোহনিবাসী সাঁওতালেরা মুসলমানের অধীনতা স্বীকার করে নাই। অদ্ভুত ক্ষমতাবান্ ক্লিভ্‌ল্যাণ্ড সাহেব শাসনভার তাহাদের হস্তে দিয়া নামমাত্র ভূমির কর নির্দ্ধারণে পর্ব্বতের নিম্নে বসতি করাইয়া অধীনতা স্বীকার করান। যিনি এই সুমহৎ কার্য্য সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার বয়স ২৯ বৎসর মাত্র হইয়াছিল। সাঁওতালদিগের শরীরের গঠন দেখিলে বোধ হয়, তাহারা যেন খাটিবার জন্যই জন্মিয়াছে—ভাবিবার জন্য নহে। কোন

বিষয় সাঁওতালদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া প্রকৃত উত্তর পাওয়া ভার। যাহা জিজ্ঞাসা কর—হাঁ বলে যেন কোন প্রকারে হাত ছাড়াইতে পারিলে বাঁচে। তাহাদের মাঝিকে (প্রধান ব্যক্তি) আপন ক্ষমতার অপব্যবহার করিতে কেহ দেখে নাই। ইংরাজেরা কহেন—প্রতিবেশী বাঙ্গালার অত্যাচারই সাঁওতাল বিদ্রোহের প্রধান কারণ। বন্যগণ কহিয়াছিল, আমাদের কষ্টের কারণ কি, তাহা বৃটিশরাজ জিজ্ঞাসা করিলে, এ ঘটনা হইত না। এক্ষণে সাঁওতালদিগের মধ্যে কেহ হিন্দু, কেহ বা খৃষ্টান হইয়াছে। সেই সঙ্গে ইহারা প্রতারণা প্রবঞ্চনা শিখিয়াছে। পর্ব্বত ইহাদের প্রধান দেবতা। তাঁহার নাম "মেরংবুরু"। বুঝিবা আমাদের শিবই ঐ দেবতা হইবেন। চড়কের মত তাহাদের 'পোটা' নামে এক উৎসব আছে। এখন আর বাণ ফুঁড়িতে পারে না। একজন সংবাদদাতা কহিলেন,—বদনা নামক উৎসব কালে, পিঠা ও মাংসসহ মদ্যপান এবং নৃত্যগীত শেষ হইলে, সন্ধ্যাকালে বৎসরের জন্য সেই একদিন স্ত্রী পুরুষে যদৃচ্ছা ব্যবহার হইয়া থাকে। হিন্দুস্থানি হোলিপর্ব্বে গালিপাড়া কি এই মূল হইতে উৎপন্ন? সাঁওতালেরা আপনাদিগকে 'হড়' কহে। হড় রমণীরা নৃত্যকে অতি প্রিয় বস্তু জ্ঞান করে। জমহির নামক নৃত্য রাসলীলার অনুরূপ। ঢাক, মাদল ও বাঁশীর বাদ্যসহকারে দ্রাবিড় ধরণে সজ্জিতকেশা এক একটি স্ত্রী এক একটি পুরুষের হস্ত ধারণ করিয়া মণ্ডলাকারে নৃত্য করে। মহাজন সাঁওতালের জমি বিক্রয় করিয়া লইতে পারে না। তাহারা কহে, জমি যদি বিক্রয় করিতে হইবে, তবে দেশের নাম সাঁওতাল পরগণা রাখিলে কেন? ক্রয়ার্থীকে কহে, আমাকে মারিয়া ফেল, তবে জমি পাইবে, নচেৎ আমরাই তোমাকে মারিব বা লুটিয়া লইব।

সাঁওতালী ভাষায় বহু সংস্কৃত শব্দ প্রবেশ লাভ করিয়াছে

অপিচ প্রাকৃত ভাষায় সাঁওতাল শব্দ দেখা যায়। এরূপ বিজাতীয় শব্দ প্রবেশে ভাষার মূল গঠনের কিছুমাত্র ব্যতিক্রম হয় না। বিভক্তি, প্রত্যয় ও ক্রিয়াপদ লইয়া ভাষার অবয়ব। এ সকলের পরিবর্ত্তন ঘটিলে নূতন ভাষার সৃষ্টি হয়। সকল ভাষাতেই বিভক্তিগুলি প্রথমে একটি পৃথক্ শব্দ থাকে, তদনন্তর সংক্ষিপ্ত আকার ধারণ পূর্ব্বক প্রকৃতির সহকারী হইয়া পড়ে। বাঙ্গালা ভাষায় এখনও এমন বিভক্তি আছে, যাহা স্বাতন্ত্র্য হারায় নাই। যথা—"এরা" বিভক্তি। এরা শব্দের প্রয়োগ—যেমন "এরা যাইবে।" কর্ত্তা কারকে এরা একটি বিভক্তি হইয়া দাঁড়ায়। যেমন "পণ্ডিতেরা কহেন।" এই বিভক্তিরই সংক্ষেপে "রা" হইয়াছে, যথা—"শিশুরা কাঁদে।" করণে "দ্বারা" ও অপাদানে "হইতে" বিভক্তির আকার এখনও বৃহৎ রহিয়াছে।

রাজমহলের পরপারে মালদহ, দিনাজপুর প্রভৃতি স্থলে যাত্রী লইয়া যাইবার জন্য অনেকগুলি গো-শকট রহিয়াছে। সেখান হইতে গৌড়ের জঙ্গল বহুদূর নহে। রাজমহল ছাড়াইলে পর্ব্বতের মধ্যে হিন্দুস্থানি দেশ অন্তর্হিত হইল। বাঙ্গালা ও হিন্দুস্থানির সন্ধিস্থান নয়ন গোচর হইল না। খোলার ঘরের পরিবর্ত্তে খড়ুয়া ঘর দেখা দিল। তিনপাহাড় হইতে একদল স্ত্রীলোক গঙ্গাস্নানে আসিয়াছে। তাহাদিগকে দেখিলে সাঁওতালি ভাব মনে আসে। একহস্তে লাক্ষা ও অন্যহস্তে কাঁসার চুড়ি। নদীতটে চাঁই, কাহার, গোয়ালা, সোণার ও মোদি প্রভৃতি হিন্দুস্থানী উপনিবেশী কৃষকের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রাম পাওয়া গেল। কথিত আছে, চৌর্য্য প্রভৃতি কুক্রিয়া করিয়া পলায়নপূর্ব্বক ইহারা স্বয়ং বা ইহাদের পূর্ব্ব পুরুষ এইস্থানে বসতি স্থাপন করিয়াছে। এইস্থান হইতে কঠিন মৃত্তিকার পাড় আর দেখা যায় না। বাঙ্গালার কোমল মৃত্তিকা পাওয়া গেল। ঘাটে কক্ষে কলসী বাঁকমল পরা কোঁচা বিরহিত

স্ত্রীলোক দেখিয়া বাঙ্গালী চিনিতে হয়। আমরা ফরক্কা নামক গ্রামের সন্নিধানে মূলধারা (পদ্মা) ত্যাগ করিয়া শাখা নদীতে (ভাগীরথীতে) চলিলাম। ঘাটে হিন্দী ও বাঙ্গালা দুইই শুনিতে পাওয়া যায়। হিন্দুস্থানীরা এদেশের বাঙ্গালার যে একটা বিশেষ স্বর আছে, তৎসহ বাঙ্গালা কহিতে পারে। ধুলিয়ানে একটি লোকের সহিত কথা কহিবার আবশ্যক হওয়ায় বাঙ্গালা কি হিন্দী কহিব চিন্তা করিতে হইল। শুঁড়ী জাতীয় লোক একখানি নৌকা করিয়া নিমন্ত্রণ খাইয়া আসিতেছে। পুরুষের বেশ বাঙ্গালীর মত—স্ত্রীলোকের হিন্দুস্থানীর ন্যায়। জলপথে জনপদ দেখা কেবল ঘটুমণ্ডল লইয়া হইতেছে। ঘাটে স্ত্রীলোকের ভাগই অধিক দেখা যায়। হাঁসুলী ও চুড়ি পড়া দেখিলে, মুসলমান ও রূপার পঁইছে, তাবিজ, নবাদা পরা দেখিয়া হিন্দু স্থির করিতে হয়। মাটি দিয়া মাথা ঘসার পদ্ধতি এখনও ছাড়ায় নাই। গ্রামে যদি কেহ দুর্গা পূজা করিয়া থাকেন, তাহার খড় জড়ান কলেবর মাটি ঝাড়িয়া ঘাটে তুলিয়া রাখিয়াছেন। এ গ্রামে যে পূজা হয়, তাহা সংবৎসর এ পথে যে চলিবে সেই দেখিতে পাইবে। ছাপঘাটীর মোহানা শুষ্ক হইয়া গিয়াছে; এজন্য ফরাক্কা মোহানা দিয়া জঙ্গিপুর নগরে আসিতে হইল। পরপারে তুলসিবিহার। এখানে নৌকার "কুৎ" হয়। ভাগীরথী যাহাতে নাব্য থাকেন সে জন্য কর-সংগ্রাহক পূর্ত্তবিভাগ সবিশেষ যত্ন করেন। যেস্থানে চড়া পড়িয়াছে, তাহার সম্মুখে বংশ প্রোথিত করিয়া বাঁধ দিয়া অন্যদিকে স্রোত চালান হইয়া থাকে। ছাপঘাটীর প্রাদেশিক কথা শুনিতে কিছু অদ্ভুত। এখানকার লোকে প্লুতস্বর ব্যবহার করিয়া থাকে। দেশের প্রাকৃতিক অবস্থা অনুসারে বাগ্‌যন্ত্রের আকার ভেদ হয় বলিয়া উচ্চারণের পরিবর্ত্তন হয়। এই উচ্চারণ-পরিবর্ত্তন হইতেই নব ভাষা উৎপন্ন হইয়া থাকে।

মুরসিদাবাদ।—আজিমগঞ্জের অপর নাম সহর। এই জনপদ ও পরপারস্থ বালুচরপুরী বাণিজ্য-নিরত ওসয়াল বণিকদিগের বসতিস্থান। নগরের সমৃদ্ধি তদুপযুক্ত দৃষ্ট হইল। মুরসিদাবাদে নবাবের হর্ম্ম্যরাজি ব্যতীত আর কিছুই দেখিবার নাই। সৈয়দাবাদে মহারাণী স্বর্ণময়ীর প্রাসাদ অতিক্রম করিয়া খাগ্‌ড়া বহরমপুর পাওয়া গেল। প্রাচীন জনপদ গৌরবচিহ্ন অঙ্কে করিয়া সুরধুনী-তটে লীলা করিতেছেন। দেখিতে দেখিতে চক্ষু ক্লান্ত হইয়া পড়িল, ইষ্টকালয় ফুরায় না। শিব মন্দিরের আরব্য গঠন; কেবল উপরিভাগে ত্রিশূল দেখিয়া চেনা যায়। স্ত্রীলোকের আভরণ, যথা—শাঁখা ও রূপার অনুকরণ শাঁখা ও মর্দ্দানা, কাঠের মালার মাঝে মাঝে সোণার মালা ও মাদুলি। পলাশীক্ষেত্র দেখিবার জন্য নৌকা ত্যাগ করিতে হইল। এক্ষণে তথায় লোকের বসতি হইয়াছে। সেখানে যাইয়া একবার চক্ষের জল ফেলিয়া আসা কর্ত্তব্য জ্ঞান করিলাম। কোথায় জয়স্তম্ভ প্রোথিত রহিয়াছে—অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে হইল। বিজয় প্রস্তরের অতি মসৃণ মর্ম্মর গাত্রে উৎকীর্ণ আছে—

"Plassey
Erected by the
Bengal Government"
—1883—

পুরাতন আম্রবৃক্ষতলে দণ্ডায়মান হইয়া পলাশীর যুদ্ধকাব্য একসর্গ পাঠ করা হইল। হৃদয়ের উচ্ছ্বাস প্রশমিত না হইতে হইতেই প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম। কাটোয়ায় অজয় নদ দেখা দিলেন। মেটিরির নিকট বর্দ্ধমান অঞ্চলের মত বেশভূষা দেখা গেল।

নবদ্বীপ।—পদ্মার জলঙ্গীধারা ভাগীরথীতে আসিয়া মিশিল। এখান হইতে গঙ্গার ইংরাজী নাম হুগলি নদী হইয়াছে। ঘাটে কেহ শিখা

বন্ধন করিয়া তর্পণ আরম্ভ করিতেছেন, কেহ বা সান্ধ্য-বন্দনা সমাপন করিয়া উঠিয়া যাইতেছেন। কনৌজীয়া, মৈথিল, তৈলঙ্গী ও বাঙ্গালী বিদ্যার্থিগণ পাকা টোলে পাঠ লইবার জন্য অধিক বেলা করিয়া স্নান করিতে আসিয়াছেন। "ঘটাত্ব ভাবের প্রত্যক্ষ" কিংবা "ধ্বংস প্রাগ্ভাবের খণ্ডন" লইয়া কিছুক্ষণ বিতণ্ডা করিতে পারেন, কারণ এখন আর ত্বরা নাই। অপরাহ্নে পুনর্ব্বার "পাঠ চাওয়া" হইবে। নিমাই কোন্ ঘাটে নৈবেদ্য তুলিয়া খাইতেন, জানিবার জন্য কৌতূহল হইল। বৃদ্ধ লক্ষ্মণ সেন এখানে গঙ্গা-বাস করিতেন। ১২০৩ খ্রীষ্টাব্দে বখ্তিয়ার খিলিজি তাঁহার রাজধানী আক্রমণ না করিয়া একেবারে নবদ্বীপে আইসেন। যেখানে সেনা থাকিত না, সেখানে বল পরীক্ষা আর কি হইবে। নদীয়া ছাড়াইয়া বহুদূর পর্য্যন্ত পুলিনে বিল্বপত্র ও পুষ্পের নির্ম্মাল্য উৎক্ষিপ্ত দৃষ্ট হইতে লাগিল। কাল্নায় বর্দ্ধমান-রাজের সমাজবাটী ও লালজীর মন্দির দেখিয়া সুখী হইলাম। দারুব্রহ্মকে মুগের ডালের নৈবেদ্য দেওয়া হয়। দেউলের ইষ্টক অতি পরিপাটী কারুকার্য্যময় ছাঁচে তুলিয়া যোজিত হইয়াছে। সুখসাগরে আমাদের দেশের (খাঁটুরার) মত কথা শুনিলাম। কিন্তু পরপারের ভাষা তদ্রূপ নহে। বাঙ্গালা লিখিতে যে ভাষা ব্যবহৃত হয়, তাহার সংজ্ঞা রাঢ়ী সাধু ভাষা হইতে পারে। বাঙ্গালা ভাষার আদিকালে বীরভূম বর্দ্ধমান অঞ্চলে গ্রন্থ রচনা হইত। কীর্ত্তন, যাত্রা, কথকতা ঐ দেশের সম্পত্তি। শ্রীরামপুরে প্রথম সংবাদপত্রের প্রচার হইয়াছিল, এবং কলিকাতা রাজধানীর ভাষা ও পুস্তক উক্ত শ্রেণীর অন্তর্ভূত হওয়ায়, এ প্রদেশের ভাষাই লিখিবার বাঙ্গালা হইয়া পড়িয়াছে। বীরভূমের এমন প্রাদেশিক পদ ও শব্দাংশ আছে, যাহা আমাদের অঞ্চলে ব্যবহৃত হয় না, অথচ লিখিবার কালে প্রয়োগ করিতে হয়।

গঙ্গার পূর্ব্বপারের বাঙ্গালা	হরিরে ডাকিতে হইবে।
গঙ্গার পশ্চিমপারের বাঙ্গালা	হরিকে ডাকিতে হইবেক।

হিন্দিতে দ্বিতীয়ার যে 'কো' বিভক্তি, তাহা এবং আমাদের 'কে' হয়ত এক মূল হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকিবে। হিন্দুস্থানি ভাষায় তেরটির মধ্যে সাতটি ককারাদির বিভক্তি দেখা যায়। ত্রিবেণীর বাঁধা ঘাট পাইলে জোয়ার-ভাঁটা অনুধাবন করিবার পথ সমুপস্থিত হইল। খালের দক্ষিণ ভাগে একটি সুবৃহৎ প্রস্তর যোজিত দেবালয় অসম্পূর্ণ অবস্থায় রহিয়াছে। তাহাতে সংলগ্ন একখণ্ড সামান্ত লৌহ-কীলক আকর্ষণ করিলে কিঞ্চিৎ বহির্গত হইয়া থাকে। এ কারণ, "দফা গাজির কুড়ুল নড়ে চড়ে পড়ে না" এই প্রবাদের সৃষ্টি হইয়াছে। বংশবাটী গ্রামের হংসেশ্বরী দর্শন করিয়া হুগলি সেতুর নিকটবর্ত্তী হইলাম। আমাদের কর্ণধার কহে, কালিকা ক্ষেত্র অর্থাৎ কলিকাতা ষোল ক্রোশ দীর্ঘ সহর। আমার ভৃত্য পূর্ব্বে কলিকাতা দেখে নাই, সে হুগলি হইতে কলিকাতা আরম্ভ হইয়াছে ভাবিল। বস্তুতঃ কলিকাতার সমৃদ্ধি হুগলি পর্য্যন্ত উছলাইয়া আসিয়াছে বলিতে পারা যায়।

কলিকাতা।

মহাপ্রদর্শনী।

১৯শে অগ্রহায়ণ—১২৯০।—অদ্য সার্ব্বজাতিক মহা-প্রদর্শনীর উদ্ঘাটন অনুষ্ঠান দেখিতে যাওয়া গেল। ইংরাজ সাম্রাজ্ঞীর ভারত-প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত লর্ড রিপণ কর্ত্তৃক প্রণোদিত হইয়া, সাম্রাজ্ঞীর তৃতীয় পুত্র ডিউক অফ্ কনট্ প্রদর্শনী উদ্ঘাটন করিলেন। লর্ড রিপণের সুললিত বক্তৃতা শুনিয়া কর্ণ পরিতৃপ্ত ও গভর্ণর জেনারল কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত দরবার দেখার বাসনা সফল হইল।

জ্ঞান, আমোদ ও বায়ুসেবন এই তিনটি অভিপ্রায় সাধনের নিমিত্ত মাসত্রয়ব্যাপী প্রদর্শনীতে প্রায় প্রত্যহই ভ্রমণ করিতে যাইতাম। দ্রষ্টব্য-বস্তুর তুলনায় জ্ঞানোপার্জ্জন অতি সামান্যই হইয়াছে। জ্ঞানচক্ষু ব্যতিরেকে কোন বিষয় সম্যক্ উপলব্ধি করা যায় না। যেমন জ্ঞান, তাহার অতিরিক্ত শিক্ষা হওয়া অসম্ভব। আমাদের বিশ্বতোমুখী বাণিজ্য-বুদ্ধি নাই। আমোদ আছে বলিয়া, প্রদর্শনীতে যাওয়া যায়। গতবারের প্রদর্শনী দেখিয়া, ইংরাজ বিলাতী ধুতী ও সাড়ী বুনিতে শিখিয়াছেন, এবারে হয় ত কাঁসারির অন্ন মারিবেন। কলের কার্য্যকারিতার সহিত হস্তের কার্য্যকারিতা কিছুতেই প্রতিযোগিতা করিতে পারে না আমরা যন্ত্রবিজ্ঞান জানি না। অতএব মহাপ্রদর্শনী হইতে বিশেষ কিছু উপকার পাইব না। কেবল লোপোন্মুখ দুই একটা ভারতশিল্পের রক্ষাকল্পে কিছু সাহায্য পাইতে পারি। অষ্ট্রেলিয়াবাসী ইংরাজ উপনিবেশীরাই এ মেলার অনুষ্ঠাতা; তাঁহারা ইহাতে বিশেষ উপকার

পাইতে পারিবেন, সন্দেহ নাই। ইতিমধ্যে ভারত ও অষ্ট্রেলিয়ার মধ্যে রীতিমত বাণিজ্যতরি যাতায়াতের নিয়ম স্থির হইয়াছে। মেলা-প্রবর্ত্তক ধুবেয়ার সাহেব অষ্ট্রেলিয়ার বিশেষ সাধুবাদের পাত্র ; তিনি আমাদেরও প্রিয়। তাঁহার প্রসাদে আমরা কিছুকাল চক্ষুর আকাঙ্ক্ষা বিলক্ষণ মিটাইয়াছি। প্রদর্শনীতে জড় ও জীবন্ত অনেক বস্তু চক্ষু শীতল করিয়াছে। যে দিন প্রথম দেখিতে যাওয়া হইল, সেদিন কোন সামগ্রীই আমাদের চক্ষু আয়ত্ত করিতে পারিল না। ইহার পর আর কি আছে দেখা যাউক, এমনি করিয়া দিন গেল। পঞ্জাবদেশীয় দ্রব্যজাত প্রদর্শনীর প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিয়া আমার জ্ঞান হইল যেন, প্রকৃতই সেই দেশে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। চতুর্দ্দিকে পঞ্জাবী বস্তু ; তাহার পর সেই প্রকোষ্ঠের কর্ম্মচারিগণও পঞ্জাবী এবং তাঁহারা পঞ্জাবী ভাষায় কথোপকথন করিতেছেন। আরও বিচিত্র এই, পঞ্জাব ভূমিতে প্রথম পদার্পণ করিয়া গৃহসাজ, দেবদারু কাষ্ঠের যে সুঘ্রাণ পাইয়াছিলাম, এখানেও সেই গন্ধ। বোম্বাই, মান্দ্রাজ, রাজপুতানা, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ, ব্রহ্ম, কোচিন যে কোন নামধেয় প্রকোষ্ঠে যাই, যেন বোধ হয়, সেই দেশের প্রকৃতি এখানে আনিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। এ স্থান ভাল করিয়া দেখিতে পারিলে দেশ ভ্রমণের বিশেষ প্রয়োজন থাকে না। সেখানকার বাড়ী দেখিবে, ছবি আছে—কাষ্ঠ ও প্রস্তরের দ্বার আছে। ফল মূল দেখিবে, —মৃন্ময় প্রতিরূপ দেখ। পশু পক্ষী দেখিবে,—মানবের বেশভূষা দেখিবে,—কার্য্যকলাপ দেখিবে, যাহা চাও, সমস্ত পাইবে। যিনি আগ্রার তাজ, অমৃতসরের গুরুদরবার, দিল্লীর কুতব মিনার, বৃন্দাবনের তামিল মন্দির ও গঙ্গাপার হইতে দৃশ্যমান কাশীনগরী দেখেন নাই, তিনি এখানে সে বাসনা চরিতার্থ করিতে সমর্থ হইবেন। মেলার উদ্দেশ্য, শিল্প-প্রদর্শনপক্ষে বিলক্ষণ সফল হইয়াছে। কাশ্মীরের পেপিয়র মেসি, দামস্কস

কর্ম্ম ও শাল, বারাণসী ও আহাম্মদাবাদের জরির কর্ম্ম, হায়দরাবাদের তাস নামক নিরবচ্ছিন্ন জরির বস্ত্র, মহীশূরের চন্দন কাষ্ঠের সামগ্রী, রাজপুতানার শস্ত্র ও বর্ম্ম (ব্‌খতর), জয়পুরের রাজা মান কর্ত্তৃক কাবুল হইতে আনীত গালিচা এবং খিল্লৎ প্রাপ্ত পরিচ্ছদ, আগ্রার নগোঁকা কাম, তাঞ্জোর ও মুরশিদাবাদের হস্তিদন্তনির্ম্মিত কারুকর্ম্ম, গোয়ালিয়র ও কাম্বের স্বচ্ছ প্রস্তর সামগ্রী, অস্‌লার কোম্পানির বেলওয়ারি পর্য্যঙ্ক, হ্যামিণ্টন কোম্পানির সঙ্গীতকারী ঘড়ি, ত্রিপুরার হস্তিদন্তের শীতলপাটী, তাঞ্জোরের মাদুর, কুচবিহাররাজের হীরার মুকুট, বর্দ্ধমানরাজের স্বর্ণসিংহাসন ও হীরার শিরস্ত্রাণ, সাম্রাজ্ঞী ইউজিনীর হীরার লিখনসামগ্রী ও নক্ষত্র, বদ্রিদাসের মুক্তা, দিল্লী ও লাহোরের সম্রাট ও বেগমগণের মূর্ত্তি, রাত্রি, বৃষ্টির পূর্ব্বলক্ষণ এবং বরফ পড়ার চিত্র প্রভৃতি নানা অপূর্ব্ব দ্রব্যের সমাবেশ এই প্রদর্শনীতে হইয়াছে। তেমনি ইউরোপ খণ্ডের তাবৎ দেশের দ্রব্য, প্রদর্শনীর পৃথক পৃথক্ গৃহ ও অতি মহান্ যন্ত্রশালা দিগ্‌ব্যাপ্ত করিয়াছে! উড্‌রফ্‌ সাহেব কাচের সূত্র কাটিতেছেন। এক স্থানে লৌহ হইতে উদ্ভাবিত তুলা দেখিলাম। ঐ কাচের সূত্র ও লোহার তুলা গুঁড়া করিলে দানা বোধ হয়, কিন্তু তাহার আঁশ কোমল। বাষ্প-প্রক্ষেপ দ্বারা একটি গৃহ এমন শীতল করা হইয়াছিল যে, সেখানে জল জমিয়া যায়।

বঙ্গ।*

বাঙ্গালী বৈশ্য।

বাঙ্গালা উড়িষ্যা ও বিহারের সন্ধিস্থলে ছোট নাগপুর বিভাগ অবস্থিত। এই প্রদেশ এখনও আদিম অধিবাসীদিগের বসতিস্থান হইয়া রহিয়াছে। বাঙ্গালী, হিন্দুস্থানী, উৎকলী, সাঁওতাল, মুণ্ডা ও কোল জাতির সম্মিলন ক্ষেত্র বলিয়া, ছোট নাগপুর জাতিতত্ত্ববিদ্‌গণের আদরের স্থল হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে এই বিভাগকে অবলম্বন করিয়া মহামতি ডাল্‌টন জাতিতত্ত্ব সম্বন্ধীয় প্রধান গ্রন্থ রচনা করেন। আর্য্য বা অনার্য্য হউক, ভাষা অপেক্ষা পরিচ্ছদের পরিবর্ত্তনে কিছু কালবিলম্ব হইয়া থাকে। বাঁকুড়া ও কলিকাতার লোকের পরিচ্ছদ এক, কিন্তু ভাষার প্রাদেশিকতা বিভিন্ন। সাধুভাষা এই প্রাদেশিকতা অনেক পরিমাণে লোপ করিয়াছে। আমরা লিখিবার সময় "হইবেক" লিখি, মুখে বলিতে হইলে "হবে" কহিয়া থাকি। "ইহা" এই শব্দ এবং "হইতে" এই শব্দ লিখিবার সময় ব্যবহৃত হয়— কথোপকথনে নয়। কিন্তু বাঁকুড়ায় এই দুইটী এবং ককারান্ত "হবেক" কথোপকথনের শব্দ। পরিচ্ছদ দেখিয়া প্রাদেশিকতা বুঝা যাইবে না। কিন্তু কথা শুনিলে, কে কোন্ দেশবাসী তাহা নির্ণীত হইতে পারে। এবম্প্রকারে ভাষার দ্বারা আর্য্য অনার্য্য নির্ণয় অসম্ভব। মানুষের আচার ও বর্ণ বা রঙ দ্বারা কে আর্য্য, কে অনার্য্য অথবা কে মিশ্র তাহা স্থিরীকৃত হয়।

---

* (১) হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা—শ্রীরাজনারায়ণ বসু প্রণীত। (২) Growth —F. MaxMuller প্রণীত।

রেলপথ উন্মুক্ত হওয়ায় এক্ষণে স্থানান্তরে গমন নিবন্ধন জনসাধারণকে মাতৃভূমির সংস্রব ত্যাগ করিতে হয় না। যখন ইচ্ছা স্বদেশে প্রত্যাগমন করিতে পারেন। তাহাতে বাঙ্গালীর হিন্দুস্থানী হওয়া বা হিন্দুস্থানীর বাঙ্গালী হইয়া যাওয়া অসম্ভব হইয়া পড়িতেছে। ইহাতে কেহ ভাবিতে পারেন, বাঙ্গালী চিরদিনই বাঙ্গালী ও হিন্দুস্থানী চিরদিনই হিন্দুস্থানী আছেন। বাস্তবিক তাহা সত্য নহে। উক্ত কারণে এক জাতির মধ্যে সমাজ-ভেদ হইবার হেতু এক্ষণে আর নাই। এক সমাজের লোক কার্য্যোপলক্ষে অন্য স্থানে বাস করিয়া, বৈবাহিক ক্রিয়ার সময় আপন দলে গিয়া মিশিতেছেন। কিন্তু পূর্ব্বে সেরূপ হইতে পারিত না। তাঁহারা যেখানে থাকিতেন, সেইখানেই একটি "থাক" হইয়া যাইত। স্বপাক-ভোজন শুদ্ধাচারের আদর্শরূপে গৃহীত হওয়ায়, অন্য থাকের অন্ন গ্রহণ করিতে আর প্রবৃত্তি হইবে কেন?

নবশাখকে এই দেশে নবসেনা কহে। আমাদের দেশে নবশাখ এ হুঁকায় তামাক খান। এ দেশে নবসেনার অন্তর্গত একজাতি অপ জাতির অন্ন পর্য্যন্ত গ্রহণ করিয়া থাকেন। এক জাতি উক্তশ্রেণীর অপ জাতিকে কুটুম্ব কহে। কিন্তু কুটুম্বিতা কালে ভিন্ন জাতির অন্ন চলে না।

নগর হইতে গ্রামের প্রাকৃতিক দৃশ্য যেমন বিভিন্ন, সামাজিক জীবনে তদ্রূপ প্রভেদ আছে। সৌধমালার পরিবর্ত্তে শস্য-শ্যামল ক্ষেত্রে পরিবেষ্টিত কুটীরের অল্পবিত্ত অধিবাসী, স্বকীয় সর্ব্বপ্রকার কার্য্যে রত থাকিয়া, নাগরিক গণের আদিস্তররূপে জীবলীলা সমাধা করিতেছে। মহানগরের সদ্গোপ ও তৈলী ধনীক রমণী বদ্ধদ্বার শিবিকারোহণে থাকিয়া পার্শ্ববর্ত্তী প্রতিবাসীর বাটীতে পদার্পণ করেন। এদেশে কোমর জড়ান স্ত্রীলোক দেখিলে, তৈলী বা সদ্গোপ বলিয়া স্থির করা যায়। কারণ তাহাদিগকে সর্ব্বদা ক্ষেত্রে কার্য্য করিতে হয় বলিয়া বস্ত্র পরিধানের প্রণালী উক্তবিধ

হইয়া গিয়াছে। ব্রাহ্মণ বাঁকুড়া হইতে মানবাজারে মাথায় পানের চেঙ্গারী লইয়া বিক্রয় করিতে আনিতেছে। ক্ষত্রিয় বৃক্ষশাখায় উপবীত রক্ষা করিয়া ধান্যচ্ছেদনে প্রবৃত্ত। উপবীতধারী বৈশ্যের রমণীগণ মুড়ি বহিয়া বাজারে বেচিতে যায়। নবসেনাভুক্ত নর দারপুত্রসহ আপন ব্যবসায়ে লিপ্ত। ইহা দেখিয়া নগরবাসিগণ আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন না। তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ এই শ্রেণীর লোক ছিলেন, ইহা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। নবসেনা পরস্পরের "কুটুম্ব" বটে। তাহাদের উপাধি একাধিক হইয়া থাকে।

এখানে কর্ম্মকার জল আচরণীয় জাতি নহে। লৌহকার ও কুম্ভকার দুই প্রকারের আছে। তাহাদের যে শ্রেণীতে বিধবার বিবাহ প্রচলিত আছে, তাহারা অনাচরণীয়। বিধবাবিবাহকারী কুম্ভকারগণ মঘাই (মগধবাসী) নামে খ্যাত। অর্থাৎ ঐ জাতির হিন্দুস্থানী নাম ও ব্যবহার অদ্যাপি ঘুচে নাই।

পুরুলিয়ার কৈরী জাতি বাঙ্গালা ও হিন্দীমিশ্রিত একপ্রকার ভাষা ব্যবহার করিয়া থাকে। তাহাদের মধ্যে যে বিধবার বিবাহ প্রচলিত আছে, এ কথা তাহারা স্বীকার করিতে চাহে না। প্রত্যক্ষ দেখাইয়া দিলে কহে, "তাহা অন্য থাকে চলিত আছে। তাহাদের সহিত উহারা আহার ব্যবহার করে না।" বৈদিক কালে দ্বিজের মধ্যেও বিধবাবিবাহ প্রথা ছিল। ইহা অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার উল্লিখিত মন্ত্রের দ্বারা প্রমাণিত হইবে। তদ্‌যথা ;—

ইমা নারীরবিধবাঃ সুপত্নীরাং জনেন সর্পিষা সংবিশংতু।
অনশ্রবোঽনমীবাঃ সুরত্না আরোহংতু জনয়ো যোনিমগ্রে॥

ঋক্, ১০।১৮।৭

অর্থাৎ এই সকল নারী বৈধব্য দুঃখ অনুভব না করিয়া, মনোমত পতিলাভ করিয়া অঞ্জন ও ঘৃতের সহিত গৃহে প্রবেশ করুন। এই সকল

বধু অশ্রুপাত না করিয়া রোগে কাতর না হইয়া উত্তম উত্তম রত্ন ধারণ করিয়া সর্ব্বাগ্রে গৃহে আগমন করুণ।

"উদীর্ষ্ব নার্য্যভি জীবলোকংগতাসুমেতমুপশেষ এহি।
হস্তগ্রাভস্য দিধিষোস্তবেদং পত্যুর্জনিত্বমভিসংবভূথ ॥"

১০।১৮।৮

অর্থাৎ হে নারি! তুমি এই গতপ্রাণ পতির নিকট শয়ন করিতেছ; উত্থান কর, জীবলোকে আগমন কর এবং তোমার হস্তধারী বিবাহেচ্ছু ব্যক্তির জায়াত্ব স্বীকার কর।" বৈশ্য জাতির অশিক্ষিত লোকে আপনা-দিগকে বিশি বা বিশ্ কহে। বাঙ্গালায় যাঁহারা ব্রাহ্মণ ও শূদ্র ভিন্ন অন্য বর্ণ দেখিতে পান না, এই জাতির প্রতি তাহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে ইচ্ছা করি। বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইয়াছি, পাবনা জেলার চাটমোহরে শঙ্খবণিক ও দাঁইহাটের নিকটস্থ সমুদ্রে কাংস্যবণিক উপবীত গ্রহণ করে। রাণীচকে তাম্বুল-বণিকের উপনয়ন হইয়াছে। ইহাদিগকে বৈশ্য না বলিলে চলিবে না।

প্রকৃতপক্ষে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র বিভাগ, বিভিন্ন স্থান ও বিভিন্ন সময়ের কার্য্য। এক্ষণে তাহার সার্থকতা নাই। তদ্দর্শনে ঔপন্যাসিক জাতিবিদ্‌গণ অসবর্ণের অবৈধ মিলনকে নববর্ণ উৎপত্তির কারণরূপে নির্দ্দেশ করিয়া চাতুর্বর্ণের ধারাবাহিকতা রক্ষা করেন।

পৌরাণিক রূপকে ব্রহ্মা হইতে চতুর্বর্ণের উৎপত্তি কথিত হইয়াছে। শূদ্রকে একবংশের বিভিন্ন শাখা ভিন্ন অপকৃষ্ট জ্ঞান করা অসঙ্গত। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র, একদেহ মধ্যে পৃথক্ অঙ্গরূপে বিরাজ করিতেছে। মূল জানিতে সকলের কৌতূহল হইয়া থাকে। তাহা অজ্ঞেয় হইলে কল্পনার সাহায্যে একটি ভিত্তি স্থাপিত হয়। চিন্তাকে প্রণালীবদ্ধ করিবার জন্য কিংবা বোধসৌকর্য্যার্থ শ্রেণী রচনা আবশ্যক। শ্রেণী যে প্রকারে

বিভক্ত হইবে, তাহার ব্যতিক্রম হইলে সঙ্করত্ব জন্মে। শ্রেণীর মৌলিকতা কল্পিত বিষয় মাত্র। সেই শ্রেণীটী যদি রূপান্তরিত করা যায়, সঙ্করত্ব থাকিবে না। অতএব সঙ্কর শব্দ, দোষপ্রকাশক নহে। শ্রেণীবিশেষে নর নারীর সংখ্যার ন্যূনাধিক্য প্রযুক্ত অনুলোম ও প্রতিলোম বিবাহ প্রথা প্রচলিত করিতে হইয়াছে। পরে তাহা নিষ্প্রয়োজন বোধ হইলে তদুৎপন্ন সন্ততি কর্ত্তৃক নূতন শ্রেণী প্রাদুর্ভূত হয়। এই প্রকারে বঙ্গে মুখ্যকুলীন শ্রোত্রিয় ও গৌণ কুলীন হইতে বংশজ নামে চতুর্থ শ্রেণী উৎপন্ন হইয়াছে। বংশজগণ কৌলীন্যে সঙ্কর। বংশজ বা ভঙ্গ কুলীন বলিলে যেমন জারজত্ব-দোষ স্পর্শে না, সেইরূপ বর্ণসঙ্করেও উক্ত প্রকার গ্লানি নাই। অধুনা যথায় নর নারীর অনুপাত সমান, সেই স্থানে অসবর্ণ বিবাহ নিষিদ্ধ; সুতরাং সঙ্করবর্ণোৎপত্তি ক্ষান্ত হইয়াছে।

পূর্ব্বকালে এক বংশীয় লোক, বৃত্তিভেদে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি বর্ণে বিভক্ত হইয়াছিলেন। ব্যবসায়ের পরিবর্ত্তন হইলে তাঁহারা বর্ণান্তর প্রাপ্ত হইতেন।

> "পুত্রো গৃৎসমদস্য চ শুনকো যস্য শৌনকঃ।
> ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়াশ্চৈব বৈশ্যাঃ শূদ্রাস্তথৈব চ॥
> এতস্য বংশে সমুদ্ভূতা বিচিত্রৈঃ কর্ম্মভির্দ্বিজাঃ॥"
>
> (বায়ুপুরাণ)

> "নাভাগারিষ্ট-পুত্রৌ দ্বৌ বৈশ্যৌ ব্রাহ্মণতাং গতৌ।"
>
> (হরিবংশ)।

কালে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইলে, সভ্যতার উৎপত্তি হইল। তৎসহকারে বহুবিধ বৃত্তি উৎপন্ন হয়। তখন চতুর্ব্বিধ ব্যবসায়ে—সংকুলান না হওয়ায় নবোত্থিত বৃত্তিগ্রহণকারী স্বীয় অবলম্বিত জীবিকানুসারে নূতন নামে

পরিচিত হইতে লাগিলেন। অদ্যাপি ব্রাহ্মণ-কুমার উপনয়ন না হওয়া পর্য্যন্ত এবং ব্রাহ্মণী শূদ্রবৎ গণ্য।

"জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ, কর্ম্মণা জায়তে দ্বিজঃ।"

ভিন্ন বংশীয় লোকও সমধর্ম্মী হইলে, আমাদের বর্ণে প্রবেশ লাভ করিয়া থাকে। হিমালয়ের উত্তর প্রদেশ নিবাসী শক জাতি, ভারতের নানা স্থানে বসতি স্থাপন করিয়া রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা প্রথমে বর্ণভেদের উচ্চাবচ সম্মানের অবহেলাকারী সন্ন্যাসীদিগের প্রবর্ত্তিত বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়া পরে বর্ণগৌরবাক্রান্ত ক্ষত্রিয় শ্রেণীতে স্থান পাইয়াছেন। পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকগণের মতে পরিহর, প্রমার, চালুক্য ও চৌহান রাজপুত শকবংশাবতংস। কাশ্মীরীয় বৌদ্ধমতাবলম্বী শকরাজ কণিষ্ক কর্ত্তৃক যে অব্দ প্রচলিত হয়, তাহা আমরা শকাব্দ নামে ব্যবহার করি। চীন ও জাপানেও এই সংবৎ চলিত আছে।

ভারতে মুসলমানগণের অধিকার হইবার কিঞ্চিৎ অগ্রে বা সমকালে ব্রাহ্মণগণ ও রাজপুতগণ নেপালে প্রবিষ্ট হইয়া মগর, গুরঙ্গ ও নেওয়ার জাতিকে আপন ধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে আরম্ভ করেন। যে সকল মগর, ব্রাহ্মণ্য নীতির অনুগত হইল, তাহারা ক্ষত্রিয়ত্ব লাভ করিয়া যজ্ঞোপবীত ধারণপূর্ব্বক, সূর্য্যবংশ প্রভৃতি সম্মানিত মূল আশ্রয় করিতে সমর্থ হইয়াছে। তাহাদিগের দ্বারাই থাপা, ঘরটি ও রাণা কুল উৎপন্ন। এই নব ক্ষত্রিয়গণ খস নামে অভিহিত হইতে লাগিল। ব্রাহ্মণকর্ত্তৃক মগর পত্নীতে উদ্ভূত সন্তানগুলিও উপবীতধারী; অপিচ উক্ত নব ক্ষত্রিয়ের অন্তর্গত। এবংবিধ বিভিন্ন ধর্ম্ম ও বংশের সংমিশ্রণে এক অভিনব ভাবের উদয় হইলে, তদ্দ্বারা উহাদের ভাষা পরিবর্ত্তিত হইয়া, তিব্বত ও ভারতীয় ভাষার মিশ্রণে খস্‌কু-নামধেয় পৃথক্ উপভাষায় পরিণত হয়। গুরঙ্গগণ উপবীত প্রাপ্ত হয় নাই। সামাজিক সম্মানে তাহারা ক্ষত্রিয়ের নিম্নে ও বৈশ্যের উপরে

স্থান পায়। যে সকল গুরঙ্গ সুদূরে বাস করে, তাহারা অদ্যাপি ম্লেচ্ছভাব রক্ষা করিয়া বৌদ্ধমতানুবর্ত্তী আছে। তথাপি খস্‌দিগের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকায়, উহাদের ব্যবহার ও বিশ্বাস রূপান্তরিত হইতেছে। বৃটিশ গুর্খা সেনাদলস্থ সেই প্রকার গুরঙ্গগণ বিদেশে অবস্থান কালে, হিন্দু সমাজে বাস করিতে হয় বলিয়া, তদনুযায়ী শৌচাচার ও ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। নেওয়ার জাতি ৬৯ ভাগে বিভক্ত। তন্মধ্যে বুদ্ধমার্গী ১৬, মধ্যপথাবলম্বী ৩৮ ও শিবমার্গী ১৫টী শ্রেণী। মধ্যপথানুসরণকারিগণ ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ উভয় পুরোহিত দ্বারা গৃহকর্ম্ম সম্পাদন করে। নেওয়ারী বর্ণমালা স্বতন্ত্র। তাহাদের স্বকীয় সাহিত্য আছে। তাহাদের শিল্পাদিতে চীনদেশীয় ভাব বিদ্যমান। চীন অক্ষরে কোন উচ্চারণ প্রকাশ করে না। তাহা একটী ভাবব্যঞ্জক চিহ্ন। পাঠক আপন অভ্যাসের অনুযায়ী একই অক্ষরে বিভিন্ন শব্দ উচ্চারণ করেন। উক্ত বর্ণমালায় দুই সহস্রাধিক অক্ষর আছে। তত্রত্য রাজা হিন্দু, তজ্জন্য নেপালে হিন্দুত্ব সম্মানিত। যদি হিন্দু-গৌরব-সূর্য্য অস্তমিত না হয়, তবে গুরঙ্গ ও নেওয়ারেরা হিন্দুই থাকিবে, সন্দেহ নাই। নেওয়ারদিগকে পরাজিত করিয়া, গুর্খারাজ নেপালকে একচ্ছত্র করিয়াছেন। জেতৃজাতি, তাহাদিগকে সেনাদলে প্রবেশ করিতে দেয় নাই। নেওয়ারেরা বাণিজ্যে রত। এ অবস্থায় জোষীগণ এখন আর তাহাদিগকে ক্ষত্রিয় করিতে পারিবেন না। তাহা-দিগকে বৈশ্যই থাকিতে হইবে।

মণিপুর এবং ত্রিপুরার পরম বৈষ্ণব বাঙ্গালী ক্ষত্রিয়দিগকে দর্শন করিলে, তাঁহারা শারীরিক লক্ষণানুসারে যে মঙ্গোলীয়-বংশীয়, তাহা প্রতিপন্ন হইবে। খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে কামরূপে আহম্‌ মগগণ রাজত্ব আরম্ভ করিয়া শাক্ত সম্প্রদায় ভুক্ত হইয়াছিলেন। মুসলমানগণের অত্যাচারে মগ যাজকেরা চট্টগ্রাম হইতে পলায়নপর হইলে, তত্রত্য মগ

অধিবাসিগণ হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত হইতে থাকে। তাহারা দুর্গাপূজা করিয়া ছাগবলি প্রদান করে; পরন্তু পূর্ব্ব আচারানুসারে অন্যত্র কুক্কুটবলিও প্রদান করিয়া থাকে। এক্ষণে তাহারা পূর্ব্ব উপদেষ্টা প্রাপ্ত হইয়া পুনর্ব্বার বৌদ্ধমতে দীক্ষিত হইতেছে। তাহাদের একই পরিবারে কালীচরণ ও বরকত আলি এই দুই ভিন্ন নাম দৃষ্ট হইবে।

ভুটিয়া বা তিব্বতীয়গণ, নেপাল হইতে কেবল বৌদ্ধমত শিক্ষা করে নাই। তাহাদের তান্ত্রিকতাও ঐ স্থান হইতেই প্রাপ্ত। অধুনা ভুটানে দেবগণের মধ্যে শক্তি মূর্ত্তি অনেক। দার্জ্জিলিঙ্ (তান্ত্রিক আচার্য্যস্থলী) অধিত্যকার রুদ্রাক্ষ ও জটাজুটধারী ভুটিয়ার সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হইয়াছে। আমরা শিবিকাবাহী, শিখাধারী ভুটিয়াকে নারায়ণ শব্দ উচ্চারণ করিয়া ক্লান্তি অপনোদন করিতে শ্রবণ করিয়াছি। নেপালী হিন্দু-স্থানীদের সহিত একত্র অবস্থান করায়, উহাদের হৃদয়ে ঘাতপ্রতিঘাত চলিয়াছে। বিশেষ চেষ্টা করিবার লোক থাকিলে, তাহাদিগকে হিন্দু করা দুষ্কর নহে। তখন ধর্ম্মের ধারাবাহিকতার মধ্যে আনয়ন করিবার জন্য, ঐ জাতিকে শূদ্রত্ব প্রদান করিয়া শাস্ত্রীয়তা রক্ষা করিতে হইবে।

ভুটিয়ারা হিন্দু হইলেও নেপালী শূদ্রের ন্যায় শূকর ও কুক্কুট মাংস ভোজনে অনুরক্ত থাকিবে। হিন্দুদের যে প্রদেশে মাংসবিশেষ ভক্ষণ নিষিদ্ধ ছিল ও স্পর্শদোষ প্রথা প্রচলিত ছিল, সেই স্থান কোন সময় প্রাধান্য লাভ করায়, উক্ত আচার অনেক স্থলে শিষ্টাচার-বিরুদ্ধ হইলেও তাহা হিন্দু-ধর্ম্মের সার্ব্বভৌমিক নিয়ম বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। সন্ন্যাসীরা অন্ন বিচার করেন না। সর্ব্বসাধারণের এ বিষয়টী অনুধাবন করা উচিত। তাহা হইলে আচার বিশেষকে হিন্দুত্বের স্থায়ী লক্ষণ বলিয়া ভ্রম জন্মিবে না।

পূর্ব্বে যে জ্ঞান, স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া বিবেচিত হইত, এক্ষণে তাহা পূর্ব্ব পুরুষার্জ্জিত বলিয়া নির্দ্ধারিত হইতেছে। জ্ঞান ও নীতি, কার্য্যে

পরিণত হইয়া বিশ্বাস এবং ব্যবহার রূপে পরিগণিত হইলে, অপরের সহিত প্রভেদ উৎপাদন করিয়া, যে শ্রেণী উদ্ভাবন করে, তাহাকেই কোন এক ধর্ম্ম কহে। জ্ঞান উন্নতিশীল ; ইহা বিশ্বাসের অবস্থানুসারে পরিবর্ত্তিত হয় ; সুতরাং তৎসহকারে ধর্ম্মেরও পরিবর্ত্তন ঘটে। ভাষা যেমন নির্ম্মাণ করিবার সামগ্রী নহে, ধর্ম্মও সেইরূপ কেহ সৃষ্টি করিতে পারে না ; এজন্য সমগ্র ধর্ম্ম ও সমুদয় ভাষা সনাতন বলিয়া গণ্য। কিন্তু ধর্ম্মের ও ভাষার পুষ্টিসাধন মনুষ্যের করায়ত্ত। যাহা নবধর্ম্ম ও নবীন ভাষা বলিয়া প্রতিভাত হইবে, তাহা কোন একটী মূলের পরিণাম মাত্র। সকল বিষয়ে ক্রমবিকাশ চলিয়াছে, তাহা অবশ্যম্ভাবী।

ঘটনাক্রমে বাধ্য হইয়া অনেক সময় আমাদিগকে দ্বিতীয় ভাষা অবলম্বন করিতে হয় ; কিন্তু মাতৃ ভাষাকে সকলে একেবারে বর্জ্জন করিতে পারে না। রোমের আধিপত্যকালে ইউরোপে লাটীন ভাষা প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। ফরাসী জাতি প্রবল হইলে, তাহাদের ভাষাকে ইউরোপীয়েরা দ্বিতীয় ভাষা করে। এক্ষণে ইংরাজী তাহার সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেছে। ভারতে মুসলমানরাজত্বে যে কারণে পারস্য ভাষা লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইয়াছিল, অধুনা ইংরাজী সেই সূত্রে আমাদের দ্বিতীয় ভাষা হইয়াছে। হিন্দুরাজ্যে সংস্কৃত গৌণ ভাষা ছিল। মাতৃ-ভাষা পরিত্যাগ করা যেমন সম্ভবপর নহে, স্বধর্ম্ম হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়াও সর্ব্বসাধারণের পক্ষে সেইরূপ অসম্ভব।

জীবনীশক্তি না থাকিলে, ধর্ম্ম, ভাষা, রাজ্য, জাতি বা বাণিজ্য বিলুপ্ত হয়। অগ্নিতে কাষ্ঠ নিক্ষেপ করিয়া যেমন প্রদীপ্ত রাখিতে হয়, উপরি উক্ত বিষয়ে সেইরূপ সর্ব্বদা উন্নতির জন্য চেষ্টা না করিলে, তাহার জীবন্ত ভাব রক্ষা পায় না। ধর্ম্ম ও জাতির জীবনী শক্তি হ্রাস পাইতেছে কিংবা বৃদ্ধি হইতেছে, পূর্ব্বাপর অবস্থার তুলনা দ্বারা তাহা নির্দ্ধারিত হয়। হিন্দুধর্ম্মের উন্নতি করিতে হইলে, তাহার সংকীর্ণতা দূর করিয়া উদারতার

বৃদ্ধি সাধন করা উচিত। জাতিভেদ, হিন্দুত্বের একটী প্রধান লক্ষণ। অতএব সমগ্র জাতিকে উন্নত করিতে হইলে, উদারতার বৃদ্ধিসাধনে সযত্ন হওয়া বিধেয়। আমাদের বিভিন্ন জাতির এক-প্রাণতা, ধন ও অধিকার বৃদ্ধি করিতে হইবে।

হিন্দু জাতি কায়িক, বাচিক ও বৈষয়িকভেদে ত্রিবিধ। ১ম, শারীরিক লক্ষণ। যথা—কাশ্মীরিগণ ককেশীয়, নেপালীরা মঙ্গোলীয় ও দ্রাবিড়-গণ কোলেরীয় জাতির উদাহরণ। সাধারণতঃ অনেক লোক কোলের-ককেশীয় ভাবাপন্ন বা সঙ্কর। বর্ণ অর্থে যদি রঙ্ বুঝায়, তাহা হইলে ব্রাহ্মণাদিতেও গৌর, শ্যামল প্রভৃতি মিশ্রবর্ণ দৃষ্ট হওয়ায়, তাঁহারাও সঙ্কর বলিয়া প্রতিপন্ন হইবেন। কোন প্রচণ্ড লেখকের মতে দ্বিজাতি শব্দের অর্থ দুই জাতি। অতএব আর্য্য ও অনার্য্যের মিশ্রণে তাঁহাদের উৎপত্তি হইয়াছে এই ইতিহাস পাওয়া যাইতেছে! ২য়, ভাষা। যথা—আর্য্য, বাঙ্গালী। তুরাণী, তৈলঙ্গী। সঙ্কর বা সেমেটীক্ আর্য্য, উর্দ্দুভাষী হিন্দুস্থানী জাতি। আমাদের হিন্দু নামটি সেমেটীক শব্দজ। ৩য়, জীবিকা। ইহা দুই প্রকার। যথা—প্রাচীন ও নবীন।

প্রাচীন।—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র।

নবীন।—মালাকার, তন্তুবায় প্রভৃতি।

আমাদের ধারাবাহিকতা প্রিয় প্রকৃতি প্রযুক্ত এক্ষণকার ব্যব-সায়ানুযায়ী জাতি, পূর্ব্বকালের কোন একটী ব্যবসায় অনুসারেই গণ্য হয়। যেমন মালাকার প্রভৃতি শূদ্র।

জীবিকার তারতম্যে সামাজিক সম্মানের ইতর-বিশেষ আছে। তদনুসারে বাঙ্গালী হিন্দু এক্ষণে চতুর্ব্বিধ।

১। ব্রাহ্মণ।

২। সৎশূদ্র (জলাচরণীয়) বৈদ্য, কায়স্থ, নবশাখ প্রভৃতি।

৩। শূদ্র (অনাচরণীয়) সুবর্ণ-বণিক, গোয়ালা প্রভৃতি ।

৪। অন্ত্যজ (অস্পৃশ্য) চণ্ডাল, বাগ্দি প্রভৃতি ।

ভারতবর্ষ ভিন্ন, পৃথিবীর অন্যত্র প্রকারান্তরে জাতিভেদ প্রচলিত আছে। ইয়ুরোপে বর্ণভেদ ও স্পর্শদোষ না থাকিলেও, অভিজাতবর্গ, সাধারণ লোকের সহিত আহার বা বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করেন না। তবে নীচও মহৎ হইতে পারেন। তখন তিনি অনাচরণীয় থাকেন না, ইহা তথাকার সামাজিক জীবনীশক্তির নিদর্শন। অধুনা বাঙ্গালায় অনেকে উচ্চশ্রেণীতে প্রবিষ্ট হইতে সযত্ন হইয়াছেন। আত্ম-সম্মান বোধ না থাকিলে, মহৎ হইতে পারা যায় না। সৎশূদ্রের মধ্যে কায়স্থগণ ক্ষত্রিয়, মধ্যম শূদ্রের সুবর্ণ-বণিকেরা বৈশ্য ও অন্ত্যজ শ্রেণীস্থ চণ্ডালজাতি শূদ্রত্ব লাভ করিতে চেষ্টা করিতেছেন; ইহা তাঁহাদের সজীব ভাবের পরিচায়ক।

আপন উন্নতির জন্য স্বয়ং সচেষ্ট হইতে হয়। স্বজাতির অধিকার বৃদ্ধি, অপর শ্রেণীর দ্বারা হইতে পারে না। নবীন-জাতি-ভুক্ত যে সকল ব্যক্তি আপনাদিগকে যে প্রাচীন জাতির অন্তর্গত বিবেচনা করেন, তাঁহাদিগকে তদনুযায়ী উপপদ ও শৌচাচার গ্রহণ করিতে হইবে। কায়স্থগণ, বিবাহাদির সংকল্পে দাসমিত্র স্থলে বর্ম্মমিত্র বাক্য পাঠ করুন। স্ত্রীলোকের পক্ষে দাসীর পরিবর্ত্তে দেবী উপাধি ব্যবহার করুন। অশৌচাদি আচারে ক্ষত্রিয়োচিত ব্যবহার গ্রহণ করুন। উপনয়ন সংস্কার যাহাতে প্রবর্ত্তিত হয়, তৎপক্ষে চেষ্টা করা বিধেয়।

বাঙ্গালায় সৎশূদ্রের অন্তর্গত জাতিগুলি এমন সদাচার নিরত যে, ভারতের অন্যান্য স্থলের শূদ্রের তুলনায় তাঁহারা দ্বিজাতি এবং বৈশ্য; কায়স্থ ও নাপিত ভিন্ন অপর সকলে বৈশ্য-বৃত্তিধারী। কাংস্য-বণিক, গন্ধ-বণিক ও স্বর্ণকারগণ পশ্চিমোত্তর অঞ্চলে বৈশ্য মধ্যে পরিগণিত ও যজ্ঞোপবীতধারী। অতএব বাঙ্গালার সৎশূদ্রগণ, শাস্ত্রাধ্যায়ী ও ক্রিয়াবান্

হইয়া শূদ্র নাম পরিত্যাগ করিতে সযত্ন হউন। গন্ধবণিক, কাংস্তকার, শঙ্খকার, কর্ম্মকার, তৈলী, তন্তুবায়, তাম্বূলী, মোদক, বারুই, কুম্ভকার, মালী ও সদ্‌গোপ জাতি দাস উপাধির পরিবর্ত্তে বৈশ্যোচিত ভূতি উপাধি ব্যবহার করুন।

"শর্ম্মা দেবশ্চ বিপ্রস্য বর্ম্মা ত্রাতা চ ভূভুজঃ।
ভূতির্দত্তশ্চ বৈশ্যস্য দাসঃ শূদ্রস্য কারয়েৎ ॥"

(কুল্লুকভট্ট-ধৃত যম-বচন)।

মাড়ওয়ার-নিবাসী বণিককে ভূতি উপপদ ব্যবহার করিতে দেখা যায়। রাজস্থান ও গুর্জ্জর নিবাসী বৈশ্যগণ উপবীত, গ্রহণ করেন না; তাঁহাদের মধ্যে কেহ বা গৃহস্থ হইয়া প্রৌঢ় বয়সে যজ্ঞোপবীত প্রাপ্ত হইয়াছেন।

উগ্রক্ষত্রিয় জাতির নামের সহিত ক্ষত্রিয়ত্ব রহিয়াছে। ক্ষমতার অভাবে তাঁহারা সে সম্মানের অধিকারী নহেন। বাঙ্গালার বৈদ্যগণকে যে এক্ষণে শূদ্র বলিয়া স্বীকার করাইতে পারা যায় না, ইহা তাঁহাদের শাস্ত্রালোচনার ফল।

অপরাপর জাতি শাস্ত্রালোচনা করিলে উচ্চ হইতে পারিবেন। হিন্দুর জন-সংখ্যায় ছয় ভাগের পাঁচ ভাগ শূদ্র নামে ঘৃণিত। তাঁহাদের মধ্যে সমর্থ লোকে রীতিমত সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিয়া, ধর্ম্ম-শাস্ত্রের ব্যবসায় আরম্ভ করিলে, নিশ্চয় গৌরবান্বিত হইবার পন্থা আবিষ্কার করিতে পারিবেন। বৈদ্য জাতিতে যেমন রাজা রাজবল্লভ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন কার্য্য বিশেষের ব্যয়ভার গ্রহণ করিবার জন্য অন্য জাতিতে তদ্রূপ মহাপুরুষের আবির্ভাব আবশ্যক। বৈদ্যদিগের উপবীত গ্রহণের সম্মান, রাজা রাজবল্লভ দ্বারা অর্জ্জিত।

মুসলমান ও খ্রীষ্টানের সংস্রবে থাকিয়া আমাদের প্রচলিত জাতি-ভেদের প্রতি ক্রমশঃ অশ্রদ্ধা বৃদ্ধি পাইতেছে। লোক যে জাতীয় হউক,

তাহার গুণ ও ক্ষমতার মান্য হইয়াছে। অধিকাংশ ব্যক্তি যোগ্যতা লাভ করিলে, সেই জাতি অবশ্যই শ্রদ্ধাভাজন হইতে পারে, তজ্জন্য কতকগুলি জাতির এক্ষণে বৈশ্যত্বের প্রস্তাব অসাময়িক হইতেছে, এমন জ্ঞান করা কর্ত্তব্য নহে। ভারতে অধিকাংশ লোক জ্ঞানালোক-বর্জ্জিত, তাহাদের মতে বর্ণভেদ সম্মানের নিদান। এই হেতু সুশিক্ষিত ব্যক্তি সামাজিক সম্মানের সময় বর্ণভেদের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন।

খৃষ্টীয় শক আরম্ভ হইবার পাঁচশত হইতে আটশত বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গে আর্য্যনিবাসের আরম্ভ হইয়াছে। তাঁহারা এখানে আসিয়া (যেমন সর্ব্বত্র হইয়া থাকে) জাতিভেদের নূতনভাবে বিকাশ আরম্ভ করিলেন। বঙ্গে সৎশূদ্র ও নবশাখ নামে দুইটী ভেদ দৃষ্ট হয়। বঙ্গদেশের জাতিভেদের সম্মানের উপর তন্ত্র-শাস্ত্রই বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, দৃষ্ট হয়। এজন্য তন্ত্রশাস্ত্র বাঙ্গালায় উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া অনেকে জ্ঞান করেন। নেক তান্ত্রিক গ্রন্থ বঙ্গদেশে বচিত হইয়াছে, সন্দেহ নাই; কিন্তু তাহার া বেদের ন্যায় প্রাচীন। আর্য্যগণ পূর্ব্ব বাসস্থান হইতে ইন্দ্র, বরুণ ভৃতি দেবতাকে সমভিব্যাহারে আনয়নপূর্ব্বক পঞ্চনদ প্রদেশে অনার্য্য বিড়গণের অসভ্য লিঙ্গপূজা দেখিয়া থাকিবেন। আর্য্য ও অনার্য্য মিশ্রিত ইয়া এক জাতিত্ব প্রাপ্ত হইলে, বৈদিক রুদ্র ও অবৈদিক লিঙ্গ একীভূত ইয়া শিবত্ব প্রাপ্ত হওয়া অসম্ভব নহে। আলেক্‌জাণ্ডারের সহচরগণ ষ্টের তিনশত বৎসর পূর্ব্বে ভারতে লিঙ্গপূজা দর্শন করিয়া গিয়াছিলেন। খন কাশ্মীর হইতে কুমারিকা ও আসাম হইতে সিন্ধু পর্য্যন্ত শিব-শক্তির আরাধনাকারী তান্ত্রিক দৃষ্ট হইয়া থাকে। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে চিত মালতীমাধবে অঘোরঘন্টিক কাপালিকের পরিচয় পাওয়া যায়। ছয় ত খৃষ্টাব্দে বৌদ্ধমত তন্ত্রের দ্বারা জর্জ্জরিত অবস্থায় তিব্বতে প্রবেশ রে। দশ শত খৃষ্টাব্দে তিব্বতীয়েরা তন্ত্রের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিতে

থাকেন। ভারতে বৌদ্ধ ও তান্ত্রিকমত সম্মিলিত হইয়া, বেদাচারিগণের নিকট বৌদ্ধগণকে ঘৃণার্হ করিয়া তুলে। তান্ত্রিক বামাচার অদ্যাপি পৈশাচিক অনার্য্যভাব রক্ষা করিতেছে। বামাচার সংস্কৃত হইয়া দক্ষিণাচারে পরিণত হইয়া আর্য্যভাব প্রাপ্ত হইয়াছে। বাঙ্গালী শূদ্র তন্ত্রের নিকট সবিশেষ উপকৃত। নেপাল, তিব্বত ও চীনে যে বৌদ্ধমত প্রচলিত, তাহার নাম মহাযান। সিংহল, ব্রহ্ম ও জাপানের বৌদ্ধমত আত্মা ও ঈশ্বর-বর্জ্জিত। বৌদ্ধ সংস্কৃতে তাহাকে যেমন হীনযান বলিয়া থাকে, তদ্রূপ বামাচারিগণ আপনাদিগকে বীর ও দক্ষিণাচারীকে পশু বলিয়া পরিচিত করিতে ত্রুটি করেন না। বীরাচার কখন কাহাকেও নিষ্ঠাবান করিতে পারে না; অতএব পশ্বাচারীরাই ক্রিয়ালোপপ্রযুক্ত শূদ্রত্ব-প্রাপ্ত বাঙ্গালী সমাজকে সদাচারসম্পন্ন হইতে শিক্ষা দিয়াছে।

বৈদিককালে সাধারণ আর্য্যগণ বিশ বা বৈশ্য নামে খ্যাত ছিলেন। বৈদেশিক আধিপত্যের বর্ত্তমান অবস্থায় তদ্রূপ জনসাধারণ শূদ্র নামে বিখ্যাত হন। অনেকে মনে করেন, শূদ্র বলিতে কেবল কৃষ্ণকায় দ্রাবিড় অনার্য্যকে বুঝায়; কিন্তু কেবল তাহারাই শূদ্র নহে। শূদ্র অনেক প্রকার। এখন বৈদিক কালের ন্যায় কেবল ভাষা ও বর্ণগত প্রভেদ নাই, স্থানীয় সম্প্রদায়গত ব্যবসায়গত, সমাজগত ও বংশগত নানা ভেদ উপস্থিত হইয়াছে। শূদ্রতত্ত্ব আলোচনা করিয়া সাত প্রকার শূদ্রের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। ১ম—আদি বিভাগানুযায়ী গুণকর্ম্মশালী অর্থাৎ উপযুক্ত স্বভাব ও ক্রিয়ান্বিত পূর্ব্বতন শূদ্র; যথা—কাহার। ২য়—আর্য্যীকরণে গৃহীত আদিম অধিবাসী কৃষ্ণকায় দ্রাবিড়; যথা—চণ্ডাল। ৩য়—আর্য্যীকরণে গৃহীত নেপালী ও আসামী প্রভৃতি গৌরকায় মঙ্গোলীয়; যথা—গুরুঙ্গ প্রভৃতি। ৪র্থ—পাতিত্য হেতুক বা ক্রিয়ালোপপ্রযুক্ত বৃষলত্ব প্রাপ্ত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য, যথা—কায়স্থ প্রভৃতি। ৫ম—পিতৃত্যক্ত ও জারজ;

যথা—রামজনী। ৬ষ্ঠ—দূষিত-বৃত্তিজীবী বা অন্ত্যজ; যথা—চর্ম্মকার। ৭ম—যাহাকে অন্যবর্ণে স্থান দিতে পারা যায় না, এমন অতিরিক্ত জাতি; যথা—ভুটিয়া। শারীরিক লক্ষণানুসারে বঙ্গদেশীয় শূদ্র নামে খ্যাত উচ্চ শ্রেণীর জাতিগুলি, দ্রাবিড় অপেক্ষা আর্য্যের সহিত অধিক ঘনিষ্ঠ। বেদে অনধিকারী হইয়া ইহারা দ্বিজজাতির সম্মানে বঞ্চিত হইয়াছিল। তন্ত্র ইহাদিগকে উচ্চাসন দিয়াছে। ব্রাহ্মণ, শূদ্র সকলকেই তন্ত্র এক দেবতা, এক মন্ত্র ও এক গুরুর শিষ্য করিয়া দিয়াছে। বৈদিক সাবিত্রী প্রাপ্ত না হইলেও শূদ্রেরা তান্ত্রিক গায়ত্রী প্রাপ্ত হইল। ব্রাহ্মণের পক্ষেও তান্ত্রিক গায়ত্রী না হইলে চলে না। শূদ্রের ক্রিয়া-কলাপ, আচার-ব্যবহার ব্রাহ্মণের পদ্ধতির অনুসরণ করিল। উত্তর ভারতের শূদ্র ও পূর্ব্ব ভারতের শূদ্র এখন আর এক নহে। আচারগুণে বিভিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। পূর্ব্ব ভারতের শূদ্রেরা আর আপনাদিগকে বেদে অনধিকারী জ্ঞান করিতে পারে না; তাহারা বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণের উত্তর খণ্ডের ১০ম অধ্যায়স্থ শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া উচ্চকণ্ঠে কহিতেছে;—"অস্মাকং বৈদিকং স্মার্ত্তং তথা-গমিকমেব চ।" তান্ত্রিকগণ বেদ অপেক্ষা আগম নিগম ও যামলকে কান প্রকারে নিকৃষ্ট জ্ঞান করেন না। বঙ্গদেশীয় শূদ্রের মধ্যে শূদ্র অপেক্ষা যে উৎকৃষ্ট বর্ণের লোক আছে, সৎশূদ্র বলিয়া একটি শ্রেণী থাকায় তাহা সপ্রমাণ হইতেছে। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যেরা সৎশূদ্রের মধ্যে কারণে পতিত হইয়াছেন, কল্পনা ভিন্ন তাহার হেতু নির্ণয় করিবার অন্য কোন উপায় দৃষ্ট হয় না। হইতে পারে, আর্য্য সমাজে অনার্য্যজাতি অধিক পরিমাণে প্রবেশ লাভ করায়, এক্ষণে শূদ্রের সংখ্যা অধিক দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু সাধারণ লোকের মধ্যে যখন বৈশ্যের ভাগ অপেক্ষাকৃত অধিক হওয়া উচিত, তখন একেবারে তাহার লোপ সম্ভবপর নহে। অতএব বৈশ্য জাতি যে শূদ্রের মধ্যে গণ্য হইয়াছে, তাহাতে কোন সন্দেহ

নাই। যে বৌদ্ধ ধর্ম্ম পৃথিবীর এক তৃতীয়াংশ লোককে অনুগত করিয়াছে, তাহার উৎপত্তি-স্থান পূর্ব্বভারতে। সেই ধর্ম্ম ঐ স্থানে যে অত্যন্ত প্রসার বৃদ্ধি করিয়াছিল, এমন বোধ হয় না কি? এক্ষণে বৌদ্ধ-কীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষের মধ্যে বহু বণিকের নাম দৃষ্ট হয়। বণিকশ্রেষ্ঠ জৈনেরাও প্রথমে বৌদ্ধ হইয়া পরে ক্রমশঃ পৌরাণিক আচারবান হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বঙ্গদেশীয় বৈশ্যেরা বৌদ্ধমত গ্রহণ করায় তাহাদের ক্রিয়ালোপ ঘটিয়াছিল। সেই পাতিত্য-নিবন্ধন তাহারা আর পূর্ব্ব বর্ণে উন্নীত হইতে পারে নাই—এমন অনুমান করিবার হেতু আছে।

সৎশূদ্রের মধ্যে নবশাখ আর একটি অবান্তর ভেদ। ১৫১০ খৃষ্টাব্দে আনন্দভট্ট বল্লাল-চরিত গ্রন্থে বল্লাল সেনের সময়ের প্রচলিত জাতি-কথায় লিখিয়াছেন ;—

"গোপোমালী চ তাম্বূলী কাংসার-তন্ত্রি-শাংখিকাঃ।
কুলালঃ কর্ম্মকারশ্চ নাপিতো নবশায়কাঃ॥
তৈলিকো গান্ধিকো বৈশ্যঃ সচ্ছূদ্রাশ্চ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
সচ্ছূদ্রাণাস্তু সর্ব্বেষাং কায়স্থ উত্তমঃ স্মৃতঃ॥"

লোকাচার অদ্যাপি প্রায় তদ্রূপ দৃষ্ট হইয়া থাকে। গুণকর্ম্মানুসারে অর্থাৎ প্রকৃত পক্ষে নাপিত ও কায়স্থ ভিন্ন উপরোক্ত জাতিগুলি বৈশ্য বর্ণের বিভিন্ন শাখা। গোপ, মালী, তাম্বূলী, কাঁসারি, তন্তুবায় শঙ্খকার, কুম্ভকার, কর্ম্মকার, তৈলী, গন্ধবণিক ও বৈদ্যজাতির মধ্যে বৈশ্যগণ যে বৈশ্য, তাহা নিজ ক্ষমতায় প্রকাশ করিয়াছেন এবং অনেকস্থলে সাধারণে স্বীকারও করিয়া থাকেন। সদ্গোপেরা কহেন, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে লিখিত আছে, শ্রীকৃষ্ণের পিতা গোপ; সুতরাং বৈশ্য ছিলেন। অতএব সদ্গোপগণ বৈশ্য। তন্তুবায় ভ্রাতৃগণ কহেন, মনুতে লিখিত আছে, বস্ত্রবয়ন বৈশ্যের ধর্ম্ম, অতএব তাঁহারা বৈশ্য; গন্ধবণিকগণ কহেন, তাঁহাদের নামের

সহিত যখন বণিক শব্দ বিদ্যমান, তখন তাঁহারা অবশ্যই বৈশ্য। এই প্রকার যুক্তিবলে বৈশ্যত্ব সপ্রমাণ করা সকলের পক্ষে সুবিধাজনক নহে। পূর্ব্ব হইতে বলা হইতেছে, মূলের একেবারে ধ্বংস হয় না। যে মূল অবলম্বনে বর্ণভেদ স্থাপন করা হইয়াছিল, নানা পরিবর্ত্তন-রূপ আবর্ত্তের মধ্যে পতিত হইয়াও অদ্যাপি তাহা সজীব আছে। কে কোন্ বর্ণের মধ্যে স্থান পাইতে পারেন, তাঁহার সামাজিক সম্মান ও আচারের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে, তাহা স্থিরীকৃত হইবে। গুণ ও কর্ম্ম অর্থে স্বভাব ও ক্রিয়া বলা হইয়াছে। আচার ও জীবিকা ক্রিয়ার অন্তর্গত। আচার ও জীবিকা দেখিয়া হিন্দু সমাজে জাতি-বিশেষের সম্মানের তারতম্য হয়। যে জাতিগুলি সাধারণ শূদ্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও বৈশ্যবৃত্তিধারী, তাহারাই বৈশ্য। তাহাদের বৈশ্যত্ব নির্ণয়ের জন্য কোন প্রকার কৌশল অবলম্বন করিবার আবশ্যক নাই। তাহাদের গুণকর্ম্ম স্বতঃসিদ্ধভাবে সেই জাতিগুলিকে বৈশ্য করিয়া রাখিয়াছে। তাহাদের বৈশ্যত্ব প্রতিপন্ন করিতে হইলে, সত্যের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া অগ্রসর হওয়াই কর্ত্তব্য। বর্ণ বংশগত হইবার পূর্ব্বে যে ভাবে ছিল, এক্ষণে তাহা একেবারে লুপ্ত হয় নাই; এবং সেই ভাবটি সমাজের অতীব কল্যাণকর ও বৈজ্ঞানিক। অতএব বঙ্গে গুণকর্ম্মানুসারে বৈশ্য নির্ণয় করা উচিত। বৈশ্যের সকল ক্রিয়া কলাপ নবশাখের মধ্যে অনেকেরই বিদ্যমান নাই। যে গুলির অভাব আছে, সেগুলি পূরণ করিয়া লইতে হইবে।

কামরূপ।*

ঔৎসুক্য না থাকিলে জীবন অকিঞ্চিৎকর। কোন একটি বিষয়ে উৎসুক হইলে জীবনের অকিঞ্চিৎকর পরিচ্ছেদ হইতে সাধারণ পরিচ্ছেদে আরোহণ করিতে পারা যায়। বিরক্ত ব্যক্তি সেই জন্য দেশাটনকে ঔৎসুক্যের বিষয় করিয়া লয়। জাতিতত্ত্ব-নির্ণায়ক মানচিত্রে ইংরাজেরা বঙ্গদেশকে মঙ্গোলীয়-দ্রাবিড়ীয় ও আসামকে মঙ্গোলীয় বর্ণে রঞ্জিত করিয়াছেন। কুমিল্লা উক্ত প্রদেশদ্বয়ের সন্ধিস্থলে অবস্থিত। অত্রত্য বাঙ্গালা ভাষায় পূর্ব্বমৈমনসিংহের সাদৃশ্য আছে। পশ্চিম মৈমনসিংহের ভাষা উহার পূর্ব্বাঞ্চল হইতে পৃথক্ বোধ হইবে। শ্রীহট্টের বাঙ্গালা অন্যবিধ। কামরূপের পর্ব্বতশ্রেণী মৈমনসিংহে প্রবেশ করিয়া ঐ প্রদেশকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছে। উক্ত শৈলে গোয়ালপাড়ার সন্নিহিত স্থানে গারো জাতি বাস করে। গারো ও টিপ্রাদিগকে দেখিলে, তাহারা অবয়বে আর্য্যজাতি হইতে যে পৃথক্, তদ্বিষয়ে সন্দেহ থাকে না। ত্রিপুরাশব্দ টিপ্রাশব্দের সংস্কৃত। ত্রিপুরানগরে অবস্থান করিয়া সর্ব্বপ্রথমে টিপ্রাদিগকে দর্শন করিবার জন্য রজনী প্রভাতের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। দেখিলাম, সেখানকার নরনারী পৃষ্ঠে ইন্ধন বহিয়া হট্টে উপস্থিত হইল। রমণীর বক্ষোদেশ পরিধেয় হইতে ভিন্ন বস্ত্রে বেষ্টিত, কর্ণে পুষ্পাভরণ; কোনও

---

* (১) Ethnographic appendices এবং (২) Tribes and Castes of Bengal—H. H. Risley প্রণীত (৩) History of Assam—E. A. Gait প্রণীত (৪) আসাম সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ—শ্রীদেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী লিখিত (৫) Up to the clouds (Darjeeling) (৬) আসামের ইতিহাস (৭) তাম্বূলবণিকে লিখিত পরিচ্ছেদ এবং (৮) নিবৃত্তির পথে—লেখক প্রণীত।

কোনও পুরুষের মস্তকে শিখা আছে। টিপ্রাকুলরত্ন যুবরাজ নবদ্বীপচন্দ্র বর্ম্মাকে মস্তকে ইউরোপীয় শিরস্ত্রাণ ধারণ করিয়া শকট চালনা করিতে দেখিয়া প্রথমে আমার চৈনিক বলিয়া ভ্রম হইয়াছিল। অধ্যাপক ফাউলারের মতানুবর্ত্তী পাশ্চাত্য জাতিতত্ত্ববিদ্যানুসারে—মানবগণ মঙ্গোলিক, ককেশীয়ান ও নিগ্রিটো এই তিন প্রাকৃতিক জাতিতে বিভক্ত। ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে সুইজ্যারল্যাণ্ড দেশীয় মহাপণ্ডিত এণ্ডার্স রেডজিয়স্ জাতিতত্ত্ব বিদ্যার ক্রিয়াসিদ্ধ অভিনব প্রণালী উদ্ভাবন করেন। তৎপ্রদর্শিত পথের অনুসরণ করিয়া কিউভার সাহেব ভারতের অধিবাসীদিগের মুখমণ্ডল ও মস্তকের পরিমাণ করতঃ স্থির করিয়াছেন, যে তাঁহারা ককেশীয় ও নিগ্রিটো জাতির মিশ্রণ। মিশ্রণ—ভারতবর্ষীয় তাবৎ জাতির মধ্যে, ব্রাহ্মণ-শূদ্র-নির্ব্বিশেষে দৃষ্ট হইয়া থাকে। আর্য্যগণ শ্বেতকায় ও ককেশীয়। তাঁহারা ভারতে আগমন করিয়া তাৎকালিক অধিবাসী কৃষ্ণকায় নিগ্রিটো বা কোলেরীয় শ্রেণীর দ্রাবিড়গণের সহিত কিছুকাল পরে একরক্ত হইয়া এরূপভাবে মিশ্রিত হইয়া গিয়াছিলেন যে, পরবর্ত্তীকালে তাঁহাদের স্বাতন্ত্র্য দৃষ্টিগোচর করা দুরূহ হইল। সূক্ষ্মাগ্র শিবমন্দিরের কৃশভাব এদেশের নির্ম্মাণ প্রণালীর বিশেষত্ব প্রদর্শন করিতেছে। বাস্তুভূমি পূগবৃক্ষ দ্বারা বেষ্টিত। বৃক্ষগাত্রে সংলগ্ন কর্ত্তিত বংশসজ্জা প্রাচীরের কার্য্য করিয়াছে। রাজকীয় পুস্তকালয়, বিচারালয়, বহুদূরব্যাপিনী পণ্যশালা প্রভৃতি দর্শন করিয়া বাসস্থানে আগমন করত মঞ্চে শয়ন করিলাম। ভূমির আদ্রতা বশতঃ শয়নের জন্য গৃহে চাঙ বা মঞ্চ ব্যবহৃত হয়। টিপ্রাদের গৃহকে চাঙ কহে। তাহাদের কৃষিক্ষেত্র আহোমিয়া নামক পার্ব্বতীয় জাতির কৃষিক্ষেত্রের ন্যায় জুম নামে খ্যাত। যোগী জাতির মধ্যে যাঁহারা ব্রাহ্মণ হইয়াছেন, তাঁহারা 'নাথের ব্রাহ্মণ' ও অপরে 'শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ', একথা ভোজনালয়ের গাত্রে উৎকীর্ণ দেখিলাম। ভারবহনের জন্য

একখানি কাষ্ঠের একদিকের অগ্রভাগ প্রশস্ত করিয়া খোদিত হইয়াছে, অপর দিক স্কন্ধে করিয়া বাহক কৃষিজাত দ্রব্য বিক্রয় করিয়া ফিরিতেছে। আমি একজনকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমার জাতি কি? তদুত্তরে সে কহিল, নমঃ অর্থাৎ নমঃশূদ্র; শূদ্র হইতেও নত বা নব শূদ্র। এক ব্রাহ্মণ কহিতেছিলেন, কলিকাতার লোকে নৌকাকে "নৌকো", লবণকে "নুন" কহে। দুইটি স্ত্রীলোককে ছত্র দ্বারা মুখাবরণ করিতে দেখিয়া, ব্যাপার কি বুঝিবার জন্য আমি যতই সম্মুখীন হইতে লাগিলাম, আহোমিয়া প্রথানুসারে তাঁহারা ততই ছত্রের অন্তরালে প্রবেশ করিতে লাগিলেন।

কুমিল্লা হইতে যাত্রা করিয়া শ্রীহট্টের নিকটবর্ত্তী বদরপুর-সঙ্গমে প্রভাত হইলে নয়নোন্মীলন করিয়া দেখিলাম, আমরা উপত্যকা প্রদেশে উত্তীর্ণ হইয়াছি। হরিৎ বনস্থলীতে কৃষ্ণ উপলখণ্ডের মধ্যে নীল-দর্পণের মত সুরমা স্রোতস্বিনী নিস্তব্ধভাবে অরণ্যের মাধুরী বিস্তার করিতেছে। কয়েকজন মণিপুরী পুরুষ ও একটি নারী সন্তান লইয়া শকটে আরোহণ করিলেন। নাসাগ্রে আলম্বিত তিলক তাঁহাদের বৈষ্ণবত্ব খ্যাপন করিতেছে। মস্তকাচ্ছাদন বস্ত্রের বন্ধন প্রণালী সহ বক্ষোবেষ্টনে মঙ্গোলীয়তা প্রকাশ পাইতেছে, পুরুষের একটিকে আমার গুরখা বলিয়া ভ্রম হইয়াছিল। ক্রমে নাগলোকে প্রবেশ করিলাম. অসংখ্য সুড়ঙ্গের অন্ধকার ভেদ করিয়া বাষ্পীয় শকটশ্রেণী একপার্শ্বে শ্লেট প্রভৃতি প্রস্তরের স্তবক ও অন্যদিকে দূরে চা-ক্ষেত্র এবং খাত রাখিয়া গন্তব্য স্থানে অগ্রসর হইতেছে। বংশ, কদলী ও বেত্র প্রভৃতি ক্ষীণবৃক্ষ ও বিবিধ গুল্ম দ্বারা শৈলটি সমাচ্ছন্ন। ইতস্ততঃ নাগাজাতির তৃণাচ্ছাদিত কুটীর ও শস্যক্ষেত্র পর্ব্বত-অঙ্গে দৃষ্ট হইল। একস্থানে মাত্র নাগাদিগের আসুরিক দেহ দৃষ্টিপথে আসিয়াছে। শকটাশ্রয়ে নেপালীরা দধি বিক্রয় করিতেছে। পথ নির্ম্মাণে শ্রমজীবীর কার্য্য করিতে আসিয়া তাহারা এক্ষণে ব্যবসায়ী

কামাখ্যা ;—ব্রহ্মপুত্র, মধ্যে দেবীর ভৈরবের দ্বীপ

হইয়াছে। লামডিং নামক স্থানে রাত্রি যাপন করিয়া, সমতল ও পর্ব্বত সন্নিহিত ভূভাগে গমন কালে বারদ্বয় সূর্য্যোদয় দৃষ্ট হইল। এই দেখিলাম, দিনমণি কোন শৈলশৃঙ্গের পার্শ্বে ভুবনমোহন রক্তিমা বিস্তার করিয়া দেখা দিলেন; চলিতে চলিতে আর দেখা গেল না; কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া আবার দেখি, তিনি উঠিতেছেন।

বহুকাল যাবৎ আমি আসামে লৌহপথ নির্ম্মাণের প্রতীক্ষা করিতে ছিলাম। এখন অভীষ্টস্থানে—গৌহাটীতে ব্রহ্মপুত্রতীরে অবস্থিতি করিতেছি। লৌহিত্যনদ শ্বেত জলরাশির উপর বাষ্পীয় তরণী ধারণ করিয়াছে। সুদূরে পরপার হইতে পর্ব্বতমালা আকাশের নীলিমায় মিশিয়া বিশ্বরঙ্গালয়ের পট পরিবর্ত্তনের মধ্যে সমুপস্থিত। প্রথমে কঞ্জগিরি, তাহার পর ভোটান্ত হইতে হিমালয়—"স্থিতঃ পৃথিব্যা ইব মানদণ্ডঃ" চলিয়াছে। কামাখ্যার ভৈরব শিবানন্দ, জলগর্ভস্থ শৈলে দেবায়তনে অবস্থান করিয়াছেন। নগরটি ইউরোপীয় প্রণালীতে প্রস্তুত গৃহে পূর্ণ। পানবাজার বাঙ্গালীর কার্য্য ক্ষেত্র। আসামী দেখিবার জন্য আমাকে উজানবাজারে যাইতে হইল; পানবাজারে তৃপ্তি পাইলাম না।

পরপারে উত্তর গুয়াহাটি তটে ভূমি ত্যাগ করিয়া রথ্যাপার্শ্বে কয়েকখানি পণ্যশালা দৃষ্টি করিলাম। দুগ্ধবিক্রেতার কেশকর্ত্তনের উৎকলী-প্রণালী ও তদনুযায়ী ভাষা আমাকে চিন্তাকুল করিল। কিয়দ্দূরে ব্যঞ্জনের উপযোগী ফলমূল ও মৎস্য বিক্রীত হইতেছে। মৎস্যগন্ধার গৌরমুখে, সিন্দূরবিহীন সীমন্তের দুইপার্শ্বে, বৃহৎ কর্ণছিদ্রে প্রবিষ্ট রক্তবর্ণ অলঙ্কারসহ মেখলা ও "রিহার" উপর বিন্যস্ত বস্ত্রাচ্ছাদন হইতে দূরস্থ রিক্ত হস্ত প্রতিভাত হইল। পল্লীমধ্যস্থ গৃহগুলি বৃক্ষবাটিকার মধ্যে অবস্থিত। ছাদের আকার ফরিদপুরস্থ গৃহের ও প্রতিমার বাঙ্গালা চালের মত সুন্দর না হইলেও তৃণ ও বংশসজ্জায় হীন নহে। অঙ্গনের বহির্দ্দেশে বক্ষঃ

হইতে জানু পর্য্যন্ত আস্তরণে গ্রন্থীকৃত বস্ত্রা ক্বচিৎ মহিলা কেরলীবৎ কেশদাম বিস্তার করিয়া পথিকের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করত অন্তর্হিতা হইলেন।

নামঘরের অনুসন্ধানে এক গৃহস্থের বাটীতে উঠিলাম। কেয়টপত্নী নিদ্রিত পতিকে আহ্বান করিয়া দিল। তাহার গৃহে বঙ্গদেশীয় পঞ্জিকা রহিয়াছে। এদেশপ্রচলিত শঙ্করদেবের ঘোষা বা কীর্ত্তন বাঙ্গলা অক্ষরে লিখিত হইয়া থাকে। এখানকার ভাষাও বাঙ্গলা হইতে অধিক ভিন্ন নহে, কৃষ্ণলীলা এখানকার প্রাচীন সাহিত্যের বর্ণনীয় বিষয়। মাধবদেবের হরি নিরাকার, ইনি প্রায় চৈতন্যের সমসাময়িক। ইঁহার মতাবলম্বিগণ মহাপুরুষিয়া নামে প্রসিদ্ধ। অসময়ে কীর্ত্তন নিষিদ্ধ বলিয়া আমাকে ভজনালয় মাত্র দেখিয়া নিবৃত্ত হইতে হইল। প্রতিবাসীগণ সায়ংকালে নামঘরে উপস্থিত হইলে সাধনাহীন পল্লীসমাজের অধিবেশন হয়। গৃহস্বামী পান সুপারি প্রদর্শন করিয়া, আমাকে সাজিয়া খাইতে কহিলেন। এ প্রদেশে অতিথিকে পান সাজিয়া দিবার নিয়ম নাই। মলওয়ারের মত তাম্বুলে খদির ব্যবহার করা হয় না। সে কালের আহোমিয়া গৃহস্থের পক্ষে কেবল রাজস্ব প্রদানের জন্যই টাকার আবশ্যকতা হইত; সেই কারণে ধান্য বিক্রয় করিবার প্রয়োজন ছিল। বিলের মৎস্য, কদলাক্ষারে প্রস্তুত লবণ, তৈলের জন্য স্বকীয় ক্ষেত্রে সর্ষপ, মধুরতার জন্য গুড়, পুষ্টির উপাদান ডাইল এবং গৃহপ্রাঙ্গণে তাবৎ লোকের জাতিনির্ব্বিশেষে বস্ত্র বয়নের যন্ত্র ছিল। প্রতি গৃহে গোধন বিরাজ করিয়া দধি দুগ্ধ প্রদান করিত। গৃহে সর্ব্বদা তুষের আগুন থাকিত, রাত্রিকালে প্রয়োজন হইলে, উহাতে তৃণ নিক্ষেপ করিয়া ফুৎকার দিলে আলোক উৎপন্ন হইয়া প্রয়োজনীয় কার্য্য সম্পাদনের সহায়তা করিত। দুগ্ধ উষ্ণ করিয়া পান করিবার পদ্ধতি এদেশে অদ্যাপি প্রচলিত

হয় নাই। এক্ষণে বাঙ্গালী বস্ত্র ও বাঙ্গালী লবণ বিলক্ষণ প্রচলিত। 'বিলাতি' দ্রব্যজাত বাঙ্গালীদ্বারা আনীত হওয়ায়, সেই সকল বস্তুকে 'বিলাতি' না বলিয়া 'বাঙ্গালী' বলা হয়। অধুনা মারওয়াড়ীগণ বাঙ্গালীর স্থান অধিকার করিতেছে। হয়গ্রীব যাইতে না পারায়, কামাখ্যা হইতে তাড়িতা ডাকিনীদিগের পল্লীর দর্শন ঘটিল না। বশীকরণ বিদ্যায় শ্রীক্ষেত্রের দেবদাসী বা কলিকাতার বারাঙ্গনা অপেক্ষা এখানকার মোহিনীদের জ্ঞান অধিক নহে। অপরাহ্নে অশ্বক্রান্ত শৈলমূলে ব্রহ্মপুত্র-তীরে অহিফেনসেবী পুরোহিত-সমাজে আবির্ভূত হইয়া, কৃত্তিবাস কৃত রামায়ণ শ্রবণ করিতে বসিলাম। উচ্চারণের পার্থক্যে উহা বাঙ্গলা বলিয়া বোধ হইল না। চন্দ্র—সন্দ্র, সর্ব্ব—হর্ব্ব, চিড়া—সিরা ও হয় স্থলে হব পঠিত হইয়া থাকে।

ধর্ম্মাধিকরণে গমনোদ্দেশে আগত কলিতাদিগের কথোপকথন শ্রবণ করিয়া, আহোমিয়া ভাষায় উৎকল শব্দ আছে বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। উড়িষ্যা ও আসাম উভয় প্রদেশ বাঙ্গালার প্রান্তদেশে অবস্থিত। অতএব ভাষাভেদ ও কেশকর্ত্তন সম্বন্ধে উভয় প্রদেশে একই প্রক্রিয়া প্রচলিত হইয়াছে। আগন্তুকের পক্ষে এই রহস্যজনক ব্যাপার এ দেশের বিশেষত্ব বলিয়া বিবেচিত হইবে। পূর্ব্ববঙ্গের প্রাচীন বাঙ্গালা কবিতায় দুই একটি উৎকলভাবাপন্ন শব্দ থাকিলেও, সেই সূত্র অবিচ্ছিন্নভাবে বাঙ্গালার মধ্যস্থল রাজসাহী হইতে পশ্চিমসীমান্তে উড়িষ্যা পর্য্যন্ত লইয়া যাওয়া অসম্ভব। বাঙ্গালাভাষার লীলাক্ষেত্র অতি বিস্তৃত, উত্তরে তিব্বতী, পূর্ব্বে মগ, দক্ষিণে সমুদ্র ও পশ্চিমপ্রান্তে দ্রাবিড়ী দ্বারা বেষ্টিত হইয়া, প্রত্যন্তপ্রদেশে আহোমিয়া, চট্টলী, মৈথিলী, মধ্যদেশী হিন্দী ও উৎকলী অবান্তরভেদে বিভিন্নরূপ ধারণ করিয়াছে।

আমরা যাহাকে অবান্তরভেদ বলি, অন্যে তাহাকে মূলস্বরূপ বলিতে

পারেন। দক্ষিণ-পশ্চিমের সাদৃশ্য উত্তর-পূর্ব্বে অর্থাৎ সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে দর্শন করিয়া আমরা অতিমাত্র বিস্ময়াপন্ন হইয়াছি।

উচ্চ আসামের অধিবাসীরা নিম্ন আসামের বা কামরূপ প্রদেশের ভাষাকে আহোমিয়া না বলিয়া ঢেকেরি কহে ; ইহাতে বঙ্গভাষার সাদৃশ্য অধিক। যথা, আহোমিয়া—

চুটি মুটি কুমুটি পেট ফটা
নগরে গরগাঁয়ে তারে হে কথা।*

ঢেকেরি, যথা—

যাকে আমি কাঁদে করি
তারে ভয়স্তি পলাও ররি।†

এ দেশে গুরুকে গোঁসাই কহে। তিনি গ্রামের শাসনকর্ত্তা। তিনি উপস্থিত না থাকিলে, এক প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়া দেন। এক গ্রামে যতগুলি গুরুর শিষ্য থাকে, তথায় সেই পরিমাণে প্রতিনিধি হইবে। তাহাদিগকে একমত হইয়া বিচার করিতে হয়। পূর্ব্বে প্রতিনিধিদের বিরুদ্ধে পুনর্বিচারের জন্য গুরুদেবের নিকট যাইবার নিয়ম ছিল। ইদানীং ইংরাজের বিচারালয়ে যাইবার প্রয়োজন হইয়াছে। ভূমিসংক্রান্ত ও অপর সকল বিষয়ে প্রতিনিধিরা বিচার করিয়া থাকেন। প্রহারের অভিযোগে এক বা দুই টাকা দণ্ড হয়। আমার একজন হাজারিকার সহিত পরিচয় হইয়াছিল, তাঁহার স্ত্রীকে হাজারিকাণী কহে ; তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ আহোম-রাজের প্রদত্ত মাটী বা ভূমি নিষ্কর ভোগ করিতেন। বিনা বেতনে আহোম-রাজের কার্য্যে এক সহস্র শ্রমজীবী দিতে হইবে বলিয়া, তিনি বৃত্তিভোগী

* চুটি মুটি—ছোট মোট। কুমটি—জিনিষ অর্থাৎ কোড়ি। পেট ফটা—পেট ফাটা। গরগাঁয়ে—দুর্গসংযুক্ত গ্রামে। তারে হে কথা—তারই সে কথা।

† পলাও ররি—দৌড়িয়া পলাই। বৃষ্টিকালে জলবাহকের দ্বারা ইহা উক্ত হইয়াছে।

হইয়াছিলেন ও তাহাতেই হাজারিকা উপাধি প্রাপ্ত হন। আসামে এখনও শ্রমজীবী পাওয়া সহজ নহে। পূর্ব্বে কাহারও অর্থের সবিশেষ প্রয়োজন হইলে, অন্যের দাসত্ব স্বীকার করিত। পঞ্চাশ টাকা ঋণ গ্রহণ করিলে, পরিবারস্থ একজনকে উত্তমর্ণের নিকট কুসীদের পরিবর্ত্তে ভৃত্যের কার্য্যে নিয়োগ করিবার নিয়ম ছিল। ইংরাজ-রাজত্বে তাহা রহিত হইয়াছে। এতদ্দেশে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত না থাকায়, প্রজাগণ হলচালন করিয়া দিনাতিপাত করে। তজ্জন্য পারিশ্রমিক লইয়া কার্য্য করিবার লোক অধিক মিলে না। প্রত্যহ ছয় আনার কমে শ্রমজীবীরা কার্য্য করে না; কার্য্য করিলেও অধিক পরিশ্রম করা অনাবশ্যক ভাবে। ডাঙ্গোরিয়ার বাটীতে শণসূত্র নির্ম্মাণের জন্য এক ব্যক্তি নিযুক্ত হইয়া সন্ধ্যাকালে পারিশ্রমিক চাহিলে, তিনি কহিলেন, "অদ্য অর্থাভাব, কল্য দিব"। পরদিন বলিলেন, "শণসূত্র বিক্রয় করিয়া, তুমি পারিশ্রমিক গ্রহণ কর"। ইহাতে কারুজীবী কহিল, "বিক্রয়ের দ্বারা তিন আনা মূল্য মিলিবে"। কর্ত্তা কহিলেন, "ছয় আনা পারিশ্রমিক লইবে বলিয়া তিন আনার মাত্র কার্য্য করিয়া দিলে; অতএব আমি উক্ত বেতন দিতে অপারগ"। পরদিন হইতে কার্য্যকারক প্রথম দিন অপেক্ষা তিন গুণ অধিক কার্য্য করিতে লাগিল! বিষয়ী লোকের জন্য এই গল্পটি সবিশেষ উপযোগী।

আহোমিয়া গৃহস্থের বাটীতে সূপকার্য্যে বাঙ্গালার মত বিবিধ ব্যঞ্জনের প্রচলন নাই; থাম্‌তি লাফা ও বাঙালি শাক লোভনীয় বলিয়া ব্যবহৃত হয়। শাকের নামে জাতির পরিচয় থাকায় উহাও ভিন্ন দেশীয় বলিয়া বোধ হয়। মহাবিষুব-সংক্রান্তিতে এখানকার প্রধান ও সার্ব্বজনিক উৎসব; চৈৎবিসু কয়েকদিনের জন্য জনসমাজকে আনন্দে নিমগ্ন করে। তৎকালে নূতন বস্ত্র অবশ্য পরিধেয়; বধূ আত্মীয়গণকে উপহার দিবার জন্য বহুপূর্ব্ব হইতে বয়নকার্য্যে ব্যাপৃতা থাকেন। বাঙ্গালী ভৃত্য ভিন্ন

স্বদেশী দাসকে, নববস্ত্র দিতে হয়। সে সময় তাহারা অবসর পাইয়া থাকে ; দ্যূতক্রীড়া, গীতবাদ্য প্রভৃতি আমোদে ও স্বজনের গৃহে নিমন্ত্রণে গমন ইত্যাদি কার্য্যে তাহাদের সময় অতিবাহিত হয়। অবিবাহিত যুবকগণ ঢোল ও করতালি সংযোগে নৃত্য করে। পরিজনবর্গ নিকটে না থাকিলে, অশ্লীল সঙ্গীত হইয়া থাকে। ডোমজাতীয়া নারী বাদ্যসহ নৃত্য করিতে পরাঙ্মুখী নহে। এই উৎসবের সহিত কোন প্রকার অর্চ্চনার বিধান নাই।

ভগদত্তের রাজধানী প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরে তাঁহার পিতা নরকাসুরের প্রতিষ্ঠিতা কামাখ্যা, এখন পুরাণ স্মরণ করাইবার জন্য অবশিষ্ট আছেন। গৌহাটীতে অধুনা ভূগর্ভে প্রাচীন ধ্বংসাবশিষ্ট গৃহের চিহ্ন বহির্গত হইতেছে। শুক্লেশ্বরের মন্দিরের নিম্নে ব্রহ্মপুত্রতীরে বৃহৎ প্রস্তরমূর্ত্তি বৌদ্ধযুগের পরিচয় দিতে সমর্থ। প্রত্যূষে সার্দ্ধক্রোশ-ব্যবহিত হিমবৎ-শৃঙ্গে দৃশ্যমান ভুবনেশ্বরীর মন্দির সম্মুখীন করিয়া, লৌহিত্য-তীরবাহী পথ অতিক্রম করত প্রস্রবণের নিকট আমাদিগকে অশ্বযুগতাড়িত শকট ত্যাগ করিতে হইল। নিম্নভূমি হইতে ঊর্দ্ধে উঠিবার অগ্রে একটি পুরদ্বারের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হইল। কোন স্থানে সোপান, কোথাও বা বন্ধুর বা মসৃণ প্রস্তরে আরোহণকালে ধীরভাব ধারণ করিয়া চলিলাম। অবতরণ করিতে হইলে কোন কার্য্যে চঞ্চল হইবার বাধা নাই। নানাবৃক্ষসমাচ্ছন্ন ঝিল্লিরব-সমাকুল বিটপিমধ্যে কিঞ্চিৎ মাধুর্য্যের পরিচয় দিবার জন্যই যেন চম্পক তরু অযাচিত ভাবে পুষ্পাভরণ প্রদর্শন করিল। দ্বিতীয় পুরদ্বারের এক কক্ষে সর্ব্বাঙ্গে ভস্ম, গলে রুদ্রাক্ষ, শ্মশ্রুধারী কিরাত-সন্ন্যাসী স্তব্ধভাবে উপবিষ্ট। আবশ্যক হইলে, দেবীর তুষ্টি-সাধনোদ্দেশে আত্মবলি বা তাহার নিষ্ক্রয়স্বরূপ একান্তে নরবলি দিতেও ভীত হইবেন না, তাঁহার মৌনমুখ-মণ্ডলে এই ব্যাখ্যা যেন আমি পাঠ করিতেছি। ছিন্নমস্তা প্রভৃতির মন্দির

অতিক্রম করিয়া, সৌভাগ্য-সরোবর-পারে পার্ব্বত্য পল্লীর সোপান-পরম্পরা অতিক্রম করিয়া পুরোহিতের সঙ্কীর্ণ প্রকাণ্ড গৃহে স্থান পাইলাম। বায়ুসেবনের জন্য আমাকে প্রতিবেশীর অঙ্গনে যাইতে হইয়াছিল। যোগিনী তন্ত্রের নীলপর্ব্বত সমুদ্রতল হইতে এক সহস্র ফুট উচ্চ।

কামপীঠে স্নান ও প্রাতরাশান্তে কামাখ্যা-দর্শনাভিলাষী হইলাম। সৌভাগ্যসরোবরে স্নানের সংকল্প শ্রবণমাত্র করিয়া মন্দিরে অবতরণ করিতে হইল। দেশের বিশ্বাস ও ব্যবহার সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিতে পারে বলিয়া দেবালয় অনেকের প্রীতির বস্তু। মন্দিরের মধ্যস্থলে প্রবেশদ্বারে চলন্ত দশভুজা দুর্গা দর্শন করিয়া, দীপালোক-সমন্বিত গর্ভগৃহতলে পুষ্প-সমাকীর্ণ জলপূর্ণ কুণ্ডের নিকট উপবিষ্ট হইলাম। কুণ্ডের মধ্যে গিরি-প্রস্রবণে হস্ত প্রবিষ্ট করায়, পীঠ স্থান স্পৃষ্ট হইল। আহোমরাজ গৌরীনাথ-নির্ম্মিত মণ্ডপে নব রাত্রি কালে হোমাদি হয়; মেষ, মহিষ, হংস, পারাবত বলির ব্যবস্থা আছে। শূকরবলি এখন নিষিদ্ধ। তিনশত বর্ষ পূর্ব্বে কুচ-বিহারাধিপ মল্লধ্বজ ও শুক্লধ্বজ ভ্রাতৃদ্বয় অদ্রি-দুহিতার প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। মিথিলেশ উহার জীর্ণোদ্ধার করিতে সমুৎসুক ছিলেন। কিন্তু মহারাজ নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপ তাহাতে সম্মত হন নাই। বিশ্বসিংহ যৎকালে সর্ব্বপ্রথম নরকাসুরের নীলশৈলে মন্দির নির্ম্মাণ করেন, তৎকালে একজন নীচ জাতীয় বাদ্যকর দেবীর পূজক ছিল। মা যখন নাচিতেন, সে তখন ঢক্কা বাদন করিত। রাজাকে তাহা প্রদর্শন করার অপরাধে, মা ঢাকির মস্তক হস্তদ্বারা ছিন্ন করিয়াছেন; এখনও পর্য্যন্ত নাকি সেই মুণ্ড প্রস্তরী-ভূত হইয়া অঙ্গনে রহিয়াছে। তদবধি কোচরাজবংশীয়গণের কামাখ্যা দর্শনে অনুমতি নাই। আমি মন্দির হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবামাত্র কুলকুমারি-কাদের সাক্ষাৎ পাইলাম। পয়সাভ্রমে—জানিয়াও আধুলি দিয়াছিলাম। পরে শুনিয়াছি, পুরোহিত মহাশয় উহা তাঁহার প্রাপ্য বোধ করিয়া, প্রতিগ্রহ

করিয়াছেন। গোদাবরীর উৎপত্তিস্থল ত্র্যম্বকের ন্যায় এখানে পুরোহিতের গৃহে যজমানের আহার সমাধা করিবার নিয়ম। কলিকাতা ত্যাগ করিয় কেবল অদ্য পরিতোষপূর্ব্বক ভোজন করিতে সমর্থ হইয়াছি। পুরোহিতের ভগিনীত্রয় অতি মধুরপ্রকৃতি-সম্পন্না, যেন সরলতার চিত্র। বহির্দ্দেশের কৃত্য সম্পাদনের জন্য পার্ব্বত্য উদ্যানে প্রবেশলাভ করিলাম। এখানে তাম্বুলবল্লী তরুকে আশ্রয় করিয়া উঠিতেছে। ব্রহ্মপুত্রতটস্থ বন হইতে কদাচিৎ বন্যহস্তী আগত হইয়া উদ্যানের অনিষ্ট করিয়া থাকে। নিম্নে ব্যঘ্রের পিপাসানিবারক উৎস-সলিলের ও উর্দ্ধে ভুবেনেশ্বরীর সন্নিহিত হওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব হইল।

এ দেশের কীর্ত্তন বাঙ্গালার মত। অগ্রে একজন এক অংশ কহে, পরে কয়েকজনে তাহার পুনরাবৃত্তি করে। দশভুজার সম্মুখে সেবার জন্য ব্রাহ্মণ মহিলাগণ যাহা গান করিলেন, তাহাতে আছে—শিব মদ্যপান করিয়া অচেতন হইয়া পড়িয়াছেন, এরূপ ভাব আর কোথাও শুনি নাই। ইহা বামাচারীর দেশেই প্রাপ্য। আসামী ব্রাহ্মণ শাক্ত। সাধককে দক্ষিণাচার হইতে বামাচারে উপনীত হইতে হয়। এই কারণে অন্য জাতীয় মহাপুরুষিয়াদিগের নিকট এখানকার ব্রাহ্মণের মর্য্যাদা নাই, তাঁহারা শুদ্ধাচারের নিতান্ত পক্ষপাতী। এজন্য তাঁহারা ব্রাহ্মণকে প্রণাম করেন না। তাঁহাদের অন্ন বা জল গ্রহণ করেন না। ইহা হয় ত বৈষ্ণবের শৈববিদ্বেষ হইতে পারে, কিন্তু ব্রাহ্মণেরা মহাপুরুষিয়াদের প্রতি আগ্রহ বা নিগ্রহ কিছুই প্রদর্শন করেন না।

তান্ত্রিক সাধকের পূর্ণাভিষেকের পর কৌল হইলে, গৃহী বা অবধূত হওয়া যেমন স্বেচ্ছাধীন, বামাচারীর পক্ষে শিষ্টাচার রক্ষার্থ দ্রব্যবিশেষের অনুকল্প ব্যবহার তেমনি সাধ্যায়ত্ত। গৈরিকধারীদের মধ্যে শ্রৌত ও স্মার্ত্ত অনুষ্ঠানকারীর অপেক্ষা তন্ত্রমার্গীর ভাগ অধিক। সরস্বতী তীর্থ ও আশ্রম

ভিন্ন দশনামীর অপর সাতটি তন্ত্রমার্গ অবলম্বন করিয়াছেন। ভারতের মধ্যে কেবল শৃঙ্গগিরি মঠের গোঁসাই তান্ত্রিক নহেন; এই পথে আচণ্ডাল সকলেই পরমহংস পর্য্যন্ত হইতে সক্ষম। ব্রাহ্মণ ভিন্ন দণ্ডী হইতে পারে না; কিন্তু কাশীর পঞ্চক্রোশীর পথে ভিক্ষার লোভে চর্ম্মকারগণকে সাময়িক-ভাবে দণ্ডকমণ্ডলু গ্রহণ করিতে দেখা যায়। তন্ত্র পরিবর্ত্তিত বৈদিক প্রণালী। তাহা স্বাভাবিকক্রমে উদ্ভূত। বৈদিক দেবতার রূপক সাকারভাব ধারণ করিয়া যখন মনুষ্যোচিত ধর্ম্মাক্রান্ত হইয়াছে, তাহার তুষ্টি সাধনার্থ মানব আপন ব্যবহার্য্য গন্ধপুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য প্রভৃতি অর্পণ করিবার ব্যবস্থা অবশ্যই করিবে। বৈদিককালের যজ্ঞীয় আহুতি-দানের বেদি, যন্ত্র লিখিয়া প্রস্তুত হইতে লাগিল। ব্রহ্মবাচক বা ব্রহ্মসঙ্কেত প্রণবের ন্যায় বিবিধ দেবতার জন্য নানা বীজমন্ত্র রচনা করিতে হইয়াছে। সোমের অভিষব অবস্থা, মদ্যদ্বারা পূরণ করা সহজ সাধ্য হইল; বৈদিকযুগে সৌত্রামণি যাগে সাক্ষাৎ সুরা ব্যবহৃত হইত। কণ্ঠনালির প্রদাহ দমনের জন্য ভৃষ্ট তণ্ডুল ও চণকাদিকে মুদ্রা কহে। তাহাই এ যজ্ঞের পুরোডাশ। পশুমেধ প্রভৃতির কার্য্য সহজ বলিদান দ্বারা সম্পন্ন হইল। মাংস অপেক্ষা মৎস্য সুপ্রাপ্য বলিয়া পূজার উপকরণে স্থান পাইয়াছে। বৈদিক যুগ হইতে মহাভারতীয় কাল পর্য্যন্ত দাম্পত্য সম্বন্ধের পবিত্রতার নিয়ম দৃঢ় হয় নাই। কুলস্ত্রী ঘটিত ব্যাপারে তান্ত্রিক ব্যবহার অদ্যাপি তাহা রক্ষা করিতেছে। *

পরিভ্রমণের সম্পূর্ণ জ্ঞান লাভ করিতে হইলে পদব্রজে ভ্রমণ করা কর্ত্তব্য। গৌহাটি হইতে তুরঙ্গযুগলে আকৃষ্ট গিরি-যানে কায়ক্লেশে উপবেশন করিয়া, তিলশৈল অভিমুখে ধাবিত হইলাম। বক্তিম পথ ক্রমে

* তন্ত্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে লেখকের এই মত নব্য। গ্রন্থের নানা স্থানে পাঠক অন্যরূপ দেখিবেন। উহার মধ্যে কোনটি সমীচীন ইহা তাঁহার বিচার্য্য।

উচ্চে প্রসারিত হইয়াছে। পথ বঙ্কিম নহে। ভূধরের সবিশেষ বৈচিত্র দৃষ্টি হইল না, পথ-সংস্কার-কার্য্যে নিযুক্ত গারোজাতীয় নরনারীর মলি বর্ণে আসামের কালাজ্বরের প্রকোপ চিত্রিত বোধ হইল। তৃতী প্রহরে শিলং রাজধানী সন্নিহিত হইলে, হিমশৈল-পরিচায়ক সূত্রব পত্রগুচ্ছে মণ্ডিত বহুশাখাসমাচ্ছন্ন দীর্ঘ সরলবৃক্ষের প্রাচুর্য্যসহ গ্রী ঋতুতে শৈত্য অনুভূত হইল। সিমলা যেমন কেলুবৃক্ষ-প্রধান, তিলশৈল তেমনি সরলতরু-প্রধান স্থান। সমুদ্রতল হইতে চার হাজার ফিট উ জয়ন্তী পর্ব্বতমধ্যে এই নগর স্থাপিত। খস জাতি এখানকার দর্শনী বিষয়।

সত্যশ্রবা কহিয়াছেন, "আসাম প্রকৃতির কাম্যকানন।" গেট সাহে কহেন, "তদ্ভিন্ন এই দেশ বিবিধ কারণে চিত্তাকর্ষক।" ভারতবর্ষে দক্ষিণ, পূর্ব্ব ও দক্ষিণ-পশ্চিম সমুদ্র দ্বারা বেষ্টিত; উত্তর দিক্‌ হিমাল কর্ত্তৃক সুরক্ষিত; এসিয়ার অপর ভাগ হইতে উপনিবেশী দলের প্রবে পথ কেবল উত্তর-পশ্চিম ও উত্তর-পূর্ব্ব সীমায় গিরিসঙ্কটে বিদ্যমান আছে। আর্য্য, গ্রীক, হুন, পাঠান, মোগল পশ্চিমের পথে ভারতে প্রবেশ করিয়াছেন। পূর্ব্ব হইতে কামরূপের পথে পশ্চিম চীনের মঙ্গোলীয় জাতি প্রবিষ্ট হইয়াছে। দ্রাবিড় জাতির সহিত মিশ্রিত হইয়া, মঙ্গোলীয়গণ পূর্ব্বতন দেহ, ভাষা ও ধর্ম্মে ভিন্নভাব প্রাপ্ত হওয়ায় আহোমিয়া এবং বাঙ্গালী, হিন্দু ও মুসলমান জাতি নির্ম্মিত হইয়া গিয়াছে। সেই মঙ্গোলীয়দিগের কিয়দংশ অমিশ্র ভাবে খস ও জয়ন্তী পর্ব্বতে জাতিত্ব রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছে। তাহারা পূর্ব্বভাষা ও ধর্ম্ম রক্ষা করিতেছে, বর্ত্তমান কোন ভাষার সহিত উহার একতা নাই। খস জাতির ন্যায় অমিশ্র মঙ্গোলীয় শোণিত যে কামরূপে স্থল-বিশেষে হিন্দুর মধ্যে বিদ্যমান আছে, তাহার প্রমাণ মুখাকৃতিতে ব্যক্ত দেখিলাম। ভারতে ইতিহাস

রক্ষার পদ্ধতি নাই বলিলেই হয়; কিন্তু আহোমজাতি খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দী হইতে রাজকথা সুন্দররূপে লিপিবদ্ধ করিয়াছে। আসামে মুসলমানগণ অর্দ্ধচন্দ্র-লাঞ্ছিত পতাকা প্রোথিত করিতে অসমর্থ হইয়াছিল। বঙ্গ সমতট নামে খ্যাত থাকায়, পর্ব্বত-সঙ্কুল প্রাগ্‌জ্যোতিষ অসমপদবাচ্য হইয়া থাকিবে, এরূপ অনুমান এখন আর কেহ করেন না। আহোম শব্দ হইতে আসাম শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে।

পথে বহির্গত হইয়া বাঙ্গালী ও আসামীতে ভেদ কি, তাহা লক্ষ্য করিতে পারিলাম না। বৈচিত্র্যের মধ্যে কেবল তাম্বুল-চর্ব্বণকারিণী দিব্যবসনা পৃষ্ঠন্যস্ত-ভারাবরোহিণী-বিশিষ্টা খস নারীকুল দৃষ্ট হইতেছিল। তাহাদের স্বাভাবিক বর্ণ পীত হইলেও, প্রায়শঃ কিঞ্চিৎ মলিনতা প্রাপ্ত হইয়াছে; মুখশ্রীতে সৌন্দর্য্য বস্তুটা অবশ্য আছে, কটিবস্ত্রের উপর দুইখানি রঞ্জিত উত্তরীয় গ্রীবা হইতে পাদ পর্য্যন্ত বক্ষঃপৃষ্ঠ আবৃত করিয়া বিপরীতদিকে আনত। শিরোরুহের আচ্ছাদনে অন্য এক খণ্ড বস্ত্র প্রয়োজনীয় হইয়াছে। নরপুঙ্গবেরা ধুতি ও কোট ভিন্ন বস্ত্র কুঞ্চিত করিয়া বঙ্কিমভাবে উষ্ণীষ ধারণ করেন। রাবণ রায়, বুদ্ধদেব বাবু প্রভৃতি যাহাদের নাম, তাঁহারা খাসি ভাষায় লিখিবার সময় রোমান অক্ষর ব্যবহার করেন। আত্মশক্তি প্রকাশের অবসর পাইবার পূর্ব্বেই তাঁহাদের বর্ণ-মালাকে অধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইতে হইয়াছে। খ্রীষ্টীয় যাজকদিগের প্রভাব ইহাদিগকে আত্মপ্রতিষ্ঠার দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া বিশ্বপ্রেমে উন্মুখীন করিয়াছে। স্বর্গীয় একষ্ট্রা আসিষ্টাণ্ট কমিশনর জীবন রায়, তাঁহার স্বজাতীয় খসগণ যাহাতে হিন্দু বা খ্রীষ্টান না হন, তজ্জন্য প্রয়াসী ছিলেন। প্রেতগণ খাসিদিগের বিশিষ্ট দেবতা। দেশের স্বার্থরক্ষার জন্য খসনেতা খাসিদিগকে শিক্ষিতের ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে নিষেধ করেন।

বিশ্বাসকে মূলভিত্তি না করিলে, ঐহিক বা পারমার্থিক কোন কার্য্য

চলে না, এ বিষয়ে বন্য ও সভ্য ব্যক্তিকে এক শ্রেণীর অন্তর্গত হইতে হয়। অশিক্ষিত ও শিক্ষিতে ভেদ আছে; অশিক্ষিত ব্যক্তি সহসা একটি সামান্য বিশ্বাসে উত্তীর্ণ হইবে, শিক্ষিত লোক তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিয়া শেষ কালে নিজের বিশ্বাসানুযায়ী কোন স্থানে উপনীত হইবেন; তাহা যে অসত্য হইতে পারে, তাহা অন্যে বুঝিবে, তিনি বুঝিবেন না। ফলে উভয় শ্রেণীর প্রত্যয়ের মূলে এক বিশ্বাস বিদ্যমান। বলবানের নিকট দুর্ব্বল, জ্ঞানীর নিকট মূর্খ যে জন্য নত হয়, ক্ষমতাপন্ন প্রকৃতির সন্নিধানে মনুষ্য, সেই কারণে, ততোধিক অনন্যোপায় হইয়া নির্ভরশীল হয়। যে অনির্ব্বচনীয় ক্ষমতার নিকট পরাভূত হইতে হইল, তাহার প্রকার-ভেদকে পৃথক বোধ করিয়া সামান্য লোকে নানা দেবদেবী, গুরু,মহাপুরুষ, ও অবতারের শরণ লয়। বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ নানার পরিবর্ত্তে এক সর্ব্ব-শক্তিমান, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর পরমেশ্বরকে স্বতঃসিদ্ধরূপে গ্রহণ করেন; তাঁহাদের বিবেচনায়, যাহা কিছু ভাল, সমস্তই তাঁহাতেই আরোপ করা হয়। জ্ঞানী ও সামান্য লোকে এইমাত্র প্রভেদ। এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের অস্তিত্ব সম্বন্ধেও মত-ভেদ আছে; এক শ্রেণীর লোক জগৎ-নাস্তিক, আর এক শ্রেণীর লোক জগৎ-আস্তিক। জগৎ-নাস্তিককে মায়াবাদী ও জগৎ-আস্তিককে জড়বাদী বলিতে পারা যায়। উভয়েই অদ্বৈতবাদী। জগৎ-নাস্তিক কহেন বাহ্য ও অন্তর্জগৎ, দুই এক; কতকগুলি খণ্ড প্রত্যয়ের সমষ্টি; ক্ষণিক অনুভূতি মাত্র, তাহার প্রকৃত সত্তা নাই। জগৎ-আস্তিক বিবেচনা করেন, জড়জগৎ ও অন্তর্জগৎ বিভিন্ন নহে; অঙ্গার-কণিকা গতিযুক্ত হইলে, তাপ জন্মে; মস্তিষ্ক-কণিকা গতিযুক্ত হইলে, হর্ষ-বিষাদ উপস্থিত হয়। পরমাণুর প্রকৃত সত্তা আছে। আস্তিক ও নাস্তিক উভয়েই চেতনাকে একই সামগ্রী, তাহা সত্য বা মিথ্যা হউক, বিভিন্ন আকারে জ্ঞান করে। আকাশ চিৎ বা জড় হউক, তাহার প্রকৃত সত্তা থাকুক বা না থাকুক, উহাকে

সর্ব্বব্যাপী বোধ হইতেছে। মনুষ্য একোন্মুখী চিন্তা দ্বারা যোগবলে আকাশে তরঙ্গ উৎপাদন করাইয়া, এক মস্তিষ্ক হইতে অন্য মস্তিষ্কে চিন্তা চালাইতে পারে, সর্ব্বজ্ঞ হয়, অন্যকে অভিভূত করিয়া স্বেচ্ছামত কার্য্য করাইয়া লয়, ইহা সাধনা সাপেক্ষ। ইথার যখন সর্ব্বত্র আছে, তখন তাহাতে কম্পন উৎপাদন করিলে, সহস্র যোজন দূরে সংবাদ বহন করিয়া লইয়া যাইবে, অনুভূতির সম্প্রসারণ করিবে, ইহা সম্ভবপর। আকাশ যখন সর্ব্বব্যাপী, মানুষেও উহা আছে, অন্য স্থানেও তাহা আছে, তখন উহার তরঙ্গ অনুভূতি বহন করিতে সমর্থ। বিষয়টী গুহ্য, যিনি ইহাতে পারদর্শী হইয়াছেন, লোকে তাঁহার নিকট অবনত হইবে। বলবানের নিকট দুর্ব্বল বশ্যতা স্বীকার করিবে, ইহা নিশ্চিত। গুরু যাহা বলেন, অবিচারিত চিত্তে শিষ্য তাহা গ্রহণ করে, কারণ তাঁহাকে উহার বিশ্বাস হইয়াছে, কাজেই নির্ভরশীল হইয়াছে। বিশ্বাসী হওয়া, নির্ভরশীল হওয়া, মানুষের স্বভাব। শঙ্করাচার্য্য জগৎ-নাস্তিক হইলেও দেবদেবী মানিতেন। শাক্যসিংহ ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদী হইলেও কর্ম্ম মানিতেন, ইহাতে তাঁহারা অসামঞ্জস্য দেখিতেন না কেন, তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। যে যাহার অতিরিক্ত জানে না বা বিশ্বাস করে না, তাহার নিকট উহাই সত্য। সুতরাং ব্রহ্ম নির্গুণ বা সগুণ, দুই হইতে পারে। দেবতা সম্বন্ধে অধিক বলা বাহুল্য। "সব্বে সত্তা সুখিতা হোন্তু" এই সূত্র পার্থিব ধর্ম্মের বীজ হইলেও প্রথমে আপনার, তাহার পর দেশের, তদনন্তর বিশ্বের হিত প্রার্থনীয়। এই কারণে অনেক স্থানে স্বধর্ম্ম রক্ষা করা প্রয়োজনীয় হইয়া উঠে; নতুবা জাতীয়তা লোপ পায়, দেশের স্বার্থ রক্ষা করিতে পারা যায় না।

এক বাঙ্গালীর জোরহাটনাম্নী এক দাসী ছিল; সে পীড়িতা হইলে, প্রভু ঔষধ সেবনের ব্যবস্থা করেন, তাহাতে বিশ্বাস-পরায়ণা দাসী উত্তর করিল, বিধাতা রাজি নহেন, তজ্জন্য পীড়া হইয়াছে, প্রতিকার করিতে

গেলে তিনি অসন্তুষ্ট হইবেন। অখ্রীষ্টান খাসি মিথ্যা ব্যবহার করিতে শিক্ষা করে নাই। বালকের সরলতা যুবার নিকট দুষ্প্রাপ্য। এই জাতির মধ্যে ভাগিনেয়ের উত্তরাধিকার রীতি প্রচলিত। তাহাতে বোধ হয়, ইহাদের মধ্যে দাম্পত্য বন্ধনের দৃঢ়তা নাই, প্রতিবেশী নাগা জাতিতে কিন্তু পুত্রাধিকার প্রচলিত আছে। ইংরাজের খসনারীর গর্ভজাত পুত্রের ফিরিঙ্গিত্ব প্রাপ্ত না হইয়া খাসি থাকিতে আপত্তি নাই। পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে, এই জাতি অমিশ্র, অথচ তাহাদের এই ব্যবহার ও বর্ণের মলিনতা, সেই কথার প্রতিবাদ করিতেছে।

ফল-মূল বিক্রয়ের জন্য সপ্তাহে দুই স্থানে ভিন্ন দিনে হট্টের অধিবেশন হয়। শ্রীহট্ট অপেক্ষা এখানকার নানাজাতীয় কমলাশ্রেণীর জম্বীর মিষ্টতায় ন্যূন। পরিচিত ও অপরিচিত দুই একটি ফল গ্রহণানন্তর জঠর সেবার জন্য আমাকে কপিশাকের প্রতি আকৃষ্ট হইতে হইয়াছিল। কাসন্দির মত স্তূপাকার এক বস্তু দেখিলাম, ক্রয় করিতে সাহস হইল না। খাসি নারীর কৃষিজাত সামগ্রীগুলি বাঙ্গালী মারোয়াড়ী পুরুষের বস্ত্র তণ্ডুল প্রভৃতির বীথি-সজ্জায় সঙ্কীর্ণ স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে। কিঞ্চিৎ নিম্নে নানাবিধ মাংস, চুল্লী প্রজ্জ্বলিত করিবার জন্য সরল বৃক্ষের নির্য্যাসপূর্ণ ধূপকাষ্ঠ, গৃহ প্রস্তুতের উপকরণ প্রভৃতি বিক্রয়ের জন্য রক্ষিত আছে।

অনাবৃত স্থানে ক্রয় বিক্রয়ের কষ্ট নিরাকরণ মানসে খসরাজ বড়হাটের জন্য বহুদূরব্যাপী প্রাঙ্গণে গৃহাবলি নির্ম্মাণ করাইতেছেন। মধ্যে মধ্যে শিখরদেশ উচ্চ করিয়া উহা শ্বেত লৌহপত্রে মণ্ডিত করত উহার শোভা সম্পাদন করা হইয়াছে। দূর হইতে দৃষ্ট হয় বলিয়া নবাগতের পক্ষে ইহা দিগ্‌দর্শনের কার্য্য করিবে। ফুলার মহোদয় হট্টের দ্বার উদ্‌ঘাটন করিতে আসিতেছেন দেখিয়া, বোধ করি, অন্তরীক্ষে দেবগণ ক্রন্দন করায় প্রবল ভাবে বৃষ্টিপাত হইল। রক্তবর্ণ বস্ত্রে শ্বেত ইংরাজি অক্ষরে খাসি

সম্ভাষণ-লিপি পত্রবিতানে সজ্জিত তোরণ-গাত্রে আলম্বিত হইয়া, সিক্ত হইতেছে; চন্দ্রাতপতলে সম্বর্দ্ধনাকারিগণ গত্যন্তরহীন গুরখালি সৈনিকের মত নীরবে বারিপাত সহ্য করিতেছেন। তিন পর্ব্বতের নির্ব্বাচিত খস-শাসনকর্ত্তারা সভার একপার্শ্বে স্থান গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহাদের কৌষেয় বস্ত্র ও কৌষেয় উষ্ণীষ-শোভিত দেহে অঙ্গরক্ষার উপর রজতময় চন্দ্রহার উপবীতের ন্যায় দুই প্রস্থ এক একটী অপর দিক হইতে আসিয়া মিলিত হইয়াছে। তাঁহারা আমলকবৎ বৃহৎ পদ্মরাগমণিসংযুক্ত কাঞ্চনমালা গলে দোলাইয়া গুম্ফান্তরে তাম্বুলচর্ব্বণে নিরত আছেন। মধ্যাহ্নে সভার অধিষ্ঠাত্রী দেবদেবী বিভিন্ন পথে অথচ এককালে অতিদ্রুত তুরঙ্গম-চালিত রথে অতি সজ্জিত অধিত্যকাস্থ পটমণ্ডপে প্রবিষ্ট হইলেন। সহৃদয় ইংলণ্ডীয় শাসনকর্ত্তা নগরশোভা-বর্দ্ধনকারিণী সভার সদস্যগণ কর্ত্তৃক প্রদত্ত অভিনন্দনপত্রের রৌপ্যাধার সম্বন্ধে কহিয়াছিলেন, ইহা "স্বদেশী" না করিয়া কলিকাতা হইতে কেন আনীত হইল?

খসরাজের সহিত প্রজাদের সবিশেষ সম্বন্ধ নাই; তাঁহাদিগকে ভূমির কর দিতে হয় না, খসরাজ্য পঞ্চবিংশতি ক্ষুদ্র প্রদেশে বিভক্ত। পঞ্চদশ প্রদেশে যদিও এক পরিবার হইতে সিয়ম্ বা রাজা নির্ব্বাচিত হইয়া থাকে, তথাপি প্রজাসাধারণের দ্বারা ঐ কার্য্য নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। একস্থানে ওহদেদার নিযুক্ত হন। সর্দ্দারের দ্বারা পাঁচটি ও লিঙতো কর্ত্তৃক চারটী প্রদেশ শাসিত হয়, তাঁহারা সকলেই নির্ব্বাচন দ্বারা নিযুক্ত হন। এক্ষণে এই নির্ব্বাচন ব্রিটিশ শাসনকর্ত্তা দ্বারা স্বীকৃত করাইয়া লইতে হয়। ব্রিটিশ রাজ, প্রতিনিধিদিগের নিকট হইতে খনিজদ্রব্য, হস্তী ও বনকর হইতে উৎপন্ন সামগ্রীর অর্দ্ধাংশ পাইলে, শাসনকর্ত্তাদিগকে স্বীকার করিতে অসম্মতি প্রকাশ করেন না। প্রজার প্রতিনিধিগণ বিচারবিধি নিজেরাই করেন। হত্যা প্রভৃতি গুরুতর ব্যাপারে তাঁহাদিগকে ইংরাজের মুখাপেক্ষা

করিতে হয়। বাঙ্গালায় শ্রীহট্টের চূণ যাহা দেখিতে পাওয়া, তাহা এই খাসিদের আকরে উৎপন্ন।

কাশ্মীর, সিমলা, দারজিলিং ও শিলং শৈলের অধিবাসিনীদের মস্তকের বস্ত্রখণ্ড বন্ধনের ঐক্য দৃষ্ট হইতেছে। ভারতের বহির্ভাগে ইহার মূল নিহিত আছে, অনুমিত হইতেছে। সে প্রদেশ আমার গন্তব্য স্থানের বহির্ভূত। নেপালী, টিপ্রা, মণিপুরী ও আহোমিয়া ললনার বক্ষবেষ্টনের সাদৃশ্যের মূল নিদ্ধারণ করিতে হইলে, ভারতভূমি ত্যাগ করিতে হইবে। আরাকাণের মগনারীর পরিচ্ছদে সেই মূল দৃষ্ট হইবে; আসামের চাদর গায়ে দিবার প্রণালী আরাকাণের প্রণালী হইতে কিঞ্চিৎ বিভিন্ন মাত্র। ভারতের দক্ষিণ প্রান্তবর্ত্তী সুদূর কেরলের সহিত পূর্ব্বপ্রান্তবর্ত্তী কামরূপের অনেক বিষয়ে সাদৃশ্য আছে। ইহাতে এক মঙ্গোলীয় প্রভাব পরিব্যক্ত করে। খাসিগণ তাম্বূল সেবনে খদিরের পরিবর্ত্তে একপ্রকার মূল ব্যবহার দ্বারা মগদিগের মত ওষ্ঠ রঞ্জিত করিয়া থাকে।

বহু শৈলাবাসে অবস্থান করিয়াছি। দারজিলিং লাউস স্বাস্থ্য-নিবাসের মত আমার উপযোগী দ্বিতীয় স্থান মিলিল না; তথায় গৃহ কর্ম্মে চিত্তবিক্ষেপ হয় না। স্নায়ুদৌর্ব্বল্য প্রশমনের জন্য "নিরালম্বং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিৎ ভাবয়েৎ সুধীঃ" এই পথ্য গ্রহণ করা যাইতে পারে। কাঞ্চন-জঙ্ঘার ন্যায় মহান্ হিমশৃঙ্গ দর্শন ও মেঘমণ্ডলে বাস অন্যত্র হইবার নহে। সংক্ষুব্ধ কার্পাসরাশির ন্যায় স্বচ্ছ মেঘের হিল্লোল এই আসিল, অমনি গেল। অম্লযানের গন্ধ অনুভব করিতে লাগিলাম। এমন নৈসর্গিক কৌতুকাবহ দৃশ্য আর কোথায় আছে?

সিমলার প্রান্তরে ভ্রমণ কালে ধূলির জন্য অস্থির হইতে হয়। এক পক্ষে একবার মাত্র বৃষ্টি পাইয়াছিলাম। এখানে কিন্তু দেখিবার বিষয় অন্যরূপ। দারজিলিং বা শিলং পর্ব্বতে অধিবাসীরা অনার্য্য; সিমলায়

হিমালয়—কাঞ্চনজঙ্ঘা শৃঙ্গ

(ভারত প্রদক্ষিণ)

তাহা নহে। প্রাচীন ভাবের হিমালয়বাসী আর্য্য কৃষক তথায় পাইয়াছিলাম। এক দিব্যাঙ্গ ভারবাহী প্রশ্নোত্তরে কহিয়াছিল, সে ব্রাহ্মণ। তাহার অগ্রজের প্রবাসে থাকিবার আবশ্যক হয় না বলিয়া, তাঁহার যজ্ঞোপবীত আছে। নিষ্ঠাবান হইতে না পারিলে উপনয়ন সংস্কার বৃথা তজ্জন্য সে যজ্ঞসূত্র গ্রহণ করে নাই বলিল। প্রস্তরকুন্তনকারী ক্ষত্রিয়ের সহিত আলাপ করিয়া কিছু তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হই। অর্থাভাব বশতঃ কেবল জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বিবাহ করিয়া থাকেন, কনিষ্ঠগণের তাহাতেই সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ হয়। প্রত্যেকের পৃথক্ পত্নী হইলে পরিবার বৃহৎ হইয়া উঠে, নির্দ্দিষ্ট পৈতৃক ভূমি হইতে উৎপন্ন শস্যে সংকুলান হইতে পারে না। এক্ষণে ইংরাজ সিমলায় বসতি স্থাপন করায়, তাহাদের অর্থাভাব দূর হইয়াছে। এখন এক ব্যক্তিকে তিন স্ত্রীর ভর্ত্তা হইতেও দেখা যায়। ভিন্ন জাতির অন্নগ্রহণ এখানকার সমাজে নিষিদ্ধ নহে। শিপর মেলায় কনেৎ সুন্দরীর রক্তিমাভ গৌরকান্তি ও পরিচ্ছদ দর্শনে কাশ্মীরের পণ্ডিতানীদিগকে স্মরণ হইয়াছিল। সে কৃষক রমণীর অসঙ্কুচিত ভাব যেন মর্ত্ত্যলোকের মত নহে। মুসলমান অধিকার গিরিপল্লীতে প্রবেশ করিতে পারে নাই। আচার ব্যবহারে বৈদেশিকতার বা হিন্দু সভ্যতার সুসংস্কৃত ব্যবস্থা হইতে সরলপ্রাণ বনচরগণ দূরে রহিয়াছেন। পর্ব্বতাভ্যন্তরে অনেকগুলি ক্ষুদ্র রাজন্য আছেন, তাঁহারা জাতিবিশেষকে উন্নত বা অধঃপতিত করিয়া থাকেন, তাঁহারা পূর্ব্বকালের মত দেশ ও সমাজ, উভয়ের রাজা।

সিমলা হইতে উত্তরাখণ্ডের পর্ব্বতমালা অধিকদূরবর্ত্তী নহে; কেদারসন্নিহিত স্থান উত্তরাখণ্ড নামে পরিচিত। সত্য ও অস্তেয়ের জন্য তথাকার অধিবাসীরা প্রসিদ্ধ। স্থানের দুর্গমতার জন্য হরিদ্বারে পদার্পণ করিয়াই আমি অগ্রগমনে নিবৃত্ত হওয়া উচিত মনে করিয়াছিলাম। মায়াপুরীতে

গঙ্গা ও গঙ্গাতট অতি রমণীয়। ব্রহ্মকুণ্ডের প্রশস্ত চত্বরে বসিলে গোধূলী-কালে ভাগীরথীর কল্লোলধ্বনি যখন কর্ণপটহে প্রবেশ করিতে থাকে, তখন, তাহাতে ভাষার যোগ না থাকিলেও, বোধ হয়, "শ্রবণে আসিয়া কথা মরমে পশিল গো—আকুল করিল প্রাণ।" আবার যখন পরপারে চণ্ডীপর্ব্বতের দিকে নয়ন ফিরাইলাম, "নব রে নব নিতুই নব, যখনই হেরি তখনই নব" জ্ঞান হইল। জলের স্বাদ হিমানীমিশ্রবৎ। গাড়োয়ালের সন্ন্যাসিনীদিগের কুটীর হইতে পাটিয়ালার রাজভবন পর্য্যন্ত নগরী সুরধুনী-তীরে বিনত। শিবালিক পর্ব্বতের প্রান্ত হইতে দর্শন করিলে সমস্ত পর্ব্বতময় বোধ হয়। ক্ষুদ্র জনপদ তন্মধ্যে লুক্কায়িত রহে। পর্ব্বতগহ্বরে যেমন জনপদ প্রচ্ছন্ন আছে, সন্ন্যাসীর হৃদয়ে তেমনি সংসার লুক্কায়িত, ভাবের উচ্ছ্বাস থামিয়া গেলে তাহা প্রকটিত হয়। সকল সম্প্রদায়ের সন্নাসীরা হরিদ্বারে আসিয়া বৃহৎ মঠ নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তাহা কি সাংসারিকতা নহে? তাঁহারা বিষয়কর্ম্মে প্রতিযোগিতা ত্যাগ করিয়া, প্রজাবৃদ্ধিতে ক্ষান্ত থাকিয়া, আমাদের মঙ্গল করিয়াছেন; ইহা ভিন্ন উদর মহাশয়ের জন্য, স্বকীয় পরমার্থের জন্য তথাকথিত সাধুকে ব্যস্ত থাকিতে দেখা যায়। বিবেকানন্দের চিকিৎসা মঠে ও দয়ানন্দের গুরুকুলে তাহার ব্যতিক্রম দেখিলাম। গাড়োয়ালিরা গঙ্গোত্তরী হইতে ভূর্জ্জপত্র-মণ্ডিত জলপাত্রের ভার লইয়া সমভূমিতে গমন করিতেছে। তাহাদের আকৃতি নেপালবাসীদের ন্যায়। তীর্থে তীর্থে জল প্রদান করিয়া ইহারা ছয় মাসে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করে। ইহাতে লব্ধ বেতন হইতে ও কৃষিকার্য্যে উৎপন্ন দ্রব্য হইতে তাহাদের পরিবারের ভরণপোষণ চলে। কম্বলের পরিধেয় ও উত্তরীয় শৈত্য নিবারণের জন্য ব্যবহৃত হয়। পল্লীবাসিনী অবলারা বদরিকাশ্রমগামী যাত্রী দেখিলে টিকুলি, ছুঁচসূতা চাহিয়া মাত্র আপনাদের সামান্য অভাব বা আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করিতে চাহে।

সাদৃশ্যের লীলা অপার। উহা শিলং হইতে সম্প্রসারিত হইয়া দারজিলিং শিবালিক হইয়া ফিরিয়া আসিল। চিন্তার সাহায্যে অনার্য্য হইতে আরম্ভ করিয়া আর্য্যে গিয়াছিলাম; পুনরায় অনার্য্যে প্রত্যাগমন করিতেছি। ইতিহাস রক্ষায় পূর্ব্বগৌরবের স্মৃতি জাগরূক থাকে; স্থলবিশেষে তদ্দ্বারা অনিষ্টপাত হইতে পারে। শ্রীযুক্ত আনন্দরাম গোঁহাই একজন আহোম্; তিনি অতিশয় দুঃখিতান্তঃকরণে আমাকে কহিয়াছিলেন, আমরা অধুনা ক্ষমতাচ্যুত, যজনকর্য্যে সর্ব্বত্র ব্রাহ্মণ মিলে না; ইহাতে পূর্ব্বমতে প্রতিগমন করিতে বাঞ্ছা হয়, অসম্মানিত অবস্থায় কালযাপন করা দুঃসাধ্য। আপনি কলিকাতায় যাইয়া হিন্দুধর্ম্মের রক্ষকদিগকে ইহার প্রতীকার করিতে কহিবেন। ইতিহাস না থাকিলে এ বিপত্তি ঘটিত না। আর্য্যীকরণে গৃহীত জাতিমালায় অতর্কিতভাবে এই জাতি স্থান অধিকার করিয়া থাকিতে পারিতেন।

জড় ও চেতন পদার্থে ভেদ নাই। চেতনের ন্যায় অচেতন পদার্থ সাড়া দিতে পারে, ইহা সম্প্রতি প্রমাণিত হওয়ায় বহুকালের দ্বৈধ মিটিয়া গিয়াছে। মানবতত্ত্ব ও ভূতত্ত্ব, সেই কারণে একসূত্রে আবদ্ধ। ভূমির অবস্থা, জলবায়ু ও প্রাকৃতিক সংস্থান মনুষ্যের শারীরিক ও মানসিক ব্যাপারে কার্য্য করে।

বঙ্গদেশের ভূমি যেমন কোমল, পশ্চিমাঞ্চলের ভূমি তদ্রূপ নহে; ইহাতে বাঙ্গালী অপেক্ষা হিন্দুস্থানী দৃঢ়। বঙ্গের ন্যায় সুজলা সুফলা ও শস্যশ্যামলা ভূমিতে দীর্ঘ কাল বাস নিবন্ধন আহোম জাতি নির্বীর্য্য হইয়া পড়িল। তাহাদের পূর্ব্ব বাসস্থলী হইতে অক্ষতবীর্য্যমান জাতি হিন্দুর উপরে, মুসলমানের আক্রমণের ন্যায়, বারংবার ধাবিত হইতে থাকে। পৃথ্বীরাজের সহিত বিবাদ করিয়া জয়চন্দ্র যেমন সাহেবুদ্দিনকে আহ্বান করিয়াছিলেন, গুজরাটের মুসলমান-রাজ যেমন মারহাট্টাদিগের সাহায্য

গ্রহণ করিয়া শক্তি হারান, তদ্রূপ, ব্রিটিশ বল ভিক্ষা করিয়া পরিশেষে আহোমরাজ আপনার রাজ্য ও আপন জাতির মর্য্যাদা লুপ্ত করিয়াছেন।

অন্যের ক্ষমতার উপর নির্ভর করিয়া কেহ অধিক দিন তিষ্ঠিতে পারে না। কর্ম্ম না থাকিলে অকর্ম্মণ্য হইতে হয়। পরিশ্রম করিবার প্রয়োজন থাকা চাই, শ্রমবিমুখ অকর্ম্মণ্যেরা আপন ক্ষমতার অপব্যবহার করে ও তদ্দারা ধ্বংস প্রাপ্ত হয়।

আহোমরাজবংশ অকর্ম্মণ্য হইয়াছিল; সুতরাং অত্যাচারপরায়ণ না হইবে কেন? মোয়ামরিয়া সম্প্রদায় বৈষ্ণব মতাবলম্বী ছিল; বলপূর্ব্বক তাহাদিগকে শাক্ত করিবার জন্য বলিদানে ছিন্ন পশুর রুধির দ্বারা উহাদের ললাটে তিলক অঙ্কিত করিয়া দেওয়া হইল। এবংবিধ রাষ্ট্রনীতি বিরুদ্ধ নানা কার্য্যে উৎপীড়িত হইয়া, প্রজাকুল বিদ্রোহী হইয়া উঠে। তাহাতে "মানর উপদ্রব" বদ্ধমূল হইতে পারিয়াছিল।

উচ্চ ব্রহ্ম হইতে প্রভূত সাহসী বৌদ্ধ শান জাতীয় যোধগণ আগমন করিয়া কামরূপে, যোগ্যতরের সংরক্ষণ নিয়মানুসারে আধিপত্য সংস্থাপন করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু পরে তাঁহারাই অযোগ্য হইয়া উঠিলেন। ইহাদের আহম নাম হইবার কারণ কি, জানি না। তাঁহাদের ইতিহাসকে বুরঞ্জি কহে; উহা শান-ভাষায় লিপিবদ্ধ। তৎকালের পুরোহিত বংশে অদ্যাপি বৌদ্ধত্ব বিদ্যমান। আমার পরিচিত গোঁহাই মহাশয়ের আকৃতি ব্রহ্মদেশীয়। তদীয় কন্যা ক্ষীরোদা বাঙ্গালীর মত হইয়াছে। মধ্যযুগে আহমরাজগণের হিন্দু নামের সহিত একটি করিয়া শান আখ্যা মিলে। যথা সুহিতপাঙ্কফা বা গৌরীনাথ সিংহ, সুদিনফা বা চন্দ্রকান্ত সিংহ ইত্যাদি। সুকাফা হইতে পুরন্দর সিং পর্য্যন্ত রাজ্যভোগ কালে ছয়শত বৎসর হইয়াছিল। বড়ুয়া, গোঁসাই, গোহাই, ফুকন প্রভৃতি উপাধিগুলি আহমরাজ প্রদত্ত। আমি শিবসাগর যাইতে পারি নাই। সেই

উপাধিগুলিতেই সেই রাজকীর্ত্তির নিদর্শন দেখিয়া ক্ষান্ত হইলাম। তবে কাশীধামে চন্দ্রকান্তের খুল্লতাত কর্ত্তৃক ষষ্টি সহস্র মুদ্রা ব্যয়ে নির্ম্মিত কামরূপের মঠ দেখিযাছি। গোঁহাইএর পরামর্শ ভিন্ন রাজা রাষ্ট্রসম্বন্ধী কোন কার্য্য করিতে পারিতেন না। গোঁহাইএর অধীন থাকিয়া বড়ুয়া সামাজিক ও সৈনিককার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। ইহাতে রাজার একাধিপত্য প্রবলভাব ধারণ করিতে পারিত না। রাজা দণ্ডশক্তি পরিচালনা করিতেন। নাসাকর্ণচ্ছেদন প্রভৃতির ব্যবস্থা ছিল। দেশস্থিতি-রীতিপ্রকরণে ইংরাজ অপরাধীর দণ্ড লঘু হইতেছে দর্শন করিয়া এখন আমরা ক্ষুব্ধ হই। ইংরাজের ব্যবহার শাস্ত্রে কিন্তু জাতিবিশেষের জন্য দণ্ডের তারতম্য নাই। কারণ এখনকার আদর্শ সাম্য। ভৃগু মনুস্মৃতি স্মরণ করিয়া বলিয়াছেন, ব্রাহ্মণ যদি শূদ্রকে বধ করে, তবে বিড়াল-কুক্কুরঘাতের ন্যায় তাহার জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিবে। আহোমরাজ্যে ব্রাহ্মণের দণ্ড উক্ত নিয়মানুসারে অতি লঘু হইত। ন্যায় ও উদারতা না থাকিলে, রাজ্যমাত্রেই শীঘ্র বা বিলম্বে ধ্বংস লাভ করে।

আহোম জনসংখ্যা ১৭৮০০০। পুরোহিতশ্রেণীর লোককে শীঘ্র স্থিতিশীলতা ত্যাগ করিতে দেখা যায় না। আহোমদিগের পূর্ব্বগুরু দেওধাইগণ প্রেততুষ্টির জন্য পশুবলি ও ডিম্বস্ফোটন করিয়া ক্ষান্ত হন। আহোমরাজ নব মতে দীক্ষিত হইয়া মনুষ্য ক্রয় করিয়া কামাখ্যা সান্নিধ্যে বলি দিয়াছেন; তাঁহার পোষ্যগণ বৃত্তি পাইত। আহোমজাতির বিবাহ অদ্যাপি পূর্ব্বতন নিয়মে অনুষ্ঠিত হয়।

আহোম ইতিহাস আলোচনা করিয়া, অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ সম্বন্ধে দৃষ্ট হইল, কর্ম্মক্ষেত্রে "সর্ব্বং কার্য্যবশাৎ জনোঽভিরমতে কস্যাস্তি কো বল্লভঃ।" যে জাতিকে সমাজ এক সময়ে ক্ষত্রিয়ের সম্মান দিয়াছিল, অধুনা তাহাদের ক্ষমতালোপ পাওয়ায়, তাহাদের স্পৃষ্টজল পর্য্যন্ত গ্রহণ করিতে সে অসম্মত।

ব্রিটিশরাজ যাহার শত্রু দমন করিতে আসিয়াছিলেন, তাহারই বংশধর এক্ষণে সিংহাসনচ্যুত। যাঁহাকে এখন একমাত্র উত্তরাধিকারী বলা হয়, তিনি অনুগ্রহের ভৃতি মাসিক ৫০৲ পঞ্চাশ টাকা ত্যাগ করিয়া, শিলঙে ১৫০৲ দেড়শত টাকা বেতন গ্রহণ করিয়া সাধারণ কর্ম্মচারী হইয়াছেন। "যথাত্মনঃ প্রিয়াঃ প্রাণাঃ সর্ব্বেষাং প্রাণিনাং তথা"। ইহা ধর্ম্মক্ষেত্রের কথা; কর্ম ও ধর্ম্মে সামঞ্জস্য বিধানেই মনুষ্যত্ব! তাহাই শ্রেয়ঃ।

আহোমদের গ্রাম্যদেবতার সহিত বঙ্গের গ্রাম্যদেবতার ঐক্য আছে। গোয়ালপাড়ায় বিষহরি বা মনসা, শুবচনী বা সুবচনী পূজিতা হন। গারো ও মেচ জাতি সিজু বা মনসাবৃক্ষের পূজা করে। নাগপূজা ভারতের সর্ব্বত্র বিদ্যমান আছে। মনসাবৃক্ষের পূজা বাঙ্গালী ভিন্ন কেবল গারোদের মধ্যে দেখিয়া, উভয় জাতিতে যে কোন সংস্রব আছে, তাহা অনুমেয়। আমাদের ক্রিয়াকলাপ, বৈবাহিক বেশ ও স্ত্রী-আচার প্রভৃতির মধ্যে অনেক ইতিহাস প্রচ্ছন্নভাবে রহিয়াছে। উত্তরায়ণ সংক্রান্তি (পৌষপার্ব্বণ) দিনে করণীয় 'বিহু'তে কামরূপে বাঙ্গলার মত পিঠা প্রস্তুত হইয়া থাকে। হিন্দুস্থানীদের মধ্যে পিষ্টক প্রস্তুত করিবার নিয়ম নাই। আহোমিয়া জাতির সংস্পর্শে আমরা বা আমাদের সংস্পর্শে তাহারা তাহারা এই প্রথা প্রাপ্ত হইয়া থাকিবে।

সত্যশ্রবা কহিয়াছেন, কোচ জাতির জলস্পর্শ করিলে, অপবিত্র হইতে হয়। রিজ্‌লি কহেন, ব্রাহ্মণে তাহাদের স্পৃষ্টজল গ্রহণ করেন। ইহাতে বিদেশী লেখকের উক্তির প্রতি অনাস্থা জন্মিবার সম্ভাবনা। আমি এতদ্দেশে আসিয়া বিদেশীর অনুসন্ধান কার্য্যের সত্যতা প্রত্যক্ষ করিলাম। কাশী ও নবদ্বীপে কোচের দান-গ্রহণ নিষিদ্ধ নহে। আসামে যতগুলি জাতি আছে, তন্মধ্যে জনসংখ্যায় কোচদের ভাগ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। ইহারা সংখ্যায় ২,২১,০০০ গণিত হইয়াছে। যোগিনীতন্ত্রে প্রকারান্তরে ইহাদিগকে ম্লেচ্ছ

বলা হইয়াছে। বাঙ্গালায় এই জাতীয় রাজা ও ত্রিপুরাধিপ স্বাধীন নৃপতি-রূপে আমাদের গৌরব বৃদ্ধি করিতেছেন। কোচরাজ-বংশের সহিত এখানকার বেলতলারাজ সংশ্লিষ্ট; কোচবংশ কামরূপে দুইশত বৎসর রাজ্য করিয়াছিলেন। আহোমদিগের সহিত তাহাদিগকে সংগ্রামে লিপ্ত হইতে হইয়াছিল। কাছাড়ী, লালুং, মিকির ও অন্যান্য জাতি হিন্দু হইবার পূর্ব্বে কোচ্ হইয়া পড়ে; অন্যদিকে উত্তরবঙ্গে সামাজিকসম্মানে কোচ্ জাতি হীনতা লাভ করায়, রাজবংশী নাম গ্রহণ করিয়াছে। কোচদিগের পূর্ব্ব-ভাষা লুপ্ত হইয়াছে; যাহা অবশিষ্ট আছে, তাহা গারো ভাষার তুল্য। পূর্ব্বে কোচ্ ও মেচজাতিতে বিবাহ হইত; কোচগণ হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করায়, তাহা অধুনা রহিত হইয়াছে। এরূপ পরিবর্ত্তন কেহ নিবারণ করিতে পারে না। অক্ষর রূপান্তর করিতে কোন ব্যক্তি প্রয়াসী হন না; অথচ পূর্ব্বের অক্ষর হইতে এখনকার বর্ণমালা কেমন বিভিন্ন আকার ধারণ করিয়াছে। সুবিধার সহিত ঘনিষ্ঠতা মিশ্রিত হইলে, পরিবর্ত্তন অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে। এইরূপে আর্য্যীকরণে গৃহীত অসংখ্য মানব অনার্য্য ভূভাগকে আর্য্যভূমিতে পরিবর্ত্তিত করিয়াছে। কুচবেহারাধিপতিকে এক্ষণে আমাদের বঙ্গাধিপ বলিয়া সম্মান করা কর্ত্তব্য।

উত্তরবঙ্গে কাছাড়িজাতি মেচ্ নামে প্রসিদ্ধ। কামরূপে মেচ্ বংশীয় রাজগণ গৌরবাস্পদ আর্য্যধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন। পূর্ব্ব কাহিনীতে সুখসম্পদ ও গৌরবের ঔজ্জ্বল্যের চিহ্ন না থাকিলে, তাহার সংস্রব রাখিতে কেহ যত্নবান হয় না। ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে অত্রত্য রাজা কৃষ্ণচন্দ্র আপনাদের ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপন্ন করিতে গিয়া মধ্যম পাণ্ডব ভীমসেনকে আদিপুরুষ বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন। নওগাঁ প্রদেশের বর্ত্তমান ডীমাপুর কাছাড়ের প্রাচীন রাজধানী হিড়িম্বপুর বলিয়া অনুমিত হয়। এই রাজবংশীয় জাতি আসামের সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন অধিবাসী; তাহাদের অপর

নাম বোদো। নরকাসুর, বোধ হয়, এই জাতীয় ছিলেন। শেষপর্য্যায়ে তিনশত বৎসর আসামে ইহাদের রাজ্য হইয়াছে। বসুন্ধরা কাহারও নহে; তথাপি তৎকালের প্রতিদ্বন্দ্বী আহোমরাজগণ সহ ইহাদিগকে বৈরতা করিতে হইয়াছিল।

শ্রীহট্টের দিকে অবতরণ করিলে, আমরা তাম্রনির্ম্মিতা জয়ন্তীশ্বরী কালিকা দর্শন করিয়া যাইতে পারিতাম। ইহা কামাখ্যার ন্যায় সতীর এক-পঞ্চাশৎ পীঠের অন্যতর স্থান। ভাষা ও আকৃতিতে খস ও জয়ন্তী জাতির প্রভেদ নাই। খাসিগণ পর্ব্বতের উপর, কিন্তু জয়ন্তীয়ারা সমভূমিতে বাস করে। ইহাদের গ্রাম্যশাসনে খসদিগের ন্যায় প্রতিনিধি-প্রণালী বর্ত্তমান আছে। পূর্ব্ব ধর্ম্ম বোধ হয় ইহারা ত্যাগ করে নাই। জয়ন্তীরাজ ব্রাহ্মণ্য-মত গ্রহণ করিয়া ঘোর শাক্ত হইয়াছিলেন। পর্ব্বত রায় হইতে রাজেন্দ্র সিংহ পর্য্যন্ত ৩৩৫ বৎসর কাল (১৫০০—১৮৩৫ খৃষ্টাব্দ) আসাম তাঁহাদের করতলস্থ ছিল।

একজন কহিয়াছেন, আমি দেশের স্থানীয় বিবরণ অপেক্ষা তাহার অধিবাসীর প্রতি অধিক মনোনিবেশ করিয়া থাকি। এক্ষণে আমার ভ্রমণ-বৃত্তান্ত, ক্রমে ঐতিহাসিক বৃত্তান্তে পরিণত করিতেছি। যাহা হউক, জাতি-তত্ত্ব কেবল আকৃতি দ্বারা নির্ণীত হয় না; পুরাবৃত্ত দ্বারা সপ্রমাণ হয়। অধিবাসীর পরিচয়কল্পে ইহার যৎকিঞ্চিৎ আভাস প্রদান করা আবশ্যক।

অধুনা কালিকাপুরাণোক্ত নরবলির অনুষ্ঠান দ্বারা জয়ন্তীশ্বরীকে প্রসন্ন করিবার কোন উপায় নাই। জয়ন্তীরাজের আধিপত্য কালে নবরাত্রির সময়, রাজপুত্রের জন্মোৎসবে, বা কোন ইষ্টসিদ্ধি ঘটিলে নরঘাত অবশ্য-ম্ভাবী ছিল। পারলৌকিক শুভ-কামনায় স্বেচ্ছা-প্রণোদিত হইয়া প্রায়শঃ হন্তব্য ব্যক্তি বলিরূপে আত্মোৎসর্গ করিতেন। এই মহাত্যাগী পুরুষের

সদসৎ সর্ব্বপ্রকার বাঞ্ছা পূর্ণ করিতে কেহ আপত্তি করিত না। সম্মত ব্যক্তি স্বভাবসিদ্ধ প্রাণভয়ে পলায়নপর হইলে, রাজা অপরের অধিকৃত স্থান হইতে কাহাকেও ধৃত করিয়া কার্য্য সমাধা করিতেন। ইংলণ্ডীয় সাম্রাজ্যের সহিত জয়ন্তীরাজের সংস্রবকালে, ঐ প্রকার অপরাধ ঘটিয়াছিল, এই হেতুবাদে জয়ন্তীভূমি বৃটিশরাজ্য-ভুক্ত হইয়াছে।

ইংরাজ শাসনকর্ত্তৃগণ নরবলির আত্মতন্ত্রানুযায়ী ব্যাখ্যা গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হন নাই। ইহাতে কামরূপে জনপদগণের জীবন নিরাপদ হইয়াছে। আত্মদোষ উপলব্ধি করিবার ক্ষমতা লোকের অতি অল্পই থাকে। রাজতন্ত্রে ত্রুটি ঘটিলে, উদ্দাম নৃপতির পক্ষে তাহার সংশোধন অসম্ভব হইয়া পড়ে। তখন প্রকৃতিপুঞ্জের মধ্যে ঘোর অসন্তোষ বৃদ্ধি পায়। বলপূর্ব্বক নরবলি দেওয়া অতি গর্হিত; রাজা ইহাতে লিপ্ত হইলে, তাঁহার পতন নিতান্ত বাঞ্ছনীয় হইয়া উঠে। সে স্থলে স্বদেশী রাজ্য অপেক্ষা বিদেশী রাজ্য কে না প্রার্থনীয় জ্ঞান করিবে?

ভারতে বৈষম্য-স্রোত নানাভাবে প্রবল হইয়াছিল। রাজন্যগণের স্বেচ্ছাচারিতা, প্রচণ্ড দণ্ডশক্তি, ন্যায়মার্গচ্যুত পারমার্থিকতার প্রাবল্য ও বহুকাল যাবৎ শান্তি-সম্ভোগ প্রভৃতি কারণে অকর্ম্মণ্যতা আসিয়া, আমা-দিগকে পরাধীন করিয়াছে। আমরা যাঁহাদের অধীন, তাঁহারা বিদেশী; সুতরাং উভয়ের স্বার্থ বিভিন্ন; ইহাতে ইংরাজশাসনে ত্রুটি থাকা সম্ভব-পর। ভারতবাসী ইংরাজকে স্বরাষ্ট্র প্রদান করিয়া, নানাপ্রকারে উপকৃত হইয়াছে, তদ্রূপ ভারতের দ্বারা ইংরাজেরাও উপকৃত হইয়াছে; পরস্পরের সাহায্যে মানবজাতি ক্রমশঃ উন্নত হইতেছে। ইংরাজ বৈশ্য জাতি; তাঁহারা যে ধন-লোলুপ হইবেন ইহা বিচিত্র নহে; আমাদের রাজা বৈশ্যজাতীয় না হইলে, দেশের ধন ক্ষত্রিয়ের বুদ্ধিতে এবম্প্রকারে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইত না। ইংরাজশাসনের গুণ ও দোষ বর্ণনকালে, গুণ এক পৃষ্ঠা ও

দোষ চারিশত পৃষ্ঠা লিখিয়া, আমরা দেশানুরাগের পরিচয় দিতেছি. ইহাতে অনেকের ভ্রান্ত ধারণা হইতেছে। বস্তুগত্যা অনুকূল অবস্থার সাহায্যে দেশের সুখসমৃদ্ধি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। যে পরিমাণে সময়ের গুণে বর্দ্ধমান হওয়া সম্ভাবিত, তাহার ক্রটি ঘটায় সকলে প্রমাদ গণিতেছেন। এরূপ হওয়াই উচিত; নহিলে জাতীয় জীবনী শক্তির হ্রাস হইতে পারে। কৃতজ্ঞতা মনস্বিতার পরিচায়ক। অতএব আমাদের ইংরাজ শাসনের গুণের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ বিধেয়। দেশী বা বিদেশী হউক, প্রতিনিধি-প্রণালীর শাসন সংস্থাপিত না হইলে, প্রজার কল্যাণ নাই। অনন্যসাধারণ বৈষম্যের লীলাভূমি ভারতবর্ষে বৃটিশ সহায়তা ব্যতীত তাহা সাধিত হওয়া অসাধ্য। নবতন্ত্রের কথায় প্রজাশক্তিকে দেশের নিয়ন্তা করিবার কল্পনা হইয়া থাকে। একচ্ছত্র রাজশক্তির অভাবে. ভারতের ন্যায় বিভিন্ন জাতি, বিভিন্ন স্বার্থ, এবং সমবেদনাহীন প্রজাশক্তি কার্য্যকরী হইবে না। রাজশক্তি ও প্রজাশক্তির সামঞ্জস্য থাকিলে, আমাদের উন্নতির অন্তরায় দূর হইবে; ইহাই এদেশের উপযোগী। রাজশক্তি এখন সাম্রাজ্যবাদের কুহকে প্রজাশক্তিকে বিনষ্ট করিতে সঙ্কল্প করিয়াছে; অতএব আমাদের আত্মনির্ভরশীলতার উদ্রেক করিতে হইবেক।

সে কালের আসাম ও একালের আসামে তুলনা করিলে, আধুনিক সময়ে সকল বিষয়ে উন্নতি দৃষ্ট হইবে। জগৎ ক্রমে সভ্যতার দিকে অগ্রসর হইতেছে। বিভিন্ন জাতির পরস্পর সাহায্য সমৃদ্ধির মূল। বণিকরাজ ইংরাজ কামরূপে তাহার নিমিত্ত মাত্র। আসামীরা পূর্ব্বে নাগাদের মত ছিল; পরে বাঙ্গালীর সংস্রবে সভ্যতা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করে।

কামাখ্যায় যাহারা স্বেচ্ছাক্রমে বলি হইবার জন্য প্রস্তুত হইত, তাহাদের কোন প্রকার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করা অবৈধ ছিল না; ভোগিগণ

লাম্পট্যকে আদরের বিষয় মনে করিত। তান্ত্রিক পণ্ডিতগণ প্রকৃতির উৎপাদনক্রিয়াকে স্ত্রী আকারে শক্তি ও ক্ষমতাশূন্য স্রষ্টা বা পুরুষকে পুং আকারে সম্মিলিত করিয়া, তাহার মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করত অদ্বৈতভাব প্রদর্শন ও আত্মতত্ত্বের ব্যাখ্যা পূর্ব্বক বন্যভাবের সহিত সভ্যভাবের সমন্বয় করিয়া থাকেন।

আমরা আপনার অস্তিত্বে বিশ্বাস না করিয়া থাকিতে পারি না। সুতরাং আমরা যাহার অধিক বুঝি না, তাহা সত্য; এইজন্য দার্শনিক ধার্ম্মিক প্রভৃতি বহু আয়াসে আপন মত প্রচার করিতে ব্যস্ত। যদি কোন স্থানে অসঙ্গতি পরিদৃষ্ট হয়, তন্নিবারণ-কল্পে বিধিমতে যত্ন হইয়া থাকে; শাক্ত বৈষ্ণবের যেস্থলে পশুভাব আছে, তথায় দেবত্ব স্থাপনের জন্য সাঙ্খ্যবেদান্ত আশ্রয়স্থল; ইহার মূলে মনুষ্যের আত্মাদর প্রবৃত্তি কার্য্য করিতেছে। আত্মতত্ত্ব অতি জটিল।

স্বকীয় মনোভাব অনেক সময় পরিষ্কার করিয়া বুঝা কঠিন। জনসাধারণের মনের গতি স্থির করা তদপেক্ষা দুরূহ। চিত্তের দ্বারা চিত্ত পরীক্ষা করিলে বিশুদ্ধ হইবার সম্ভাবনা কোথায়? মনুষ্য এখন তিন বৎসর বয়সে আরম্ভ করিয়া ১৫ বৎসর বয়ঃক্রম কালে যে জ্ঞান প্রাপ্ত হয়, তাহা উপার্জ্জন করিতে মানবজাতিকে বহু সহস্রবর্ষ তপস্যা করিতে হইয়াছিল। আমরা উত্তরাধিকারিতার ফলে অল্প দিনে তাহা লাভ করিতেছি। মনুষ্যের যতপ্রকার জ্ঞান আছে, তাহার সকলগুলি লইয়া আত্মজ্ঞান। বর্ণজ্ঞান সম্বন্ধে পণ্ডিতেরা কহেন, ৩০ সহস্র বৎসরের ন্যূন-কল্পে মানব জাতি ইহা অর্জ্জন করিতে পারে নাই। জাতিস্মর শিশু পঞ্চ বা ষষ্ঠ বৎসরে এখন তদ্‌গুণশালী হইতেছে। বর্ণজ্ঞানের পরে গন্ধজ্ঞানের উৎপত্তি; শৈশবের কোন্ সময় মনুষ্য তাহা লাভ করে, অদ্যাপি তাহা নির্ণীত হয় নাই। সঙ্গীতজ্ঞান পঞ্চ সহস্র বৎসরের অনুশীলনের ফল।

পূর্ব্বপুরুষের পুণ্যে যুবক ১৫ হইতে ২০ বৎসর বয়সের মধ্যে তাহাতে সিদ্ধি লাভ করে। নীতিজ্ঞান অর্জ্জন করিতে নৃসমাজকে অযুত সম্বৎসর পরিশ্রম করিতে হইয়াছে। পূর্ব্বজন্মের কর্ম্ম ফলে বা উর্দ্ধতন পুরুষের অনুশীলন প্রভাবে এখন আমরা পঞ্চদশ বর্ষ বয়সে সেই ধন লাভ করি। এবংবিধভাবে সুদীর্ঘকালে লব্ধ বিভিন্ন বোধের আধার আপন অস্তিত্বকে নিতান্ত অভ্রান্ত জ্ঞান করা অসঙ্গত।

কামরূপে নারীজাতির পাতিব্রত্য সম্বন্ধে শিথিলতা ও তান্ত্রিক অভিচার-ক্রিয়ার প্রাদুর্ভাব বশতঃ পূর্ব্বকালে বঙ্গে নানা গ্লানিসূচক জনশ্রুতি প্রচলিত হইয়াছিল। বাঙ্গালা ব্যতীত ভারতের সর্ব্বত্র দ্বিজেতর জাতির মধ্যে ভিন্ন বিধবার বিবাহ প্রচলিত আছে। অধিকন্তু আসামে বৈধ বিবাহের প্রচলন স্বল্প; তজ্জন্য দাম্পত্যবন্ধন ছেদন করা দুরূহ হয় না। অনার্য্যগণ আর্য্যাকরণে গৃহীত হইয়া, বিবাহ সম্বন্ধে পূর্ব্বতন আচার সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করিতে পারে নাই। "আগচালুয়া" বিবাহে সমাগত জনকে পান সুপারি দেয়, ইহা অভিভাবকের বিনা অনুমতিতে সম্পন্ন হইতে পারে। "গুড় পিঠা-খোয়া-বিবাহ" বর-কন্যার সম্মতি-সাপেক্ষ; বর কন্যাকে "রিহা ও মেখলা" নামক বস্ত্র, মাদুলি প্রভৃতি অলঙ্কারসহ প্রদান করিলে সম্বন্ধ স্থির হয়। কন্যাকর্ত্তা গ্রামিকদিগকে আহ্বান করিয়া চিপিটক ও গুড় প্রদান করে। স্বর্ণকার, কুম্ভকার, নাপিত, কর্ম্মকার, নট, কাটানি প্রভৃতি জাতির মধ্যে উক্ত প্রকারের বিবাহ-প্রণালী প্রচলিত। ঐ সকল জাতির সাধারণ নাম ছোটকলিতা। শাস্ত্রীয় ভাষায় ছোটকলিতার বিবাহকে গান্ধর্ব্ব বিবাহ বলিতে হইবে।

ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, গণক ও বড়কলিতা "হোম জ্বালানি" বা প্রাজাপত্য প্রণালীতে বিবাহ করেন। সে বিবাহ বিচ্ছিন্ন হয় না। ছোট কলিতারা এই প্রণালীতে বিবাহ করা এখন শ্রেয়ঃ জ্ঞান করিতেছেন। ব্রাহ্মণ

কায়স্থেরা অবশ্য বিদেশী। বড়কলিতা ও কায়স্থে অসবর্ণ বিবাহ হইয়া থাকে। কায়স্থের সংখ্যার ন্যূনতাই ইহার কারণ। কলিতা বড় ও ছোটতে প্রভেদ কি, আমরা বুঝিতে পারি না। জীবেশ্বর মৌজাদার কহিয়াছেন, "ভারবহন ও হলচালন ত্যাগ করিলে ছোট লোক বড় হয়।" ছোট বড় বিশেষণ দ্বারা উভয়ের একজাতিত্ব প্রতিপন্ন হইতেছে। বাঙ্গালীকে কলিতা অর্থে কায়স্থ বুঝাইবার চেষ্টা করিতে দেখিয়াছি; তাহার ইতিহাস পর্য্যন্ত আছে। পরশুরামের ভয়ে যে সকল ক্ষত্রিয় অজ্ঞাতবাস করিতেছিলেন, তাঁহারা "কুললুপ্তা" বা কলিতা নামে প্রসিদ্ধ। গান্ধর্ব্ব বিবাহ ছেদনার্থ কখন কখন ধর্ম্মাধিকরণে অভিযোগ উপস্থিত হইয়া থাকে। ত্রিপুরা ও কুচবিহার রাজপরিবারে বিবাহপ্রণালীর বৈধতাকে সূত্র করিয়া, ব্রিটিশরাজ উত্তরাধিকারী নির্ণয় করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, গান্ধর্ব্ব বিবাহের জটিলতা হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য, আসামীরা প্রাজাপত্য বিবাহের আশ্রয় লইতেছে। গান্ধর্ব্ব বিবাহে কন্যা বয়স্থা হইলেও চলে, কিন্তু প্রাজাপত্য বিবাহে কন্যার অল্প বয়সে বিবাহ-সংস্কার অবশ্যম্ভাবী। গান্ধর্ব্বে বৈদিক মন্ত্রের পরিবর্ত্তে মাতৃভাষায় দম্পতিকে উপদেশ প্রদত্ত হয়। আমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ যৌতুক প্রদান করিলে, কন্যাকর্ত্তা তাঁহাদিগকে বস্ত্রাদি প্রদান করিয়া সম্মানিত করেন।

ব্রাহ্মণকুমার হস্ত্যশ্ব বা শিবিকায় আরোহণ করিয়া বিবাহ করিতে যান; ঢোল করতাল বাজিতে থাকে; পুরস্ত্রীগণ মঙ্গলগীত করিয়া, সমভিব্যাহারে যাত্রা করেন; বরযাত্রিকদিগের কেহ কেহ হস্তীতে আরোহণ করিয়া থাকেন। দিবাভাগে বিবাহ হইবার আপত্তি নাই। স্বর্ণসূত্রখচিত শ্লথ উপানৎ-ধারী বর ধুতি চাদর পরিয়া অলঙ্কারে সজ্জিত হইয়া, বনাত বা শাল সহযোগে গাত্র আবরণ করিয়া, মস্তকে উষ্ণীষ প্রদান করেন। ব্রাহ্মণ আপন বিশুদ্ধতা রক্ষার মানসে নিকট সম্পর্কীয় ব্যক্তি ভিন্ন ভোজ্যান্নতা

রক্ষা করিতে অক্ষম; এজন্য চিপিটকের অনুরূপ জলসিক্ত "বোকা" তণ্ডুল, দধি ও কদলী সহ ভোজন করিয়া কুটুম্বকে প্রীত করিয়া আসেন।

একদা খাসি পল্লীতে পরিভ্রমণ করিতে যাইয়া, শিলাহট্টবাসী জনৈক বাঙ্গালীর সহিত পরিচিত হইলাম। তিনি এক খস রমণীকে ব্রাহ্মমতাবলম্বিনী করিয়া বিবাহ করিয়াছিলেন। তাহার গর্ভজাত সন্তান খস-আবরণ-বস্ত্র পরিধান করিয়া, বিচরণ করিতেছে, দৃষ্ট হইল। বর্ত্তমান সময়ে বাবুটি খ্রীষ্টান হইলেও, শর্ম্মা উপাধি পরিত্যাগ করিতে পারিতেছেন না। অধিকন্তু রাজপ্রতিনিধির সমধর্ম্মা হইয়াছেন বলিয়া সুখী হইতেছেন। বঙ্গপল্লীর শিখর ভাগে উত্থিত হইয়া, অন্যদিন দেখিয়াছি, খ্রীষ্টীয় ভজনালয়ে আচার্য্য উপাসকের অভাবে একাকী স্বীয় কর্ত্তব্য বোধে যথাসময়ে সুসমাচার প্রচার করিতেছেন। সেই পার্ব্বত্য স্থানের নিম্নে স্রোতস্বিনী-বক্ষে সেতুর উপর দণ্ডায়মান হইয়া, হরিসভায় যোগ দিবার জন্য জনসমাগম দর্শনে আমার মনে হইল, আত্মাদরের কি মোহিনী শক্তি! ইহার প্রভাবে খ্রীষ্টান হিন্দুকে ধর্ম্মশিক্ষা দিতে চায়।

শিলঙ শৈলের পথ সিমলা ও দারজিলিঙ্গের ন্যায় প্রৌঢ় লোকের পক্ষে ক্লেশদায়ক নহে। যদৃচ্ছাক্রমে কদাচিৎ রক্তিম পথে বিচরণ করিতে গিয়া, পথিপার্শ্বে ঘনসন্নিবিষ্ট সরলদ্রুমের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলাম। সুরঞ্জিত অয়ঃ-পত্র নির্ম্মিত বহুচূড়া-সমন্বিত ইউরোপীয় সুবৃহৎ হর্ম্ম্য নয়নপথগামী হইল। অহো, আমি রাজপ্রাসাদের অঙ্গনে প্রবেশ করিয়াছি! ইতস্ততঃ না করিয়া একেবারে চলিয়া যাইতে পারিলে, কেহ বাধা দিতে সাহস করে না; সেই জন্য গুরখা প্রহরী আমাকে কিছু বলে নাই; সে সদর্পে স্কন্ধে যন্ত্র রক্ষা করিয়া, স্বীয় পাদচারণায় মনোনিবেশ করিয়াছিল। আমি আর অগ্রসর না হইয়া, হ্রদের দিকে অবতরণ করিতে লাগিলাম। মহামতি কটন এই স্থানকে উপবনে পরিণত করিয়া গিয়াছেন।

ইহাই এখানকার সবিশেষ দর্শনীয় স্থান। স্থতলে বাপীর উপর সেতু দর্শন করিয়া তদুপরি যাইতে ইচ্ছা হইল। তথা হইতে বারিপাত উচ্ছ্বাসিত অবরোধ দৃষ্ট হইলে, তদুদ্দেশে ধাবিত হইলাম। পার্শ্ববর্ত্তী পথগুলিতেও ভ্রমণ করিয়া তৃপ্ত হইতে বাসনা হইল। যাহাতে আকৃষ্ট করে, তাহার সকলই মনোরম বোধ হয়। উপরে দেখিতেছি, কর্ত্তিত তৃণাচ্ছন্ন মসৃণ হরিদ্‌বর্ণের ক্রমাবনত ভূমি, অধোদেশে হরিতের মধ্যে বঙ্কিমা বিস্তার করিয়া কুসুমিকার পার্শ্বে রেখার মত শীর্ণবর্ত্ম জনহীন হইয়া মধুরতার নিকেতন হইয়াছে। এবার অন্য পথ আবিষ্কার করিয়া স্বকীয় কুটীরে উপনীত হওয়া গেল।

শ্লেষ্মার আতিশয্য দেখিয়া সত্বর শৈল পরিত্যাগ করিলাম। বাষ্পীয় তরণী হইতে গোয়ালপাড়ার পর্ব্বতের সৌন্দর্য্য দেখিয়াছি, স্মরণ আছে। প্রত্যাগমনকালে জগন্নাথগঞ্জে পাটের ক্ষেত্র-মধ্যস্থ ভোজন-গৃহে আহার করিয়া বুঝিলাম, ম্যালেরিয়া দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছি। তদনন্তর নারায়ণগঞ্জ হইতে কখন গোয়ালন্দে উত্তীর্ণ হইলাম, তাহা স্মৃতিপথারূঢ় হয় না। আসাম অস্বাস্থ্যকর জ্ঞানে ভ্রমণ বিলম্বিত করিয়া আশঙ্কিত ফল দ্রুত লাভ করিয়াছি।

হিমালয়।

রাওলপিণ্ডি হইতে বুটামলের করাচি গাড়ীতে যাত্রা করা হইল। এক প্রহরের মধ্যে হিমালয় পর্ব্বতে উঠিলাম। পরিচিত বৃক্ষ আর দেখা যায় না; পথ পর্ব্বতের গাত্র দিয়া বাঁকিয়া বাঁকিয়া চলিয়াছে। রাত্রিকালে বলীবর্দ্দ পরিবর্ত্তনের জন্য এক স্থানে (তাহার সীমান্ত প্রদেশে) শকট-চালক আমাদিগকে ফেলিয়া চলিয়া গেল। অন্য কোন ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি আসিল না। এদিকে মুসলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হইল। শীত নিবারণ করা দুষ্কর হইয়াছিল। আমরা জনসমাগমশূন্য ঘোর অন্ধকার রাত্রিতে পর্ব্বতের মধ্যে অবিশ্রান্ত প্রবল বৃষ্টি ও বিদ্যুদ্গর্জ্জনে উৎকণ্ঠায় যাপন করিতে লাগিলাম। জীবনে একটা ঘটনা-বৈচিত্র্য পাওয়া গেল।

মরি-শৈলের সমৃদ্ধি শুনা ছিল। কিন্তু পরদিন দিবাভাগে আমরা দেখিলাম, যেন কোন নিদ্রিত জনপদে আসিয়া পৌঁছিয়াছি। ভাবটা বড় বিষণ্ণ। আকাশে সূর্য্য নাই, বৃষ্টিতে পথ আর্দ্র। পথে মনুষ্য-সমাগম নাই। পর্ব্বতের বিভিন্নতলে ইংরাজি গৃহগুলি দ্বার বদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু অতি নিকটে নিকটে চিঠি দিবার জন্য স্তম্ভ বর্ত্তমান আছে। ইহাতে বোধ হইল, কোনসময়ে এই স্থান বিলক্ষণ জনশালী ছিল। আমাদিগকে যে স্থানে শকট পরিত্যাগ করিতে হইল, তথায় নামিয়া কিছু জিজ্ঞাসা করিব, এমন লোক দেখিতে পাইলাম না। যদি বা কেহ মিলিল, সে বলে, 'উপরে যাও বা বাজারে সন্ধান কর'। উপর কাহাকে বলে, বুঝিতে পারিলাম না। একটা আপিসে ঢুকিয়া পড়িলাম; জিজ্ঞাসা করিলাম, 'এখানে কি কোন বাঙ্গালী কর্ম্ম করেন?' তাহাতে যাঁহার সাক্ষাৎ পাইলাম,

তিনি লোক দিয়া আমাদিগকে গন্তব্যস্থানে পাঠাইলেন। তখনও ভিজিতে ভিজিতে উপরের সরল ও প্রশস্ত পথে উঠিলাম। দেখি সকল দোকানই বন্ধ। তাহার নীচে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র দেব মজুমদারের বাটীতে উপস্থিত হইলাম। আহারাদি করিয়া গৃহসম্মুখস্থ ছাদের উপর গিয়া দাঁড়াইলাম। তখন আকাশ পরিষ্কৃত। সম্মুখে অপূর্ব্ব দৃশ্য! পথের পর পথ ক্রমশঃ নামিয়া চলিয়া গিয়াছে। দুইপার্শ্বে গৃহশ্রেণী। তাহার পর "খড্"। তদনন্তর পর্ব্বত ক্রমে ক্রমে আকাশে উঠিয়াছে। শৈলগাত্রে পেঁজা তুলার ন্যায় পদার্থ সূর্য্যকিরণে উদ্ভাসিত হইতেছে। আমি শিবচন্দ্র বাবুকে বলিলাম, মেঘগুলা পর্ব্বতগাত্রে পড়িয়া রহিয়াছে। পরে জানিলাম, তাহা তুষার। এক্ষণে চক্ষু সার্থক বোধ করিতেছি, হিমালয়ের হিম দেখা হইল। "মসেড়ি"তে এমন সমতল স্থান নাই, যেখানে দুইখানি বাঙ্গালা একত্র থাকিতে পারে। প্রত্যেকের জন্য পৃথক পথ করিতে হইয়াছে।

অশ্বারোহণে মরি হইতে কাশ্মীর যাত্রা করা গেল। পথের একদিকে খড্, (গভীর নিম্ন ভূমি). অন্যদিকে উচ্চ পর্ব্বত। বৃক্ষকাণ্ড পথের উপর আসিয়া পড়ায় সমুদায় পথ ছায়াযুক্ত হইয়াছে। এখানে নৈসর্গিক শোভা গম্ভীর। হিমালয়ে প্রকৃতির ভাব দেখিয়া, পূর্ব্বকালের মুনি ঋষিগণ ও তাঁহাদের তপশ্চর্য্যার কথা স্মরণ হয়। পর্ব্বত দেখিবার বড় সাধ ছিল, সেই জন্য মসুরিতে যাইতে ইচ্ছা করিয়াছিলাম। তাহার পর ভাবিলাম, 'যদি যাইতেই হইল, তবে কাশ্মীর যাওয়া যাউক। ইহাতে শৈলবিহার ও যাহাকে লোক ভূস্বর্গ বলে, সে স্থান দেখা,—উভয়ই হইবে।' এক্ষণে সেই জন্য মহাপ্রস্থান করিয়াছি। পর্ব্বত বলিলে, পূর্ব্বে প্রস্তরের একটা সমাবেশ বুঝিতাম। এখন দেখিতেছি, তাহা নহে। একটার পর আর একটা প্রস্তরের স্তূপ, মধ্যে কিঞ্চিৎ ব্যবধান, এইরূপ ক্রমাগত চলিয়াছে।

যে শৃঙ্গ অধিক উচ্চ (উহার মধ্যে বড়) তাহারই শিরে বরফের মুকুট। বরফ প্রায় গলিয়া গিয়াছে, তথাপি অনেক স্থানে অবশিষ্ট রহিয়াছে। দেখিতে দেখিতে ডাক-বাঙ্গালায় গিয়া পৌঁছিলাম। আহারাদি সমাপন হইল। সন্ধ্যাকালে অলিন্দে কাষ্ঠাসনে উপবেশন করত অদূরবর্ত্তী তুষার-মণ্ডিত শৈলশৃঙ্গ সন্দর্শনাদিতে অপূর্ব্ব সুখানুভব করিতে লাগিলাম।

অশ্বারোহণের বিষম ব্যাপারে আর প্রবৃত্ত হইলাম না, পদব্রজে চলিলাম। কাননের শোভা ভাল করিয়া হৃদয়ঙ্গম হইতে লাগিল, কর্ণার নামক উপত্যকা, দেখিতে কি অনুপম। এক শৃঙ্গ হইতে শৃঙ্গান্তরে যাইতে হইবে, এজন্য পথ পর্ব্বতগাত্র দিয়া স্তূপ ব্যবহিত নিম্ন ভূমিতে নামিয়াছে। তাহার পর পারিপার্শ্বিক স্তূপগাত্রের নিম্ন হইতে ক্রমশঃ উপর দিকে উঠিয়াছে। কিয়ৎক্ষণ পরে বিতস্তা নদীতীরে উপনীত হইলাম। দেখিয়া অবাক হইতে হইল! এত উচ্চস্থানে নদী! বিতস্তা তীব্রবেগে উপলখণ্ডে আহত হইয়া, কলকল শব্দে অবিশ্রান্ত চলিয়াছে। অনতিদূরে গৈরিক বর্ণের এক তটিনী হিমালয় ভেদ করিয়া বিতস্তায় আসিয়া মিশিতেছে। সঙ্গমের উপরেই সেতু! কি সুষমা!

মসেড়ি হইতে কোহালা পর্য্যন্ত ১০ ক্রোশ পথ ক্রমশঃ নিম্ন হইয়া আসিয়াছে অর্থাৎ উতরাই। আর রাওলপিণ্ডি হইতে মসেড়ি পর্য্যন্ত ২০ ক্রোশ পথ চড়াই, অর্থাৎ উচ্চের পর উচ্চের দিকে উঠিয়া আসিতে হইয়াছিল। এক্ষণে "পড়াও"এ বা পান্থনিবাসে পৌঁছিলাম। শ্রীযুক্ত শশিভূষণ দত্ত নামক জনৈক ব্যক্তির সহিত আমার শ্রীক্ষেত্রে আলাপ হয়। তিনি আবার শিব বাবুর সহাধ্যায়ী; তিনিও কাশ্মীর যাইবার জন্য মিলিত হইলেন। এখানে সুরম্য ডাকবাঙ্গালা ছাড়িয়া ধর্ম্মশালায় আশ্রয় লইলাম। হট্টের বণিকগণ ধর্ম্মশালার সংস্থাপক। ভাই তেজা সিং নামা শিখ প্রাতঃকালে গ্রন্থসাহেব পাঠ করেন। তিনিই পথিকের অভিভাবক।

যাত্রী আসিলে সেখানে থাকিবার স্থান পায়। রন্ধনের জন্য বাসন পায়। ধর্ম্মশালার ব্যয়ে সমস্ত রাত্রি প্রদীপ জ্বলে। একখানি সঙ্কীর্ণ গৃহ, তাহারই মধ্যে পাঞ্জাবী স্ত্রী ও পুরুষ পান্থের সহিত আমরা অতি সামান্য স্থান ব্যবধানে শয্যা রচনা করিয়া শয়ন করিলাম। দ্বার বন্ধ করা হইল না। ভাই নানা গল্প করিতে লাগিলেন। আমি ভাবিলাম, এ মন্দ নয়।

কোহালা হজারা প্রদেশে স্থিত। পাটনের (কোহালা-সেতুর) বাম-পারে কাশ্মীর-রাজের রাজ্য। দুর্য্যোগ দেখিয়া, অদ্য যাত্রা করা হইবে না, স্থির করা হইয়াছিল; বৃষ্টি পতনের উপক্রম দেখা গেল। কিন্তু কবে সুদিন আসিবে, ভাবিয়া, পথিক তিষ্ঠিতে পারে না। ইংরাজ-রাজ্য ত্যাগ করিয়া, বিতস্তা পার হওয়া গেল। হিন্দুর গৌরবান্বিত ভূমিতে এত দিনে পাদস্পর্শ হইল। কাশ্মীর যাইবার যে কয়েকটি পথ আছে, তন্মধ্যে ঝিলম্ উপত্যকার পথ অধিক সুগম। নদী কখন ঊর্দ্ধদিকে উঠিতে পারে না, এজন্য ইহার আর একটি নাম নিম্নগা। নদীর গমনপথ ধরিয়া পথ করিতে পারিলে অবশ্য তাহা দুরারোহ হইবে না। কোহালা হইতে কাশ্মীর পর্য্যন্ত পথ ঐরূপে অবস্থিত। যাহাতে শকট যাইতে পারে, এমন সমতল ও প্রসর করিয়া ঐ পথ আরও সুগম করা হইতেছে। আমরা ভিজিতে ভিজিতে সেই পথ অতিক্রম করিতে লাগিলাম। বর্ষায় নূতন পথ দুর্গম করিয়া তুলিয়াছে। কোথাও পথ ভগ্ন—অনেক স্থানে বৃষ্টিতে উদ্‌বেজিত হইয়া, কর্ত্তিতগাত্র শৈলের প্রস্তর পতিত হইয়া, পথ রুদ্ধ করিয়াছে। এই ভয়ানক পথে, শৈলগাত্রে আলম্বিত প্রস্তর দেখিয়া, কোথাও বা প্রাণ হাতে করিয়া দৌড়িতে হইয়াছে। দূরে সশব্দে পাথর পড়িতেছে। ভয়ে হৃদয় কম্পিত হইতে লাগিল। এক স্থানে লম্ফ দিয়া ভগ্ন পথ পার হইলাম। কিন্তু আমাদের ভারবাহী ছাগ কিরূপে পার হইবে, ভাবিতে লাগিলাম। সহসা পাদস্খলন হইলে, একবারে বিতস্তা-

বক্ষে পড়িতে হইবে। এইরূপে চলিতে চলিতে এক স্থানে দেখি, পথের উপর অশ্বশালা নির্ম্মিত রহিয়াছে। অনুসন্ধানে জানা গেল, ইহার উত্তরে অদ্যাপি সেতু নির্ম্মিত হয় নাই। এজন্য এখানে একটা অবরোধ নির্ম্মাণ করা হইতেছে। আমরা "পাগ্‌দণ্ডীতে" বা পাদপথে উঠিলাম।

নির্ম্মিত পথের ত এই দশা! এক্ষণে শৈলগাত্রে স্বাভাবিক পথ দেখিতে হইবে। ব্যাপার বড় গুরুতর। আমার এক হস্ত ছত্রধারণ পূর্ব্বক বারিধারা নিবারণ করিতেছে, অন্য হস্ত সূক্ষ্মাগ্র লৌহ-কীলক-সম্বদ্ধ চারি হস্ত পরিমিত পার্ব্বত্য যষ্টি ধারণ করিয়া, পিচ্ছিল চড়াই অতিক্রমের সাহায্য করিতেছে। প্রতি পাদবিক্ষেপে বিপদের আশঙ্কা হইতেছে। কিয়ৎক্ষণ পরে কিঞ্চিৎ সমভূমিতে আসিয়া পড়িলাম। উপলখণ্ডে যষ্টি বাধাইয়া বাধাইয়া চলিলাম। পথ আর শেষ হয় না। দেশে শীতকালে ঊর্ণাবস্ত্র ব্যবহার করিতে পারিতাম না। এখন আমাদের গ্রীষ্মকাল। একটা ফ্লানেল ও একটা পট্টুর জামা আছে, তাহার নীচে কার্পাস সূত্রের অঙ্গরক্ষা; কিন্তু তথাপি এ ভ্রমণের পরিশ্রমেও শরীর উষ্ণ বোধ হইতেছে না। বলা বাহুল্য যে, মুখ ব্যাদান করিয়া বায়ু নিঃসারণ করিলে, ধূম দেখা যায়। শীতে হাত পা অসাড় হইয়া যাইতেছে। পান্থনিবাস সম্বন্ধে যাহাকে জিজ্ঞাসা করি, সে যাহা কহে, তাহাতে দূরতা বুঝিতে পারি না। ভারবাহী ছাগের যে পরিচালক, সেই আমাদের পথপ্রদর্শক। কিন্তু সে ব্যক্তি এতদূর কখনও আসে নাই মসেড়ি হইতে পাটন পর্য্যন্ত সে যাতায়াত করিত।

আবার নূতন পথে পৌঁছিলাম। পথে এমন কর্দ্দম যে, পাদুকা চলে না। মহারাজের ডাকবাঙ্গালা দেখা যাইতেছে—বাঁচিলাম। শরীর এমন ক্লান্ত হইয়াছিল যে, বসিলে আর উঠিতে পারিব না; এজন্য পথে বসি নাই। মরণাপন্ন হইয়া চলিয়া আসিতেছি। পথ ন্যূনাধিক ৮ ক্রোশ

হইবে। এখানে সে দিন যাহা পাওয়া গেল, তাহাই আহার করা হইল। লুচি ও লবণ ভিন্ন তথায় আর কিছুই মিলিল না। পরদিন আস্ত কলাই বাঁধিয়া ভাত দিয়া খাওয়া হইল। কুক্কুট মাংস খাইতে পারিলে, এ প্রকার নিরামিষাশী থাকিতে হইত না। একে ত পথের অবস্থা শোচনীয়, তাহার উপর অনবরত বৃষ্টি, যানবাহনেরও তাদৃশ সুযোগ দেখিলাম না। সুতরাং কাশ্মীর যাইবার সংকল্প পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইলাম। কিয়ৎক্ষণ পরে দেখিতে পাইলাম, কতকগুলি স্ত্রীলোক যাত্রী সেই দুর্গম পথ অতিক্রম কবিতেছে। তখন মনে সাহস হইল। অতঃপর ডাক-বাঙ্গালার মুন্সি কহিল, আরও তিন ক্রোশ আপনাদিগকে এই নূতন পথে চলিতে হইবে। প্রাচীন পথ সুগম।

ক্রমে ক্রমে বৃষ্টি নিবারিত হওয়ায়, আমাদিগের যাত্রারও সুবিধা হইল। মুন্সির পরামর্শে "ঝাঁপান" পাইবার আশায় নিকটবর্ত্তী জনপদে যাওয়াই স্থির হইল। একটা পার্ব্বত্য সোপান অতিক্রম করিয়া গ্রামে উঠিলাম। তহসিলদার তখন উপস্থিত ছিলেন না। আমি তাঁহার বাটীতে বসিয়া রহিলাম। তাঁহারই একজন কর্ম্মচারী আমার নিকট কাশ্মীররাজের অনুজ্ঞা পত্র দেখিয়া, তাহা মস্তকে স্পর্শ করিল। ঠিকেদার পুনর্ব্বার আসিয়া সংবাদ দিল, আবেটাবাদ হইতে একজন কাশ্মীরযাত্রী ইংরাজ এই পথে আসিয়াছেন। তাঁহার অনেক সংখ্যক ভারবাহী আবশ্যক। তখনি দরবার হইতে তহসিলদার আসিয়া পৌছিলেন এবং "রাম রাম" বলিয়া আমাকে কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। অতঃপর ভারবাহক সংগ্রহের জন্য হুলস্থুল পড়িয়া গেল। যদিও সাহেব এখনও পৌছান নাই, কিন্তু তাঁহার দ্রব্য-সম্ভার অগ্রে উপস্থিত হইয়াছিল। সুতরাং অবিলম্বে তাঁহার জন্য কতিপয় ভার-বাহককে নিযুক্ত করিয়া পাঠাইতে হইবে। গ্রামের প্রধান-গণ আহূত হইল। কাহাকে কয়জন লোক দিতে হইবে, তাহা কাগজে

লিখিয়া তহসিলদার তাহাদিগকে বিদায় দিলেন। তিনি ভদ্রতা করিয়া আমাকে তাঁহার পালকীখানি দিতে চাহিলেন। তাহার পর, আলওয়ারের রাজার জন্য যে কয়েকখানি ঝাঁপান নির্ম্মিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে দুইখানি আমাদের জন্য আনাইয়া দিবেন, প্রতিশ্রুত হইলেন। পরদিন বৈশাখী মেলা; কোনও কাজ হইল না। ঝাঁপান আসিয়া পৌছিল। তাহা অসংস্কৃত থাকায়, সংস্কারের আবশ্যক হইল। স্থির হইল, বাহকেরা প্রাতঃকালে যান ফিরাইয়া লইয়া যাইবে। কিন্তু মুজফ্ফরাবাদের তহসিলদার দয়ারামের কর্ম্মচারী পূর্ব্ব দিন তাহাদিগকে আনাইয়া আমার নিকট উপস্থিত করিলেন এবং "রাজিনামা" অর্থাৎ প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সম্ভারের প্রাপ্তিস্বীকার লিখাইয়া, আপন কর্ত্তব্য সমাপনান্তে গন্তব্য স্থানে প্রস্থান করিলেন।

ঝাঁপান ডুলির মত; কিন্তু তাহার বাহুদণ্ড দুইটি আসনের নিম্নে উভয় পার্শ্বে সম্বদ্ধ। সুতরাং উপবেশনকারীকে বাহকের স্কন্ধদেশের উপরিভাগে যাইতে হয়। বাহুদণ্ডের মাঝে রজ্জুর বন্ধনী দিয়া তৃতীয় বাহু আবদ্ধ, তাহাতে অগ্রপশ্চাৎ ভাবে স্কন্ধ দিয়া শিবিকা বহন করা হয়। পার্ব্বত্য পথ স্থানবিশেষে এত সঙ্কীর্ণ যে, দুইজন বাহক পাশাপাশি ভাবে যাইতে পারে না। এ কারণ মধ্যস্থলে একটা দণ্ড লাগাইয়া অগ্রপশ্চাৎ ভাবে চলিতে হয়। শিবচন্দ্র বাবু ও আমি ঝাঁপানে যাইতে লাগিলাম। পর্ব্বতের শোভা অতি চমৎকার। বৃক্ষে বিস্তৃত পত্র দেখা গেল না। ঝাউগাছের ন্যায় বৃক্ষই অধিক। সুবৃহৎ সিডার বৃক্ষরাজি যেন পথ আটকাইয়া দণ্ডায়-মান আছে। পর্ব্বতের নিম্নে ও উপরে চিড় (পাইন) ও ওক্ বৃক্ষ সরল ভাবে দণ্ডায়মান। চিড়কাষ্ঠ-আহরণকারীরা বৃক্ষ ছেদন না করিয়া, বৃক্ষের মূলের কিঞ্চিৎ উপরে অগ্নি সংযোগ করিয়া দেয়। তাহাতে ঐ বৃক্ষ ভাঙ্গিয়া নদী গর্ভে পতিত হয়। এই প্রকারে স্রোতে কাষ্ঠ ভাসাইয়া

অধিকারীর নিকট পৌছাইয়া দেয়। পর্ব্বতোপরি ইতস্ততঃ দুই এক খানি গৃহ দৃষ্টিগোচর হইতেছে। সে স্থানে লোকে কি করিয়া অধিরোহণ করে, বুঝিতে পারিলাম না। এক স্থানের অধিবাসী, নিকটবর্ত্তী কোন গৃহস্থকে সংবাদ দিতে হইলে, সেই স্থান হইতেই চীৎকার করিয়া বলিয়া থাকে। কারণ তথায় যাইতে হইলে অনেক ঘুরিতে হয়। অত্রস্থ প্রকৃতিপুঞ্জ সকলেই কৃষিজীবী, পশুপালক ও মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী। কদাচিৎ শিখ বা ক্ষত্রিয়ের বাস থাকিতে পারে, কিন্তু তাহাদের জীবিকা অভিন্ন। পঞ্জাবী অথবা কাশ্মীরী ভাষা বুঝি না; সুতরাং ভাষার ক্রমশঃ পরিবর্ত্তন সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারিলাম না। তাহাতে আবার বাহকদিগের "হোসকদম" প্রভৃতি শব্দমাত্র আমাদের অবলম্বন। শুনিয়াছিলাম, যে উত্তরাখণ্ডের পাহাড়ে চোর নাই। সে কথা যে সত্য, তাহা এক্ষণে উপলব্ধি করিতেছি। তদ্ব্যতীত এখানে সর্প বা ব্যাঘ্রের ভয় নাই।

কাশ্মীর।*

কবি না হইলে, সুচিত্রকর হওয়া যায় না। কিন্তু এখানে আসিলে লোকে যদি ভাবুকও না হয়, তথাপি সুন্দর চিত্রপট আঁকিবার উপকরণ পাইবে। প্রকৃতিকে গুছাইয়া লইতে হইবে না। নিসর্গ-সুন্দরী এখানে আপনি ছবির মত হইয়া বসিয়া আছেন। এখানে বলিবার সামগ্রী অধিক নাই, কিন্তু দেখিবার যথেষ্ট আছে। চকোঠি হইতে উড়ি পর্য্যন্ত পথটা অত্যন্ত দীর্ঘ। ডণ্ডিতে বসিয়া বসিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িলাম। বেলা দুইপ্রহর অতীত হইয়া গিয়াছে। তাহার পর উড়ির চড়াই আরম্ভ হইল, ফুরান ভার। আরও কতদূর যাইতে হইবে তবে বাংলা পাইব। কিন্তু উপরে উঠিয়া দেখি—এই বাংলা। অত্যন্ত আহ্লাদ হইল। পথে একস্থানে দেখিয়াছি একটা স্রোতস্বতীর উপর পর্ব্বতের উপর হইতে একগাছি মাত্র রজ্জু আলম্বিত করিয়া তাহাতে অপর রজ্জু ঝুলাইয়া পাদভার রাখিয়া এক ব্যক্তি পার হইতেছে। এখানে আর একটি রজ্জুর সেতু দেখিলাম। উড়ি হইতে যাত্রা করিয়া, পথের শোভা অন্যরূপ দেখিলাম। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরুবল্লীতে পথ সমাকীর্ণ। যত যাই, ততই অধিক মনোরম। প্রকৃতি গম্ভীর ভাব ছাড়িয়া, এক্ষণে হাস্যময়ী হইতেছেন। ক্রমে ক্রমে ফুলের ভূষণ দেখা দিল। জাহঙ্গির বলিয়াছিলেন ঋতুরাজ আমার জন্য যেন অপেক্ষা করেন। তাহাতে রাজকর্ম্মচারী বরফ

---

* (১) Hand book of Cashmere—Dr. Inns. প্রণীত;
(২) Journal of Baron Heugil.
(৩) Kashmiri Vocabulary.

দিয়া বৃক্ষ মণ্ডিত করিয়া পুষ্পোদ্গম স্থগিত করিয়া রাখেন। আমার সেই জন্য বসন্ত সমাগম দেখিবার নিতান্ত বাসনা ছিল। তাহা হইবে না বলিয়া দুই বৎসর পূর্ব্বে এক সময় কাশ্মীর যাত্রা স্থগিত করিয়াছিলাম। এবারেও বিলম্ব হইয়া পড়িয়াছে। বসন্ত সমাগম আরম্ভ হইয়া পড়িয়াছে। আহা কি সুন্দর বেশ! শীতকালে বৃক্ষের সমুদায় পত্র পতিত হইয়া যায়। তাহার পর এখন নব পুষ্পোদ্ভেদ হইয়াছে। যেমন পাতা বাহির হইতে থাকিবে, অমনি ফুল খসিবে। যে ফুলগুলি অবশিষ্ট থাকিবে, তাহাতে ফল ধরিতে থাকিবে। আগে ফুল, পরে পাতা। কি চমৎকার ব্যাপার! পথের উভয় পার্শ্বে সেও, গেলাস প্রভৃতি ফলের গাছ আপাদমস্তক পুষ্পময়। যেন ফুলের তোড়া বাঁধিয়া কৃত্রিম বৃক্ষ প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছে। যেদিকে নয়ন ফিরাও, কেবল বড় বড় শ্বেত পুষ্পের গুচ্ছ সাজান আছে। একটি বা দুইটি সেও বৃক্ষ দেখিলাম, তাহাতে অদ্যাপি একটি পত্রও নির্গত হয় নাই। ভাবিলাম, যদি আর কিছু না দেখি, এই দুইটি গাছ দেখিয়াই, আমার পর্য্যটনের কষ্ট সফল হইয়াছে। যথেচ্ছাক্রমে দুই একটি গুল্মের পাতা ছিঁড়িয়া দেখিলাম, তাহা সুগন্ধময়।

বারমুল। বারমুল গিরিসঙ্কট উত্তীর্ণ হইলে কাশ্মীর উপত্যকা দৃশ্য হইল। সমতল ভূমিতে বিতস্তা দর্পনের মত দেখাইতেছে। এক্ষণে তাহার বহু দূর পর্য্যন্ত গমন দেখা যাইতে লাগিল। সফেদা বৃক্ষশ্রেণী সৈন্য সংঘের মত দেহ সরল করিয়া কাশ্মীরের অবতরণ ভূমিতে পথের উভয়পার্শ্বে দণ্ডায়মান। নদীবক্ষে একটি সেতু, পরপারে একখানি নগর ঘুমাইয়া রহিয়াছে। দেখিতে নূতন। তুষার সঙ্ঘাত নিবারণের জন্য গৃহের ছাদ উভয় দিকে ঢালু। নদীতীরে আসিয়া কাশ্মীরি নরনারী দেখিতে পাইলাম। নাবিকা পত্নী গুণ টানিয়া চলিল। ক্ষেপনি

নাবিকের হস্তে। সোপুর নামক স্থানে রাত্রে নৌকা থাকিল। প্রাতঃকালে অলয় হ্রদ বামে রাখিয়া খালের মধ্য দিয়া শাদিপুর নামক স্থানে পুনর্ব্বার ঝিলমে পড়িলাম। এখানে সিন্ধু নামক স্রোতস্বতী সঙ্গতা হইয়াছেন। সঙ্গমস্থানে একখানি গণ্ড শৈল। তাহাতে শ্বেতকান্ত চেনার বৃক্ষমূলে শিবলিঙ্গ সমাসীন। একস্থানে এমনি ঝড় আসিল যে নৌকা ডুবিবার উপক্রম দেখিলাম। রাত্রে একস্থানে থাকিয়া প্রাতঃকালে শ্রীনগর যাত্রা করিলাম।

শ্রীনগর। শ্রীনগরে পৌছিলাম। নদীর বেগে বিপরীত দিকে নৌকাচালন কঠিন বলিয়া একটা খাল দিয়া যাইতে হইল। শ্রীনগরের কিছু শ্রী দেখি না। কাষ্ঠের ঘরগুলা দেখিতে কদর্য্য। এখানে সেখানে রজক বস্ত্র প্রক্ষালন করিতেছে। আমরা শ্রীনগরের অতি জঘন্য প্রদেশেই প্রথমে আসিয়া পড়িয়াছি। ফেরন পরা টুপি মাথায় জাফরানের ফোটা পরা পণ্ডিতানী দেখিলাম। শ্রী বটে। কাশ্মীররাজের মন্ত্রী বাবু নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়ের বাটীতে পৌছিলাম। শ্রীযুক্ত শশীভূষণ শ্রীমানী নামক মহারাজার চিকিৎসালয়ের ডাক্তার আমাদিগকে অভ্যর্থনা করিয়া নৌকা হইতে লইয়া গেলেন। আমিরি কদল নামক সেতুর উপর বাটী ভাড়া লওয়া হইল। একজন পাচক, চারিজন নাবিক ও একখানি শিকারী নামক নৌকা নিযুক্ত করা হইল। এ দেশে মাথা খুলিয়া রাখা ভদ্র ব্যবহার বিরুদ্ধ। ডাক্তার শশীবাবুর অনুরোধে টুপি ব্যবহার আরম্ভ করিলাম। পায়জামা চাপকান্ ফরমাইস দিতে হইল। শ্রীযুক্ত মাখনলাল চট্টোপাধ্যায় আসিলেন। সকলে মিলিয়া ডল হ্রদে বিহার করিতে যাওয়া হইল। কাশ্মীরকুসুম নামক পুস্তক পড়িয়া আমার মনে এমনি আবেশ ছিল যে কাশ্মীরে গেলে যেখানে সেখানে ফুলের গালিচা বিছান ভূমি দেখিতে পাইব।

এক্ষণে মনের সে ঘোর ভাঙ্গিল। উক্ত পুস্তক সৌন্দর্য্যটা বড় বাড়াইয়া লিপি করিয়াছে। অনুসন্ধান করিয়া জানিলাম এখান হইতে ব্যবহিত গুলমর্গ নামক স্থানে কয়েক মাস পরে গেলে ঐরূপ দেখিতে পাওয়া যাইবে। শশীবাবুর বাটীতে আসিয়া মেষ মাংস আহার আরম্ভ করা হইল।

সেখবাগ, খঞ্জীরবাগ প্রভৃতি উদ্যানে "মুকোফ্‌তা" দেখিতে যাইলাম। শুক্রবার মুসলমানের বিশ্রাম দিন। সেই দিন যে উদ্যানে অধিক পুষ্প প্রস্ফুটিত হয়, সেই খানেই ফুলের মেলা বসে। সেখবাগে একটি গেলাস ফলের গাছ দেখিলাম। তাহাতে তখনও পত্রোদ্‌ভেদ হয় নাই। গাছভরা ফুল শাদা ধপ্‌ ধপ্‌ করিতেছে। চক্ষুর পিপাসা নিবারিত হইল। ভৃত্যকে বৃক্ষমূলে আসন বিস্তৃত করিতে কহিলাম। অপর এক ভৃত্য কহিল, সৌন্দর্য্য দেখিতে হইলে, বৃক্ষের মূলে না বসিয়া দূরে উপবেশন করা উচিত। আমরা বিচিত্র ভাব চরিতার্থ করিব বলিয়া কিছুক্ষণ ফুলময় বসন্ত তরুর তলে বসিয়া রহিলাম। পরে কিঞ্চিৎ ব্যবধানে গিয়া উপবেশন করিলাম। পুষ্পোৎসবের শেষদিন সমাগত। নিসাৎবাগে যাইতে হইবে। ডল হ্রদে মহা মহোৎসব। "সতু"র নীচ দিয়া পথ। উভয় পার্শ্বে তরি শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দণ্ডায়মান। আমাদিগের নৌকাও সেই পংক্তিতে ধরা হইল। মধ্য দিয়া অসংখ্য বিলাস-তরি আমাদিগকে দেখিতে দেখিতে বাহিয়া চলিল। নৌকায় গান বাদ্য নানা প্রকার আমোদ চলিতেছে। মুহুর্মুহু চা প্রস্তুত হইতেছে। কোনও কোনও তরণি হাস্যমুখী তরুণী লইয়া দেখাইয়া বেড়াইতেছে। সকলের চক্ষু আমাদের দিকে, আমাদের চক্ষু সকলের দিকে। সময়টা বড় আনন্দে কাটিতে লাগিল। সুখের মুখে ছাই দিয়া আমি দুঃখ সার করিয়াছিলাম। এক্ষণে দেখিতেছি, সুখও আছে। নিসাৎ যাওয়া

হইল। তথায় হিআসমান নামক পুষ্প দেখিয়া বড় প্রীত হইলাম। উহা নিসাৎবাগের প্রথমতল আলো করিয়া রহিয়াছে। বল্লীময় ছড়া ছড়া বেগুনি রঙ্গের ফুল স্তূপাকারে কানন ভরিয়া শোভা পাইতেছে। অপূর্ব্ব শোভা! আমরা আর থাকিতে পারিলাম না। পুষ্প-বিতানে বসিলাম। কিছুদিন পরে "অরয়ল" অর্থাৎ পীত গোলাপ প্রস্ফুটিত হইল। কাশ্মীরবাসীরা আভরণ পাইল।

আমাদের যদি কোনও আবশ্যক হয় এজন্য শ্রীযুক্ত বাবু নীলাম্বর মুখোপাধ্যায় জম্বু হইতে কাশ্মীরের গবর্ণরকে আমাদের জন্য পত্র লিখিয়াছিলেন। এজন্য আমাদিগকে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতে হইল। রণজিৎ সিংহের দরবারে রাজা দীনানাথের ভ্রাতুষ্পুত্র দেওয়ান বদ্রীনাথ কাশ্মীরের হাকিম আলা। গবর্ণর আমাদিগকে আপ্যায়িত করিয়া বিদায় দিলেন। আমাদের শ্রীনগর পৌঁছিবার অব্যবহিত পরে দেওয়ান সাহেব আমাদের ব্যবহারের জন্য দুইখানি চেয়ার পাঠাইয়াছিলেন, ডেপুটি গবর্ণর পণ্ডিত রামজু আমাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা করিলেন। তাঁহার নিকট যাইয়া আমি নিতান্ত সুখী হইলাম। পণ্ডিত সাহেব বাঙ্গালীকে বিশেষ স্নেহ করেন। হ্যাপি ভ্যালি (Happy Valley) নামক পুস্তক আমাকে পড়িতে দিলেন। তাঁহার সহিত নানা কথা হইল। কাশ্মীরিদের বাটীতে কেহ যাইলে চা পান করিতে দিয়া তাহাকে অভ্যর্থনা করা হয়। আমাকেও চা পান করিতে হইল। এখানকার মধ্যে প্রধান শাস্ত্রীর নাম পণ্ডিত দয়ারাম। আমি তাঁহার বাটীতে যাইয়া নীলপুরাণ লই। পণ্ডিত পরিবারের সহিত বিশেষ ঘনিষ্টতা হইল। তাঁহার পুত্র পণ্ডিত দেবরাম প্রত্যহ আমার বাটীতে আসিতেন। কাশ্মীর সম্বন্ধে অনেক কথা তাঁহার নিকট জানা যাইত। নীলপুরাণ খানি কিছু নয়, কাশ্মীর

সম্বন্ধে গল্প মাত্র। রাজতরঙ্গিনী স্বদেশ হইতে সঙ্গে লইয়া যাই। কাশ্মীরে বসিয়া কাশ্মীরের রচনা রাজতরঙ্গিনী ইতিহাস পড়িয়া আমোদ করিতাম।

আমাদের বাসস্থান অতি মনোরম স্থানে সন্নিবেশিত হইয়াছিল। বিতস্তা গর্ভ হইতে বাটী উঠিয়াছে। আমার ঘরের নীচে সেতু। সেতুর দুইপারে বাজার; এবং সের গড়ি অর্থাৎ রাজপ্রাসাদ ও রাজ কার্য্যালয়ে যাইবার এই প্রধান পথ। অহোরাত্র বাটীর নিম্নে মেলা। সম্মুখ দিকে দৃষ্টি করিলে বরফ আচ্ছন্ন তিব্বত দেশের পাহাড় দেখা যায়। বাটীর ঘাটে চারিজন নাবিক কর্ত্তৃক রক্ষিত নৌকা সর্ব্বদা আমার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে। লক্ষ্মণ পণ্ডিত পাক কার্য্যে বিশেষ পটু। রাত্রে আহার করিয়া শয়ন করিলে আমাদিগকে নিদ্রার ঔষধ দিত। দেশীয় আচার ব্যবহার ও বিশ্বাস ঘটিত কাহিনী শোনা হইত। নয়জন বাঙ্গালী একত্রে প্রীতিভোজন করা হইল। শ্রীযুক্ত নীলাম্বর মুখোপাধ্যায় মহাশয় আমাদের জন্য এক বৃহৎ সিধা পাঠাইলেন। নীলাম্বর বাবু বাঙ্গালী বলিয়া কাশ্মীরবাসীর নিকট আমরাও পূজ্য। কিন্তু কোনও কোনও বাঙ্গালী এখানে আসিয়া দুরাচার করিয়া সে সম্মানের হানি করিতেছেন। ডল হ্রদ আমাদের বিচরণ স্থান। শলামারবাগ, নসিমবাগ, হজরতবল ও ক্রালিয়র পুরাতন হইয়া গেল। চশমাসাহি ও তন্নিকটবর্ত্তী দ্রাক্ষাক্ষেত্র মাখনলাল বাবুর সহিত ভ্রমণ করা হইল। ঐ উৎসের জল আমরা পানার্থ নিত্য ব্যবহার করিতাম। মাখনবাবুর কার্য্যালয় গুপ্‌কারের রাজকীয় সুরাপরিস্রবণশালা আমাদের প্রতিবেশীর বাটীরূপে ব্যবহার হইতে লাগিল। বেহেত (বিতস্তা) নদীর যে দিকে নগরের সমৃদ্ধভাগ সেখানে না ভ্রমণে যাইলে প্রাণ উদ্বিগ্ন হইত। আমিরিকদল হইতে সফাকদল যাইতেই হইবে।

কাশ্মীরী সিন্ধু নদী বাহিয়া ক্ষীর ভবানীর মেলায় উত্তীর্ণ হইলাম। পদ্মবনে বাসা ঠিক হইল। যে দিকে চাও, প্রফুল্ল কমল সদৃশ রমণীকুল নৌকা আলো করিয়া রহিয়াছে। ক্ষীরপ্রিয়া ভাবনীকে দেখিবার জন্য ভূমিতে উঠা গেল। ভবানীর অপর কোন মূর্ত্তি নাই, কেবল একটি জলের কুণ্ড মাত্র। তাহাতে একটি প্রস্রবণ সংযুক্ত আছে। সময়ে সময়ে সেই জলের বর্ণ পরিবর্ত্তিত হয়। পাছে কেহ পরীক্ষা করে, এই ভয়ে পাণ্ডারা কুণ্ডের জল কাহাকেও তুলিয়া লইতে দেয় না। রাত্রিকালে একবার তথায় যাওয়া হইল। আলোক-মালা-মণ্ডিত কুণ্ডের চতুর্দ্দিকে শুভ্র-বসনা শুভ্রবর্ণা অঙ্গনাসমূহ শুভ্র আলোকে মিশিয়া করযোড়ে স্তব পাঠ করিতেছে। কি সৌম্য দর্শন! কি পবিত্র ভাব! কাশ্মীরের স্ত্রী পুরুষ যিনি সুযোগ পাইয়াছেন, সকলেই এখানে আসিয়াছেন। পরদিন অপরাহ্লে আমি কুণ্ডের নিকট দাঁড়াইয়া আছি, এক ব্যক্তি কহিল, আপনি কি দেখিতেছেন? আমি কহিলাম, কিছুই না। সে কহিল, কুণ্ডের মধ্যস্থ বেদীর উপর যে সুবর্ণ ছত্র শোভিত দেবীর শূন্য আসন রহিয়াছে, তাহাতে একটা সর্প দেখা যাইতেছে। আমি দেখিলাম, তাহা সর্পের মত বটে, কিন্তু রৌপ্য নির্ম্মিত। ক্রমে জনতা বাড়িতে লাগিল। কে কাহার উপর পড়িতেছে, স্থির নাই; আমি কিছু না বুঝিয়া পলায়ন করিলাম। অনুসন্ধানে জানিলাম, দেবী সর্পরূপে দেখা দিয়াছেন। দ্বীপস্থ সমস্ত লোক সেই দিকে ধাবমান। কেহ কেহ বা পদ-দলিত হইয়া গেল। শান্তিভঙ্গ দেখিয়া পূজকেরা বেদী হইতে দেবীর আসন তুলিয়া লইলে, জনতা ভঙ্গ হইল। নৌকায় যাইয়া শুনিলাম, কোন কোন লোক সর্পকে চলিতে দেখিয়াছেন।

তৎপরে আমরা মানসবলে পৌছিলাম। মানসবল ডল হ্রদ অপেক্ষা ক্ষুদ্র। কিন্তু জল তদপেক্ষা সুন্দর; দেখিতে হরিদ্বর্ণ, অথচ নিরতিশয়

স্বচ্ছ। ১০।১৫ হাত নিম্নে মৎস্য বিচরণ করিতেছে স্পষ্ট দেখা যাইতে লাগিল। যেখানে জল অপেক্ষাকৃত গভীর, সেখানে জলের বর্ণ আরও গাঢ়। আমরা মানস সরোবরের কূলে স্নানক্রিয়া সমাপন করিয়া হ্রদবক্ষে আহার করিতে বসিলাম। একবার খাই, একবার জলের দিকে চাই। যত দেখি, চক্ষু তত স্নিগ্ধ হয়। সেই জলে আচমন করিলাম। হস্ত যথার্থই পূত হইল। মানসবলের রূপে মুগ্ধ হইলাম।

ক্রমে চেনার শৈলে উঠিলাম। অহো, কি সুন্দর ছায়া! শরীর ও মন শীতল হইল। এখান হইতে মানসনাগ অতি চমৎকার দেখায়। চেনার বৃক্ষ দেখিতে বড় সুন্দর, ইহা পারস্য হইতে আনীত। আকার অতি প্রকাণ্ড। কাণ্ড শুক্লবর্ণ। পত্র বৃহৎ। পাঁচ সাতটা বৃক্ষে একটা দেশ জুড়িয়া রহিয়াছে। তাহার ছায়াপথে ক্ষুদ্র সরিৎ বহিয়া যাইতেছে। ঐ স্থান ছাড়িয়া, তরণী ক্রমে উলার ভ্রমণে চলিল। কাশ্মীরীদের পক্ষে ইহাই সমুদ্র। দৈর্ঘ্য ৩ যোজন, প্রশস্ত ২ যোজন। আমরা লঙ্কায় পৌঁছিলাম। লঙ্কা অর্থে দ্বীপ। এখানে মনুষ্য সমাগম নাই। ভগ্ন গৃহ ও জঙ্গল আছে। আমি একটা ভগ্ন হিন্দু দেবালয়ে প্রবেশ করিলাম। যাইয়াই ব্যাঘ্রের গন্ধ পাইলাম। তখনি নামিয়া আসিলাম। আমার নৌচালক সমুধু শুনিয়া তোবা তোবা বলিতে লাগিল। কহিল ইহা অসম্ভব। দুই হস্তে লতাগুল্ম সরাইয়া পথ করিয়া চলিলাম। এক প্রাচীন মহজিদে উপস্থিত হইলাম। শিববাবু সেই নিবিড় বনে আপনার নাম রাখিবার জন্য মহজিদের ভিত্তিতে নাম লিখিয়া আসিলেন। স্নান করিয়া স্বহস্তে বন্যফল (তুত) চয়ন করিয়া জলযোগ করা হইল। উলারের অপর পার দিয়া তিব্বত যাইবার পথ।

পরদিন অঞ্চারসরে পৌঁছিলাম। জলময় নলবন। তাহার উপর দিয়া নৌকা চলিল। অসংখ্য পদ্ম-পত্র জলের উপর ভাসিতেছে। যখন ইহাতে

আনন্দ-প্রসূন প্রস্ফুটিত হইবে, তখন (সর) কি অপূর্ব্ব ভুবনমোহন রূপ ধারণ করিবে! কুমুদ্বতী প্রসন্না হইয়াছেন, নৌচালকগণ কুমুদের নাল তুলিয়া ভাঙ্গিয়া মালা করিয়া পরিল। দুই একটি যুবতী নাবিকতনয়া একাকিনী তীব্রবেগে নল বোঝাই নৌকা সঞ্চালন করিয়া লইয়া যাইতেছে। আমাদের মাঝিরা তাহাদিগকে বিদ্রূপ করিতে ও তৎসঙ্গে গালি খাইতে লাগিল। কাশ্মীরে এত জলময় স্থান দেখিয়া বিশ্বাস হয় যে, ভিগনি সাহেবের কথা সত্য। কাশ্মীরের প্রবাদ, যাহা কহ্লন রাজতরঙ্গিণীতে লিখিয়াছেন, তাহাও সত্য। পূর্ব্বে এই স্থান সতী-সর ছিল। পরে কশ্যপ মুনি স্থল নির্ম্মাণ করেন। আমরা ক্রমে নানা খাল অতিক্রম করিয়া ডল হ্রদে আসিয়া পড়িলাম। আসিয়া দেখি, ডল-দ্বার বন্ধ হইয়া গিয়াছে। উহা এমনি কৌশলে নির্ম্মিত যে, বিতস্তার জল অতি বৃদ্ধি পাইলে ডলে যাইয়া তত্রত্য গ্রাম প্লাবিত করিয়া দিতে পারে বলিয়া, উহা আপনি বন্ধ হয়; অর্থাৎ যে দিকে জল যায়, সেই দিকে স্রোতোবেগে আপনি কবাট ঘুরিয়া যায়।

বিজ্‌বেহারা। মুসলমান মহলে মিরবাবা হয়দর সাহেবের মেলা বড় প্রসিদ্ধ। প্রথমে বিজ্‌বেহারার জীয়ারত সন্নিধানে মেলা হয়, তাহার পর সে স্থান হইতে উঠিয়া ইসলামাবাদ পরে অচ্ছবলে শেষ হয়। আমার মেলা দেখা নিতান্ত আবশ্যক। এক বৎসর বাস করিলে যে জ্ঞান না হয় মেলায় যাইয়া এক ঘণ্টায় তাহা দর্শন লাভ ঘটে। আমরা তদুদ্দেশে যাত্রা করিলাম। নলডাঙ্গা নিবাসী শ্রীসৌরেশ দেব রায় ও তাঁহার সহচর আর এক নৌকায় আমাদের সহিত চলিলেন। ২ ঘণ্টায় পাণ্ড্রেতনে পৌঁছিলাম। অতি পূর্ব্বকালে ইহা সমৃদ্ধ নগর ছিল। রাজা অভিমন্যু উন্মত্ত হইয়া নগর দাহ করেন। এক্ষণে এক সরের মধ্যে একটি মন্দির আছে। আকার সম্বন্ধে ইংরাজ প্রত্নতত্ত্ববিদ কহেন উহার গঠন-

কাশ্মীর—মানসবল

প্রণালী ইজিপ্‌টের পিরামিডের সদৃশ। পরদিন বিজ্‌বেহারার মেলা দেখা হইল। গ্রাম্য জীবনের প্রয়োজনীয় দ্রব্য সম্ভার দেখিলাম। প্রকৃতিপুঞ্জের বিলাস আমোদ দেখিতে লাগিলাম। জিয়ারতের অর্থাৎ সমাধিগৃহের বাহিরে যে স্থানে বাবা হয়দর সাহেবের ক্রিয়া উৎকীর্ত্তন হইতেছে ও শ্রোত্রিবর্গ অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছে আমি তথায় বহুক্ষণ দাঁড়াইলাম। বৃদ্ধ বক্তা সাশ্রুনয়নে আমি বিদেশী বলিয়া ঈশ্বর সন্নিধানে কুশল কামনা জানাইতে লাগিল। মেলার নায়ক যখন সমস্ত আগন্তুককে সঙ্গে লইয়া কার্য্য দেখাইয়া ধাবিত হইয়া যান, আমাদিগকে দেখিয়া দাঁড়াইলেন ও দুয়া মাঙিলেন।

পরদিন অবন্তিপুরে পৌছিলাম। পূর্ব্বে এইস্থল কাশ্মীরের রাজধানী ছিল। রাজা অবন্তিবর্ম্মা ইহার নির্ম্মাতা। পরে প্রবরসেন শ্রীনগর স্থাপন করেন। অবন্তিপুর প্রস্তর নির্ম্মিত গৃহ ও দেবায়তনের ভগ্নাবশেষে পরিপূর্ণ। ভিত্তির প্রস্তরগুলি দেখিলে বোধ হয় তাহা যেন কর্দ্দমবৎ কোমল অবস্থায় বসান, এক্ষণে প্রস্তরিভূত হইয়াছে।

অনন্তনাগ। বিতস্তার জল এখানে অতি তীব্রবেগে যাইতেছে। নিতান্ত অপ্রশস্ত এবং গভীরতা কম। বিতস্তা এক্ষণে উৎপত্তি স্থানের সন্নিকট হইতেছে। বিতস্তা ত্যাগ করিয়া অনন্তনাগের সলিলের প্রণালী দিয়া উজীর পন্নুর উদ্যানে উপনীত হইলাম। অনন্তনাগ দেখিতে যাওয়া হইল। একটি বৃক্ষ বাটিকার মধ্যস্থলে প্রসন্ন সলিলপূর্ণ কুণ্ড। তাহাতে অগণ্য মৎস্য রহিয়াছে। আমরা একখানা রুটি ফেলিয়া দিয়া মৎস্যের কৌতুক দেখিতে লাগিলাম। চংক্রমন করিয়া আর একটু উর্দ্ধে উঠিলাম। দেখিলাম অপেক্ষাকৃত একটি ক্ষুদ্র কুণ্ড রহিয়াছে। তাহার জল নিম্নবর্ত্তী কুণ্ডে যাইতেছে। সে স্থান হইতে সবেগে তাহার নিম্নবর্ত্তী রাজপথের প্রণালীতে গিয়া পতিত হইতেছে। কোথা হইতে জল

আসিতেছে তাহা দেখিবার জন্য সংলগ্ন গণ্ডশৈলে উঠিলাম। কিন্তু মূল দেখিতে পাইলাম না। সিদ্ধান্ত হইল, তৃতীয়তলবর্ত্তী কুণ্ডের পার্শ্বে যে গৃহ আছে অবশ্য তাহার নিম্নে প্রস্রবণ থাকিতে পারে।

নিশাকালে নৌকাসংলগ্ন চন্দ্রিকাস্নাত নিভৃত বিপিনে ভারত-সঙ্গীত গাহিয়া বন কাঁপাইতে লাগিলাম। কৌমুদীপ্লাবিত তৃণশয্যা বিনির্ম্মিত গালিচার উপর ভোজন পাত্র স্থাপন করিয়া সতরঞ্জির উপর বসিয়া প্রীতিভোজন করা হইল।

রজনী প্রভাত হইলে মার্ত্তণ্ড উদ্দেশে যাত্রা করিলাম। পর্ব্বতোপরিস্থ মালভূমি (টেবলল্যাণ্ড) অবলম্বন করিয়া কুরুপাণ্ডু মন্দিরে উত্তীর্ণ হইলাম। কাশ্মীরের মধ্যে এইটী সর্ব্বপ্রধান ভগ্নাবশেষ। বিশাল দেবায়তন অদ্যাপি দণ্ডায়মান রহিয়াছে। প্রাঙ্গণ বেষ্টন করিয়া চতুর্দ্দিকের গৃহশ্রেণী ভগ্ন শরীরে পুরাতন কাহিনী কহিতেছে। জনমানবের সমাগম নাই। কাশ্মীরে হিংস্র জীব থাকিলে, এই স্থান তাহাদের সুন্দর নিবাস হইত। এখন যে সকল প্রাচীন মন্দির বিদ্যমান আছে, তাহা ধর্ম্মাশোক ও অবন্তিবর্ম্মার রাজত্বকাল মধ্যে (২৫০ খ্রীঃ পূর্ব্বাব্দ হইতে ৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত) নির্ম্মিত বলিয়া কথিত। মটনের মন্দিরে সূর্য্যের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত ছিল। আমরা দুই দণ্ড তথায় বসিয়া হৃদয়ে ভাল করিয়া স্থানটীর চিত্র আঁকিয়া ভয়ন নামক তীর্থস্থানে চলিলাম। তথায় এক কুণ্ড হইতে বারি পরিস্রুত হইয়া বেগে চেনার বৃক্ষের ছায়াতলে ইতস্ততঃ চলিয়াছে। সেই প্রশস্ত ভূমিতে বসিয়া কাশ্মীরের সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে লাগিলাম। কুণ্ডের উপরেই আমাদের বাসস্থান নির্ণীত হইয়াছিল। জলমধ্যে অসংখ্য শঙ্কহীন মৎস্য বিচরণ করিতেছে। জল বিমল বলিয়া তলদেশ পর্য্যন্ত দেখা যাইতেছে। কাশ্মীর সহরে দেখিবার যোগ্য স্থান নাই। যাহা আছে, তাহা বাহিরে। কাশ্মীর-কুসুম পাঠে ধারণা হয়, সর্ব্বস্ব ঘুচাইয়াও

একবার এই ভূস্বর্গ দেখা আবশ্যক। কাশ্মীর কিন্তু ততটা উত্তেজক নহে।

তথা হইতে আমরা অচ্ছয়ল উৎস দর্শনে বহির্গত হইলাম। যে উদ্যানে অচ্ছয়ল উৎস আছে, সেই উদ্যানের প্রথম, দ্বিতীয়, পরে আমরা তৃতীয় তলে উঠিলাম। এই স্থানে পৃথিবী আপনার বুক চিরিয়া প্রবল বেগে অচ্ছয়ল উৎস উৎক্ষেপ করিতেছেন। শৈল পাদমূল হইতে অতিশয় প্রবল বেগে জল বহির্গত হইয়া চলিয়াছে। ঠিক নদীর মত স্রোত। আর এক উৎস স্তম্ভাকারে এক হস্ত উঠিয়া বাহির হইতেছে। দুই জল একত্র হইয়া বিপুল আকার ধারণ করত দ্বিতীয় তলে পড়িতেছে; সেখানে অসংখ্য ফোয়ারা ছুটিয়া তৃতীয় তলে পড়িয়া মহাবেগে উদ্যান হইতে নিম্নবর্ত্তী রাজপথে যাইয়া বিতস্তা নদীর কলেবর বৃদ্ধি করিবার জন্য ধাবিত হইয়াছে। সম্রাট্ শাহজহান এই উৎস পাইয়া বৃক্ষবাটিকা নির্ম্মাণ করিয়াছেন। পর্ব্বতের গাত্র অধোভাগে ক্রম-নিম্ন। সেই ক্রম ধরিয়া পর্ব্বতগাত্রে উদ্যান রচিত হইয়াছে, সুতরাং সমতল রক্ষা করিতে উদ্যানটি ত্রিতল বা চতুস্তল হইয়া পড়িয়াছে। এইরূপে তালাওয়ালা বাগানের সৃষ্টি। ইহারই অনুকরণে লাহোর নগরের সলিমার উদ্যান রচিত হইয়াছে। অচ্ছয়লের শোভা বড় চমৎকার। ফোয়ারাগুলির মাঝে মাঝে আবার আলোক রক্ষা করিবার স্থান আছে। আলোকের প্রতিবিম্ব যখন অসংখ্য ফোয়ারার জলে পতিত হয়, তখন যার পর নাই রমণীয় দেখায়। এমনি সম্বন্ধভাবে উদ্যান সমাবেশ করা হইয়াছে, যেন পৃথিবীপতি মোগল সম্রাট্ বিলাস-ভবন রচনা করিয়া, ফোয়ারার জল আহরণার্থ স্বয়ং অচ্ছয়ল উৎস খনন করাইয়াছেন।

বেরনাগের পথে প্রকৃতির শোভা অতীব রমণীয়। ঝিলম উপত্যকার পথে উচ্চ পর্ব্বত নাই, এবং এমন গম্ভীর সৌন্দর্য্যও নাই। উভয় পার্শ্বে

অসংখ্য গোলাপ ক্ষীণদলে কণ্টকময় গাছ ভরিয়া ফুটিয়া রহিয়াছে। এই গোলাপ আদিম। ইহার উৎকর্ষ সাধনানন্তর কলম করিয়া কণ্টকহীন ও বৃহৎ দলযুক্ত গোলাপের সৃষ্টি হইয়াছে। এ পথে অসংখ্য সেতুহীন নির্ঝর বা নদী আছে;—সেগুলি গভীর নহে, অথচ খরবেগ! দেখিলে নয়ন জুড়ায়। পর্ব্বতের উপর ঝাঁপান উঠিল। বিপরীত দিকে ফিরিয়া বসিলাম। বাহকেরা অতিকষ্টে চলিতে লাগিল। ক্রমে বেরনাগে গিয়া উত্তীর্ণ হইলাম। এই স্থান রাওলপিণ্ডি হইতে ১৬০ ক্রোশ। আমরা গিরিরাজ হিমালয়ে এতদূর ভ্রমণ করিয়াছি। বেরনাগ একটি অষ্টকোণ-বিশিষ্ট কুণ্ড। তাহার জল সাগরাম্বুবৎ নীল। সমুদ্র দেখিয়াছি। তাহার বারির সদৃশ বারি আর কোথায় মিলে নাই। নিতান্ত পরিষ্কার জল অত্যন্ত গভীর হইলে এই বর্ণ প্রাপ্ত হয়। এই উৎসের জল নিকটবর্ত্তী গোলাপ কুসুমের উদ্যান বহিয়া মহাবেগে, ঘোর নিনাদে, বিপুল পরিমাণে নিম্নভূমিতে পড়িয়া ফেনযুক্ত হইয়া, নদীর আকারে অতিশয় তীব্রবেগে ছুটিয়াছে। ইহাই বিতস্তা নদীর উৎপত্তি স্থান। কিন্তু কাশ্মীরবাসীরা বেতহোত্রকে বিতস্তার উৎপত্তিস্থান কহে। আমরা আহারান্তে তথায় যাইলাম। কয়েকটা উৎস এক স্থানে রহিয়াছে, তাহাদের দূরতা পরস্পরের নিকট হইতে বিতস্তি পরিমিত হইবে। কেহ কেহ অনুমান করেন, এই জন্যই নদীর নাম বিতস্তা হইয়াছে। আমি তাহার একটি উৎসের উপর পা রাখিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। ধন্য আমি, নদীর উৎপত্তি স্থান দেখিতে সমর্থ হইলাম। ঝিলমের (বিতস্তার) তীরে তীরে ১৩০ ক্রোশ আসিয়া তবে উৎপত্তি স্থান পাইলাম। আমাদের এতশ্রম আজ সফল হইল। একটা প্রস্রবণের জলে নদী বহুশত ক্রোশ ব্যাপী হয় না। তাহাতে অনেক ক্ষুদ্র নদী আসিয়া সঙ্গত হয় এবং বহু উৎস ও প্রস্রবণ জল দান করায় একটি প্রবল নদী জন্মে। যেটি সর্ব্বপ্রধান

জলদাতা তাহাকেই উৎপত্তি স্থান বলিতে হইবে। ইহাতে বেরনাগকে বিতস্তার উৎপত্তি স্থান বলিতে হয়। কিন্তু যেটির পর আর মিলিত হয় নাই অর্থাৎ যেটি সকলের অন্তে তাহাকে যদি নদীর উৎপত্তি স্থান বলিতে হয় তবে বেতহোত্র উৎসকে ঝিলমের উৎপত্তি স্থান বলিতে হইবে। বেরনাগ নূরজাহান ও জাহাঙ্গিরের প্রিয় আবাস ছিল। বেরনাগের উদ্যানে অসংখ্য গোলাপ বৃক্ষ অত্যন্ত সুগন্ধ যুক্ত খুব বড় বড় বিপুল ফুল লইয়া চতুর্দ্দিকে উজ্জ্বল করিয়া রহিয়াছে। একটি গাছে ত্রিশটি ফুল হইবে। রাজার গোলাপজল তৈয়ার করিবার জন্য ফুল তুলিয়া স্তূপাকারে একখানি গৃহে রাখা হইতেছে। আমরা সেই ঘরে অবস্থিতি করিলাম। কুসুম শয্যায় শয়ন হইল। সমস্ত দিন আকাশ মেঘাবৃত গিয়াছে। এক্ষণেও মন্দ মন্দ বৃষ্টি হইতেছে। কি মজার শীত! যত বস্ত্র গাত্রে দাও, উষ্ণ বোধ হয় না। আমার প্রত্যহ স্নান করা অভ্যাস। কিন্তু হিমালয়ে আসিয়া এমনি শীতের রাজ্যে পড়িয়াছি যে মসেড়ি শৈল হইতে শ্রীনগর পর্য্যন্ত পথে একদিন স্নান করি নাই। স্নান করিবার ইচ্ছাও হয় নাই। এমন কি 'ষ্টকিং' খোলাই হয় নাই। পাদাবরণিকা ধারণ করিলে যে আরাম বোধ হয় তাহা পূর্ব্বে কদাপি অনুভূত হয় নাই।

বনহালের পথ দিয়া প্রত্যাগমন করিতে লাগিলাম। বাহকেরা কহিল আমরা এত কষ্ট করিয়া যে আপনাকে লইয়া যাইতেছি তাহার মূল্য আমরা কিছু পাইব না। আপনি যাহা দিবেন তাহা সমস্ত মুন্সি আত্মসাৎ করিবে, আমাদিগকে কেবল একদিনের আহার উপযোগী তণ্ডুল দিবে। আমি ইসলামাবাদে নৌকায় পৌঁছিয়া মুন্সিকে ডাকাইলাম। বাহকদের মজুরি তাহার নিকট দিতে অসম্মত হইলাম। অবশেষে কহিলাম তবে জিলে সাহেবের নিকট পাঠাই। লক্ষ্মণ কহিল তাহার নিকট

পাঠাইলে তিনিই লইবেন, মুন্সিও পাইবে না, বাহকও পাইবে না। আমি উপায়ান্তর না দেখিয়া রফা করিলাম। অর্দ্ধেক মুন্সিকে দিলাম, অর্দ্ধেক বাহকদিগকে দিলাম। মরিপথে ইংরাজ যাতায়াত করে, সেখানে এরূপ নাই, সমস্তই বাহকেরা পায়। কি ভয়ানক ব্যাপার। যে পরিশ্রম করিবে সে না পাইয়া অন্যে অর্থ লয়। ইংরাজের চক্ষু যে পথে আছে সে পথে এরূপ হয় না। অতএব দেখা যাইতেছে কাশ্মীর রাজের উপর ইংরাজের দৃষ্টি থাকিলে প্রজার সুখ বৃদ্ধি হইবে। একজনের উপর আর একজন দৃষ্টি রাখিলে অন্যায় করিতে সাহস হয় না।

তরণী ছাড়িল। আমরা আহারাদি করিতে লাগিলাম। সন্ধ্যাকালে এক পিণ্ডে (গ্রামে) দুগ্ধ আহরণের জন্য নৌকা লাগান হইল। একটু ভ্রমণের জন্য নামিলাম। এখানে বিক্রয়ের জন্য অশ্ব উৎপন্ন ও পালিত হয়। অরক্ষিত অশ্বপাল যথেচ্ছাক্রমে বিচরণ করিতেছে। অশ্বগুলি হৃষ্টপুষ্ট ও মূল্যবান। রক্ষক সন্ধ্যা হইয়াছে বলিয়া বাটী লইয়া যাইতে চাহিতেছে কিন্তু দুই একটা অশ্ব কিছুতেই যাইতে চাহিতেছে না, কেবল দৌড়িতেছে। সমস্ত রাত্রি নৌকা বাহিয়া প্রাতেঃ পাম্পুরের কেশর ক্ষেত্রে আসিয়া উপনীত হইলাম। অদ্যাপি উদ্ভিদ জন্মিবার সময় হয় নাই। অনেক স্থানে জাফ্‌রানের মূল দুর্ভিক্ষ পীড়িত লোকে আহার করিয়া ফেলিয়াছে। আমাদের দেশে কাশ্মীর ভিন্ন অন্যত্র জাফ্‌রান উৎপন্ন হয় না। একটা মূল তুলিয়া দেখা হইল তাহা পলাণ্ডুর মত।

আমার দুইটি বাসনা অপূর্ণ রহিল। গুলমর্গে যাওয়া হইল না। অদ্যাপি সে স্থানে পুষ্পোদ্গম হয় নাই। আর কিছুদিন অপেক্ষা করিলে হইতে পারে। কাশ্মীরের মেওয়া খাওয়া হইল না। তাহা পক্ক হইতে বিলম্ব আছে। তুত, গেলাস ও ষ্ট্রবেরি পাকিয়াছে। তাহাই খাওয়া

হইল। কাঁচা বাদাম ও খোবানির তরকারি করিয়া খাওয়া হইয়াছে। অমরনাথ তীর্থ যাইবার জন্য বহু সন্ন্যাসী সমাগম হইয়াছে। পথ দুরাগম, সেখানে ঝাঁপান চলিবার উপায় নাই, এজন্য যাইতে পারিলাম না।

শ্রীনগরের প্রধান রাজপথ বিতস্তা-বক্ষ। নদীর উভয়তটে বাটী ও ঘাট। স্থল-কমল-গঞ্জন রমণীগণ গৃহকার্য্য-তৎপরা। শাক-বিক্রয়কারিণী আমাদের অবোধ্য ভাষায় নানারূপ গল্প করিতে করিতে তরণী বাহিতেছে। কাষ্ঠ-বিক্রেতার নৌকা যাইতেছে। মুসলমান বর বন্দুকের শব্দ করিয়া হামামে চলিয়াছে। হিন্দু বর শঙ্খধ্বনি করিয়া, ভৃত্যাদির দ্বারা স্বীয় মস্তকে ছত্রধারণ করাইয়া বিবাহ করিতে যাইতেছে। দেওয়ান সাহেব সবেগে তরণীর ক্ষেপণী সঞ্চালন করাইয়া বাটী ফিরিতেছেন। শাহমদম্ মহজিদ্ দেখিতে তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইলাম। প্রকোষ্ঠ সকল নানাপ্রকার কারুকার্য্যময়। কোরাণ শরিফের শ্লোক গৃহময় খোদিত রহিয়াছে। বড়শা দেখিতে পাইলাম। উহা পুণ্যশ্লোক জৈনউলউদ্দিনের সমাধি মন্দির। এই মুসলমান রাজা কাশ্মীরের যথেষ্ট শিল্পোন্নতি সাধন করেন। ইঁহার আদেশে সংস্কৃত রাজতরঙ্গিণীর এক ভাগ বিরচিত হয়। শঙ্করাচার্য্যের টিব্বায় উঠিলাম। উহা তিব্বতের পর্ব্বত। সহস্র সোপান অতিক্রম করিয়া উঠিতে অতিশয় কষ্ট হইল, কিন্তু শ্রমাতিরিক্ত পুরস্কার পাওয়া গেল। এখানে প্রকৃতির শোভা অনুপম। ডল হ্রদে যেন গ্রামগুলি ভাসিতেছে। হিন্দুর কাশ্মীর মুসলমানেরা লইয়াছিল। নরশার্দ্দূল রণজিৎ সিং পাঁচশত বৎসর পরে মুসলমানের রক্তে ধরাকে বিধৌত করিয়া পুনরায় কাশ্মীর গ্রহণ করিলেন। হিন্দুদের মন্দির মুসলমান ভজনালয়ে পরিণত হইলে, তাহার আর পুনরুদ্ধার হয় না। কিন্তু এখানে তাহার অন্যথা দেখা যায়। দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী কোন হিন্দু রাজা এই মন্দির নির্ম্মাণ করেন। তাঁহাদের মত পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে মন্দিরের মূর্ত্তি পরিবর্ত্তন

অবশ্যই ঘটিয়াছিল। মুসলমান আসিয়া শিবলিঙ্গ উৎপাটন করিয়া মসজিদ করিল। রণজিৎ কর্ত্তৃক পুনরায় এইস্থানে শিব-স্থাপনা হয়। এই স্থানকে স্বাধীনতার তীর্থ বলিতে পারা যায়। এই গিরিশিখরে শিব-মন্দির ব্যতীত আরও দুই এক খানি বাসগৃহ ছিল, তাহা এখন ভগ্ন হইয়া গিয়াছে। একটি প্রস্রবণ ছিল, তাহাও শুষ্ক হইয়া গিয়াছে।

রঘুনাথপুরে পানচক্কি দেখিলাম। ক্ষুদ্র সিন্ধু নামক সরিতের জল মনুষ্য খাত প্রণালীদ্বারা অতিবেগে আসিয়া চক্রের উপর পড়িতেছে, তাহাতে চক্র ঘুরিতেছে। সুতরাং তদনুবর্ত্তী পেশনযন্ত্রে ধান্য হইতে তণ্ডুল নিষ্কাষিত হইতেছে।

বাবু নীলাম্বরের কীর্ত্তি রেশমের বাণিজ্য বিপন্ন। কৌষেয়শালা উজাড় হইয়া পড়িয়াছে। গুল্‌মর্গে যাইবার সময় আসিবে না, এজন্য আরমন্ সাহেবের উদ্যানে যাইয়া গুল্‌মর্গের ফুল দেখা হইল। একদিন শালবোনা দেখিতে যাওয়া হইল। মহারাজা এক্ষণে শালের শুল্ক উঠাইয়া দিয়াছেন। কাশ্মীরের নগর যে দেখিতে সুন্দর নহে তাহার কারণ আছে। আমাদের দেশে কোনও বস্তুর প্রয়োজন হইলে সমস্ত পৃথিবী হইতে সাহায্য পাওয়া যায়। কিন্তু এস্থান দুর্গম গিরি পরিবেষ্টিত বলিয়া অন্য স্থানের সাহায্য পাইতে বঞ্চিত। এই ৩০ ক্রোশ বিস্তীর্ণ ১০ ক্রোশ প্রশস্ত উপত্যকায় যাহা মিলে তদ্দ্বারা কার্য্য সমাধা করিতে হয়। দূরদেশ সাধারণ লোকের নিকট এমনি অপরিচিত যে ভারতবর্ষ বলিতে পঞ্জাব মাত্র বুঝে। বেরনাগ পর্য্যন্ত যিনি গিয়াছেন তিনি অনেকদূর গিয়াছেন।

ভারতের মধ্য ভূভাগে ব্যবসায় অনুসারে মনু-প্রবর্ত্তিত বর্ণ-বিভাগ ঘটিয়াছিল। কিন্তু তাহার পূর্ব্ব হইতেই কাশ্মীরে আর্য্য বংশের বাস; তন্নিমিত্ত এখানে সেরূপ হয় নাই, এক বর্ণই রহিয়াছে। ব্রাহ্মণ ভিন্ন বুহুর নামে কয়েক ঘর কাশ্মীরী আছে বটে, কিন্তু তাহাদিগের স্ত্রী জাতির

অলঙ্কার ও বর্ণ দেখিলে, তাহাদিগকে উপনিবেশী বলিয়াই বোধ হয়। অত্রত্য পণ্ডিতদিগের বর্ণের সহিত যদি কোন সৌন্দর্য্যের তুলনা করিতে হয়, তবে গোলাপ ফুলের রূপের সাদৃশ্য হইতে পারে। কাশ্মীরীর দুধে আলতা গোলা রঙ দেখিয়া, ইউরোপীয় লেখকেরা ইহাদিগকে ইহুদিবংশ-সম্ভূত কহেন। এমন কি, কাশ্মীরের প্রাচীন খিলানের ত্রিকোণ আকার দেখিয়া, তাঁহারা তাহাতে ইহুদা দেশীয় জেরুজেলমের মন্দিরের সাদৃশ্য দেখেন। একজন হঙ্গেরিদেশীয় পণ্ডিত জাতিতত্ত্বের অনুসন্ধানার্থ ভারতে আসেন। তিনি কাশ্মীরীদিগকে দেখিয়া কহিয়াছেন যে, এমন অমিশ্রিত প্রাচীন জাতি আমি আর কোথাও দেখি নাই। কাশ্মীরী মুসলমানেরা পণ্ডিতদিগের ন্যায় রূপবান্ নহে। যে সকল মুসলমান কিছুদিন পূর্ব্বে হিন্দু ছিল, তাহারা দেখিতে পণ্ডিতদিগের ন্যায় সুন্দর মুসলমানেরা যে হিন্দুর ন্যায় সুন্দর নহে, বোধ হয়, বিভিন্ন-জাতীয় লোকদিগের সহিত বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হওয়াই তাহার প্রধান কারণ।

কাশ্মীরের জন-সংখ্যা প্রায় চারি লক্ষ। ইহাতে প্রতি দশ জনে একজন হিন্দু। স্ত্রী ও পুরুষ আপাদ-লম্বিত ফেরণ নামক আংরাখা ও পুরুষেরা উষ্ণীষ ব্যবহার করেন। মুসলমান ও ব্যুহুর স্ত্রীলোকে লাল টুপি ও পণ্ডিতানীরা শ্বেত শিরস্ত্রাণ ব্যবহার করিয়া থাকেন। সধবা স্ত্রীলোকে এক প্রকার কর্ণভূষণ ব্যবহার করেন, তদ্দ্বারা তিনি কুমারী বা বিধবা নহেন বলিয়া প্রকাশ পায়। পণ্ডিতারা এক প্রকার ঘাসের পাদুকা ব্যবহার করেন। রৌপ্যনির্ম্মিত অলঙ্কার তাঁহাদের প্রায় এক হস্তেই থাকে, দুই হস্তে পরিতে হইলে দুই প্রকারের পরিয়া থাকেন। কাশ্মীরে বিদ্যার চর্চ্চা অতি অল্প। এখানকার জাতীয় ভাষা কাশুর। ইহা লেখ্য ভাষা নহে। হিন্দু মুসলমান সকলেই পারস্য ভাষায় লেখা পড়া করেন। এখানে রীতিমত কোন বিদ্যালয় নাই। পণ্ডিতেরা সংস্কৃত

ভাষা অবগত নহেন। যাঁহারা শাস্ত্রী তাঁহারা ফারসী পড়েন না। জন্মপত্রী নির্ম্মাণই তাঁহাদের শাস্ত্রীয় ব্যবসায়। রাজভাষা পারস্য। পারস্য ভূমি কাশ্মীরকে অনুপ্রাণিত করিয়াছে। কাশ্মীরের শাল পারস্য-শিল্প। পেপিয়ার মেসি, দামস্কাস, মিনার কাজ ও চা পাত্র এবং ররাব প্রভৃতি বাদ্য যন্ত্র সমস্তই পারস্যের দ্রব্য। হিন্দুই হউন বা মুসলমানই হউন, কাশ্মীরির আহার ভাত ও মেষ-মাংস। আমাদের সূপকার একদিন কাশ্মীরী ব্যঞ্জন রাঁধিয়াছিল। সে দিন শাকের সহিত তৈল দ্বারা ভাজা ছানা, মেষ মাংসের সহিত শর্করা দিয়া অম্বল, নদরু অর্থাৎ মৃণাল এবং গুচ্ছি (বেঙ্গের ছাতা) দ্বারা প্রস্তুত ব্যঞ্জন হইয়াছিল। সোপুরের বাথরথানি রুটি ও কুলচা [বিস্কুট] চার সহিত ব্যবহৃত হয়। কাশ্মীরের বিপণীতে সাধারণতঃ সুরাটী ও সবুজ এই দুই প্রকারের চা দেখিতে পাওয়া যায়। সুরাটী চা প্রায় ইংরাজি চার ন্যায়। বিখ্যাত সবুজ চা ও সুরাটী চা লদাক্ এবং পঞ্জাব হইতে আনীত হয়। কাশ্মীরে চা প্রস্তুত প্রণালী দুই প্রকার। প্রথম মোগল চা, দ্বিতীয় সিরি চা। একতোলা চা ও পাঁচ বাটি জল, চা পাত্রে রক্ষা করিয়া অর্দ্ধ ঘণ্টা কাল জ্বাল দিতে হয়; পরে অপেক্ষাকৃত শীতল হইলে, তাহাতে কিছু জল মিশ্রিত করিয়া, চিনি ও মসলা দিয়া পুনরায় অর্দ্ধ ঘণ্টা জ্বাল দেওয়া আবশ্যক; তৎপরে দুগ্ধ মিশাইয়া লইলেই উৎকৃষ্ট পানযোগ্য মোগল চা প্রস্তুত হইল। ইহার বর্ণ রক্তিম। সিরি চা প্রস্তুত করিতে হইলে, প্রথমতঃ কিছু জল ও সোডা চার সহিত মিশ্রিত করিয়া, অর্দ্ধ ঘণ্টা কাল জ্বাল দিতে হইবে; পরে দুগ্ধ, লবণ ও মাখন মিশাইয়া পুনরায় অর্দ্ধ ঘণ্টা কাল জ্বাল দিলেই পানযোগ্য সিরি চা প্রস্তুত হইল। চীন ও লাশা হইতে এখানে অনেক চা আমদানী হয়।

একাদশীর দিন বাজারে মাংস বিক্রয় করা রাজার নিষেধ।

মুসলমানেরা এখানে গো-মাংস ভক্ষণ করিতে পায় না। গো-হত্যা ও নরহত্যার দণ্ড এক। পূর্ব্বে মুসলমান ভৃত্য পণ্ডিতের জল তুলিত, এক্ষণে রাজার হিঁদুয়ানীতে তাহা রহিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণেরা ভোজন কালে একখানি পট্টু অর্থাৎ উর্ণাবস্ত্র পাতিয়া তদুপরি ভোজনপাত্র রক্ষা করিয়া একত্র সকলে আহার করেন। বাঙ্গালা ব্যতীত সকড়ির বিচার উত্তর ভারতে আর কোথাও দেখা যায় না। কাশ্মীরে সঙ্গীত বড় দূষ্য। আমরা স্ব স্থানে একদিন তৌর্য্যত্রিক অনুষ্ঠান করিতে সঙ্কল্প করায় জনৈক হিতৈষী কহিলেন, কেহ নিবারণ করিবে না, কিন্তু পল্লীর সকলে আপনাদিগকে অভদ্র বলিবে এবং মহল্লা মুখতিয়ার রাজসন্নিধানে রিপোর্ট করিবে। যাঁহারা নঘ্‌মা (সঙ্গীত) করাইতে চান, তাঁহারা ডলহ্রদে করাইয়া থাকেন। আমরা একখানি বৃহৎ ডোঙ্গায় করিয়া ডল অভিমুখে যাত্রা করিলাম। চাপ্পা অর্থাৎ ক্ষেপণী-তাড়নের অপূর্ব্ব কৌশলে ডোঙ্গাখানি তালে তালে নাচিয়া চলিল। আমরা পৌছিবামাত্র সঙ্গীত আরম্ভ হইল। নর্ত্তকীর পরিচ্ছদ ও কেশবিন্যাস কাবুলীদিগের ন্যায়। নর্ত্তকীর সহিত একটি কিশোরী এবং বাদ্যকরেরাও গাইতে লাগিল। বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে সাজ, কানুন ও তবলা। বাঁয়ার কার্য্য অপর এক ডাহিনার দ্বারা হয়। পূর্ব্বতন দিল্লীর মুসলমান সম্রাটগণ সঙ্গীতকে ঘৃণা করিতেন। তাহার পর একজন বুদ্ধিমান্ গায়ক কৌশলক্রমে সভায় প্রবিষ্ট হইয়া, বাদসাহকে সঙ্গীতে মোহিত করিয়া ফেলেন। সেই হইতেই তাঁহারা উক্ত বিদ্যার হিতৈষী হন। তাঁহাদিগের বিদ্বেষের কারণ এই যে, ঐ বিষয় কোরাণে নিষিদ্ধ। কাশ্মীর বহুকাল মুসলমান রাজার অধীন ছিল, সেই জন্যই বোধ হয়, নগরে সঙ্গীত দূষ্য হইয়াছে।

প্রজাবর্গ ভূমির কর অর্দ্ধেক রৌপ্যমুদ্রা ও অর্দ্ধেক ধান্য দিয়া পরিশোধ করে। রাজা সেই ধান্য লইয়া রীতিমত ব্যবসা করেন। কর্ম্মচারীদিগকেও

অর্দ্ধেক ধান্য বেতন দেন। এদেশের কৃষককে জমীদার বলে। নৈসর্গিক নিয়মানুসারে তাহারাই জমীদার পদবাচ্য হইতে পারে, সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহাদিগের ন্যায় বিপন্ন এদেশে আর নাই। কাশ্মীরীরা বলবান্ কিন্তু ভীরু,—স্বাধীন থাকা কেবল শারীরিক বলসাধ্য নহে। কাশ্মীর চির-পরাধীন। এক্ষণে যিনি রাজা, তিনি কাশ্মীরী নহেন, পঞ্জাবী। রাজকীয় প্রধান পদ সকল পঞ্জাবী ও কাশ্মীরী হিন্দুদিগের অধিকৃত। হিন্দুদিগের মধ্যে, বোধ করি, দুঃস্থ লোক নাই।

কাশ্মীরীদের ভাষা ও ভাবের অবগতির জন্য তদ্দেশীয় কয়েকটি প্রবাদ প্রদত্ত হইতেছে।

১। উন ক্যাহ জাঁনি প্রোণ বত।	১। অন্ধ কি জানে শুক্লভাত?
২। ববস্ হাবান সংসার কি তমাস।	২। পিতাকে দেখায় সংসারের তামাসা।
৩। লগ্ন বিজী ইয়াঁন হুম ছরোন।	৩। বিবাহ কালে আসিতেছে মল।
৪। যস্ কোরি নে থুর সকুর লুবরন্।	৪। যে কন্যার বিবাহ, সেই কন্যা গোময় আনিতে গিয়াছে।
৫। শির নিশিয় রহতম্ থত্রর মত করতম্।	৫। দৌর্জ্জন্য হইতে রক্ষা কর, ভাল নাই করিলে।

দ্রষ্টব্য।—এখানে লতাগুল্ম পুঞ্জিকৃত করিয়া মৃত্তিকা প্রক্ষেপ দ্বারা প্রস্তুত যে ভাসমান দ্বীপ আছে, তাহাতে বাসোপযোগী গৃহ নির্ম্মিত হইতে পারে না। তবে সবজি উৎপন্ন হইতে পারে বলিয়া, অপর কর্ত্তৃক ভূমি অপহৃত হইয়া, তাহার ক্ষেত্রে ভাসাইয়া লইয়া সংযুক্ত করার অভিযোগ হইয়া থাকে।

পঞ্জাব। *

লাহোর।—শাহ অলমি দরওয়াজায় আমাদিগের বাসস্থান নিরূপিত হইল। পূর্ব্বে লাহোর নগর চতুর্দ্দিকে পরিখা-বেষ্টিত ছিল। এক্ষণে ইংরাজ বাহাদুর তাহা ভরাট করিয়া উদ্যানে পরিণত করিয়াছেন। নগরের এই ভাবটি সাতিশয় মনোরম। সহরের চতুর্দ্দিকে, যে দিকে ইচ্ছা বাহির হও, ফলপুষ্প-শোভিত সুন্দর উদ্যান। তন্মধ্যে জলনিঃসরণের জন্য পয়ঃ-প্রণালী চলিয়া গিয়াছে। মধ্যে মধ্যে স্ত্রীলোকদিগের জন্য স্নানপ্রকোষ্ঠ। এ দেশের রমণীগণের পরিধেয় বসন ইজার বা ঘাগ্‌রা। তাহাদের স্নানকালে তৎসমুদায়ের উন্মোচন ব্যতিরেকে গত্যন্তর থাকে না। কাশ্মীরে উল্লিখিত প্রণালী প্রচলিত। শ্রীনগরে স্ত্রীলোকদিগের স্নান-কোষ্ঠ দেখিয়াছি। পূর্ব্বে আমার সংস্কার ছিল, পঞ্জাবের অধিকাংশ লোক শিখ। এখন দেখিতেছি তাহা নহে; শিখ ধর্ম্মাবলম্বী লোক অতি অল্প। তবে কৃষক সম্প্রদায় ও যাহারা সৈনিক কার্য্যে নিযুক্ত থাকে এবং জাঠ-নামধারী ব্যক্তিগণই বোধ হয় শিখ। একদা আমি একখানি গুরুমুখী অক্ষরের বর্ণমালা লইয়া অনেক অনুসন্ধানেও তাহার পাঠক খুঁজিয়া পাই নাই। স্বরবর্ণ মধ্যে 'এ' এবং 'ও' বর্ণ নাই। অথচ মুদ্রিত পুস্তকে ঐ স্বর যুক্ত অক্ষর দেখিয়াছি। বর্ণমালার ক্রম এইরূপ; উ অ ই। স হ। ক খ গ ঘ ঙ। চ ছ জ ঝ ঞ। ট ঠ ড ঢ ণ। ত থ দ ধ ন। প ফ ব ভ ম। য র ল ব ড় ঢ়।

---

* (১) পঞ্জাবেতিহাস—শ্রীরাজনারায়ণ ভট্টাচার্য্য প্রণীত। (২) শ্রীনগেন্দ্রনাথ চট্টো-পাধ্যায়ের বক্তৃতা। (৩) Railway Guide.

হিন্দুর মধ্যে ক্ষত্রিয়ই অধিক। ক্ষত্রিয়াণীরা সুন্দরী। পরন্তু যাহারা এখান হইতে কলিকাতা, কাশী প্রভৃতি স্থানে গিয়া বাস করিয়াছে, তাহারা পরিষ্কৃত থাকে ও শাড়ি পরিধান করে বলিয়া অধিকতর সুন্দরী দেখায়। শ্বেতরাণী ও স্বর্ণলতা একই কথা।

এখানে প্রায় সকল দোকানেই সাইন-বোর্ড দেখিলাম। উকিল, মোক্তার এমন কি জনৈক নর্ত্তকী, আপন অলিন্দের নিম্নে ইংরাজীতে সাইন-বোর্ড লিখিয়া রাখিয়াছে। তাহার মর্ম্ম এই, নৃত্য দর্শনেচ্ছু যে কেহ আসিতে পারেন, পরিচিত লোকের সহিত সাক্ষাতের সম্ভাবনা নাই ইত্যাদি। মহারাজ রণজিৎ সিংহের সমাধি-মন্দিরের ছাদের অভ্যন্তর ভাগ সম্পূর্ণ দর্পণ-মণ্ডিত। অন্যান্য কয়েক স্থানেও ঐরূপ বিচিত্র কারুকর্ম্ম (শিস) দেখা গেল। এই স্থানে শাহজহান সম্রাটের "শালামার" নামক এক সুন্দর অপূর্ব্ব ত্রিতল উদ্যান-বাটিকা আছে। তন্মধ্যস্থ সহস্র ফোয়ারা-পরিশোভিত শ্বেত-প্রস্তর-বিনির্ম্মিত মণ্ডপে উপবেশন করিয়া, জলপ্রপাতের মধুর ধ্বনি শ্রবণে সাতিশয় সুখানুভব হইল।

একদিন প্রাতঃকালে দেখিলাম, মহাসমারোহে একদল লোক যাইতেছে। তাহাদের অগ্রে ইংরাজী বাদ্য ও দেশী বাদ্যকর-সম্প্রদায়; তাহার পর নর্ত্তকী; মধ্যে মধ্যে এক এক স্থানে দাঁড়াইয়া গান করিতে করিতে চলিয়াছে। জিজ্ঞাসায় জানা গেল, বালকের চূড়াকরণ উপলক্ষে এই সমারোহ।

এখানে মিশির ব্রাহ্মণেরা রন্ধন করে, উচ্ছিষ্ট লয়; সুতরাং বাসন মাজে এবং আবশ্যক মত জুতা বুরুষও করিয়া থাকে। বাঙ্গালা দেশে যে প্রবাদ আছে, "চণ্ডীপাঠ হইতে জুতা বুরুষ" এ প্রবাদের সার্থকতা এইখানে দৃষ্ট হয়। যাহা হউক, প্রবাসী বাবুদিগের ইহাতে সুবিধা ভিন্ন অসুবিধা নাই; একজন পাচক ব্রাহ্মণ রাখিলেই আর অন্য ভৃত্যের প্রয়োজন হয় না।

এখানে কেবল ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রী ও জাঠ এই তিন জাতি দেখা যায়। কায়স্থ, বৈদ্য কাহাকে বলে, তাহা ইহারা জানে না। বোধ হয়, বাবুদিগকে ব্রাহ্মণ ভাবিয়াই তাহারা সকল কায করিতে স্বীকার করে।

অমৃতসর।—এই নগরে "দরবার সাহেব" প্রধান দ্রষ্টব্য স্থল। উক্ত দরবার অমৃতসর নামক সুবৃহৎ সরোবরের মধ্যস্থলে অবস্থিত। গুরু রামদাস এই অমৃতসর খনন করেন এবং গুরুগোবিন্দ তাহাকে সমৃদ্ধিশালী করেন। মুসলমানগণ যে যে স্থান গোরক্তে কলঙ্কিত করিয়াছিল, গুরু-গোবিন্দ সেই সেই স্থান যবন রক্তে পরিশুদ্ধ করিয়াছিলেন। গুরুর পিতা তেগ বাহাদুর দিল্লীর সম্রাট কর্ত্তৃক নিহত হন; তাহাতেই ধর্ম্মপরায়ণ গোবিন্দ আপন শিষ্য (শিখ) মণ্ডলীকে সংগ্রাম-বিদ্যায় ভূষিত করিয়া যান। তাঁহার এমন অবস্থান্তর না হইলে, বোধ হয় শিখ জাতি এতদূর রণ-নিপুণ হইতে পারিত না। অদ্যাপি প্রত্যেক শিখ গোবিন্দের আজ্ঞায় সদা সশস্ত্র থাকে। আজ্ঞারক্ষার্থ এমন কি একখানি ছুরি, অভাবপক্ষে, হস্তে লৌহবলয়ও ব্যবহার করিতে হয়। তেগবাহাদুর যখন বধ্যভূমিতে নীত হইলেন, সম্রাট জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তোমার যদি কিছু প্রার্থনা থাকে বল। তিনি কহিলেন, আমাকে একখণ্ড কাগজ, লেখনী ও মস্যাধার দিতে বল। তেগ (তরবারি) বাহাদুর একটু লিখিয়া তাহা গল-দেশে ধারণ করিলেন। তৎক্ষণাৎ জল্লাদের শাণিত অস্ত্রে পুণ্যাত্মা সাধু-পুরুষের মস্তক দেহ হইতে বিচ্যুত হইল। অতঃপর সেই কাগজখানি খুলিয়া পাঠ করা হইল। তাহাতে লিখিত ছিল, "আমি শির দিলাম, শর অর্থাৎ ধর্ম্ম দিলাম না।" শিখজাতি অতি অল্প দিনই স্বাধীনতা হারাইয়াছে। অদ্যাপি ইহাদের বীরত্বের চিহ্ন দৃষ্ট হয়। খৃষ্টীয় ধর্ম্মপ্রচারকগণ প্রায় বক্তৃতাকালে পরধর্ম্মের নিন্দাবাদ করিয়া থাকেন। একদা কোন এক প্রচারক শিখ ধর্ম্মের নিন্দাবাদ করিতেছিলেন, এমন সময় পশ্চাৎ হইতে

সহসা একজন তাঁহার মস্তকে যষ্টিদ্বারা আঘাত করিল। সেই আঘাতেই প্রচারক পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন। বিচারক জিজ্ঞাসা করিলে, হত্যাকারী উত্তর দিল, "আমাদের গুরুর এই আদেশ আছে যে, যে ব্যক্তি শিখধর্ম্মের নিন্দা করিবে, তাহাকে সাত ঘা লাঠি মারিবে; কিন্তু আমি এক ঘা মাত্র মারিয়াছি, ও ব্যক্তি তাহাতেই হত হইয়াছে।" শিখদিগের বীরত্ব যেমন প্রশংসনীয়, সাধুতাও তদনুরূপ। অমৃতসর নগরে যাহাতে গো-হত্যা না হয়, তজ্জন্য একদা কতকগুলি নগরবাসী বৃটিশরাজ সমীপে বিনীত আবেদন করেন। কিন্তু তাঁহাদিগের অনুরোধ গ্রাহ্য হয় নাই। একদিন প্রাতঃকালে শুনা গেল, অমৃতসর নগরীর সমস্ত কসাই গত রাত্রিতে নিহত হইয়াছে। পুলিস কর্ত্তৃক অপরাধিগণ ধৃত হইয়া বিচারালয়ে আনীত হইল এবং বিচারে তাহাদের প্রাণদণ্ডের আদেশ হইল। এমন সময় কতিপয় শিখ সশস্ত্র যোদ্ধবেশে তথায় উপস্থিত হইয়া কহিল, "নিরপরাধের কখনই প্রাণদণ্ড হইতে পারে না। উহারা হত্যাকারী নহে, কসাইদিগকে আমরাই নিহত করিয়াছি। দেখ, এখনও আমাদিগের তরবারিতে রক্তের চিহ্ন রহিয়াছে। গোহত্যাকারীকে নিপাত করিলে পাপ স্পর্শে না। তজ্জন্য একান্তই যদি দণ্ডগ্রহণ করিতে হয়, আমরা প্রস্তুত আছি।" প্রবলপ্রতাপ দিল্লীশ্বরও সময়ে সময়ে শিখদিগের ভয়ে কম্পিত হইতেন। যতদিন "পঞ্জাবকেশরী" রণজিৎ জীবিত ছিলেন, ততদিন পঞ্জাবের স্বাধীনতার লোপ হইবার কোন সম্ভাবনা ছিল না। রণজিৎ সিংহের মৃত্যুর পর গৃহবিচ্ছেদ মিটাইবার জন্য ইংরাজ সৈন্য পঞ্জাবে আহূত হইয়াছিল। বীরত্বে ও বিক্রমে বৃটীশসিংহ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। "পঞ্জাবকেশরী" রণজিৎ যখন ইংরাজের পত্র পাইতেন, তখন উৎকণ্ঠিত ভাবে পাদচারণা করিতেন। ইংরাজরাজও শিখের বিক্রম ও বীরত্বের অনেক নিদর্শন পাইয়াছেন। চিলিয়ানওয়ালা সমরে বৃটীশ পতাকা শিখের হস্তগত
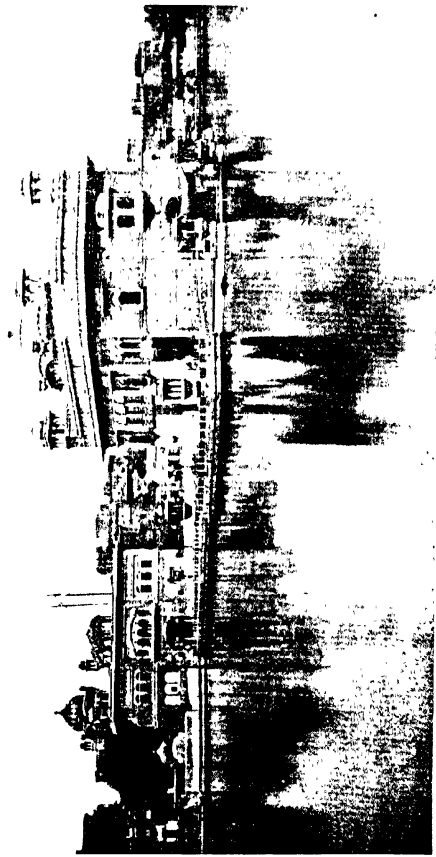
অমৃতসর—দরবার সাহেব

(ভারত প্রদক্ষিণ)

হয়। শিখবীরগণ উপযুক্ত নেতার অভাবে অবশেষে পরাজয় স্বীকার করেন। জয়চন্দ্র পৃথ্বীরাজকে দমন করিবার জন্য সাহাব উদ্দিনকে ভারতে আনয়ন করেন। তাহাতেই এদেশে মুসলমানগণ স্থায়ী হয়েন। লাল সিং খাল্‌সা সৈন্যের পতন কামনায় ইংরাজের শরণাগত হয়েন। রণজিৎ সিংহের মৃত্যুর পর, সাত বৎসরের মধ্যে ঈর্ষ্যাপরায়ণতা ও জিঘাংসা দোষে অমাত্যবর্গ সমেত সমস্ত রাজকুল নির্ম্মূল হইয়া যায়।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, অমৃতসর নামক বৃহৎ সরোবরের মধ্যস্থলে গুরুদরবার প্রতিষ্ঠিত। একটি শ্বেত-প্রস্তর নির্ম্মিত সেতুদ্বারা মন্দির সংযোজিত হইয়াছে। মন্দিরের আকার দেবালয়ের মত নহে। উহা সম্রাটের দরবারের ন্যায়, শ্বেত-প্রস্তর নির্ম্মিত; তাহাতে পচ্চিকারী করা চতুর্দ্দ্বার যুক্ত প্রশস্ত গৃহ। গৃহমধ্যে বিচিত্র সোণালি কাজ করা। বাহিরের শিখরভাগ স্বর্ণমণ্ডিত। গৃহাভ্যন্তরে চৌকির উপর সুবৃহৎ গ্রন্থ-সাহেব বিরাজমান। আচার্য্য দীর্ঘ শ্মশ্রু ও শ্বেত উষ্ণীষ ধারণ করতঃ গম্ভীরভাবে গ্রন্থ সাহেবকে সম্মুখে করিয়া উপবিষ্ট আছেন। পার্শ্বে গায়ক-মণ্ডলী মৃদঙ্গ ও বীণা সহযোগে ধ্রুবপদ গান করিতেছে। সেতুর পরপারে অকালমুঙ্গা নামক হর্ম্ম্য। সম্মুখে বিচিত্র কারুকার্য্য যুক্ত শ্বেত প্রস্তরের প্রাঙ্গণ। সেখানেও মেঘগম্ভীর স্বরে মৃদঙ্গ সহ ধ্রুবপদ গীত হইতেছে। গানের যেমন ভাব তেমনি সুর! রাত্রিশেষে আচার্য্যগণ এই স্থান হইতে গ্রন্থ সাহেবকে মস্তকে করিয়া মঙ্গলবাদ্য বাজাইয়া বিভুগুণ গান করিতে করিতে দরবারে লইয়া যান। তথায় মঙ্গল আরতি নিষ্পন্ন হয়। সূর্য্যোদয় হইলে, দরবারের অর্থসাহায্যকারিগণের নামের বৃহৎ তালিকা পঠিত হয়। অতঃপর নানা ভাব যোগের সহিত গ্রন্থ উদ্ঘাটিত করিয়া তন্মধ্য হইতে অতি অল্পমাত্র অংশ পঠিত হইলে, গ্রন্থ সাহেবকে আবৃত করা হয়। সরোবরের চতুর্দ্দিকে নানাস্থানে গুরুবাগ ও বাবা অটলের মন্দিরে বহুক্ষণ

আদিগ্রন্থ পঠিত হয়। পাঠকের মধ্যে স্ত্রীজাতিও আছেন। অপরাহ্ণ কালে সরোবরতীরে কোন স্থানে ভাগবত ব্যাখ্যা হইতেছে, কোথাও জনম-শাখী অর্থাৎ নানকের জীবন চরিত পঠিত হইতেছে। কুত্রাপি বা জ্ঞান-গোধূলি অর্থাৎ সায়ং সময়ে শাস্ত্রচর্চ্চা হইতেছে। স্থানে স্থানে সঙ্গীত ত আছেই। ভক্তি, জ্ঞান, আমোদ যাহা চাও এ তীর্থে সব আছে। আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই এ স্থানে আগমন করেন। বাহিরে পাদুকা উন্মোচনের জন্য অনুশাসন লিখিত আছে। সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম কল্যাণকর নহে। নিজের জ্ঞান উন্নত না হইলে, কেহ অন্য লোকের অর্জ্জিত মহৎ ভাব গ্রহণ করিতে সমর্থ হয় না। নানক প্রতিমা-পূজক ছিলেন না। এক্ষণকার শিখ কহিবে, আমরাও প্রতিম'-পূজক নহি। কিন্তু নানক-চরিত গ্রন্থকে দেবতার ন্যায় পূজা করা হইতেছে।

লাহোরের ন্যায় অমৃতসর অপরিচ্ছন্ন নহে। নগরের চতুর্দ্দিকে প্রাচীব আছে; স্থানও অধিকতর সমৃদ্ধিশালী। পঞ্জাবের মুসলমান রমণীগণ সুথ্‌ন নামক পায়জামা পরিধান করে। তাহার ব্যাস তিন হস্ত হইবে, কিন্তু পাদমূল এমনি সঙ্কীর্ণ, যে অতি কষ্টে প্রবেশ করাইতে হয়। হিন্দু নারী কোষের ঘাগরা ব্যবহার করিয়া থাকেন। বালিকা বয়সে পায়জামা পরিবার রীতি আছে। বালক বালিকাগণকে কানা কড়ির ভূষণ পরা-ইতে দেখা যায়। কিন্তু উহার কারণ কি বুঝা যায় না। স্ত্রীলোকগণ মস্তকময় ক্ষুদ্র বেণী করিয়া কেশ পাতাইয়া রাখে। এখানকার হিন্দু-ললনা অবাধে পাদুকা ব্যবহার করেন। তাঁহাদের মধ্যে কৃষ্ণাঙ্গী অতি বিরল। জাঠেরা তত গৌরাঙ্গ নহে। বোধ হয়, ইহারা সকলেই শিখ। ইহারাই পঞ্জাবের কৃষক। এক্ষণে যে কয়েকটি শিখ রাজ্য দেখা যায়, তাহার অধীশ্বরগণ সকলেই জাঠ। কাশ্মীররাজ ডোগরা। আমরা স্বদেশে শিখসৈন্যের দীর্ঘকায় দেখিয়া মনে করি, পঞ্জাবী মাত্রেরই বুঝি

ঐরূপ দীর্ঘ দেহ, বস্তুতঃ তাহা নহে। লাহোর অমৃতসর ইদানীং শিখরাজ্য নহে। কিন্তু পূর্ব্ব গৌরবের নিদর্শন-স্বরূপ এখানে অনেক সরদার আছেন। তাঁহাদিগকে পৈতৃক আচার ব্যবহার রক্ষা করিয়া চলিতে হয়। কোন মেলায় যাইতে হইলে, পূর্ব্বপদ্ধতি অনুসারে তাঁহাদের কাহারও সঙ্গে দশ জন, কাহারও সঙ্গে বা পনের জন অশ্বারোহী গমন করে। ঐ সংখ্যায় তাঁহাকে তত সহস্র সৈন্যের অধিনায়ক বুঝায়, অর্থাৎ মহারাজ রণজিৎ সিংহের সময় বর্ত্তমান সরদারদিগের পূর্ব্ব পুরুষগণ তৎ-সংখ্যক সৈন্যের অধিনায়ক ছিলেন। এক দিন ইঁহারা বিক্রমে সিংহ সদৃশ ছিলেন, এই জন্যই বোধ হয় ইহারা সিং আখ্যায় আখ্যাত হইয়াছেন। বাঙ্গালা দেশে ভ্রষ্টা স্ত্রীকে গ্রহণ করিবার উপায় নাই। পঞ্জাবে স্ত্রীলোক গৃহত্যাগ করিয়া ব্যভিচারিণী হইলেও, কালসহকারে পুনরায় পরিবার মধ্যে গৃহীতা হইয়া থাকে। শুনা যায়, এখানেও ছল্লা কোঠা অর্থাৎ "*Empty House*" আছে। সেই জন্যই অনেক পঞ্জাবীকে শতমুখে বঙ্গ রমণীর সতীত্বের প্রশংসা করিতে শুনিয়াছি। শিখদিগের জন্য বাজারে ভাত রুটী ও মাংসের ব্যঞ্জন বিক্রীত হয়। একদা আমি এক ক্ষত্রিয়-দোকানে হলুদা খাইয়াছিলাম। উহা মুসলমান খাদ্য। টিণ্ডা নামক এক প্রকার তরকারী ব্যঞ্জনে ব্যবহৃত হয়, অস্মদ্দেশের খেঁড়োর ন্যায় তাহার স্বাদ, কিন্তু উহা অতি ক্ষুদ্র। কাশীতে যেমন প্রচুর পরিমাণে বদরী ফল বিক্রীত হয়, এখানে সেইরূপ আড়ু বিক্রীত হইয়া থাকে। ইহার স্বাদ পীচের ন্যায়। বাজারে দালভরি ভিন্ন সাদা পুরি পাওয়া যায় না। দেবালয় অনুসন্ধান করিয়া দুর্গানীতে যাওয়া গেল। নিকটেই প্রাচীর বেষ্টিত শ্মশান-ভূমি। চিতা সন্নিকটে স্ত্রীলোকেরা বক্ষে করাঘাত করিতেছে। পঞ্জাবের বাটীর গঠন আমাদের দৃষ্টিতে কিছু নূতন ঠেকে। কেমন এক প্রকার চাপা বারান্দা থাকে। অধিকাংশ প্রধান বাটীতে বোখারি বা Fire place আছে।

ছাদের উপর প্রায় পাইখানা নির্ম্মিত হয়। মেথর ময়লাসহ গৃহ মধ্য দিয়াই যাতায়াত করে। ইহাতে কাহারও বিকার নাই। এক দিন গোবিন্দগড় দেখিতে গেলাম, ইহা রাজা রণজিতের নির্ম্মিত। এক্ষণে সেই স্থান রাজা রণজিতের ভবিষ্যৎ বাণী সফল করিয়া, মানচিত্রে ইংরাজ রাজ্য-জ্ঞাপক রক্তবর্ণে মিশিয়া গিয়াছে।

ভ্রমণকারীর পক্ষে সহজে কোন দেশের ভাষা শিক্ষা করিতে হইলে, বাইবেল সবিশেষ সাহায্য করিতে পারে। যে ভাষায় বাইবেল অনূদিত না হইয়াছে, পৃথিবীতে এমন কোন ভাষা নাই। পঞ্জাবী ভাষার আদর্শ প্রদর্শনের জন্য অনুবাদসহ খৃষ্টীয় ধর্ম্ম-পুস্তক উপস্থিত থাকিলেও আমরা অনুবাদ বিহীন নানক প্রণীত জপজী নামক গ্রন্থের কবিতাত্রয় প্রদান করা উপযুক্ত জ্ঞান করিলাম।

১

মঁনেকী গত কহীন জাই।
জেকো কহে পিছে পছতাই॥
কাগদ কলমণ লিখন হারা।
মঁনেকা বহি করণি বীচারা॥
অএসা নামু নিরঁজন হোই।
জোকো মঁনি জান এ মণি কোই॥

২

মঁন এ সুরতি হোব এ মণি বুধি।
মঁন এ সগল ভবকী সুধি॥
মঁন এ মুহি চোটা না খাই।
মঁন এ জমকে সাথ না জাই॥

অএসা নাম নিরঁজন হোই।
জোকো মঁনি জান এ মণি কোই॥

৩

মঁন এ যাব এ হি মোথ দুআরা।
মঁন এ পরবার এ সাধার॥
মঁন এ তর এ তারে গুরু শিক্ষ।
মঁন এ নানক ভরহিন ভিক্ষ॥
অএসা নাম নিরঁজন হোই।
জোকো মঁনি জান এ মণি কোই॥

গজিয়াবাদ হইতে যখন প্রথমে পঞ্জাবে প্রবেশ করি, তখন যে দৃশ্য ও ভাবের মধ্যে নিমজ্জিত হইয়াছিলাম, সে স্মৃতি অতি আমোদকর। ভাষা ও বেশ সম্বন্ধে হিন্দুস্থানীর সহিত পঞ্জাবীদিগের অনেক পার্থক্য পরিদৃষ্ট হইয়াছিল। লুধিয়ানা ষ্টেশনে নিদ্রাভঙ্গান্তে দেখি সকলেই পঞ্জাবী। কেবল পঞ্জাবী ভাষা শ্রুত হইতেছে। বস্তুতঃ তখন বোধ হইয়াছিল, যেন আমি এক নূতন দেশে আসিয়া পৌছিয়াছি।

হৃষীকেশ।

(১৩১৫ অব্দে)

হরিদ্বার হইতে সার্দ্ধ ষট্ ক্রোশ উত্তরে শিবালয় ও হিমালয় গিরিযুগলের মধ্যে, সুরধুনী-তটে, যতিগণ-সেবিত এই তীর্থ অবস্থিত। অখিল ভারতে এমন স্থান আমি দ্বিতীয় দেখি নাই। ভারতীয় তীর্থের অধিকাংশ স্থান পবিত্রতা-শূন্য। সর্ব্বত্রই লোকালয় হইয়াছে। এখানকার তপোবনে প্রবেশ করিলে সন্ন্যাসীদিগকে প্রকৃতপক্ষে সন্ন্যাসী বলিয়া ধারণা হয়। সংকীর্ণ প্রাঙ্গণের মধ্যে তৃণ-নির্ম্মিত কুটীর। তাহাতে কিঞ্চিৎ অলিন্দ যোজনা করা হইয়াছে। কোন মহাত্মা বিল্বফল আহরণ করিয়া, তথায় উপবেশন করত পানীয় প্রস্তুত করিবার জন্য ভগ্ন করিতেছেন। গৃহাভ্যন্তরে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলাম, তৃণ-শয্যা, একখানি পুস্তক ও জল-পাত্র ভিন্ন অন্য কিছু নাই। গৃহের পর গৃহ চলিয়াছে। এক পথ হইতে অন্য পথে চলিলাম। সকলই যেন ধ্যানস্থ বোধ হইল। আহার্য্য শোভার একেবারে অভাব। এ গ্রাম তপস্যার জন্য। কোন বস্তু ক্রয় করিতে মিলে না। জনতা নাই। দ্রষ্টব্য, শ্রোতব্যের অবসান হইয়াছে। এখানে মৌনভাবে কতই ব্যাখ্যা হইতেছে। দর্শক তাহাতে বিগত-সংশয় হইবেন। কোন আশ্রমে একজন বসিয়া আছেন, কে যাইতেছে, দেখিয়াও দেখিতেছেন না। অভিবাদন করিলে, আগ্রহ প্রদর্শন নাই। কদাচিৎ আগন্তুকের সহিত আলাপ হইতেছে। দণ্ডী বলিলেন, কথা কহিতে না হইলেই ভাল। মধ্যাহ্নে ইঁহারা মধুকরী বৃত্তি দ্বারা ভিক্ষার জন্য, কেবল তাঁহাদের জীবন ধারণের জন্য স্থাপিত জনপদে গমন করিয়া থাকেন। সত্রে ভাত, রুটী ও ডাল বিনীত ভাবে বিতরিত

হইয়া থাকে। বিতরণ করিয়া কর্ত্তা যেন কৃতার্থ হইলেন। বহির্ভাগে জলসত্র। পানীয় দানকারী কহিতেছে, অনুগ্রহ করিয়া আমার জল গ্রহণ করুন। একটি প্রবাদ আছে, কোন দেবতা এই স্থানে আগমন পূর্ব্বক অনুচরকে বারি সংগ্রহের জন্য প্রেরণ করেন, পরে তাহার প্রত্যাগমনে বিলম্ব হইতেছে বিবেচনা হইলে, স্বয়ং অনুসন্ধানে যাইয়া দেখেন, সে সমাধিস্থ হইয়া রহিয়াছে। কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন, স্থানের গুণে তাহার এই ভাব হইয়াছিল। বাস্তবিক, হৃষীকেশ নিবৃত্তির উপযুক্ত ভূমি। এখানকার বর্ণনীয় বিষয় নিবৃত্তি। তৎসম্বন্ধে অগ্রে আলোচনা করিব।

ভবৌষধি। মানব-প্রকৃতি, প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি দ্বারা পরিচালিত। নিবৃত্তিকে কৈবল্য নামে অভিহিত করা যায়। যোগ ইহার প্রধান উপায়। মনের একাগ্রতা দ্বারা বিভূতি লাভ হইতে পারে, ইহারই জন্য অনেকে ব্যস্ত হইয়া থাকেন, কৈবল্যের জন্য নহে। যোগের নানাবিধ উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে। তন্মধ্যে প্রক্রিয়া-বিশেষ দ্বারা স্নায়ুমণ্ডল শীতল হয়। পতঞ্জলির অষ্টাঙ্গ যোগ সম্পূর্ণভাবে অনুষ্ঠান করা সকলের সাধ্য নহে। শ্বাস-প্রশ্বাসের গতিবিচ্ছেদ-রূপ প্রাণায়াম উগ্রতা-সম্পাদক। ধারণা ও ধ্যানও তদ্বৎ। যম-নিয়মাসন-প্রত্যাহার সমাধি যোগের এই পঞ্চাঙ্গ সকলের অবলম্বনীয়।

সমাধির সময় দ্রষ্টা আপনার স্বরূপে অবস্থান করেন। (১) মন স্বাভাবিক অবস্থায় থাকে। চিত্তবৃত্তির নিরোধকালে পুরুষের মন অপরিবর্ত্তনীয় রহে। চিত্ত চাঞ্চল্য-বিরহিত হয়। বীতস্পৃহ ব্যক্তির সমাধি ভাব আপনিই আইসে। (২) বৈরাগ্য দ্বারা মন সর্ব্ববিষয়ে অনাসক্ত হইলে

(১) তদা দ্রষ্টুঃ স্বরূপেঽবস্থানম্।—পাতঞ্জল দর্শন (পা ১। সূত্র ৩।)

(২) বিবেক-খ্যাতে ধর্ম্মমেঘঃ সমাধিঃ।

কৈবল্য লাভ হইয়া থাকে। বিবেক দ্বারা সমাধি লাভ হয়। সমাধির স্থায়িত্বকে কৈবল্য বা মুক্তি কহে। প্রত্যাহার দ্বারা চিত্তসংযম করিতে হয় বলিয়া, এই প্রণালীকে অভাব-যোগ বলা যাইতে পারে।

সমাধির অর্থ দ্রষ্টার আপন স্বরূপে অবস্থান, এবং চিত্ত আপন স্বরূপে স্থায়িভাবে প্রতিষ্ঠিত হইলে, তাহাকে কৈবল্য বলা যায়। এতদুভয়ে এই মাত্র প্রভেদ। আপন স্বরূপে অবস্থিত হইবার চেষ্টার নাম বৈরাগ্য। সুতরাং এতত্রয়কে একাত্মক বলিতে হইবে। একটি হইলে, তিনটিই হয়। সাধনা অনাসক্তি হইতে আরম্ভ করিবে। বৈরাগ্যই প্রকৃত পক্ষে সমাধির সাধন। সৎ ও অসৎ সমুদয় বিষয়ে ঔদাসীন্য এবং সমুদয় ইন্দ্রিয়-জ্ঞানে তাচ্ছিল্য হইলে, পুরুষের প্রকৃত স্বভাব প্রকাশিত হয়। (৩) নিরন্তর বিবেকের অভ্যাস অজ্ঞান নাশের কারণ। (৪) বাসনার হেতু, ফল ও আধার লুপ্ত হইলে, তাহা যাইবে। (৫) ইহা বৈরাগ্যের দ্বারা প্রাপ্তব্য। তাহা হইলে মানব জীবন্মুক্ত হয়। গুণসকল তখন পুরুষের প্রয়োজনে আইসে। (৬) চিত্ত শক্তি আপন স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইলেই, কৈবল্য হইল। বৈরাগ্য ও প্রত্যাহার অভিন্ন। যৎকালে ইন্দ্রিয় নিজ বিষয় পরিত্যাগ করিয়া, চিত্তের স্বরূপে অবস্থিত হয়, দর্শন শাস্ত্রে সেই অবস্থার পারিভাষিক নাম প্রত্যাহার। (৭) নিরীশ্বর ব্যক্তিরও এই সাধনায় অধিকার আছে। সেই জন্য পতঞ্জলি

(৩) তৎ পরং পুরুষখ্যাতেঃ গুণবৈতৃষ্ণ্যম্। (পা ১ সূ ১৬)

(৪) বিবেক-খ্যাতিরবিপ্লবা হানোপায়ঃ। (পা ২ সূ ২৬)

(৫) হেতুফলাশ্রয়ালম্বনৈঃ সংগৃহীতত্বাদেষামভাবে তদভাবঃ। (পা ৪ সূত্র ১১)

(৬) পুরুষার্থশূন্যানাং গুণানাং প্রতিপ্রসবঃ কৈবল্যং স্বরূপপ্রতিষ্ঠা বা চিতিশক্তিরিতি। (পা ৪ সূ ৩৪)

(৭) স্ববিষয়াসম্প্রয়োগে চিত্তস্য স্বরূপানুকার ইব ইন্দ্রিয়াণাং প্রত্যাহারঃ। (পা ২ সূ ৫৪)

সমাধিপাদে "ঈশ্বরপ্রণিধানাৎ" স্থলে 'বা' শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। (পা ১সূ ২৩) সূত্রকার বৈরাগ্যকে প্রধান করিয়া গৌণ কল্পে ঈশ্বর-প্রণিধানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। জগতের পৃথক অস্তিত্বে অবিশ্বাস এবং মনঃ স্নায়বিক ক্রিয়া মাত্র, আত্মা স্নায়বিক ক্রিয়াসমূহের সমষ্টি। জীবনী-শক্তি বা প্রাণ বাস্তবিক জড় হইতে পৃথক-চৈতন্য, এরূপ যাহার বিশ্বাস নাই, তিনি পর্য্যন্ত ইহাতে অনধিকারী নহেন। পাতঞ্জলে আত্মা শব্দ নাই।

বিভূতিগুলি যেথানে অসম্ভব বোধ হয়, তাহা প্রক্ষিপ্ত হইতে পারে। ইদানীং অন্যের অনুভব জানিবার ক্ষমতা ও চিন্তাপ্রক্ষেপ আকাশের কম্পন দ্বারা ব্যাখ্যাত হইতেছে; তাহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ; এজন্য বিশ্বাস্য। একজনের মস্তিষ্কের পরমাণুর কম্পন, ব্যোম অবলম্বনে অন্যের মস্তিষ্কের পরমাণুর কম্পন উৎপাদন করে। ব্যোম সর্ব্বব্যাপী, চৈতন্য ও জড়, উভয় স্থলে এই শক্তির ক্রিয়া প্রত্যক্ষ অনুমিত হইয়াছে। পরশরীরে প্রবেশ, শূন্যমার্গে ভ্রমণ যদি রূপকের ভাষা না হয়, বিশ্বাস না করিলে ক্ষতি নাই। কি সম্ভব, কি অসম্ভব, তাহা নিজের অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে। কোন অসম্ভব বিষয় সম্ভবপর হইলে, সমুদয় অসম্ভাবিত বিষয়ে বিশ্বাস করা উচিত নহে। চিন্তাকারকের যাহাকে দর্শন করিবার ইচ্ছা নিতান্ত প্রবল হয়, তদীয় মানসিক চিন্তা, শারীরিক পরমাণুর আকার গ্রহণ পূর্ব্বক আকাশ অবলম্বনে তাহা সংহত হইয়াছিল বলিয়া, তাহার সম্মুখে উপস্থিত হয়; এমন হইতে পারে না। জড় ও চেতন অভিন্ন, তজ্জন্য সকলই আকাশের কার্য্য ভাবিয়া, যাহার ব্যাখ্যা নাই, বিশ্বাস করা অনুচিত। গুরুতর অসম্ভবে বিশ্বাস স্থাপিত হইলে, তাহা সংহত হইয়া প্রকৃত হইতে পারে না। কোন সামান্য বিষয়ে বিশ্বাস দ্বারা তাহা মিথ্যা হইলেও ফলপ্রদ হইতে দৃষ্ট হয়। সামান্যের সময় হইবে, গুরুতরের নহে, ইহা প্রহেলিকা বটে। সূক্ষ্ম শরীর অর্থে চৈতন্যের পরমাণু বিশিষ্ট দেহ, কিন্তু সে কি প্রকার পদার্থ, বুঝা

গেল না। তাহার জড়ীয় পরমাণুর দ্বারা নির্ম্মিত স্থূল শরীর ধারণ অসম্ভব

ব্রহ্মসূত্রের দশ প্রকার ভাষ্য আছে। ভাষ্যকার দশ জনের মত বিভিন্ন; ইহাতে তাঁহারা আপন মতের পোষকতার জন্য সূত্রের অর্থান্তর করিয়া দিয়াছেন। যাঁহার যেমন প্রকৃতি, তিনি তদনুযায়ী ব্যাখ্যান গ্রহণ করিয়া থাকেন। সূত্র-যুগে দর্শন রচনা যে ভাবে হইয়াছিল, পৌরাণিক কালে সমন্বয়ের সময়, তাহা রূপান্তরিত করিতে হইয়াছে। এক দর্শনে অপর দর্শনের উল্লেখ আছে এবং যাহা সন্নিবেশিত হওয়া উচিত ছিল না, তাহাও উল্লিখিত হইয়াছে। ইহাতে বিলক্ষণ প্রতীতি হইবে যে, সে সমুদয় মৌলিক নহে। মনকে নানাবিধ চিন্তা হইতে এক চিন্তায় ও এক চিন্তা হইতে চিন্তা-শূন্যতায় লইয়া যাওয়া, যখন সাধনার বিষয়ীভূত হইতেছে (৮), তখন বিভূতি সমাধির প্রতিকূল হইবে (৯)। বিভূতি কাহারও স্বভাবতঃ কাহারও বা ঔষধ বিশেষ সেবন দ্বারা এবং অভ্যাস বশতঃ লাভ হইয়া থাকে (১০)। জড় সমাধিকে অনেক যোগী হেয় জ্ঞান করিয়া থাকেন। তাহাতে হৃৎপিণ্ডের কার্য্য স্থগিত হয়। সে অবস্থায় মৃতবৎ থাকিলেও শরীর গলিত হইবে না। দীর্ঘকাল তদবস্থায় অতিবাহিত হইতে পারে। কিন্তু সর্পদংশনে প্রকৃত মৃত্যু ও বস্তিশোধনের অভাব থাকিলে পূর্ব্বতন আহারজনিত কৌপীনে মলত্যাগ হইতে দেখা যায়। পতঞ্জলি চৈতন্য-সমাধিরই ব্যবস্থা দিয়াছেন। যোগের সমুদয় অঙ্গ (১১) সাধনা না করিলে মুক্তি

---

(৮) তদপি বহিরঙ্গং নির্বীজস্য। [পা ৩ সূ ৮]

(৯) তে সমাধাবুপসর্গা ব্যুত্থানে সিদ্ধয়ঃ। [পা ৩ সূ ৩৭]

(১০) জন্মৌষধি-মন্ত্র-তপঃ-সমাধিজাঃ সিদ্ধয়ঃ। [পা ৪ সূ ১]

(১১) যম নিয়মাসন প্রাণায়াম প্রত্যাহার ধারণাধ্যান সমাধয়োঽষ্টাবঙ্গানি [পা ২ সূ ২৯]

হইবে না, এমন নহে। বিশেষ বিশেষ যোগীকে এক এক অঙ্গ সাধন করিতে দৃষ্ট হয়। যম সকলের সাধ্য (১২)। যেমন করিয়া হউক, আপন স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে। এই লক্ষ্য স্থির থাকা আবশ্যক।

যোগীর কোন অনুষ্ঠান করিতে হয় না। না করিয়াও কর্ম্ম হইবে। সেগুলি সংযমের ফল। যে ব্যক্তি সত্য সংযম করিয়াছেন, তিনি কদাপি মিথ্যাকে আশ্রয় করিবেন না (১৩)। তিনি আত্মতৃপ্ত; সুতরাং মনুষ্যত্বের নির্ম্মলতা তাঁহার স্বভাবতঃ হইয়া থাকে। প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তি যাহার যেটি অবলম্বন করা শ্রেয়ঃ, তাহার পক্ষে সেই পথে মনুষ্যত্ব লাভ ঘটিতে পারে।

সাধনা করিবার জন্য সুখে উপবেশন করিয়া মনকে অবলম্বন-শূন্য করতঃ সর্ব্বপ্রকার চিন্তা ত্যাগ করিবে।

"নিরালম্বং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিদ্‌ভাবয়েৎ সুধীঃ।"

তৎকালে দর্শন, শ্রবণ বা ইন্দ্রিয় পরিচালনা কর্ত্তব্য নহে। তখন মনে বা দৃষ্টি ও শ্রুতি পথে কিছু আসিবে না, এমন নহে। কিন্তু বিবেক দ্বারা তাহা ত্যাগ করিতে হইবে। দেখিয়াও দেখিতেছে না, শুনিয়াও শুনিতেছে না, ভাবিয়াও ভাবিতেছে না, এইরূপ করিতে হইবে। নির্ব্বীজ সমাধি একেবারে গ্রহণ করিলে ক্ষতি নাই। তাহা কিন্তু প্রথমে হইবার নহে। মনে ভাব উঠিবে, আর ত্যাগ করিতে হইবে, ইহাতেই বুঝা যায়, সেটি সবীজ হইতেছে। ক্রমে উহা যাইবে। ফল কথা, সকল বিষয়ে অনাসক্ত হইবে। এরূপ অবস্থায় চিত্তপ্রসাদনের জন্য প্রথমতঃ মৈত্রী ভাবনা করা যাইতে পারে। যথা—সকল প্রাণী সুখী হউক।

---

(১২) এতে জাতি-দেশ-কাল-সমায়ানবচ্ছিন্নাঃ সার্ব্বভৌমা মহাব্রতম্। [পা ২ সূ ৩১]

(১৩) সত্যপ্রতিষ্ঠায়াং ক্রিয়াফলাশ্রয়ত্বম্।

"সব্বে সত্তা সুখীতা হোন্তু।"

পতঞ্জলি তাহাই অন্য প্রকারে করিতে কহিয়াছেন। পরের সুখ, দুঃখ, সৎ, অসৎ, এই কয়েকটি ভাবের প্রতি যথাক্রমে বন্ধুতা, দয়া, আনন্দ, উপেক্ষা, এই কয়েকটি ভাব ধারণ করিতে পারিলে চিত্ত প্রসন্ন হয় (১৪); পরন্তু মনকে শূন্যভাবাপন্ন করাই (১৫) আনন্দের নিদান। সুখ ও দুঃখের অতীত হইলে, চিত্ত নিরুদ্বেগ হয়, তাহাই আনন্দ; ইহার নামান্তর ঔদাসীন্য কিংবা বৈরাগ্য। সন্ন্যাসের দ্বারা বৈরাগ্য প্রাপ্য, এইজন্য সন্ন্যাসীদিগের নামের সহিত 'আনন্দ' ব্যবহৃত হয়। সংসার ত্যাগ করিলে, সন্ন্যাসী হয় না, বাসনা ত্যাগ করিলে হয়। বাসনা ত্যাগের পক্ষে সংসার অনুকূল নহে। বিশেষতঃ সাধনার প্রথমাবস্থায় অত্যন্ত প্রতিকূল হইয়া থাকে। যিনি অন্তঃপ্রকৃতিকে জয় করিতে পারিয়াছেন, সংসারে তাঁহার চিত্ত-বিক্ষেপ হয় না।

সাধনার জন্য সুখে উপবেশন করিতে হইলে, শরীরের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ যেমন প্রার্থনীয়, শরীর যে প্রদেশে সংস্থাপন করিতে হইবে, তাহার অনুধাবন করাও তদ্রূপ প্রয়োজনীয়। অতএব বনবাস প্রশস্ত। আসক্তি থাকিলে বনেও দোষ উৎপন্ন হয়।

"বনেঽপি দোষাঃ প্রভবন্তি রাগিণাম্।"

আলোচনা। দেখিয়াও দেখিতেছে না, শুনিয়া শুনিতেছে না, ভাবিয়াও ভাবিতেছে না, এইরূপ করিতে হইবে। ইহার অর্থ তাহাতে মন দিবে না। অনাসক্ত হইবে। ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শীত, গ্রীষ্ম ও কটু, মিষ্ট বোধ অবশ্য না হইয়া যায় না। তাহার প্রতিকার না করিলে চলিবে না।

(১৪) মৈত্রীকরুণামুদিতোপেক্ষাণাং সুখদুঃখপুণ্যাপুণ্যবিষয়াণাং ভাবনাতশ্চিত্তপ্রসাদনম্। [পা ১ সূ ৩৩]

(১৫) সর্ব্বনিরোধাৎ নির্বীজঃসমাধিঃ।

অপর অনুভূতি সম্বন্ধেও এই কথা প্রযোজ্য। সংসারে যিনি যে কার্য্য করিবার জন্য দায়ী, তাঁহাকে তাহা করিতে হইবে।

নহি দেহভৃতা শক্যং ত্যক্তুং কর্ম্মাণ্যশেষতঃ।

সেই জন্য যৎকালে কোন ব্যাপার সম্পন্ন হইবে, তখন বিতৃষ্ণ হওয়া উচিত।

যস্তু কর্ম্মফলত্যাগী, স ত্যাগীত্যভিধীয়তে।

ভগবদ্গীতা অঃ ১৮।১১ শ্লোঃ।

রাজস ও তামস ভাবে কর্ম্ম করা কর্ত্তব্য নহে। সাত্বিক কর্ত্তা হইলে ক্ষতি নাই।

মুক্তসঙ্গোঽনহংবাদী ধৃত্যুৎসাহসমন্বিতঃ।
সিদ্ধাসিদ্ধ্যোর্নির্ব্বিকারঃ কর্ত্তা সাত্বিক উচ্যতে॥
রাগী কর্ম্মফলপ্রেপ্সুর্লুব্ধো হিংসাত্মকোঽশুচিঃ।
হর্ষশোকান্বিতঃ কর্ত্তা রাজসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥
অযুক্তঃ প্রাকৃতঃ স্তব্ধঃ শঠো নৈস্কৃতিকোঽলসঃ।
বিষাদী দীর্ঘসূত্রী চ কর্ত্তা তামস উচ্যতে॥

[১৮ অঃ।২৬।২৭।২৮]

নিষ্কাম হইয়া কর্ত্তব্য মাত্র সমাধা করিলে, প্রকৃতপক্ষে কিছুই করা হয় না।

কর্ম্মণ্যকর্ম্ম যঃ পশ্যেদকর্ম্মণিচ কর্ম্ম যঃ॥
স বুদ্ধিমান্ মনুষ্যেষু স যুক্তঃ কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ॥ [১৭ অঃ ১৮ শ্লোঃ]
তস্মাদসক্তঃ সততং কার্য্যং কর্ম্ম সমাচর॥
অসক্তোহ্যাচরন্ কর্ম্ম পরমাপ্নোতি পুরুষম্॥ [৩ অঃ ১৯ শ্লোঃ]

এইরূপ ভাবে কার্য্য করিতে অভ্যাস হইলে, আত্মতৃপ্তি হইবে। তখন মনুষ্যত্বের পরম প্রয়োজনীয় পরার্থপরতা পর্য্যন্ত অনাবশ্যক।

যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাদাত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ।
আত্মন্যেবচ সন্তুষ্টস্তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে॥
নৈব তস্য কৃতেনার্থোনাকৃতেনেহ কশ্চন।
ন চাস্য সর্ব্বভূতেষু কশ্চিদর্থব্যপাশ্রয়ঃ॥ [৩ অঃ ১৭।১৮]

কর্ত্তব্য কর্ম্ম কাহাকে বলে, তাহা স্থির করিয়া লইতে হইলে, অবশ্য সাধারণের হিতের লক্ষ্য হওয়া প্রয়োজনীয়, ইহাতে বিশেষ সাবধানতা চাই।

কর্ম্মণোহ্যপি বোদ্ধব্যং বোদ্ধব্যঞ্চ বিকর্ম্মণঃ।
অকর্ম্মণশ্চ বোদ্ধব্যং গহনা কর্ম্মণো গতিঃ॥ [৭ অঃ ১৭ শ্লোঃ]

শরীর ধারণের জন্য যাহা করিতে হয়, তাহা কর্ম্ম বলিয়া গণ্য নহে।

নিরাশীর্যতচিত্তাত্মা ত্যক্তসর্ব্বপরিগ্রহঃ।
শারীরং কেবলং কর্ম্ম কুর্ব্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্॥ [৪।২১]

প্রিয় ও অপ্রিয় বোধকে তুচ্ছ করিবে।

জ্ঞেয়ঃ স নিত্যসন্ন্যাসী যো ন দ্বেষ্টি ন কাঙ্ক্ষতি।
নির্দ্বন্দ্বো হি মহাবাহো সুখং বন্ধাৎ প্রমুচ্যতে॥ [৫।৩]

অনাসক্ত হইতে হইলে কিরূপ ভাবাপন্ন হইতে হয়, তাহা শিক্ষা করা প্রয়োজনীয়।

যদা বিনিয়তং চিত্তমাত্মন্যেবাবতিষ্ঠতে।
নিস্পৃহঃ সর্ব্বকামেভ্যো যুক্ত ইত্যুচ্যতে তদা॥ ১৮
সঙ্কল্পপ্রভবান্ কামা-স্ত্যক্ত্বা সর্ব্বানশেষতঃ।
মনসৈবেন্দ্রিয়গ্রামং বিনিয়ম্য সমন্ততঃ॥ ২৪
শনৈঃ শনৈরুপরমেদ্‌বুদ্ধ্যা ধৃতিগৃহীতয়া।
আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ॥ ২৫

যতোযতো নিশ্চলতি মনশ্চঞ্চলমস্থিরম্।
ততস্ততো নিয়ম্যৈতদাত্মন্যেব বশং নয়েৎ॥ ৬।২৬

বৈরাগ্য তীব্রভাবে অভ্যাস না করিলে, উপরি-উক্ত শিক্ষার পদ্ধতিতে কৃতকার্য্য হইবার সম্ভাবনা নাই।

অসংশয়ং মহাবাহো মনো দুর্নিগ্রহং চলম্।
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে॥ ৬।৩৫

আত্মতৃপ্ত ব্যক্তি স্বভাবতঃ অত্যন্ত নির্ভরশীল হইয়া থাকেন। যাহা হয় হউক, এই ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া থাকিলে, নির্ভর করা হইল। আত্মতৃপ্ত, এই আত্মনির্ভর বা ব্রহ্মে নির্ভর—এতত্রয় নির্ভরশীলতা ভিন্ন অন্য কিছু নহে। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ নির্ভরাস্পদরূপে বর্ণিত হইয়াছেন। ভক্তি নির্ভরশীলতা মাত্র। নির্ভরশীল ও নিষ্কাম অভিন্ন। নির্ভরশীল হইবার জন্য প্রস্তুত হইতে হইলে, তপস্যা করিতে হইবে। অধিকারিভেদে তাহার প্রণালী পৃথক্।

দেবদ্বিজগুরুপ্রাজ্ঞপূজনং শৌচমার্জবম্।
ব্রহ্মচর্য্যমহিংসা চ শারীরং তপ উচ্যতে॥ ১৪
অনুদ্বেগকরং বাক্যং সত্যং প্রিয়হিতঞ্চ যৎ।
স্বাধ্যায়াভ্যসনং চৈব বাঙ্ময়ং তপ উচ্যতে॥১৫
মনঃ-প্রসাদঃ সৌম্যত্বং মৌনমাত্মবিনিগ্রহঃ।
ভাবসংশুদ্ধিরিত্যেতৎ তপো মানসমুচ্যতে॥ ১৬।১৭

গীতার সার কথা, শ্রীকৃষ্ণের বিশেষ মত, নিস্পৃহ হইয়া কর্ম্ম করিবার উপদেশ।

এতান্যপি তু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলানি চ।
কর্ত্তব্যানীতি মে পার্থ নিশ্চিতং মতমুত্তমম্॥ ১৮।৬

বিতৃষ্ণ হইতে উপদেশ অন্যত্রও আছে; কিন্তু তাহার অর্থ বিতৃষ্ণ

হইয়া কর্ম্ম করিবার পক্ষে কিনা, তাহা সে গ্রন্থে গীতার ন্যায় পরিষ্কার করিয়া পরিব্যক্ত হয় নাই।

যে প্রকৃতপক্ষে আত্মতৃপ্ত, নিষ্কাম, নিঃস্পৃহ, অনাসক্ত ও নির্ভরশীল হইয়াছে, বিতৃষ্ণা তাহার ধর্ম্ম। অন্য ধর্ম্ম তাহার পক্ষে পরিত্যাজ্য। সে কদাপি কুকর্ম্ম করিতে যাইবে না। সুতরাং এক নির্ভরশীলতা অবলম্বন করিয়া অন্য ধর্ম্ম ত্যাগ করিলে, অথবা পুণ্যজনক ধর্ম্মের অনুষ্ঠান হইতে নিবৃত্ত থাকিলে ক্ষতি নাই। শ্রীকৃষ্ণ নির্ভরাস্পদরূপে কহিয়াছেন, যদি অনিচ্ছায় সে ব্যক্তি পাপ করিয়া ফেলেন, তজ্জন্য তিনি দোষী নহেন। উক্ত পাপের জন্য তাঁহার শোক করা উচিত নহে।

"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥"

গুণ সকল যখন মনুষ্যের প্রয়োজনে আইসে না, চিত্তশক্তি আপন স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়, এই অবস্থাটি পাতঞ্জলের মোক্ষ। ভগবদ্গীতায় তাহা অনাসক্তিরূপে বর্ণিত হইয়াছে। প্রবৃত্তিমার্গের অনাসক্তি নিবৃত্তি-মার্গের সোপানস্বরূপ হইয়া থাকে। গীতা সেই জন্য, যোগশাস্ত্র ও পাতঞ্জল দর্শনের ব্যাখ্যানস্বরূপ। অনাসক্ত হইয়া কর্ম্ম করা অভ্যস্ত হইলে, পুরুষ আপন স্বরূপে অবস্থিত হইবার ক্ষমতা লাভের জন্য অগ্রসর হইতে পারিবেন। তখন ইন্দ্রিয়গণ আপনার বিষয় সকলে সম্যক্ নিযুক্ত হইতে পারিবে না। এইরূপে বৈরাগ্য হইতে সমাধি ও কৈবল্য লাভ হইয়া থাকে।

মতান্তরে। নিবৃত্তির জন্য নিরতিশয় ব্যাকুল শ্রমণগণ নিম্নলিখিত প্রণালীতে সাধন করিতে উপদেশ দেন, তাহা "ধম্মানুপস সতি পট্‌ঠানং" নামে খ্যাত। ইহাই তাঁহাদের যোগ।

১।	সম্মা দিট্‌ঠি।	সম্যক্ দৃষ্টি।
২।	সম্মা সংকপ্প।	সম্যক্ সংকল্প।
৩।	সম্মা বাচা।	সম্যক্ বাক্।
৪।	সম্মা কম্মন্তো।	সম্যক্ কর্ম্মান্ত।
৫।	সম্মা আজীবো।	সম্যক্ আজীব।
৬।	সম্মা বায়ামো।	সম্যক্ ব্যায়াম।
৭।	সম্মা মতি	সম্যক্ স্মৃতি।
৮।	সম্মা সমাধি।	সম্যক্ সমাধি।

সমাধির লক্ষণ "সতিং উপট্‌ঠতীতি সতি পট্‌ঠানাং।" এই সূত্রের অর্থ, চিত্তের উপর চিত্ত, ইহাই চিত্তপ্রতিষ্ঠা।

অর্থাৎ, দ্রষ্টার আপন স্বরূপে অবস্থান, সন্দেহ নাই। চিত্তের উপর চিত্ত না বলিয়া চিত্তের মধ্যে চিত্ত কহিলে, আমাদের যেন ভাল বোধ হয়। বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। গ্রন্থধুর ও বিদর্শনাধুর। গ্রন্থধুরগণ অল্প সময়ের জন্য সমাধি করিয়া থাকেন। বিদর্শনাধুর বা বিরাগব্রতধারীরা নির্জ্জনবাস, প্রত্যহ ভিক্ষা মাত্র দ্বারা জীবন ধারণ, স্বল্পবস্ত্ররক্ষণ ও সদা ধ্যানস্থ রহেন। ইঁহাদের সংখ্যা অতি অল্প। যোগের অষ্টাঙ্গ সম্যক দৃষ্টি প্রভৃতি তাঁহাদের সেব্য। ধ্যান ও সমাধিতে ভেদ নাই। কোন মূর্ত্তি ধ্যেয় নহে, কিন্তু চল্লিশ প্রকারের কর্ম্মস্থান ধ্যান করিতে হয়। যে যাহাতে আকৃষ্ট হইতে পারে, উহাই কর্ম্মস্থান। তাহার বিপরীত ভাবনা বিধেয়। ক্রোধপ্রধান ব্যক্তির মৈত্রী ভাবনা, কাম উপস্থিত হইলে কমনীয় ব্যক্তির অস্থিময় ভাগ চিন্তনীয়। অভ্যাসবলে অন্তঃপ্রকৃতিকে জয় করিতে পারিলে উক্তবিধ ভাবনার প্রয়োজন নাই। তখন চিত্তের উপর চিত্ত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বৌদ্ধ সমাধির অন্তিম অবস্থা পাতঞ্জলের মত অচপলতা।

মনকে অবলম্বনশূন্য করিলে নির্বিষয় চৈতন্য মাত্র অবশিষ্ট রহে।

ইহাই পুরুষের স্বরূপ। মনের স্বাভাবিক আকার নির্লিপ্তরূপে অবস্থান, নির্ম্মল ও নিধর্ম্মভাব কিংবা বৃত্তিহীন অবস্থা। তাহাতে আমি সুখী দুঃখী ইত্যাদি জ্ঞান থাকে না।

চূর্ণক। পাতঞ্জলের উদ্দেশ্য বেদান্তের শাঙ্কর-প্রস্থান দ্বারা সিদ্ধ হইতে পারে। জ্ঞান ভিন্ন অন্য কোন পদার্থ একেবারে নাই। জগৎ ও জাগতিক দুঃখ-সুখাদির প্রকৃত সত্তা অমূলক। উহা কাল্পনিক, অনুমিত হয় মাত্র। বেদান্তের মূলতত্ত্ব বৌদ্ধ ক্ষণিক-বিজ্ঞানবাদ হইতে গৃহীত। ভিন্ন ভিন্ন বোধ, নানা প্রকার ক্রিয়ার ফল। অবস্থাভেদে তাহা রূপান্তরিত হইয়া থাকে। সুতরাং কেবল নিজ বোধ বা জ্ঞান ভিন্ন জাগতিক সত্তার অস্তিত্ব থাকিতে পারে না। অতএব জাগতিক ব্যাপার সুখ দুঃখ কখনই সত্য নহে। এই মিথ্যা জ্ঞান দূর হইলে আসক্তি যাইবে। মানুষ মুক্ত হইবে। তখন সৎ ও অসৎ তুল্য। প্রবৃত্তি আপনি পলায়ন করিবে। মানবীয় উন্নতির পক্ষে এবংবিধ জ্ঞান নিতান্ত প্রতিকূল। অনেকের জীবনে এমন সময় উপস্থিত হয়, তৎকালে নিবৃত্তি ভিন্ন শান্তির অপর উপায় মিলে না। তাহার জন্য ইহা মঙ্গলকর। জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তিতে যেমন বিশেষত্ব আছে, তাহা তেমনই বৈশেষিক ভেদে বিভিন্ন লোকের জন্য। নিবৃত্তি আপনা হইতে আসা চাই। বল পূর্ব্বক নিবৃত্ত হইলে,-সে ভাব স্থায়ী হয় না। কথা যথার্থ; কিন্তু এই বল-প্রয়োগই অভ্যাস। অভ্যাসের ফলে বিরাগ স্বাভাবিকতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

সমাধির অবস্থা যেমন সর্ব্বদা থাকে না, মানব নিবৃত্তির পথে তেমনই চিরদিন যাপন করিতে সমর্থ নহে। এতদুভয়ে সময় বৃদ্ধি করিতে যত্ন করিলে, কৃতার্থ হইতে পারা যায়। কালক্রমে সাধকের বৈরাগ্যের তীব্রতা বিলুপ্ত হইতে দৃষ্ট হয় বলিয়া, তাহার আদর্শের সন্নিহিত হইবার রুচি নাই বলিতে পারা যায় না। পুনরুত্থান অসম্ভব নহে।

সমাধিকালে চিত্ত চঞ্চল হইবে, ইহা সম্ভব। অভ্যাস দ্বারা সমর্থ হইবে। আদর্শের সন্নিহিত হইবার চেষ্টায় ফল আছে।

প্রাণায়াম দ্বারা চিত্তের স্থৈর্য্য হয়। এতদ্ব্যতিরেকে সমাধি হইতে পারে না, পতঞ্জলি এমন কহেন নাই। বিরাম, প্রসন্নতা প্রভৃতি বিবিধ উপায় উল্লিখিত হইয়াছে। বায়ুর ক্রিয়া করিতে যিনি সমর্থ, তিনি উহা সংযত করিবেন। যোগের অষ্টাঙ্গের মধ্যে প্রাণায়াম একটি, সন্দেহ নাই। কিন্তু চিত্তের স্থৈর্য্য প্রত্যাহার দ্বারা হইতে পারে। ইহা নিরাপদ। বৌদ্ধযোগের অষ্টাঙ্গ অন্য প্রকার। তাহাতে প্রাণায়াম নাই।

যোগীর কোন প্রকার সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবার প্রয়োজন নাই কেন? নিঃস্পৃহ হইতে হইলে, সৎ অসৎ উভয় প্রকারের স্পৃহা ত্যাজ্য। তবে যাহা অবশ্য-কর্ত্তব্য হইবে, আসক্তিহীন হইয়া সম্পাদন করিলে, ক্ষতি নাই। সৎকর্ম্ম করিতে প্রবৃত্তি আইসে। নিবৃত্তি-প্রয়াসী লোকের তাহা স্পৃহণীয় হইবে না। সাধনার অবস্থায় যৎকালে মৈত্রী ভাবনা করিতে হয়, তখন পরোপকার ব্রতে চিত্ত শুদ্ধি করা শ্রেয়।

ভক্তি ও বৈরাগ্যের অবশ্য অধিকারি-ভেদ আছে। অন্যের প্রতি একান্ত নির্ভর করিলে এবং তাহাতে এক প্রকার নম্রতার ভাব থাকিলে ভক্তি করা হইল। স্বরূপ বা স্বভাবের প্রতি নির্ভর করায় তেমন নম্রতা থাকে না, তথাপি উহাতে যে শান্তি আছে, তাহা নম্রতার তুল্য। যে কোন বিষয়ে নির্ভর হইলে, অপর বিষয়ে স্বভাবতঃ তাচ্ছিল্য হইবে, ইহা আত্মতৃপ্ত এবং ভক্তের পক্ষেও প্রযোজ্য। এই তাচ্ছিল্য ভাবই বৈরাগ্য। যিনি যে ভাবে নির্ভরশীলতায় গমন করিতে অভ্যস্ত হইয়াছেন, তাঁহার পক্ষে তাহাই নিঃশ্রেয়স।

স্থানীয়। বহু ব্যক্তি আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন, তুমি বিস্তর পর্য্যটন করিয়াছ, তেমন ক্ষমতাপন্ন সাধু কোথায় দেখিলে? দ্রোণাশ্রমে

এক সত্যবান্ ব্রহ্মচারীর সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তিনি অষ্টাদশবর্ষ কাল উত্তরাখণ্ড, নর্ম্মদাতীর ও গিরনার-শৈল ভ্রমণ করিয়াছিলেন। তিনি যথায় গিয়াছেন, দেখিতে ত্রুটি করেন নাই। মনের মানুষ মিলে নাই। তিনি যে গুরুলাভের প্রয়াসী, তাঁহাদ্বারা ভগবানের সাক্ষাৎকার হইবে; সুতরাং গুরুদেবের কিঞ্চিৎ অতিপ্রাকৃত ক্ষমতাশালী হওয়া প্রয়োজনীয়। অনেকে সাধুর সেই গুণ থাকা প্রয়োজনীয় মনে করেন, সন্দেহ নাই। আমি সেই সকল ব্যক্তিকে নূতন ভূলোক হইতে আগত ঐন্দ্রজালিকদিগের রঙ্গালয়ে যাইবার জন্য পরামর্শ দিতে পারি। যোগাচার্য্য শ্যামাচরণ লাহিড়ী একদা আমাকে তীব্রভাবে কহিয়াছিলেন, যোগাভ্যাস পরামার্থিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য,—অলৌকিক ক্ষমতা প্রত্যক্ষ করিবার জন্য নহে।

প্রাচীন কাশীতে ঋষিপত্তন বিহারে শ্রীসুমঙ্গলের সহিত বৌদ্ধযোগ আলোচনা কালে তিনি সমাধির জন্য আমাকে হৃষীকেশ যাইতে কহিয়াছিলেন। এখানে দেখিতেছি, উত্তর কাশী হইতে এক সাধু আসিয়াছেন, তিনি তথায় ত্রয়োদশবর্ষ যাপন করিয়াছেন, কেহ তাহাকে সংবাদ দিয়াছে, বারাণসীতে প্রবল ক্ষমতাপন্ন কোন যোগী আছেন। আমি কাশী হইতে যে জন্য আসিয়াছি, তিনি কাশীতে সেই জন্য যাইবেন।

ত্যাগ শিক্ষার জন্য ব্রহ্মচর্য্য বা সন্ন্যাস অনুষ্ঠেয়। অলৌকিক ক্ষমতা লাভের জন্য কোন প্রকার সাধনা প্রবৃত্তির প্রেরণা মাত্র, নিবৃত্তির বিরোধী, শান্তির প্রতিকূল। গার্হস্থ্যের পর বানপ্রস্থ আশ্রমে সংযম অভ্যাস হইলে, যতিধর্ম্ম অবলম্বন করিতে মনু ব্যবস্থা করিয়াছেন। সংসারে শান্তি না পাইলে, কেহ এত অপেক্ষা করিতে পারেন না। তিনি দশনামী, নানক-সাহী, রামানন্দী, বা অন্য একটা হইয়া বসেন।

ঝাড়িতে, ঋষিমধ্যে সন্ন্যাসী ও উদাসীন ভিন্ন বৈরাগী কেন দেখিলাম না,

ভাবিতেছিলাম। হঠাৎ একদিন মৌনিকারেতিতে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, তাঁহারা বদরিকাশ্রমের পথে বাস্তু মনোনীত করিয়াছেন। কেহ কেহ নারায়ণ বিগ্রহ লইয়া অবস্থিত আছেন। স্থানভেদের কারণ তৎক্ষণাৎ হৃদয়ঙ্গম হইল। যাত্রী এইপথে যাইবে, আর তাম্রখণ্ড দিবে। নহিলে দেবতাকে সুবর্ণ ভূষণ পরাইয়া কৃতার্থ হইবেন কি করিয়া? নির্জ্জনে থাকিয়া কি করিবেন? প্রবৃত্তি তাঁহাদিগকে গ্রাস করিয়া রহিয়াছে। সকলি মিথ্যা, এই বোধ হইলে লোকালয় মনঃপুত হইবে না। ভেদজ্ঞান থাকিলে, আত্মতৃপ্তির অভাবে অশেষ প্রয়োজন থাকে। ঝাড়ি ও রেতিতে এই শিক্ষা নিহিত আছে।

হৃষীকেশ জনপদে ডাকবাঙ্গালা ভিন্ন বেতন দিয়া বাস করার উপায় নাই। ধর্ম্মশালার মধ্যে সিন্ধু-পাঞ্জাবের সুবৃহৎ প্রাসাদ অতি পরিপাটী। ১৫ দিন পর্য্যন্ত বিনা অনুরোধে একটি কক্ষ অধিকার করিয়া থাকিতে পারা যায়। নিয়ন্তৃগণ আগন্তুকের সেবার জন্য দীপ, জলপাত্র, শয্যা, ভৃত্য ও প্রয়োজন হইলে, চিকিৎসক পর্য্যন্ত বিনামূল্যে দিবার আয়োজন করিয়া রাখিয়াছেন। তাপ হরণের জন্য অতি নিকটেই জাহ্নবী অবস্থিতি করিতেছেন। বহিঃশান্তি, লৌকিকতা ও জীবন-রক্ষার্থ চৌরোদ্ধারণিক ও পত্রার্পণক গৃহ এবং কতিপয় পণ্যাগার প্রস্তুত আছে। চাতুর্মাস্যের সময় স্থানটি অস্বাস্থ্যকর হইয়া থাকে। তখন এখানে কেহ থাকেন না। অতএব এখানে হরিদ্বার ও কনখলের হলহলাধ্বনি-পূর্ণ চিরবসতি হইবার সম্ভাবনা অল্প। বনস্থলী শীঘ্র নগরে পরিণত হইবে না। যদি কোন নিবৃত্তিপ্রবণ ব্যক্তি স্বীয় তুল্য-প্রকৃতি-সম্পন্ন ভাবের মধ্যে অবস্থিত হইয়া কিয়দ্দিন অভ্যাসশীল হইতে বাঞ্ছা করেন, তাঁহার পক্ষে উত্তরাখণ্ডের এই স্থানে একবার আসা উচিত।

উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল। *

দিল্লী—এই নগরে কোন পরিচিত লোক না থাকায়, আমরা কালীবাড়ীতে উপস্থিত হইলাম। প্রবাসে অপরিচিত বাঙ্গালীকে স্বপরিবার মধ্যে স্থান দেওয়া অনুচিত বোধে স্থানীয় বাঙ্গালীরা চাঁদা দ্বারা একটি বাটি রাখিয়া, তন্মধ্যে কালীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়া, সেবা চালান। অভ্যাগত বাঙ্গালী আসিলে, তথায় স্থান পায়। প্রথমতঃ বাঙ্গালার নিকটবর্ত্তী দানাপুরে কালীবাড়ী হয়। এক্ষণে পেশওয়ার পর্য্যন্ত প্রায় সর্ব্বত্র হইয়াছে। অতঃপর আমরা ধরমপুরে একটি বাটী ভাড়া লইয়া তথায় পৌছিলাম। অত্রস্থ ডেপুটী-কমিশনারের জনৈক কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র বসু তদ্বিষয়ে আমাদের অনেক সাহায্য করেন। দিল্লীর ভাষা আমার কর্ণে অতি মধুর বোধ হইল। এমন চমৎকার হিন্দি আর কোথাও শুনি নাই। কলিকাতায় ক্ষেত্তরাণীদের ভাষা শুনিয়া মুগ্ধ হইয়াছি। এই স্থান সেই ভারত মোহিনী ভাষার জন্মভূমি। এখানকার ভাষাকে হিন্দী না বলিয়া উর্দ্দু বলিলেও চলে। দিল্লী অতি সমৃদ্ধ নগর। বর্ত্তমান দিল্লী ষষ্ঠবার নির্ম্মিত। সম্রাট সাহজহানই ইহার প্রতিষ্ঠাতা। নগরের চতুর্দ্দিক দুর্গ-প্রাকারের ন্যায় প্রাচীরে বেষ্টিত; তাহার স্থানে স্থানে তোপ রাখিবার স্থান। যমুনাতীরে সাহজহান নির্ম্মিত দুর্গ। আমরা অনুজ্ঞাপত্র লইয়া দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিলাম। যথায় মোগল সম্রাটের তখ্‌ত্‌তাউস্‌ বিরাজ করিত, সে হর্ম্ম্য অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে। ইংরাজ তাহা ভগ্ন করেন নাই। সেই স্বর্ণমণ্ডিত রত্ননির্ম্মিত লতাপুষ্পখচিত মসৃণ শ্বেত প্রস্তর-

---

* (১) Mathura: A District Memoir—F. S. Growse প্রণীত।

(২) Traveller's Guide—Thacker Spink & Co. কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

দিল্লী—দেওয়ান-ই-খাস

(ভারত প্রদক্ষিণ)
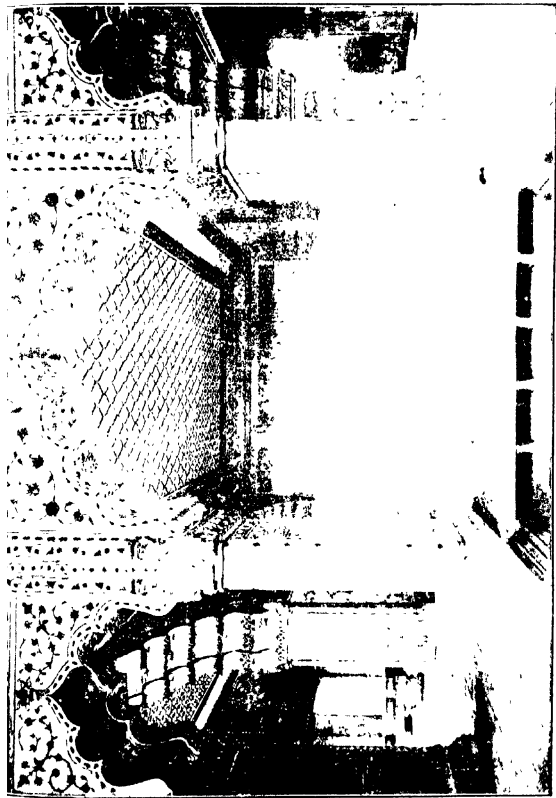
বিরচিত অট্টালিকার নাম দেওয়ানেখাস। এই স্থানে বসিয়া মুসলমান বাদসাহ ভারত শাসন করিতেন। এই স্থানে ভারতের অদৃষ্ট-লিপি লিখিত হইত। আজ এই স্থান নীরব। নিম্নেই যমুনা! প্রশান্ত!!

"যুগ-যুগবাহী, প্রবাহ তোমারি, দেখিল কত শত ঘটনা ও।
"তব জল-বুদ্‌বুদ, সহ কত রাজা, পরকাশিল লয় পাইল ও॥
"কলকল ভাষে, বহিয়ে কাহিনী, কহিছ সবে কি পুরাতন ও।
"স্মরণে আসি, মরম পরশে কথা, ভূত সে ভারত-গাথা ও॥
"আজি সব নীরব, রে যমুনে সব, গত যত বৈভব কালে ও।
"নির্ম্মল সলিলে, বহিছ সদা, তটশালিনি সুন্দর যমুনে! ও॥"

শ্বেত-প্রস্তরের 'মতি মস্‌জিদ' ও 'হমাম' (স্নানাগার) অতি বিচিত্র-দর্শন। "দেওয়ানীআম" এক্ষণে ইংরাজ সেনার সুরাপান গৃহে পরিণত হইয়াছে। বাদসাহের সিংহাসন (বেদী) অদ্যাপি তথায় বিরাজ করিতেছে। আর এক দিন আমরা পুরাতন দিল্লী দেখিবার জন্য যাত্রা করিলাম। যত অধিক অগ্রসর হই, কেবল ভগ্নাবশেষই দৃষ্টিগোচর হয়। ক্রমে 'যন্ত্রমন্ত্র' (মান-মন্দির) ছাড়াইলাম। অশোক রাজার স্তম্ভ (ফিরোজ সার লাট) দেখা হইল। পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বোচ্চ স্তম্ভ কুতব মিনার দূর হইতে দৃষ্টিগোচর হইল। মধ্যে মধ্যে সংস্কার করা হয় বলিয়া, এটি নূতনের ন্যায় রহিয়াছে। অতি চমৎকার কারুকার্য্য-খচিত পল তোলা প্রশস্ত প্রস্তর-গ্রথিত স্তম্ভ। স্তম্ভগাত্রে প্রস্তরের উপর কোরাণের বিবিধ শ্লোক খোদিত রহিয়াছে। প্রশস্ত সোপানাবলী অতিক্রম করিয়া স্তম্ভোপরি উঠিলাম; যতদূর দৃষ্ট হয়, কেবল অনন্ত ইষ্টক ও প্রস্তর রাশি চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইয়া রহিয়াছে। মধ্যে মধ্যে অভগ্ন ও অর্দ্ধ-ভগ্ন গৃহ সকল দেখা যাইতেছে। সুদূরে হুমায়ুনের সমাধি-মন্দিরের প্রকাণ্ড শ্বেত-প্রস্তরের গুম্বজ পরিদৃশ্যমান হইতেছে। অন্য দিকে উৎসাদিত তুগলকাবাদ নগরের শ্বেত 'কঙ্গুরা' দেখা

গেল। পূর্ব্বের দিল্লী নগরী এই মহাসমাধিতে নিহিত রহিয়াছে। পৃথ্বী-রাজের লাল কোঁঠ এখন ধূল্যবলুণ্ঠিত। তাঁহার কালী এখনও অন্তর্হিত হয়েন নাই। দেবী যোগমায়া "সাহেবের" মন্দির দর্শনার্থে বুতখানায় আসা গেল। ইহা একটি মন্দিরের অবশিষ্টাংশ; তজ্জন্যই মুসলমানগণ এই স্থানের নাম বুতখানা অর্থাৎ পৌত্তলিক ভজনালয় রাখিয়াছে। ইহার মধ্য-স্থলে ধাতুনির্ম্মিত একটি স্তম্ভ বিরাজিত। কথিত আছে, ৩১৯ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে রাজা ধব কর্ত্তৃক উহা নির্ম্মিত হয়। পৃথ্বীরাজ দ্বারা কুতব স্তম্ভের নির্ম্মাণ আরম্ভ হয় মাত্র; কিন্তু কুতবুদ্দীন ইহার নির্ম্মাণকার্য্য শেষ করেন। দিল্লী নগরের প্রধান দ্রষ্টব্য কুতব-স্তম্ভ। এখানে বহুতর সম্ভ্রান্ত মুসলমানের গোরস্থান, বিচিত্র শ্বেত প্রস্তরের কারুকার্য্যে অতুলনীয় হইয়া ইতস্ততঃ শোভা পাইতেছে। ইহাই কেবল দিল্লীর পূর্ব্ব গৌরবের চিহ্ন। এক দিন পুরাণকিলা নামক স্থান দেখিতে যাওয়া হইল। এই স্থানে ইন্দ্রপ্রস্থ অবস্থিত ছিল। কনিংহাম সাহেব কহেন, এখানে রাজা যুধিষ্ঠিরের সম-সাময়িক কালের একখানিও খোদিত প্রস্তর নাই। ইন্দ্রপ্রস্থ দর্শনের সাধ মুসলমানের ভজনালয় দেখিয়া মিটাইতে হইল। দিল্লীর এই বিশাল মহাপ্রান্তর হিন্দু ও মুসলমান-গৌরবের সমাধিস্থান। মুসলমান সাম্রাজ্যের পতন দেখিয়া হিন্দুর সাম্রাজ্য স্মরণ হয়।—

"কত কাল পরে, বল ভারত রে, দুঃখসাগর সাঁতারি পার হবে।
অবসাদ হিমে, ডুবিয়ে ডুবিয়ে, ও কি শেষ নিবেশ রসাতল রে,
নিজবাস ভূমে, পরবাসী হলে, পর-দাস-খতে সমুদায় দিলে।
পর-হাতে দিয়ে ধন-রত্ন-সুখে, বহ লৌহ বিনির্ম্মিত হার বুকে।
পর-দীপমালা নগরে নগরে, তুমি যে তিমিরে, তুমি সে তিমিরে।"

দিল্লীর চাঁদনি চৌক অতি প্রশস্ত ও রমণীয়। মধ্যস্থলে ও উভয় পার্শ্বে তরুরাজিশোভিত সুন্দর পথ, তাহার আবার উভয়পার্শ্বে সুপ্রসর রাজপথ—

বৃন্দাবন—সরোবরে গিরিগোবর্দ্ধন ও হরিদেব মন্দির
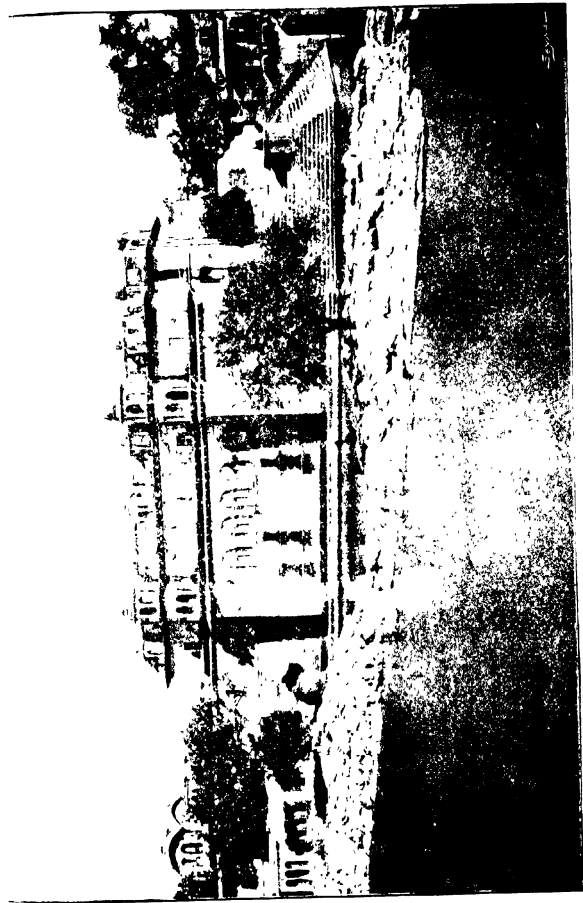
বাদসাহের সোওয়ারি বাহির হইবার উপযুক্ত স্থান বটে। নিকটেই মলকা বাগ অর্থাৎ মহিষীর উদ্যান; তন্মধ্যে বিচিত্র চিত্রশালিকা প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। এই গৃহে দিল্লীশ্বরের ময়ুর-আসনের শিরঃ-শোভাকারী একটি ক্ষুদ্র ময়ুর দেখা গেল। অতঃপর শৈল, মিউটিনি-মেমোরিয়ল্, জুম্মা-মহজিদ্ প্রভৃতি নানা স্থান, বহুবিধ নরনারী দেখিয়া ও কথকতা শুনিয়া দেশভ্রমণ সার্থক করা হইল। এখানে ক্ষত্রিয়দিগের মধ্যে 'ফুলওয়ালোঁ কি সয়ের' নামক একটি উৎসব হইয়া থাকে। প্রাবৃট্‌কালে ঐ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। তাহা দর্শনযোগ্য। দিল্লীর কোলাহলময় ভাব হৃদয়ে অঙ্কিত হইয়া রহিল। অত্রস্থ ফেরিওয়ালাদিগের চীৎকার কথনও ভুলিতে পারিব না।

মথুরা।—বৃন্দাবন।—গিরিগোবর্দ্ধন।—এখানে বাসস্থানের জন্য অধিক কষ্ট পাইতে হয় নাই। শ্রীযুক্ত বাবু শীতলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের যত্নে আমরা দিব্য বাসস্থান পাইলাম। চিরবাঞ্ছিত ব্রজমণ্ডল এক্ষণে আমাদের পদতলে স্থিত। যমুনার পরপার হইতে মথুরা কাশীর একটি ক্ষুদ্র পল্লী সদৃশ দেখায়। মথুরাতে সমস্ত পথ প্রস্তর মণ্ডিত। এখানকার ভাস্করের কর্ম্ম অতি বিচিত্র। পাথরের উপর অতি সুন্দর লতা পত্র খোদিত হইয়া থাকে। উহা সংগ্রহের জন্য গ্রাউস সাহেব একখানি আদর্শ গৃহ নির্ম্মাণ করাইয়াছেন। তাহা স্থাপত্য-কর্ম্মের চিত্রশালিকা। গোবর্দ্ধনের ছৎরি (মৃত ব্যক্তির স্মরণার্থ গৃহ) অতি মনোরম। এই সমস্ত দর্শন পক্ষে গ্রাউস সাহেবকৃত মথুরা নামক পুস্তক আমাদের সবিশেষ সাহায্য করিল। মথুরার শেঠেরা সাতিশয় ধনবান্। গোকুলদাস পারিখজী একজন গুজরাতী; তিনি গোয়ালিয়ার রাজের কোষাধ্যক্ষ ছিলেন। তাঁহার সন্তান ছিলনা। সহোদরের সহিত প্রণয় না থাকায়, তিনি অন্তিমকালে আপনার সম্পত্তি নিজ কর্ম্মচারী জৈন ধর্ম্মাবলম্বী মণিরামকে

প্রদান করিয়া যান। পারিখজী বৈষ্ণব ছিলেন। অতুল সম্পত্তি বিধর্ম্মীকে দান করিলেন, অথচ সহোদরকে দিলেন না। শরীরের সম্পর্ক প্রধান বলিয়া গণ্য হইল না! এক্ষণে সেই মণিরামের বংশই মথুরার শেঠ নামে খ্যাত। কথিত আছে, বৃন্দাবনের রঙ্গজীর মন্দির নির্ম্মাণে ৪৩ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে। উহা এই শেঠদের কীর্ত্তি। এক্ষণে ইঁহারা জৈন ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া বৈষ্ণব হইয়াছেন। কিন্তু ইঁহাদের জৈন দেবালয়ও আছে। রঙ্গাচার্য্য স্বামী শেঠদের গুরু। ইনি দ্রাবিড়ী। তদনুসারে বৃন্দাবনের মন্দির সম্পূর্ণ তামিল ভাবে নির্ম্মিত হইয়াছে। দেবতার গঠনও তদ্রূপ তামিল আকারের। রামানুজ সম্প্রদায়ের এত বড় মন্দির আর দেখি নাই। শাহ্ কুন্দন লালের মার্ব্বেল প্রস্তর নির্ম্মিত মন্দির ছবির মত সুন্দর। নির্ম্মাতার নিবাস লক্ষ্ণৌ। ইঁহাদের ধনোৎপত্তির প্রবাদ এইরূপ:—দিল্লীশ্বরের কোনও প্রধান কর্ম্মচারীর সহিত বণিক মহাশয়ের প্রণয় ছিল। এক সময় সেই অমাত্য উপযুক্ত ক্ষমতা পাইলেন। তখন বণিক কহিলেন, এখন আমাকে ধনী করিতে হইবে। অতঃপর বণিকের একখানি সিংহাসন বাদসাহকে বিক্রয় করা হইল। তাহার মূল্য কয়েক সহস্র মুদ্রা মাত্র; কিন্তু অমাত্য সেই সহস্রকে লক্ষের অঙ্ক ধরিয়া যত সহস্র টাকা মূল্য হইয়াছিল, তত লক্ষ টাকা মূল্য নির্দ্ধারণ করিয়া দিলেন। কলিকাতাস্থ রামলাল বদ্রিদাস নামীয় কুঠির ইঁহারাই অধিকারী। বৃন্দাবনের অপর প্রধান দ্রষ্টব্য স্থানের মধ্যে গোবিন্‌জীর প্রাচীন মন্দির প্রসিদ্ধ। পুরাতত্ত্ববিৎ ইংরাজ পণ্ডিতগণ বলেন, মানসিংহ কোনও ইউরোপীয় স্থাপত্যের আদর্শে এই সুবৃহৎ লোহিত প্রস্তরের দেবায়তন রচনা করিয়া যান। ধন্য গ্রাউস্ সাহেব! তিনি ইংরাজরাজকে লওয়াইয়া মন্দির সংস্কার করত হিন্দুর এই কীর্ত্তি রক্ষা করিয়াছেন। এখানকার দেবালয়ে যদৃচ্ছাক্রমে দেবদর্শন ঘটে না। রাজ-দরবারের মত দেবতার দর্শন

দিবার বার হয় এবং পুষ্প-নৈবেদ্যের পরিবর্ত্তে রাজার ন্যায় দেবতাকে নজর (ভেট) দিতে হয়। বিহারীজী নামক বিগ্রহ বিলাসী বাবুদিগের মত বেলা ১০ টার সময় নিদ্রাত্যাগ করিয়া উঠেন। তখন তাঁহার দাঁতন-সেবা হয়। ঈশ্বর মানুষ গড়েন নাই, মানুষ ঈশ্বর গড়িয়াছে, এ কথা যথার্থ। অতি রমণীয় স্থান শুনিয়া চিরদিন বৃন্দাবনকে হৃদয়ে আঁকিয়া রাখিয়াছিলাম। বৃন্দাবন বলিলে মাধবী লতার কুঞ্জ, প্রমোদোদ্যান, শারদ জ্যোৎস্না, মধুর মূরলী ধ্বনি ও সুন্দরী রমণী প্রভৃতি কত কি মনে উদয় হইত। এখানে আসিয়া বনশোভা তাদৃশ কিছুই দেখিলাম না। কেবল কতকগুলা জনপূর্ণ বাটী। নূতন দেশ ভাবিতে হইলে, আর ভাবের আবেশ হয় না। দেশ ভ্রমণে ক্রমে অরুচি জন্মিল। ব্রজের ভাষা কর্ণে মধুর শুনায় না। বেশভূষা মারওয়াড়ীদিগের অনুরূপ। মারওয়াড়ী আচার বড়ই অপ্রীতিকর। বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রীতিপ্রধান। বৈষ্ণবদের মতে যুগল-ভজন আবশ্যক। আরাধিত যুগলমূর্ত্তির পরস্পর সম্পর্ক অপবিত্র। তজ্জন্যই বৈষ্ণব ধর্ম্মে ব্যভিচার হেয় বলিয়া গণ্য হয় না। রাধাকৃষ্ণের অনন্ত প্রণয় যখন আদর্শ, তখন সতীত্ব বিষয়ে উপাসকের মন কি ভাবে গঠিত হয়, তাহা সহজেই অনুমেয়। পরম ভাগবত বাঙ্গালী, যাঁহারা বৃন্দাবনে বাস করিয়া আছেন, তাঁহাদের অনেকেই ব্যভিচারী। শৈব শিবপূজার ধ্যান পাঠান্তর আপনাকে শিবের মত চিন্তা করিয়া সম্মুখস্থ মূর্ত্তিকে তদ্রূপে ধ্যান করেন। বৈষ্ণব আপনাকে শ্রীকৃষ্ণ ভাবিবে ; সুতরাং একটি রাধা না হইলে উপাসনা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। গোকুলের গোস্বামীদের নিকট বাঙ্গালী বৈষ্ণবগুরু আপন উপাধি শিক্ষা করিয়াছেন। সেই বল্লভাচারী মহারাজগণ আপন শিষ্যের ধন, প্রাণ ও শরীরের স্বামী। অতএব শিষ্যা উপভোগে পাপ স্পর্শে না। উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল ও বোম্বাই প্রদেশে গুজরাত বেণিয়া জাতি ও ক্ষত্রিয়গণ গোকুলস্থ গোস্বামী-

দিগের শিষ্য। গোকুল জনপদ মথুরার (যমুনার) অন্যতর পারে স্থিত। ঝুলনযাত্রা উপলক্ষে আমি যে কয়েকজন মহারাজকে হিন্দোলা দুলাইতে দেখিয়াছি, তাঁহাদের সকলেরই লম্পটের ভাব। বৈষ্ণব প্রেম পরিশেষে এতদূর বিকৃত হইয়া পড়ে যে, সম্প্রদায়-বিশেষ সখীভাব ধারণ করে। পুরুষ উপাসক শ্রীকৃষ্ণকে স্বামি-ভাবে উপাসনা করিতে লাগিল। কৃষ্ণ পতি হইয়াছেন বলিয়া পুরুষ উপাসক স্ত্রীবেশ ধারণ করিলেন। নববিধানের প্রবর্ত্তক স্বর্গীয় কেশবচন্দ্র সেন ধর্ম্মসমন্বয় দেখাইবার জন্য কতকগুলি লোককে সখী সাজাইয়া উপাসনার ক্রম দেখাইয়াছিলেন। নিরাকারে কিছু না মিলায়, কেশব বাবু বোধ হয় ব্রাহ্মদের জন্য ঈশ্বরের সহিত উপাসকের পতি-পত্নী সম্পর্ক ঘটাইয়া দিয়াছেন। বৈষ্ণব ধর্ম্মে বাঙ্গালার উপকার হইয়াছে। শাক্ত সম্প্রদায়ের বীরাচার প্রায় তিরোহিত হইয়াছে।

আগ্রা।—তাজমহল দেখিয়া চক্ষু স্বার্থক হইল। ইহা যে দেখিতে পায়, সে ধন্য। শ্বেত প্রস্তরের বাটী, তাহার সর্ব্বাঙ্গে প্রস্তরের গাত্র খুদিয়া রঙ্গিন পাথর বসাইয়া ফুল ও পত্র প্রস্তুত করা হইয়াছে। একটি ফুলে ২০।৩০টি জোড় দিতে হইয়াছে, দেখিতে নিতান্ত সুন্দর। তাজের গৌরব কাহাকেও বলিয়া বুঝান যায় না, দেখিলে তবে বুঝিতে পারা যায়। যে দেখিবে, সে কৃতার্থ হইবে। ব্যস্ততা প্রযুক্ত ফতেপুর-শিকরী ও সেকেন্দ্রা দেখিতে যাওয়া হইল না।

কাণপুর।—এ নগরীর বাণিজ্যের সমৃদ্ধির কথা বহুদিন হইতে হৃদয় অধিকার করিয়া রাখিয়াছিল। পঁহুছিয়াই কলেক্টরগঞ্জে যাত্রা করিলাম। তখন বেলা ৮টা বাজিয়াছিল। এখানে অতি প্রত্যূষে হট্টসমাবেশ হয়, এখন ভাঙ্গা বাজার। একটি চতুরস্র স্থান, তাহার চারিদিকে গৃহশ্রেণী, এখানে আড়তিয়ারা বসিয়াছে। খরিদদার ইহাদের মধ্যবর্ত্তিতায় মাল লয়। মধ্যস্থলে দ্রব্যজাতপূর্ণ গরুর গাড়ী সকল
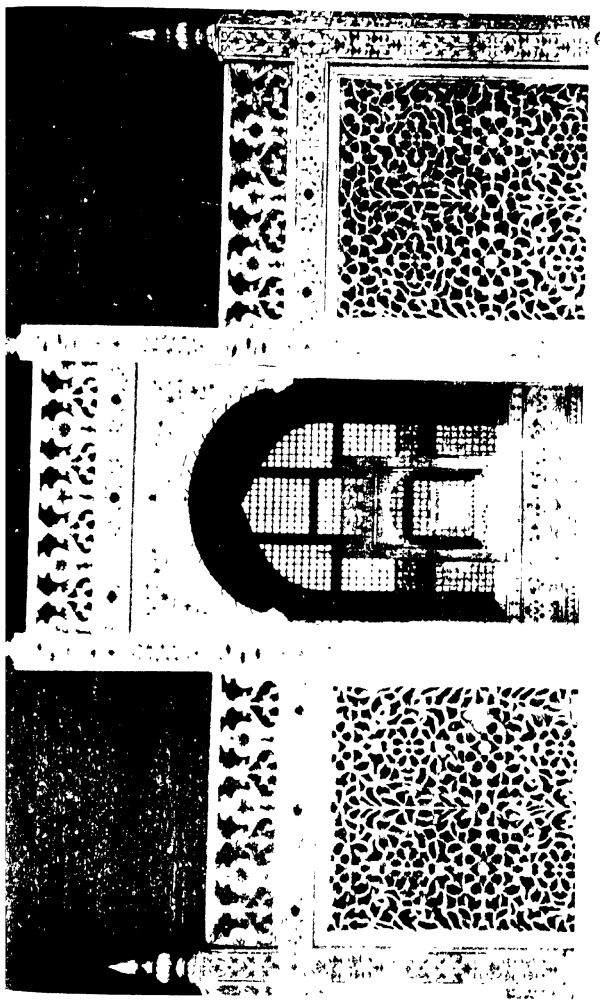
আগ্রা—তাজমহল অভ্যন্তর

রহিয়াছে। পথের ধারে চট পাতিয়া তাহার উপর নীলের বস্তা মুখ কাটিয়া ফেলিয়া রাখিয়াছে। যে কানপুরের বাজারে প্রত্যহ দুই শত মণ ঘৃত আমদানী হয় শুনিয়াছিলাম, সেথানে আজ দুই এক জন, দশ পাঁচ সের করিয়া ঘৃত লইয়া বসিয়া আছে দেখিতে পাইলাম। লবণ ও হরিদ্রা প্রভৃতি যে স্থানে বিক্রীত হয়, সেথানেও ঐরূপ পথের উপর বস্তার মুখ কাটিয়া ফেলিয়া রাখিয়াছে।

আহারান্তে সিপাহী-বিদ্রোহের স্মারক-দেউল দেখিতে যাওয়া গেল। ভারতবাসী এ স্থল দেখিতে চাহিলে ম্যাজিষ্ট্রেটের অনুমতি-পত্র লইতে হয়; তজ্জন্য আমরা তাঁহার নিকট হইতে লিপি লইয়া আসিয়াছিলাম। প্রথমেই কূপ সন্নিধানে গিয়া উপস্থিত হইলাম, অতি পরিপাটী ভাস্করের কর্ম্ম। আঙ্গুরের পাতা অতি সুন্দর ভাবে খোদিত হইয়াছে। সমাধির উপর মর্ম্মর-প্রস্তর নির্ম্মিত শান্তিদেবীর মূর্ত্তি। মুখখানি দেখিলে বাস্তবিক করুণার উদয় হয়। ইংরাজ নানা সাহেবকে দোষী কহেন, কিন্তু তিনি হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত ছিলেন না; তাঁহার অনুচরের দ্বারা সে নৃশংস ব্যাপার অনুষ্ঠিত হয়। তার পর চৌরাঘাট নামক স্থান দেখিয়া ফিরিয়া আসিলাম। কথিত আছে, এই স্থানেই ইংরাজের তরণীতে অগ্নি-সংযোগ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল।

প্রয়াগ।—গঙ্গা ও যমুনা এখানে মিশ্রিত হইয়াছেন, সেই জন্য এ স্থানের নাম প্রয়াগ। নৌকা আরোহণ করিয়া সঙ্গমের অদূরে উপস্থিত হইয়া, স্রোতস্বতীদ্বয়ের জলের পার্থক্য দর্শনে পুলকিত হইলাম। আকবর সাহের রক্তবর্ণ প্রস্তরনির্ম্মিত দুর্গ এখানকার দ্বিতীয় দর্শনীয় সামগ্রী। ভূগর্ভে আলোকবিরহিত হইয়া অক্ষয় বটের পত্র হরিদ্ বর্ণ না হইয়া শ্বেত রহিয়াছে। আরব্যভাষানুরাগী মীওর মহোদয়ের পরামর্শে নির্ম্মিত মীওর কলেজের আকার আরব্য স্থাপত্যের সৌন্দর্য্য প্রদর্শন করিতেছে।

লক্ষ্ণৌ।—বলরামপুরে রাজার সরায়ে অবস্থিতি করা গেল। ভটিয়ারিণ কি পদার্থ, এতদিনে জানিতে পারিলাম। এবারকার এই শেষ আড্ডা। কত প্রকার স্থানেই যে বাস গ্রহণ করা হইল! মুদির দোকান, বাঙ্গালীর হোটেল, বাড়ীওয়ালীর ঘর, রেলওয়ে সরাই, বন্ধুর শ্বশুর বাটী, বয়স্তের বাসা, অন্যের পত্র দ্বারা পরিচিত বাসা, ইংরাজের ডাক বাংলা, শিখের ধর্ম্মশালা, কাশ্মীররাজের ডাক বাংলা, ভাড়াটিয়া বাটী, নৌকা, কালীবাড়ী, অবশেষে ভটিয়ারিণের সরাইয়ে পর্য্যন্ত আশ্রয় লওয়া হইল। প্রয়াগ ছাড়াইয়া আর খোলার ঘর দেখি নাই। এখানে আসিয়া তাহা দেখিতে পাইলাম। কেশরবাগ, বিদ্ধ গুলির চিহ্নে অলঙ্কৃত। ভগ্ন রেসিডেন্সী ইংরাজের প্রতি ভারতবাসীর দৌরাত্ম্য প্রদর্শনের জন্য চিররক্ষিত হইয়াছে। ইমামবাড়া, চৌক, মিউজিয়ম প্রভৃতি নানা স্থান দেখা হইল। ছত্রমঞ্জিলও দেখা গেল। লক্ষ্ণৌএ দেওয়ালের উপর চুনের লতা পাতা খোদাই অতি চমৎকার। লক্ষ্ণৌ নগর দেখিতে সুন্দর না হইলেও এখানকার লোক যে বিলাসী, তাহা সরায়ে বসিয়াই জানা গেল। যে সকল মিষ্টান্ন সর্ব্বসাধারণে গ্রহণ করে, ফেরিওয়ালা তাহাই বিক্রয় করিয়া বেড়ায়। যাহা অতি উৎকৃষ্ট, তাহা সন্ধান করিয়া লইতে হয়। অন্যস্থানের দুর্ল্ভ খাদ্য এখানে সাধারণ ভাবে ফেরিওয়ালাকে বিক্রয় করিতে দেখা যায়।

রাজপুতানা।

জয়পুর।—প্রভাত সময়ে পৌঁছিয়া রেলওয়ে সন্নিহিত ঠাকুর ফতেসিং নির্ম্মিত ধর্ম্মশালায় উত্তীর্ণ হওয়া গেল। দেশের প্রকৃতি বিভিন্ন দেখা যাইতে লাগিল। ভূমি বালুকাময়ী,—স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র শৈল দেখা যাইতেছে। অনতিদূরে শের গড়ের প্রাকার পর্ব্বতের সানুদেশ ঘেরিয়া রহিয়াছে। প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া গোবিনজীর দর্শন করিতে ও নগর দেখিতে চলিলাম। নগর প্রাচীরবেষ্টিত; পুরদ্বার অতিক্রম করিয়া, সুবিস্তৃত রাজপথে সমুপস্থিত হইলাম। বাটী, ঘর সকলই প্রস্তরনির্ম্মিত; ইষ্টক একেবারে নাই। পূর্ব্বপশ্চিমবাহিনী একটি রথ্যা, উত্তর দক্ষিণ বাহী আর একটি পথ ছেদ করিয়া গিয়াছে। উভয় পথের দুই পার্শ্বের বাটী এক প্রণালীতে গঠিত ও লোহিত বর্ণে রঞ্জিত। কোনও বাটীর অলিন্দ নাই; বাতায়ন ও গবাক্ষ যে এক পর্য্যায়ের শব্দ, তাহা এখানে সপ্রমাণ হইল। সকল বাটীরই উপরে পাথরের জালীর কর্ম্ম শোভমান। পথিপার্শ্বে জলের কল ও গ্যাসালোকের স্তম্ভ বিরাজমান। রাজবাটী অতি প্রকাণ্ড। বোধ করি, সহরের বার অংশের এক অংশ হইবে। উহাকে বাটী না বলিয়া পল্লী বলা উচিত। একটি প্রাচীরবদ্ধ স্থান, তাহার মধ্যে অসংখ্য পৃথক্ পৃথক্ অট্টালিকা। গোবিনজীর মন্দির রাজার পুষ্পবাটিকায় সংস্থাপিত। শ্রীবৃন্দাবনে গোবিনজীর প্রাচীন মন্দির বলিয়া প্রসিদ্ধ যে এক অভূতপূর্ব্ব দেবালয় আছে, তথা হইতে জয়পুররাজ আওরঙ্গজেবের ভয়ে এখানে সেই বিগ্রহ আনয়ন করিয়াছিলেন। দিব্য মূর্ত্তি! একজন ভক্ত কহিল, যতবার দেখ, পুনর্ব্বার দেখিতে

ইচ্ছা হইবে। পূজারীরা বাঙ্গালী, আমাদিগকে নবাগত দেখিয়া জিজ্ঞাসাবাদ করিল। এখান হইতে এক বৃহৎ জলাশয়তীরে যাওয়া গেল; উহাতে বহু কুম্ভীর বাস করে। কৌতুক দেখিবার জন্য মাংস আনান হইয়াছিল; তত্রত্য অন্তেবাসী উহা রজ্জুবদ্ধ করিয়া জলে প্রক্ষেপ করত নক্রগণকে আহ্বান করিতে লাগিল। বহুদূরে দেখা গেল, একটা কুম্ভীর জল কাটিয়া আসিতেছে। বার বার ডাকাতে অনেকগুলি নক্র আসিয়া জুটিল। তখন অন্তেবাসীরা মাংসখণ্ড-বদ্ধ রজ্জু ক্রমশঃ টানিয়া লইতে লাগিল; অতঃপর কুম্ভীরগুলা জল ছাড়া হইলে তাহাদের ভয়াবহ মুখ-কন্দর স্পষ্ট দেখা যাইতে লাগিল। বেলা অধিক হওয়ায়, গৃহে প্রত্যাগমন করিলাম। বিনা অনুমতিতে রাজপ্রাসাদ দেখিবার সম্ভাবনা নাই; সে জন্য বৃটিশ রেসিডেণ্টকে পত্র লিখিয়া আজ্ঞালিপি আনাইলাম। আহারান্তে রেসিডেন্সী হইতে একজন বার্ত্তাবহ আসিয়া রাজপুরে লইয়া গেল। প্রাচীরের পর প্রাচীর অতিক্রমণ করিতে করিতে অনেকগুলি মণ্ডপ ও হর্ম্ম্য দেখিলাম। কাশী ও দিল্লীর মানমন্দির অপেক্ষা এখানকার জ্যোতিষশালায় অধিক বস্তু আছে এবং অতি যত্নের সহিত রক্ষিত হইতেছে, বোধ হয় যেন নূতন। কিন্তু আমাদের পক্ষে উহা কেবল "যন্ত্র মন্ত্র"। যন্ত্র মন্ত্র শব্দে অবিজ্ঞেয় বুঝায়। দিল্লীর অধিবাসীরা সেখানকার মানমন্দিরকে যন্ত্র মন্ত্র নামে অভিহিত করে। জয়পুরের শিল্পবিদ্যালয় ও চিত্রশালায় বাঙ্গালা অক্ষরে অঙ্কিত হিরণ্য মুদ্রা দেখিলাম। পরিশেষে রাম-নিবাস উদ্যানের ছায়াগৃহে বসিয়া দিবসের অবশিষ্ট ভাগ অতিবাহিত করা হইল। অর্দ্ধরাত্রে জয়পুর ত্যাগ করিলাম।

আজমীর।—(অজমীঢ়) পুষ্কর এখান হইতে তিন ক্রোশ। বাষ্পীয় রথ হইতে অবতরণ করিয়া তৎক্ষণাৎ, এক্কাযোগে "দুষ্কর তীর্থ" পুষ্কর অভিমুখে ধাবমান হইলাম। কিয়দ্দূর যাইয়া দুইটি বাঙ্গালীর সহিত

জয়পুর—রাজপথ

সাক্ষাৎ হইল। তাঁহারা আজমীরবাসী। সে দিন রবিবার বলিয়া পুষ্কর যাইতেছেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন, আজমীরে যাঁহার বাটীতে আমাদিগের থাকিবার কথা, নাম বাবু প্রসন্নকুমার চক্রবর্ত্তী; আর একজনকে আমার পরিচিতের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল, কিন্তু চিনিতে পারিলাম না। তিনি আমাকে চিনিয়াছিলেন,—বোধ হয়, শিবচন্দ্র বাবুর নিকট পরিচয় পাইয়া থাকিবেন। কথার সম্প্রসারণ করিতে করিতে আমি বলিয়া ফেলিলাম, আপনার নাম নন্দবাবু (মুখোপাধ্যায়) না? তিনি বলিলেন, হাঁ। অসম্ভাবিত রূপে ১৩।১৪ বৎসর পরে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইল। এখন শরীরের অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে বলিয়া আমি তাঁহাকে চিনিতে পারি নাই। সমতল ভূমি ত্যাগ করিয়া পাহাড় কাটিয়া পথ গিয়াছে। সে জন্য এখানে কিয়দ্দূর পদব্রজে চলা আবশ্যক হইয়াছিল। নন্দলাল বাবুর সহিত বহু পুরাতন কথা-প্রসঙ্গে অতি সুখে চলিলাম। এখানকার পাহাড় দেখিলে মারওয়াড় দেশে অর্থাৎ মরুস্থলীতে যে আসিয়াছি, তাহা বুঝা যায়। শৈল তরুগুল্মহীন। মনসাগাছের মত একরূপ উদ্ভিদ পর্ব্বতে রহিয়াছে, কিন্তু তাহাও পত্রহীন। গিরিবরের বর্ণও তদুপযোগী; যেন দগ্ধ হইয়া রহিয়াছে। পুষ্কর হ্রদের তিন দিক্ বাঁধান। উপরে নানাদেশীয় রাজগণ ও বণিক্‌বৃন্দ দেবালয় ও আবাস নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ব্রহ্মার মন্দির মহারাজ হোলকার নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। ভারতের মধ্যে ইহা ভিন্ন আর ব্রহ্মার মন্দির নাই। বেলা অধিক হইয়াছিল বলিয়া সাবিত্রী পর্ব্বতে যাওয়া হইল না। পাণ্ডা কহিল, বাঙ্গালী রমণীদের নিকট সাবিত্রী দেবীর সাতিশয় গৌরব আছে। অন্যান্যদেশীয় যাত্রী সে পাহাড়ে প্রায় যায় না। এখানে ব্রাহ্মণ-ভোজন করাইতে হইল। মালপুয়া, পকৌড়ী ও পচা দধির রায়তা অতি উপাদেয় বুঝিয়া পাণ্ডাজী আহরণ করিয়াছিলেন, সুতরাং আমাদের ভাগ্যে বিধাতা আজকার জন্য উহাই মাপাইলেন।

অপরাহ্ণকালে আজমীরে প্রত্যাগমন করা হইল। জয়পুরের মত এখানকার বাটী সকল প্রস্তরগ্রথিত ও সাতিশয় পরিষ্কৃত। সহরটিও প্রাচীরবেষ্টিত। সন্ধ্যা সমাগত দেখিয়া এক দেবালয়ে গীতবাদ্য শ্রবণে কালাতিপাত করা গেল। রজনীযোগে সাঁঝি নামক উৎসব দেখিলাম। প্রত্যেক পল্লীতে একটা স্থান চন্দ্রাতপ দ্বারা আবৃত হইয়া আলোকমালায় সজ্জিত রহিয়াছে ও বিবিধ চিত্র আলম্বিত হইয়াছে। ধরাতলে নানাবর্ণের চূর্ণ দ্বারা আসন বা মণ্ডল রচিত হইয়াছে। কি উদ্দেশে এ অনুষ্ঠান, জিজ্ঞাসা করিয়া প্রকৃত উত্তর পাইলাম না। প্রসন্ন বাবু অতি সদাশয়, এখানে সপরিবারে আছেন, তাঁহার অনেকগুলি কন্যা-সন্তান। আমাদের আতিথ্য সৎকার অতি যত্নের সহিত সমাপন করিলেন। বোধ হইল যেন, কোন পরম আত্মায়ের বাটীতে উপস্থিত হইয়াছি।

পরদিন প্রাতঃকালে তারাগড় নামক গিরিদুর্গের উপর উঠা গেল। এখান হইতে অজমেঢ় নগর অতি সুন্দর দেখায়। ধবলাকার বাটীগুলি দূরে ঘনসমাবিষ্ট; যেন শ্বেত প্রস্তরের নির্ম্মিত সহর বলিয়া প্রতীত হয়। অন্যদিকে তরু-পুষ্প শোভিত শ্যামল ক্ষেত্রের উপর দূরবিচ্ছিন্ন ইংরাজী বাংলাগুলি চমৎকার দেখাইতেছে। আয়নাসাগরটি নিকটে হইলে আরও উহার রূপের ছটা বাড়িত। কাশ্মীরে তুখৎ-ই-সুলেমান হইতে প্রকৃতির যে সৌন্দর্য্য দেখিয়াছি, তাহা অতুলনীয়। কিন্তু নগরের এমন শোভা আর বুঝি কোথাও দেখিব না। পর্ব্বত হইতে অবতরণ করিয়া 'আড়াহি দিন কা ঝোপড়া' নামক এক অতি প্রাচীন বৌদ্ধ বা হিন্দু দেবালয়ে উপস্থিত হইলাম। তাহার কারুকার্য্য চমৎকার। এই স্থান ১২১১—৩৬ খৃষ্টাব্দে মুসলমান ভজনালয়ে পরিগণিত হইয়াছে। বেলা ২টার সময় যাত্রা করিয়া রাত্রি ২ টার সময় আবুরোড ষ্টেশনে পৌছান গেল। ষ্টেশনমাষ্টার হিন্দুস্থানী, অতি ভদ্রলোক। রিফ্রেশ্‌মেণ্ট রুমে তিনি রাত্রিকালে আমাদিগকে স্থান দিলেন।

আবুজী। *

অর্ব্বুদাচল আর্ব্বলি পর্ব্বতের সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গ। ইহার অপর নাম গুরু-শিখর। ইহা সমুদ্রতল হইতে ৫০০০ ফিট উচ্চ। ঝাপানে করিয়া শৈলে উঠিতে আরম্ভ করা গেল। প্রাকৃতিক শোভা মন্দ নহে। চেনার বৃক্ষের ন্যায় কডু নামে একরূপ শ্বেত বৃক্ষ দেখিলাম। হিংস্র জন্তু এ পর্ব্বতে অনেক। অসভ্য ভীল জাতির ভয়ে পূর্ব্বে এস্থানে আসা বড় সহজসাধ্য ছিল না; কিন্তু এক্ষণে দুর্দ্দান্ত ইংরাজ শাসনে সেই ভীলজাতি ধনুর্ব্বাণ লইয়া আড্ডায় আড্ডায় শান্তি-রক্ষা কার্য্যে ব্রতী রহিয়াছে। ক্রমশঃ ইংরাজ সমাশ্রয় আবু অতিক্রম করিয়া দিলওয়াড়ায় উত্তীর্ণ হওয়া গেল। ভিত্তি বেষ্টিত একস্থানে কয়েকটি মলিন দেবায়তন রহিয়াছে, দেখা যাইতে লাগিল। উহার কিছু মাত্র সমৃদ্ধি নাই। হৃদয় স্তম্ভিত হইল। মুখে বাক্য সরে না। কি ছবি হৃদয়ে আঁকিয়া রাখিয়াছি, আর এখন কি দেখিতেছি, আমার সহচরকে কিছু বলিতে পারিলাম না। তিনিও সে বিষয়ে কোন বাঙ্-নিষ্পত্তি করিলেন না। নীরবে দুইজনে চেয়ার হইতে অবতরণ করিয়া বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলাম। প্রহরী জিজ্ঞাসা করিল, আপনারা কি শ্রাবক! আমরা কহিলাম না, বৈষ্ণব। শাক্ত বলিলে বুঝিবে না, এজন্য

---

* (১) Indo Aryans—শ্রীরাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রণীত। (২) আর্য্য জাতির শিল্পচাতুরী (Fine Arts of Ancient India: with a short sketch of the origin of art)—শ্রীশ্যামাচরণ শ্রীমাণী প্রণীত (৩) সভ্যতার ইতিহাস (Origin of Civilization) —শ্রীশ্রীকৃষ্ণদাস প্রণীত। (৪) জৈন ধর্ম্ম (বঙ্গদর্শনে লিখিত)—শ্রীরামদাস সেন প্রণীত। (৫) First Report of the Curator of Ancient Monuments in India for 1881-82.

বৈষ্ণব বলিয়া পরিচয় দিতে হইল। সে আমাদিগকে কোন মহাজন অর্থাৎ বণিক ভাবিয়া বাসের জন্য এক গৃহ খুলিয়া দিল। মন্দির মধ্যে যাইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে পর দুইজন দ্বারবান্ আর এক প্রাচীরের মধ্যে লইয়া চলিল। সেখানে গিয়া আরও নিরাশ হইলাম। একটি ঘর খুলিল, তাহার মধ্যে মন্দির নির্ম্মিতা বিমলসাহ ও তদীয় শেঠানীর (শেঠ-পত্নীর) মূর্ত্তি রহিয়াছে। দশটা শ্বেত হস্তী ও আরোহীর মূর্ত্তি গৃহের মধ্য-স্থলে বিরাজমান। ভাবিলাম খুব দেখা হইল—এই দেখিতে এত পরিশ্রম করিয়া খিরওয়াড়ি হইতে আসিয়াছি কি ?

এমন সময় একজন কুঞ্জি লইয়া আসিল। অপর দিকে আর এক দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইল। উহা আর একটি মহল। অহো! যেন বৈকুণ্ঠের দ্বার খোলা হইল। সম্পূর্ণ প্রকোষ্ঠ শ্বেত প্রস্তর নির্ম্মিত। স্তরে স্তরে যেন পুষ্পরাশি রহিয়াছে। চিত্তের মল দূর হইল—নয়ন ও মন জুড়াইল। ধর্ম্ম মন্দির বাহির হইতে আড়ম্বর শূন্য দেখান ভাল, অথবা দস্যুর যাহাতে লোভনীয় না হয়, এই উদ্দেশেই বোধ হয় এই অতুল সৌন্দর্য্য প্রচ্ছন্ন রাখা হইয়াছে। আমাদের সহিত দ্বাদশ জন বাহক ছিল, তাহারাও এই সুযোগে দেখিয়া লইবে বলিয়া প্রবেশ করিতে চাহিল। প্রহরী তাহাদের জাতি জিজ্ঞাসা করিয়া ভিতরে আসিতে দিল। চৌর্য্য যাহাদের কুলাচার, সেই জাতি না হয়, এই অভিপ্রায়েই বোধ হয় প্রহরিগণ জাতি জিজ্ঞাসা করিয়া থাকে। স্থানটি ১২৮ হস্ত দীর্ঘ ও ৭২ হস্ত প্রস্থ হইবে। ভিত্তির ভিতর অংশে দৈর্ঘ্যের দিকে ১৭ ও প্রস্থের দিকে দশটি করিয়া কুঠরি। কুঠরির সম্মুখে যুগ্মস্তম্ভশ্রেণী সজ্জিত দালান চলিয়াছে। প্রতি কুঠরিতে এক ক্ষুদ্র বেদি, তাহাতে উত্তান-পাণিপাদ ধ্যানাবলম্বিত তীর্থঙ্কর মূর্ত্তি। প্রতি চতুঃস্তম্ভ অন্তরালে সমতল বা খিলানের মত ছাদ। এতৎ সমস্তই উৎকৃষ্ট মর্ম্মর নির্ম্মিত। প্রত্যেক স্তম্ভ, ছাদের খিলান এবং বেদির
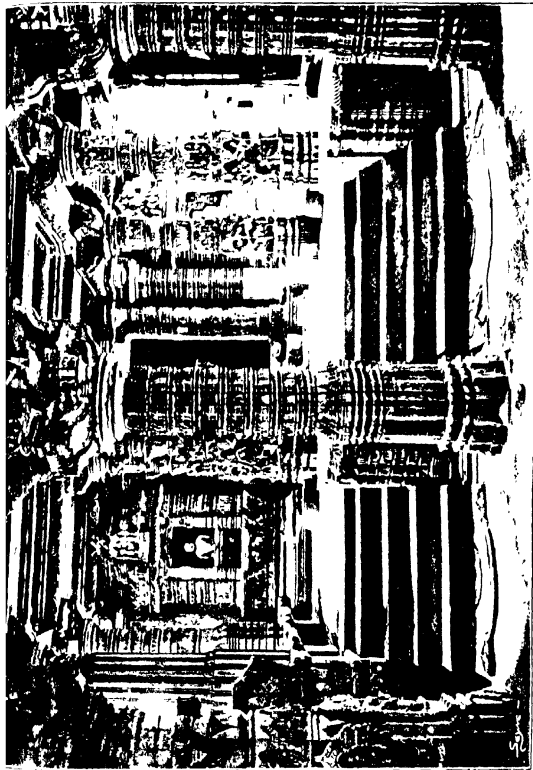
আবু-দিলওয়াড়া মধ্য

প্রাকার বিভিন্ন ও শিল্পের অলঙ্কারও ভিন্ন প্রকারের। উহার কারু-কার্য্যের প্রাচুর্য্য ও নির্ম্মাণের সৌন্দর্য্য বর্ণনার আয়ত্ত নহে। এ সকল ছাড়াইয়া মন্দির সম্মুখে মণ্ডপ। ইহাতে যে স্তম্ভ শ্রেণী আছে, তাহার কারুকার্য্য অতি বিস্ময়কর। যেন হস্তিদন্ত খুদিয়া ফুল, পাতা ও কাণ্ড বাহির করিয়াছে। স্তম্ভ গাত্রে উপরে একটা স্তর রাখিয়া মধ্যে আর একটা কারুকার্য্যের স্তর নির্ম্মাণ নিতান্ত অদ্ভুত ব্যাপার। ছাদের ভিতর দিক ফুলের আকার সদৃশ; গহ্বরে পূর্ণভাবে খোদিত জৈন পৌরাণিক মূর্ত্তি পূর্ণ। 'নক্কাশী' বা কারুকর্ম্ম বিহীন এক অঙ্গুল পরিমিত স্থান পাওয়া দুষ্কর। এরূপ অতি সূক্ষ্ম খোদকারীর কর্ম্মে ভারতবর্ষে ইহার প্রতিযোগী নাই। তাজমহল 'পচ্চিকারী' কর্ম্মের জন্য অতুল, খোদকারীর জন্য নহে। যে তাজমহল দেখিয়াছে, তাহার একবার বিমলসাহ দেখা কর্ত্তব্য। সম্রাট জাহাঙ্গিরের পূর্ব্বে প্রস্তরের উপর "পচ্চিকারী" কর্ম্ম কোথাও দেখা যায় না। ইংরাজ পুরাণকার কহেন, সাজাহানের কর্ম্মে কয়েকজন ইউরোপীয় শিল্পী ছিল; তাহাদের শিক্ষা অনুসারে "নগোঁকা কাম" করা হয়। এই কথায় আমাদের কিছুমাত্র শ্রদ্ধা নাই।

উল্লিখিত শিল্পে দুইটি অভাব দেখিলাম, রঙ্গিন পুষ্প ও পত্র নির্ম্মাণে আলোক ছায়ার ভেদ নাই। আর স্বাভাবিক পুষ্পের অনুকরণ না করিয়া কাল্পনিক আদর্শের পুষ্প বিনির্ম্মিত হইয়াছে। প্রথমটির কথা ছাড়িয়া দ্বিতীয় বিষয়ে এই বলা যাইতে পারে যে, এ দেশ অদ্ভুতত্ব-প্রিয়। সুতরাং শিল্পীর রুচি কি করিয়া স্বভাবের দিকে যাইবে? কিন্তু সুন্দর কল্পিত বিষয় প্রদর্শন করাই শিল্পের উদ্দেশ্য। আপনাকে আপনি প্রকাশ করাই তাহার কাজ। শিল্পের নিজের একটা জীবন আছে। প্রাণি জগৎ বা নৈসর্গিক সামগ্রীর যে অনুকরণ করিতেই হইবে, এমন কোন কথা নহে।

বিমলসাহর মার্ব্বেল 'চন্দ্রবতি' নামক স্থান হইতে আনীত। কথিত আছে, পূর্ব্বে এই স্থানে শিব ও বিষ্ণুর মন্দির ছিল। পূজককে উৎকোচ দ্বারা বশীভূত করিয়া, জৈন মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ভূমির মূল্য এত রজত মুদ্রা দিতে হইয়াছে, যে সেই টাকা এক একটি করিয়া রাখিলে, ক্রীত ভূমি সম্পূর্ণ আচ্ছাদিত হয়। ১০৩২ খৃষ্টাব্দে গুর্জ্জর দেশান্তর্গত পাটন নিবাসী বণিকশ্রেষ্ঠ বিমলসাহ অষ্টাদশকোটি মুদ্রা ব্যয়ে ইহার নির্ম্মাণ কার্য্য সমাধা করেন। ইহা প্রস্তুত হইতে চতুর্দ্দশ বৎসর লাগিয়াছিল। ইদানীং সিরোহি ও অহম্মদাবাদ নগরস্থ পঞ্চায়েত কর্ত্তৃক মন্দিরের রক্ষণাবেক্ষণ হইয়া থাকে। যে সকল শ্রাবক তীর্থ যাত্রা করিতে আগমন করে, তাহারা সঙ্গতি অনুসারে দশ টাকা হইতে সহস্র টাকা পর্য্যন্ত ভাণ্ডারে জমা দেয়। তদ্দ্বারা মন্দিরের ব্যয় নির্ব্বাহিত হয়। পূজারী ও সশস্ত্র দ্বাররক্ষক সংখ্যায় ষোল জন। মন্দিরে কোনও যতি নাই। পূজারী ও যতি ব্রাহ্মণ বর্ণ হইতে গৃহীত হয়। এই মন্দির হইতে বহির্গত হইয়া তেজপাল ও বস্তুপাল নামক ভ্রাতৃদ্বয় নির্ম্মিত মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করা গেল। ১১৯৭ হইতে ১২৪৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যে এই দেবালয় প্রস্তুত হইয়াছে। চতুঃশালী অলিন্দ, মণ্ডপ প্রভৃতি সমস্তই বিমলসাহের ন্যায়। কিন্তু কারুকার্য্যের পারিপাট্য তদপেক্ষা অধিক। মন্দিরের মুখে উভয় পার্শ্বে জেঠানী ও দেবরাণীর দুইটি তাথ। তাহার নকাশী এমন সূক্ষ্ম যে, এক একটা প্রস্তুত করিতে, কথিত আছে, সওয়া লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। তেজপাল, বস্তুপাল মন্দির-নির্ম্মাণ কার্য্য সমাধা করিলে, তাঁহাদের পত্নীদ্বয় কহিল, "ইহা ত তোমাদের হইল, আমাদিগের জন্য কি করিলে?" তাহাতেই এই তাখ দুইটি বিনির্ম্মিত হয় ও সেই জন্যই ইহার নাম জেঠানী ও দেবরাণীর তাখ হইয়াছে। প্রবাদ আছে, স্থপতিগণ নকশা খুদিলে যে পাথরের গুঁড়া বাহির করিত, তাহা ওজন করিয়া যতটুকু হইত, ততখানি

ওজনের রৌপ্য ঐ কার্য্যের বেতন পাইত। ফলতঃ খোদ্‌কারীর গভীরতা অতিশয় দেখা গেল। এপ্রকার ভাস্কর্য্য যাহাদের দ্বারা সম্পন্ন হইয়াছে, তাহাদের স্থাপত্য বিদ্যায় অসাধারণ জ্ঞান ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই।

সায়ংকালে আরতি দেখিবার জন্য বিমলসাহের মন্দিরে প্রবেশ করা গেল। প্রথম তীর্থঙ্কর ঋষভদেবের অতি প্রকাণ্ড অরুণ বর্ণ প্রস্তর নির্ম্মিত ধ্যানমগ্ন মূর্ত্তি দীপালোকে মণিময় কণ্ঠভূষা উদ্ভাসিত করিয়া বিরাজ করিতেছে। চক্ষু দুইটি হীরকময়, কর-ভূষণ তদুপযুক্ত স্বর্ণ নির্ম্মিত। এখান হইতে তেজপালের মন্দিরে যাওয়া হইল। তখন আরতি আরম্ভ হইয়াছে। এখানে কৃষ্ণ-প্রস্তর নির্ম্মিত শেষ তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথের নাতি-দীর্ঘ মূর্ত্তি নানা সুবর্ণালঙ্কারে ভূষিত হইয়া দণ্ডায়মান আছেন। আরতির দীপ নামাইবার জন্য আমাকে সওয়া মণ ঘৃত মানসিক করিতে কহিল! সেই দীপ লইয়া মন্দিরস্থ অন্যান্য মূর্ত্তির আরতি করিয়া, বহির্দ্দেশের সমুদায় মন্দিরে আরতি করিয়া বেড়াইতে লাগিল। আমরা দুইজনে ভক্ত শ্রাবকের মত অনুবর্ত্তন করিতে লাগিলাম। তাহাতে সমস্ত দেবালয় দেখা হইল। বিমলসাহ তেজপাল ও বস্তুপালের মন্দির ভিন্ন অপরগুলি শ্বেত প্রস্তর নির্ম্মিত নহে। জৈন যাত্রীদের সহিত বিবিধ প্রসঙ্গে বহুক্ষণ যাপন করিয়া শয়ন করিলাম। ঋষভদেবের বক্ষোবিলম্বিত বড় বড় মরকতমণির দীপ্তি বার বার মনে হইতে লাগিল। জৈন সম্প্রদায়ের মধ্যে শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর নামে দুই শ্রেণী আছে। শ্বেতাম্বরী শ্রেণী বোধ হয় বিলুপ্ত হইয়াছে। দিগম্বরীরা মহাপুরুষের মূর্ত্তিকে নানা অলঙ্কারে ভূষিত করিবে, কিন্তু বস্ত্র পরাইবে না। কারণ তাহা হইলে, নির্গ্রন্থ অর্থাৎ বন্ধনরহিত হওয়া যায় না। যেমন অন্তরে সঙ্গরহিত, তেমনি বাহ্য শরীরেও বস্ত্রাদি সঙ্গরহিত না হইলে কি চলে? বৌদ্ধ ধর্ম্ম ও

ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের মিশ্রণে জৈন ধর্ম্মের উৎপত্তি। মাধবাচার্য্য উপহাস করিয়া বলিয়াছেন,—এ ধর্ম্মে কেবল বিশেষের মধ্যে পিচ্ছিকাগ্রহণ, কেশোল্লুঞ্চন ও মুখবন্ধন আছে। ধর্ম্ম প্রবর্ত্তকের নাম মহাবীর। এই ধর্ম্মে জগৎকে "জন্য" কহে না, পরন্তু কোনও সর্ব্বজ্ঞ আত্মা আছেন, এমন বিবেচনা করিয়া থাকে। যে সকল মহাপুরুষ যোগবলে নির্ব্বাণ লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা তীর্থঙ্কর নামে অভিহিত হন ও তাঁহারাই জিন। জয়তি রাগদ্বেষমোহানিতি (জি-নক্) জিনঃ! পূজাপদ্ধতি;—ওঁম্ শ্রীং ঋষভায় স্বস্তি। ওঁম্ হ্রীংহম্, ওঁম্ হ্রীং শ্রীসুধর্ম্মাচার্য্য আদি গুরুভ্যো নমঃ। ওঁম্ হ্রীং হ্রীংম্ সমজিন চৈত্যালেভ্যঃ শ্রীজিনেন্দ্রেভ্যোনমঃ।

কাশী অঞ্চলে বণিয়াদের মধ্যে এক জাতিতে জৈন ও হিন্দু উভয় মতাবলম্বী আছে। এক্ষণে অনেক জৈন হিন্দু হইতেছে। জৈনেরা যে হিন্দু নহে, এমন বলিতেছি না। উহাদিগের শাস্ত্র পৃথক্; এই জন্য উক্ত প্রকার বলিতে হয়। জিনের উপাসনা ত্যাগ করিয়া, যাহারা বিষ্ণুর উপাসনায় প্রবৃত্ত হইতেছে, তাহাদের সম্বন্ধেই জৈন হইতে হিন্দু হওয়া বলা হইল। কাশীতে আগরওয়ালাদিগের প্রায় অর্দ্ধেক জৈন। অনেক স্থানে জৈন ও বৈষ্ণব আগারওয়ালায় বিবাহ হয়। বৈষ্ণব স্বামী যদি জৈন সম্প্রদায় হইতে স্ত্রী গ্রহণ করেন, সে স্ত্রী বৈষ্ণবী হইবে। জৈন স্বামী যদি বৈষ্ণব সম্প্রদায় হইতে স্ত্রী গ্রহণ করেন, সে জৈন হইবে না,—এবং সমর্থপক্ষে আপনি স্বহস্তে রাঁধিয়া খাইবে। মৈনপুরী হইতে আগত কাশীতে বৌদ্ধমতি নামে জৈন আছে। ধর্ম্ম স্বভাবতই খিচুড়ি হইবার জিনিস। মোরাদাবাদ ও বিজনোরে বিষ্ণুই বলিয়া এক সম্প্রদায় আছে, তাহারা কোরাণ পাঠ করিয়া থাকে এবং একাদশীর ব্রত করে। উভয় কার্য্য তাহারা এক ধর্ম্মের অঙ্গ করিয়াছে।

কেহ কেহ বলেন, জিনধর্ম্ম বুদ্ধধর্ম্ম হইতে সঞ্জাত নহে। বহুকাল

ধরিয়া স্বতন্ত্র ভাবে চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু জৈন আখ্যায়িকাগুলির আলোচনা করিলে, তাহার মূলে বৌদ্ধধর্ম্ম ও আমাদিগের পুরাণ দেখিতে পাওয়া যাইবে। বৌদ্ধদিগের ন্যায় জৈনেরা বেদ মানে না বলিয়া, হিন্দুর শত সহস্র সম্প্রদায়ের মধ্যেও স্থান পায় নাই।

হিন্দু শাস্ত্রে পরস্পর-বিরুদ্ধ নানা মত আছে। থাকিবারই কথা। হিন্দু-জাতি একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে কখনও চির-নিয়ন্তা ভাবে নাই। তাহাদের শাস্ত্র একজনে লিখে নাই। এক সময়ের লেখাও নহে। দেশ কাল-পাত্র ভেদে সমাজ যখন যাহা শ্রেয়ঃ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে, তাহাই তখনকার হিন্দুধর্ম্ম। নানা ঋষি (পণ্ডিত) গ্রন্থ লিখিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাদের স্বাধীন মত ব্যক্ত হইয়াছে। কিন্তু হিন্দু সমাজ তাহার সকল-গুলি গ্রহণ করিতে বাধ্য হয় নাই। এখানে সমাজ ও ধর্ম্ম এক কথা। সমাজ না মানিলে ধর্ম্ম যায়। পরলোক বা ইহলোক সম্বন্ধে চলিত মত ভিন্ন যদি তোমার অন্য মত থাকে, কিন্তু যদি তুমি হিন্দু সমাজের আচার ত্যাগ না কর, তবে তুমি হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী। হিন্দুধর্ম্ম ঈশ্বর-নাস্তিককে গ্রহণ করিতে পারে, কিন্তু কর্ম্ম-নাস্তিককে গ্রহণ করিবে না। হিন্দুধর্ম্ম যাহা পূর্ব্বে মানিয়াছে, তাহা এখন মানে না। যাহা এখন মানিতেছে, তাহা অতঃপর হয় ত মানিবে না। সমাজ এক, এই জন্য শাস্ত্র এক বলিতে হয়। সমাজের লোকের প্রকৃতি বিভিন্ন, এজন্য শাস্ত্রের মত এক নহে। সকলের জ্ঞান সমান নহে, তবে ভিন্ন ভিন্ন লোকের লেখা কি করিয়া এক হইবে? উপনিষদে লিখিত আছে, যিনি বলেন, ঈশ্বরকে জানা যায়, তিনি ঈশ্বরকে জানেন না; যিনি বলেন, ঈশ্বরকে জানা যায় না, তিনি ঈশ্বর জানেন। যিনি বলেন, ঈশ্বর জানা যায়, তিনি ঈশ্বরকে জানেন না; এ বাক্যের ভক্তিশাস্ত্র-সম্মত অর্থ হইলে হইতে পারে। কিন্তু যিনি বলেন, ঈশ্বরকে জানা যায় না, তিনিই ঈশ্বরকে জানেন; এ কথার অর্থ

কি? যাহা জানা যায় না, তাহার আবার জানা কি? অবশ্য "নাই" এই কথাকে জানা বুঝাইতেছে। পূর্ব্ব-মীমাংসা প্রণেতা মহামুনি বলেন, যজ্ঞ প্রভৃতি অনুষ্ঠানের ফল দেবতা দেন না, আপনা হইতেই হয়। দেবতা নাই; যাহা নাই তাহার জন্য কিন্তু কার্য্য চাই। সাংখ্য ঈশ্বর মানেন না। তিনি সংখ্যা করিয়া দেখিয়াছেন, সৃষ্টির মূল পদার্থগুলি গণনা করিয়া যতগুলি সংখ্যা হয়, তাহার মধ্যে ঈশ্বরকে ধরিতে পারা যায় না। কিন্তু তিনি বেদ মানেন। বেদ তখনকার সমাজের শাস্ত্র। ঈশ্বর না মানিলে চলে, কিন্তু সমাজ না মানিলে চলে না। সমাজ মানিতে হইলে, সুতরাং বেদ মানিতে হয়। নহিলে জৈন বৌদ্ধবৎ পৃথক্ সম্প্রদায় হইয়া পড়ে।

আমরা প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া বিমলসা মন্দিরের মণ্ডপে গিয়া বসিলাম। কোনও স্থানের মাধুর্য্য সম্যক্ উপভোগ করিতে হইলে, বসিয়া দেখা আমার অভ্যাস। মন্দিরের চিত্রখানি কথঞ্চিৎ হৃদয়ে আঁকিয়া লইতে চেষ্টা করিলাম। সাতিশয় সভ্য অবস্থাতেও পুরাতন অসভ্য রীতির চিহ্ন বিদ্যমান দেখিতে পাওয়া যায়। মনুষ্য জাতির আদিম অবস্থায় বলপূর্ব্বক স্ত্রী হরণ করিয়া ভার্য্যা করা হইত; সুতরাং প্রতিদ্বন্দ্বীর সহিত যুদ্ধ ভিন্ন কার্য্য সমাধা হইত না। অধুনা সেই প্রথার অনুকরণে রহস্যচ্ছলে বরকে অল্পবিস্তর লঘু প্রহার সহ্য করিতে হয়। সেইরূপ স্থাপত্য কার্য্যেও আদিম প্রথার চিহ্ন ঘুচে নাই। এই যে বিমলসার মন্দির, যেখানে স্থাপত্য-বিদ্যা উৎকর্ষের পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছে, সেখানেও বৃক্ষকাণ্ড ও শাখার আদর্শ হইতে যে স্তম্ভের উৎপত্তি, তাহা অনায়াসেই বোধগম্য হয়। বৃক্ষকাণ্ড সকল সমোচ্চ না হওয়ায়, 'পাড়' সংস্থাপনের যে অসুবিধা ঘটিত, তাহা নিবারণার্থে খর্ব্বতরগুলির অগ্রভাগে প্রস্তর-ফলক প্রভৃতি স্থাপন করিয়া তাহা রজ্জুদ্বারা বন্ধন করা হইত। এইরূপ আদর্শ হইতেই স্তম্ভাগ্র বা বোধিকার সৃষ্টি হইয়াছে। অধিস্থান অর্থাৎ থামের গোড়াবন্দির

নির্ম্মাণ রীতিও প্রায় উক্ত প্রকারে উদ্ভূত হইয়াছিল। আরব জাতির গৃহ-নির্ম্মাণ তাঁবুর অনুকরণে। তাহারা পূর্ব্বে বস্ত্রাবাস প্রস্তুত করিয়া বাস করিত। কারণ উহারা বহুদিন এক স্থানে স্থায়ী হইত না। সেইজন্য ইদানীং তাহাদের হর্ম্ম্য-নির্ম্মাণ প্রণালীতে কঙ্গুরা এত অধিক দেখা যায়। বঙ্গদেশীয় শিবালয় দেখিলে ঠিক যেন খড়ুয়া ঘরের আকার প্রতিভাত হয়। যেন শাঁখার অনুকরণে বাউটী প্রস্তুত হইয়াছে। যেটি মূল গঠন, তাহা অবিকৃত আছে। আনুষঙ্গিক বিষয়ে বিশিষ্ট পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। আদিম কালের বৃক্ষকাণ্ডের রীতিতে সেই স্তম্ভাগ্র বসান প্রথা আছে; কিন্তু পুষ্পবোধিকা তরঙ্গবোধিকা প্রভৃতির শিল্প, অধিস্থান উপপীঠ প্রভৃতির সমৃদ্ধি, স্তম্ভবপু ও প্রস্তরাগ্রের কারুকার্য্য অনুধাবন করিয়া দেখিলে, অন্য জগতে আসিয়া পড়িতে হয়। ভারতীয় মন্দির-নির্ম্মাণ প্রণালী পাঁচ প্রকার; বৌদ্ধ, জৈন, হিন্দু, তামিল ও কাশ্মীরী। উত্তর-ভারত, দক্ষিণ-ভারত ও নেপালের বৌদ্ধ-স্থাপত্য পরস্পর বিভিন্ন। উড়িষ্যা, মধ্য-ভারত, বাঙ্গালা এবং কাশী অঞ্চলের মন্দির এক প্রকার নহে। এতদ্ভিন্ন মিশ্র বা হিন্দু-সারাসেনিক মন্দিরও আছে।

অদ্যই আহম্মদাবাদ যাত্রা করিব। স্নান, ভোজন আবুরোড ষ্টেশনে হইবে। ভৃত্য একাকী আমাদের প্রতীক্ষায় খিরওয়াড়ির বাসায় ক্লান্ত হইয়া পড়িয়া আছে। এই সকল চিন্তা করিয়া মণ্ডপ হইতে উঠিতে হইল। নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত চলিলাম। পশ্চাৎ ফিরিয়া বার বার শেষ দেখা দেখিতে লাগিলাম। আমার চরণযুগল কে যেন নিগড়বদ্ধ করিয়া গতি নিবারণ করিতে লাগিল। এমন সময় প্রহরী সেই সৌন্দর্য্যের ললামভূত প্রাসাদের দ্বার রুদ্ধ করিল। ধর্ম্মশালায় আসিয়া বস্ত্রাদি লইয়া যাত্রা করিলাম। আবুজী হইতে আবুরোড ৭ ক্রোশ। পৌছিয়া শুনিলাম, অদ্য আর গাড়ি পাওয়া যাইবে না। আমার গাইড পুস্তকে যে সময় লিখিত

আছে, তাহা প্রকৃত নহে। অপরাহ্ণ কালটা বারান্দায় বসিয়া রাজপুতা-নার প্রকৃতিপুঞ্জ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম। এদেশে বুঝি সকলেই অস্ত্র শস্ত্র ব্যবহার করে। উষ্ট্রপালক কয়েকটা উষ্ট্র লইয়া যাইতেছে, তাহারও হাতে বন্দুক। সাদৃশ্য ও সম্প্রসারণে চিন্তা ফিরে। এখানে আমার কলিকাতা ইন্টারন্যাশনেল এক্জিবিসন মনে পড়িল। রাজ-পুতানা-প্রকোষ্ঠে অস্ত্র শস্ত্র ভিন্ন আর বড় কিছু ছিল না। ইহাই বোধ হয়, এখানকার প্রধান বস্তু। দুই চারিটার নামোল্লেখ করা যাউক। তরবার —লহের দরিয়া, দোহেরি, কষ্টিদোদরি, ধুপ, তেগদলিলখানি, শমশের অরাদম, খণ্ডাঅলৈমণি, নাগফনা। তরফনা কটার—ইশ্পাতের কমান অর্থাৎ ধনুর্ব্বাণ, ভালা, নাগপাশ, ফুলহরি, তবল, তমাচা, বন্দুক—পথ্‌রদার ও টোপিদার, খঞ্জর প্রভৃতি।

গুর্জ্জর।

রাজপুতানার মরুভূমি, মরীচিকা, গন্ধর্ব্ব-নগর ও ওয়েসিস্ প্রভৃতি শব্দগুলি বাল্যকাল হইতে শুনিয়া আসিতেছি, কিন্তু দেখা হইল না। চিরবাঞ্ছিত চিতোর দর্শনের কামনা বিসর্জ্জন দিয়া, ক্রমে বাষ্পীয় শকটে গুর্জ্জর দেশের সিকতাযুক্ত ভূমিতে উত্তীর্ণ হইলাম। মধ্যে মধ্যে জোয়ারা ও বাজরার ক্ষেত্র দেখা যাইতে লাগিল। কৃষাণ বালক বালিকাগণ ধূমজান দেখিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল। আর স্ত্রীলোকের ঘাগরা দেখা গেল না, তাহাদের পরিধেয় এক্ষণে লঘুবস্ত্র। করভূষণ লোহিত কাচের একখানি করিয়া বাঁউড়ি। গাড়ির মধ্য হইতে দেখাইয়া, "এই গ্রামখানি গাইকোয়াড়ের, এইখানি ইংরাজের" লোকে ইত্যাকার কথোপকথন করিতেছে। রাজপুতানা-মালোয়া রেলওয়ের ষ্টেশন গৃহগুলি সমস্ত কঙ্গুরাদার। এস্থানে আরোহীদিগকে জল কিনিয়া তৃষ্ণা নিবারণ করিতে হয়। "ব্রাহ্মণীয়া পানি" ও "মুসলমানী পানি" বলিয়া জাতি খ্যাপন করিয়া জল দিয়া বেড়াইতেছে। সাবরমতি জংশনে আমাদের টিকিটগুলি লইল। অহম্মদাবাদ পরবর্ত্তী ষ্টেশন। অনতিবিলম্বে সাবরমতি সেতু পার হইয়া অহম্মদাবাদ নগর মধ্যে গাড়ি আসিয়া পৌছিল। ষ্টেশন হইতে বহির্গত হইবামাত্র বাড়ীওয়ালা ও বাড়ীওয়ালীদিগকে দেখিতে পাইলাম। একজনের সঙ্গে বাটীতে যাইয়া উঠিলাম। বেলা অবসান দেখিয়া তখনি "শীগ্রং" (সিগরাম) ভাড়া করিয়া নগর ভ্রমণে বহির্গত হইলাম। ঘর বাড়ীর আকার সুন্দর নহে, সমস্তই খোলার চাল। আমরা প্রধান রাজপথ অতিক্রম করিয়া চলিলাম। এক পার্শ্বে চাহিয়া দেখি, একটা পুরদ্বারের মধ্যে অসংখ্য

লোহিতবর্ণের বৃহদাকার উষ্ণীষ প্রাঙ্গণ সমাচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে। ঐ স্থানের নাম মাণিক চৌক। উষ্ণীষধারিগণ রথ্যা সমাকীর্ণ করিয়া বস্ত্র ক্রয় বিক্রয় করিতেছেন। প্রথমতঃ আমার চক্ষে মানুষ পড়ে নাই; কেবল পাগড়ির সমুদ্র নয়নগোচর হইয়াছিল। ক্রমে তিন দরওয়াজা ছাড়াইয়া ভদ্রকালী মাতার দর্শন করিতে অবরোহণ করিতে হইল। আমাদের আগমন বিষয়ে দুই একজন নাগরিক জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। স্থানটি বিলক্ষণ সমৃদ্ধ। প্রাচীন মহত্ত্বের চিহ্ন দেদীপ্যমান রহিয়াছে। পরদিন প্রাতঃকালে গাড়িওয়ালাকে সহায় করিয়া ভ্রমণ আরম্ভ করিলাম। (১৪১২ খৃষ্টাব্দে সুলতান অহম্মদ শাহ কর্তৃক এই নগর প্রতিষ্ঠিত হয়। পূর্ব্বে এ স্থানের নাম অশ্ববল ও কোনও সময়ে কর্ণাবতী ছিল। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে রাজমান্য রাজেশ্বর পেশওয়ার হস্ত হইতে ইহা বৃটিশ অধিকারভুক্ত হইয়াছে।) হত্তিভাই নির্ম্মিত জৈনমন্দির দেখা হইল। পথিমধ্যে নগরশেঠ প্রেমাভাইয়ের বাটী পাওয়া গেল। কিছুদিন হইল, ইনি দুইটি যমজ কুমারীর একটিকে আপনি বিবাহ করেন, পুত্রের সহিত অপরটির বিবাহ দেন। জুম্মা মহজিদ, রাণীকা রোজা, ভীলতনয়া রাণী শিপরী ও শাঅলমকা রোজা এবং বাদসাহদের গোরস্থান প্রভৃতির ভাস্কর কর্ম্ম অতি বিচিত্র। গুজরাতের মুসলমান রাজা অহম্মদ শা ও শা অলম প্রভৃতি হিন্দুবংশ সম্ভূত ছিলেন, এজন্য তাঁহারা যে সকল কীর্ত্তি-স্তম্ভ স্বরূপ বাটী রাখিয়া গিয়াছেন, তাহার গঠনপ্রণালী সম্পূর্ণ সারাসেনিক অর্থাৎ আরব্য ভাবাপন্ন নহে। (কঙ্করিয়া তলাও অতি মনোরম স্থান। ইহার প্রাচীন নাম হৌজ-ই-কুতব। ১৪৫১ অব্দে সুলতান কুতবউদ্দীন (গুজরাতের রাজা) এই সরোবর খনন করাইয়াছিলেন। ইহার চতুর্দ্দিক সোপানবদ্ধ ছিল। জলাশয়টি চারিদিকে ১ মাইল হইবে। মধ্যস্থলে এক দ্বীপ আছে, তাহার নাম নগিনা অর্থাৎ অঙ্গুরী মধ্যবর্ত্তী রত্ন।) ঐ দ্বীপে বিবিধ পুষ্পবৃক্ষ শোভমান আছে। মধ্যস্থলে

বট্টমণ্ডল। তীর হইতে দ্বীপে যাইবার জন্য তৃণ-শস্প-শোভিত সুন্দর পথ—সেতু নহে। কয়েক বৎসর হইল, কলেক্টর সাহেব সংস্কার দ্বারা এই সরোবরের বর্ত্তমান উন্নত অবস্থার বিধান করিয়াছেন। গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া স্নানের উদ্যোগ করিতেছি, এমন সময়ে এক ব্যক্তি সারঙ্গী লইয়া উপস্থিত হইল। তাহার ব্যবসায় নৃত্যগীত। আমরা অসময় বলিয়া তাহাকে চলিয়া যাইতে কহিলাম। সে স্বীয় যজ্ঞোপবীত আকর্ষণ করিয়া, অঙ্গরক্ষা সরাইয়া উদর দেখাইল; সুতরাং তাহাকে কিছু দিয়া বিদায় করিতে হইল। তিনি কিছু পাইয়াছেন শুনিয়া, তাঁহার সতীর্থ বীণা স্কন্ধে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে নিষ্কামভাবে কেবল আশীর্ব্বাদটি করিয়া যাইতে অনুরোধ করিলাম।

বেচড়াজী।—রজনীর শেষভাগে গাড়ি হইতে নামিয়া ধর্ম্মশালার আশ্রয় লইতে হইল। তখন উপরে রৌশন চৌকি বাজিতেছে। প্রভাতে উঠিয়া দেখি, সেটি এক দেবালয়। এদেশে যে ব্যক্তি দেব-গৃহ নির্ম্মাণ করে, সে পান্থনিবাসেরও ব্যবস্থা করিয়া থাকে। আমরা এক্ষণে আবার পবিত্র হিন্দুরাজ্যে সমাগত হইলাম। সহরে লক্ষাধিক লোকের বাস। যেমন সর্ব্বত্র হইয়া থাকে, প্রধান রাজপথটি অতিশয় সমৃদ্ধ। মতিবাগ ও নজরবাগ প্রভৃতি দর্শন করিয়া, বেচড়াজীর মন্দিরে প্রবেশ করিলাম। ভবানী মূর্ত্তি আপাদমস্তক হীরকালঙ্কারে ভূষিত। আজ মহাষ্টমী। বহুলোকের সমাগম হইয়াছে। গাইকোয়াড় স্বয়ং অর্চ্চনা করিয়া গেলেন। প্রাঙ্গণে গরবো নামক সঙ্গীত হইতেছে। প্রথমতঃ একজন প্রগল্ভা রমণী রঙ্গস্থলে অবতীর্ণা হইলেন। তিনি সহচরীগণকে আহ্বান করিয়া মণ্ডলীকৃত করিলেন। সংখ্যা ন্যূন হওয়ায় যাহারা গান করিতে ইচ্ছুক নহে, তাহাদের প্রতি দৃষ্টি করিতে হইল। "মাতাজীনো গরবো" ইহাতে লজ্জা কি? এই বলিয়া তাহাদিগকে টানিয়া লইলেন। একটি হিন্দী গীত বুঝিতে পারিলাম,

তাহা শ্রীকৃষ্ণ-গোপাঙ্গনা বিষয়ক। গাইবার সময় মূল গায়িকা লজ্জিত হইতে লাগিলেন। রমণীকুলের বসন ভূষণ অতি সুন্দর। যাহারা সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিধান করিয়াছে, তাহারা অভ্যন্তর ভাগে স্থূল অধোংশুক দিয়াছে। নক্ষত্র মালার মত মুক্তাগুচ্ছ কণ্ঠশোভা করিতেছে। তাহার মধ্যস্থিত মণি বক্ষ উজ্জ্বল করিয়াছে। কর্ণভূষণ মণি-মুক্তা জড়িত। করভূষণ জড়াও নহে। পাদ-ভূষণের পরিসর অতি ভয়ানক। এক একটাতে শৃঙ্গ বাহির হইয়া রহিয়াছে। কোনটা বা ঘণ্টিকাপংক্তি দ্বারা আকীর্ণ। নিশীথ-কালে পথিমধ্যে গরবা উৎসব দেখিতে যাওয়া হইল। পল্লীর মধ্যে একটি সুবিধাজনক স্থানে প্রতিবেশিনী রমণী মণ্ডলী মণ্ডলাকারে দণ্ডায়মান হইয়া মধ্যবর্ত্তী দীপাধার বেষ্টন করিয়া করতালি প্রদান পূর্ব্বক সঙ্গীত ধরিয়া-ছেন। বিচিত্র বস্ত্র, স্বর ও দীপালোক, এই তিনটি একত্র মিশ্রিত হইয়া এক অনির্ব্বচনীয় সামগ্রী প্রস্তুত হইয়াছে। দর্শকগণ দলে দলে আসিয়া ঘেরিতেছে। রাধাকৃষ্ণের যুগল ভজন উপলক্ষে গরবার সৃষ্টি। একারণ বাটীর মধ্যে যে নারী অধিক রূপ-যৌবন সম্পন্না, তাঁহারি উহাতে যোগ দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। অবিবাহিত বালক বালিকাগণ রাধাকৃষ্ণের প্রতি-নিধি হইয়া দীপের চারিধারে বসিয়াছে। একজন পুরস্ত্রী গান ধরিয়া দিতেছে, আর সকলে অনুবর্ত্তন করিতেছে। স্বর নিতান্ত মধুর। বহুক্ষণ শ্রবণ করিলেও বিরক্তি বোধ হয় না। তবে সুর একই প্রকারের। তালে তালে ঘন ঘন করতালি দেওয়া হইতেছে এবং সেই সময় একবার তনু আনত করিয়া ঘুরিয়া আসা হইতেছে।

অপরাহ্নকালে সওয়ারি বাহির হইল। পূর্ব্বে মহারাষ্ট্র ভূপতিরা বিজয়ার দিন যুদ্ধ যাত্রা করিতেন। তাহার পর এমন হইল যে, সে দিন যাত্রা করিয়া, কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া বাটীতে ফিরিয়া আসিতেন। অতঃপর ব্যবস্থা হইল, সুযোগ মত যাইয়া শত্রু আক্রমণ করা যাইবে। এক্ষণে

আর আক্রমণ নাই, কিন্তু যাত্রাটি আছে। কোন কোন দেশের রাজাদের মধ্যে এমন প্রথা আছে যে, তাঁহারা বিজয়ার দিন ছত্র বা তরবারি খানি অন্যত্র পাঠাইয়া রাখেন, তাহাতেই যাত্রার কার্য্য হইয়া রহিল। আমাদের গ্রামে রীতি আছে, দশমীর দিন প্রাতঃকালে যে বাটীতে পূজা হইয়াছে, পৌরবর্গ সেইখানে হরিদ্রা-রঞ্জিত এক খণ্ড বস্ত্রে একটি টাকা বাঁধিয়া যাত্রা করিতে যায়। পুরোহিত যাত্রার মন্ত্র উচ্চারণ করিতে থাকেন, তাহারা দুর্গা প্রতিমা প্রদক্ষিণ করিয়া আসে। বরোদারাজ তারা-শুদ্ধি দেখিয়া অদ্য কোন পথে বা কোন দিকে যাত্রা করিবেন, তাহা পূর্ব্বে স্থির করিয়া দিয়াছেন। প্রথমে ডঙ্কা বাহির হইল। পদাতি সৈন্য ইংরাজ নায়ক কর্ত্তৃক চালিত হইয়া, দলে দলে রণবাদ্য বাজাইয়া চলিয়াছে। সোণা ও রূপার তোপ স্বর্ণালঙ্কার-ভূষিত বৃষভদ্বয় বাহিত রৌপ্যনির্ম্মিত শকটযোগে চলিয়াছে। রাজার অমাত্য ও কুটুম্বগণ বহুসংখ্যক হস্তি-সমারূঢ় হইয়া যাইতেছেন। একদল কচ্ছদেশীয় সৈন্য সম্পূর্ণ দেশীয় ভাবে সজ্জিত হইয়া কাড়া ও সানাই বাজাইয়া চলিয়াছে। কতকগুলি অশ্বারূঢ় অনু-চরকে পশ্চাৎ রাখিয়া, পর্ব্বতের মত উচ্চ হস্তি পৃষ্ঠে স্বর্ণসিংহাসনে মহা-রাজ শ্রীসয়াজীরাও গাইকোয়াড় সেনাখাসখেল সমশের বাহাদুর প্রজাবর্গকে প্রত্যভিবাদন করিতে করিতে মন্থর গতিতে ভুবন কাঁপাইয়া চলিয়াছেন। পশ্চাৎ ভাগে বৃদ্ধ মন্ত্রী কাজি সাহেবউদ্দীন সমাসীন। এই অভিযানে অশ্বা-রোহী সৈন্য দেখিলাম না। পতাকায় রাজচিহ্ন অসি ও অশ্বজঙ্ঘা। ঐ দুইটি যে মহারাষ্ট্র জাতীয় অভ্যুদয়ের হেতুস্বরূপ, তাহা সকলেই জানেন। ঈপ্সিত স্থানে পৌঁছিয়া মহারাজ শোণ পত্র গ্রহণ করিয়া প্রত্যাগমন করি-লেন। খণ্ডেরাও গাইকোয়াড় স্বহস্তে একটি মহিষ-শাবক (পাড়া) হনন করিয়া তাহার রক্তে তিলক পরিয়া যাত্রার উপসংহার করিতেন। অন্যান্য স্থানে (বিরুলে) অদ্যাপি পুরদ্বারের বাহিরে দশরার দিন পাড়া মারিবার প্রথা

আছে। মানুষ মারিবার কাল গিয়াছে বলিয়া পশু অনুকল্প হইয়াছে। সভ্যতার আরও উন্নতি হইলে পৃথিবী হইতে যুদ্ধ উঠিয়া যাইবে। কি আশ্চর্য্য, কোন প্রজা একটি নরহত্যা করিলে তাহার প্রাণদণ্ড হইবে; কিন্তু রাজা যুদ্ধের নাম করিয়া সহস্র সহস্র প্রাণি সংহার করিলেও নিন্দনীয় হয় না। বাটীতে প্রত্যাগমন করিয়া কেবল সওয়ারির কথা মনে উঠিতে লাগিল। তুরঙ্গমের সেই আস্কন্দিত, বলগতি ও প্লুতগতি যেন সম্মুখে বর্ত্তমান। পত্তি সংহতি যেন গায়কোয়াড়কে বন্দুক আনত করিয়া সামরিক অভিবাদন করিতেছে। এখনও হিন্দু জাতি জীবিত আছে, ইহা খ্যাপন করিয়া বৈজয়ন্তী মস্তক উন্নত করিয়া বাহিত হইতেছে। সেই মহাভারতীয় বলের চতুরঙ্গিণী সেনার স্মরণ-চিহ্ন দেখিতে পাইলাম। ইদানীং সিংহনাদ কাহাকে বলে, আহোপুরুষিকা, অহংপূর্ব্বিকা দেখিতে কেমন, তাহা বুঝিবার কোনও উপায় নাই। আততায়ীর সম্মুখ নহিলে সেনামধ্যে সে সকল ভাব কি করিয়া উদিত হইবে? এ বাহিনী-রচনা যুদ্ধ-নৈপুণ্য প্রকাশের জন্য নহে, সমৃদ্ধি প্রকাশের জন্য। সেই কারণে সোণা রূপার কামান দেখিতে পাইলাম। রাজ গুরু গোকুলিয়া গোঁসাই রাজপরিচ্ছদ ধারণ করিয়া, ফিটন্ চড়িয়া চলিয়াছেন, আগে নকিব ফুকরাইতেছে। হস্তিযুথের হুড়াহুড়ি, ও সল্মার কাজ করা বহুমূল্য আস্তরণ দোদুল্যমান, তদুপরি রজত নির্ম্মিত হাওদায় দিব্য কিরীটধারী রাজকুটুম্বগণ যাত্রা করিতেছেন,—'বাটীতে বসিয়া' এই সকল চিন্তা করিতে লাগিলাম।

এই সময় মহরম পর্ব্ব উপস্থিত। রাত্রিকালে অনবরত হুসেন হু-সে-ন শব্দে কর্ণ ব্যথিত হইতে থাকে। রাজা প্রজারঞ্জক। সেইজন্য সরকারী তাজিয়া হয়। রজনীযোগে "লাগ" দেখিবার জন্য সাতিশয় জনতা হইয়াছে দেখা গেল। তিনটি শেল দণ্ডায়মান করিয়া তাহার ফলকের উপর একজন শ্বেত-পরিচ্ছদধারী স্থূলতনু মুসলমান শয়ান রহিয়াছে। তাহার

দেহ নিস্পন্দ। ব্যাঘ্র, কুম্ভীর প্রভৃতি নরভুক্ জীবের মূর্ত্তি, জীবন্ত মনুষ্য দন্তে ধারণ করিয়া রহিয়াছে ইত্যাদি দৃশ্য প্রদর্শিত হইয়া থাকে। তাজিয়া দর্শন করিতে যাইবার সময়, লক্ষ্ণৌ অঞ্চলের মুসলমানেরা যে শোক-সঙ্গীত গাহিয়া থাকে, তাহার সুর শুনিলে পাষাণও দ্রবীভূত হয়। বেশ দেখিলে প্রাণ উদাস হয়। যখন "দুল দুল" নামক অশ্ব রক্তাক্ত কলেবরে রক্তমাখা পতাকা অগ্রে করিয়া মহজিদের উপর গিয়া উঠে, তখন ··ত্রত্য নরনারী চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া ফেলে। তাহার পর বেদীর উপর ইমাম বসিয়া, কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে আরম্ভ করেন, "এই দিনে, ঠিক এমনি সময়ে, তাঁহার অশ্ব শূন্যপৃষ্ঠে ফিরিয়া আসিয়াছিল" ইত্যাদি। নিকটে অশ্ব উপস্থিত, স্থির হইয়া দাঁড়াইতে পারিতেছে না। অশ্বটি শ্বেতবর্ণ, লোহিত রঙ্গে আপ্লুত, তদুপরি শোণিতচিহ্নযুক্ত শ্বেত বস্ত্রের আস্তরণ। এবংবিধ সমাবেশ হওয়ায়, ভক্তবৃন্দ কাঁদিয়া আকুল হয়। আমিও যে দিন উপস্থিত ছিলাম, অশ্রু সংবরণ করিতে পারি নাই। বরোদার সুন্নীগণ বিপরীত ভাব দেখাইবার জন্য ব্যাঘ্র প্রভৃতি সাজিয়া, গীত বাদ্য করিয়া আমোদ উৎসব দেখাইয়া বিচরণ করিয়া বেড়াইতেছে।

১৭২০ খৃষ্টাব্দে মহারাষ্ট্র-সেনানায়ক পিলাজী গায়কোয়াড় গুজরাত আক্রমণ করিয়া চৌথ আদায় করিতে সমর্থ হন। তদবধি তিনি ক্রমশঃ বদ্ধমূল সাম্রাজ্য সংস্থাপন করিলেন। অধুনা বরোদারাজ্যের আয় ১,২৫,০০,০০০ টাকা। ভূমির পরিমাণ ফল ৪,৩৯৯ মাইল। অধিবাসীর সংখ্যা ২০,০০,২২৫। রাজ্য চারি ভাগে বিভক্ত। প্রত্যেক বিভাগকে এক একটি প্রান্ত কহে। প্রতি প্রান্তে একজন সুবা আছেন। শাসনপ্রণালী ইদানীং অবশ্য সুন্দর হইয়াছে। কাঠিয়াওয়াড় প্রদেশের ভূম্যধিকারিগণ ইংরাজকে অর্দ্ধেক ও গায়কোয়াড়কে অর্দ্ধেক কর দেয়। এমন

এক সময় গিয়াছে, যখন সাথমারিতে রাজাজ্ঞায় অপরাধী হস্তীর পদদলিত হইত। জীবন্ত প্রোথিত করা, পর্ব্বত হইতে ফেলিয়া দেওয়া, দেওয়ালে পেরেক দিয়া বিদ্ধ করা প্রভৃতি নানা নিষ্ঠুর দণ্ডের প্রচলন ছিল।

মতিবাগে মহ্লর রাও মহাশয়ের চিত্র দেখিলাম। অপবিত্র হোলি উৎসবের সময় রাজভবনে প্রকাশ্য ভাবে শত বারাঙ্গনাকে মহ্লর রাও স্বয়ং পিচকারি দ্বারা রঞ্জিত করিতেন। একবার ঘুঘুর বিবাহ অতি সমারোহে সম্পন্ন হয়। ঘুঘু-বৌকে বিড়ালে খায়, তাহাতে রাজা নগরের সমস্ত বিড়াল হত্যা করিয়া ক্ষান্ত হন। একদা বিল্লিমোরা নামক জনপদে মহ্লর রাও গমন করেন। সে স্থানের রাজপথ খণ্ডেরাও গায়কোয়াড় কর্ত্তৃক নির্ম্মিত, এজন্য সেই পথে তিনি পদার্পণ করিতে অস্বীকার করিলেন। তৎক্ষণাৎ শস্যক্ষেত্র প্রভৃতি নষ্ট করিয়া নূতন রথ্যা প্রস্তুত হইতে আরম্ভ হইল এবং কয়েক ঘণ্টার মধ্যে উহা সম্পূর্ণ হইয়া গেল। কর্ম্মচারিগণ প্রভুকে বুঝাইয়া দিল, পঞ্চবিংশতি সহস্র মুদ্রা ব্যয় হইয়াছে। রেসিডেণ্টকে বিষ দেওয়ার কথা সকলেই অবিশ্বাস করে। যমুনা বাঈ কারামুক্ত হইয়া যে বালকের ললাটে রাজতিলক দিয়াছেন, তিনি সুশিক্ষিত হইয়া এক্ষণে রাজ্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। স্যার ত্র্যম্বক মাধব রাও মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করিয়াছেন। কথিত আছে, মাধব রাও অশীতি লক্ষ মুদ্রা ইংরাজের নিকট গচ্ছিত রাখেন, তাহার কুশীদ বরদা রাজ্য পাইবে, কিন্তু মূল অর্থ লইতে পারিবে না, এই নিয়ম হয়। ইহাতে প্রাপ্তব্যবহার ভূপতি অসন্তুষ্ট হওয়ায়, তিনি পদত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। মাধব রাওয়ের হাসিভরা মুখখানি দেখিলে, তাঁহাকে অতিশয় চতুর বলিয়া উপলব্ধি হয়। মহারাণী যমুনা বাঈ এক্ষণে পৃথক্ বাটীতে অবস্থান করেন, রাজকীয় ব্যাপারে লিপ্ত থাকেন না। কয়েক দিন হইল, তাঁহার বাটীতে তিনটি খুন হইয়া গিয়াছে। রাণী তখন

উপস্থিত ছিলেন না। পুরুষানুক্রমে আফ্রিকা নিবাসী সিদ্দিগণ বরোদা রাজ্যে নিযুক্ত আছে। তাহারা রীতিমত সৈনিক কর্ম্ম করে না বা অন্য কোনরূপ উপকারে আসে না। কেবল মাদক-সেবন প্রভৃতি কার্য্যে দিনাতিপাত করে। রাজ্যের সহিত উহাদের সম্বন্ধ এত ঘনিষ্ঠ, যে উহাদের অন্য নাম "রাজ্যের সন্তান।" যদি বল অমুকের শিরচ্ছেদন করিয়া আন—তাহা অনায়াসে করিতে পারিবে, কিন্তু যে কার্য্যে নিয়মিত পরিশ্রম করিতে হয়, এমন কর্ম্মের ভার তাহারা কদাচ লইবে না। বর্ত্তমান গায়কোয়াড় তাহাদের তিনজনকে একটি নির্দ্দিষ্ট কার্য্য করিতে বলেন। তাহাতে তাহারা অসমর্থ হওযায় তাহাদের বেতন বন্ধ করিয়া দেন। উহারা সে জন্য হয়দরাবাদে চলিয়া যায়। সেখানে কোন সুবিধা না দেখিয়া, প্রত্যাগমনপূর্ব্বক বৃত্তি যাচ্ঞা করে এবং কহে, যদি না দেন, বলপূর্ব্বক ধনাগার হইতে আমাদের প্রাপ্য আদায় করিব। সুতরাং গায়কোয়াড় তাহাদিগকে ধৃত করিবার জন্য পুলিশের প্রতি আজ্ঞা দিলেন। যমুনা বাঈ সাহেবের বাটীতে উহারা বাস করিত; সেই স্থানে পুলিশের সহিত যুদ্ধ করিয়া তিন জনেই হত হইয়াছে।

বরোদার সুরসাগর বা নওলাক্ষি প্রভৃতি বাপী তড়াগ দর্শনীয় বস্তু বলিয়া পরিগণিত। যমুনা বাঈয়ের চিকিৎসালয় ও বিদ্যামন্দির জয়পুরের মত সুন্দর পাথরের জালি দ্বারা গ্রথিত। রাজা বা কোনও উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী অথবা রাজকুটুম্বের গমনাগমনকালে বহু অশ্বারোহী তাঁহাদের অনুবর্ত্তন করে। রাত্রিকালে মসালচিরা গাড়ির অগ্রে দৌড়ায়। গায়কোয়াড়ের আধ-পয়সার মুদ্রা নাই। ঐ মূল্য আদান প্রদানের জন্য আমাদের দেশে কৌড়ি ব্যবহারের ন্যায় তথায় আটটা বাদাম ব্যবহৃত হয়। পূর্ব্বকালে বাঙ্গালায় তাম্র মুদ্রা ছিল না। বিনিময়ের কার্য্য কৌড়ি দ্বারা সম্পন্ন হইত। এই জন্য অদ্যাপি ১ এক পয়সার অঙ্ক লিখিতে হইলে ৻৫ পাঁচগণ্ডা লিখিতে হয়।

ইহাতে আর এক কথা পাওয়া যায়। যখন প্রথম তাম্র-খণ্ড ব্যবহৃত হইয়াছিল, সে সময় এক পয়সায় পাঁচগণ্ডা কৌড়ি কিনিতে পাওয়া যাইত। এখন এক পয়সায় ষোলগণ্ডা কখন কখন ইহা অপেক্ষা অধিকও পাওয়া যায়। গুজরাতে সিকিকে পাওলি ও পয়সাকে ঢোড়িয়া কহে। টাকা বলিলে গায়কোয়াড়ের টাকা বুঝায়। ভিক্টোরিয়ার টাকা চাহিতে হইলে "কলদার" বলিতে হয়।

সুরত।—রাত্রি ২টার সময় আড্ডায় গাড়ি থামিল। একজন পারসি দস্তুর শুভ্র শিরস্ত্রাণ ধারণ করিয়া আমাদের গাড়িতে আরোহণ করিতে আসিলেন। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, এই কি সুরত? তিনি কহিলেন, এই বটে—"সুরত, দেখনেকী মূরত।" করণ্ডবাহিনী একটি স্ত্রীলোক আমাদিগকে এক বাড়ীওয়ালার ঘরে পৌছাইয়া দিল। তাহার মাদুরের ছারপোকার যন্ত্রণায় ও গৃহের সঙ্কীর্ণতাবশতঃ রজনী-যাপন অতি কষ্টকর হইল। বাল্যকালে ভূগোল-হস্তামলকে পড়িয়াছি, সুরত নগরীতে জৈনদের স্থাপিত পশুরক্ষাশালা আছে, সেখানে গবাদি পশুর ন্যায় ছারপোকাও প্রতিপালিত হয়। ছারপোকাকে আহার দিবার জন্য, অর্থ দিয়া মানুষকে খাটে শুয়াইয়া রাখে। আমাদিগকে কি সেই পিঁজরাপোলে রাখিয়া গেল? পর দিবস ভ্রমণার্থ বহির্গত হইয়া ক্রমশঃ প্রকৃত সহরে প্রবেশ করিলাম। মন শান্ত হইল। মরোয়ানজী হোরমজ্‌জী ফ্রসের স্মরণ-চিহ্ন, ক্লকটাওয়ার বা ঘড়িয়াল ছাড়াইয়া হাইস্কুল, ও হসপিটল সন্নিহিত নৈমিত্তিক পণ্যবীথী দেখিতে দেখিতে দুর্গপার্শ্বস্থ ভিক্টোরিয়া উদ্যানে, তাপী নদীর কূলে আসিয়া সমুপস্থিত হইয়া আরও কিছু দূর "ফ্রি থিঙ্করস্ করণর্" দিয়া ইংরাজী পল্লী বেড়াইয়া ফিরিলাম। সন্ধ্যাকালে বহু মূর্ত্তি এই তাপী তটে তাপ অপনোদন করিতে আসিয়া থাকেন। তাপীর জল কমিয়া যাওয়ায় এবং বোম্বাই বন্দর হওয়ায়, সুরত পূর্ব্ব গৌরব অনেক

পরিমাণে হারাইয়াছে। এখানে ১৬১২খৃষ্টাব্দে ইংরাজের প্রথম বাণিজ্যশালা স্থাপিত হয়। পূর্ব্বে সুরত বাষ্পীয়-তরি নির্ম্মাণের প্রধান স্থানছিল। তৎকালে পারসিরা ঐ কার্য্যে নিযুক্ত ছিল। অদ্যাপি বোম্বাইএর ডক-ইয়ার্ডে পারসি মাষ্টার-বিলডরের পদ ভোগ করিতেছেন। পারস্য হইতে তাড়িত স্বধর্ম্ম-নিরত পারসিরা খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে সমুদ্র-তরঙ্গ-ক্ষুব্ধ হইয়া এই সুরতে হিন্দু রাজার আশ্রয়ে উপনিবেশ সংস্থাপন করেন। কেহ কেহ কহেন, সুরাষ্ট্র শব্দের অপভ্রংশে সুরত নাম হইয়াছে। সৌরাষ্ট্র দেশ বস্তুতঃ কাঠিয়াওয়াড় প্রদেশ। এখানে কাঠি নামক জাতির বাস ছিল বলিয়া, ইহার কাঠিওয়াড় আখ্যা হইয়াছে। তেমনি গুজর নামক জাতির বাসস্থান ছিল বলিয়া গুজরাত সংজ্ঞা উৎপন্ন হইয়াছে। সুরতের জনসংখ্যা ১,০৭,১৪৯। সহর পনাহ অর্থাৎ নগরের চতুর্দ্দিকে প্রাচীর আছে, কিন্তু সর্ব্বত্র নহে। বিদেশী লোক (হীন অবস্থাপন্ন) আসিলে ফৌজদার অর্থাৎ পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সবিশেষ তত্ত্ব লইয়া তবে তাহাকে বাস করিতে অনুমতি দেন।

সুরত নগরের মিষ্টান্ন অতি উপাদেয়। এখানে ৩৫ তোলায় সের। সুরতের ঘি ও বাঙ্গালার চিনি গুজরাতীদের প্রিয় পদার্থ। ইদানীং বাঙ্গালার পরিবর্ত্তে মরিশস্ চিনি যোগাইতেছে। গুজরাতীতে বলে—“কাশী নো মরণ, সুরত নো ভোজন” অর্থাৎ কাশীধামে মৃত্যু যেমন প্রার্থনীয়, সুরতের খাদ্য দ্রব্য তেমনি লোভনীয়। ঘরি নামক মিঠাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। বরফি জমাইয়া তাহার উপর ঘৃত ঢালিয়া দেয়। খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিলে, তাহার উপর স্থূল ঘৃতের স্তর দেখিতে পাওয়া যায়। এখানে লুচি মিলে না। নিমকি প্রভৃতি সমস্ত গুর্জ্জরেই তৈলপক। শাক ও তরকারি রাত্রিকালে সমারোহের সহিত বিক্রীত হয়। নানাবিধ ফল মিলে। চা ও কাফি পানের স্থান আছে। ইতর লোকে বিলক্ষণ মদ্যপান করে। কলু প্রভৃতি জাতির রমণীরা মদিরা-গৃহে গিয়া অবাধে পান করিয়া থাকে।

বল্লভাচারীদের শ্রীনাথজীর দেবালয় অতি বিচিত্র স্থান। সেখানে নাগরিক নরনারীর একাধারে সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। দ্বার উদ্ঘাটিত হইবা মাত্র প্রবল জনস্রোত ঘূর্ণাবায়ুর মত একদ্বার দিয়া প্রবেশ করিয়া ক্ষণমাত্র না তিষ্ঠিয়া, শ্রীনাথের দর্শন হউক বা না হউক, অন্য দ্বার দিয়া নিষ্ক্রান্ত হয়। ক্ষণ বিলম্ব হইলে, কোড়ার আঘাত সহ্য করিতে হইবে। তখনি দ্বার রুদ্ধ হইবে। যদি কেহ এইরূপে দর্শন করিতে অবশিষ্ট থাকে, এবং কপাট পড়িতেছে এমন সময় উপস্থিত হয়, তাহা হইলে "জয় জয়" বলিয়া দৌড়িয়া আসে ও এক নিমেষের জন্য দ্বার পুনরায় উদ্ঘাটিত হয়। যখন দর্শন হইবার বিলম্ব থাকে, নারীমণ্ডলী মন্দিরের ব্যবহারের জন্য পর্ণ রচনায় সময়ক্ষেপ করে। তথায় আমাদের সহিত কয়েকজন হিন্দুস্থানীর পরিচয় হইল। তাহারা আমাদিগকে পাইয়া যেন স্বদেশী পাইল। এই দূরদেশে বাঙ্গালী, হিন্দুস্থানীর স্বদেশীয় হইল! যে বাঙ্গালী, হিন্দুস্থানীদিগকে "ছাতু" ও হিন্দুস্থানী বাঙ্গালীদিগকে "ভাতু" বলিয়া অবজ্ঞা করে, তাহাদের পরস্পর সহানুভূতি উল্লেখযোগ্য। কাশীতে বাঙ্গালীর প্রতি হিন্দুস্থানীর কদাপি এমন আত্মীয় ব্যবহার প্রত্যাশা করা যায় না।

সুরতের পাগড়ি আহম্মদাবাদের মত নহে। কচ্ছ মাণ্ডুই নিবাসী ভাটীয়াদের উষ্ণীষ অন্যরূপ। কাঠিয়াওয়াড়ের পাগড়ি ও কাপোল বণিয়াদের শিরস্ত্রাণ ভিন্ন প্রকারের। সুতরাং পাগড়ি দেখিলে বলা যায়, কোন গুজরাতীর বাটী কোথায়। একজন ভ্রমণকারী যে লিখিয়াছেন, পাগড়ীতে ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত পাওয়া যায়,—তাহা সত্য। আমরা নগ্ন শিরে বাঙ্গালীভাবে বিচরণ করায়, একটা উপকার দেখিলাম। লোকে ডাকিয়া আমাদের সহিত আলাপ করে। কোথা হইতে আগমন, কেন আগমন ইত্যাদি প্রশ্ন করে। তাঁহাদের মধ্যে কেহ জগদীশ (পুরুষোত্তম) দর্শনার্থ বাঙ্গালা মুলুক দেখিয়া যান। এক ব্যক্তি

কৌতূহলপরতন্ত্র হইয়া আমাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আমাদের দুইজনে বিতণ্ডা হইতেছে বাঙ্গালীরা পাগড়ি মাথায় দেয় না ও স্ত্রীলোকে কাঁচুলি ব্যবহার করে না,—এ কথা কি সত্য ?" আমার উত্তর শুনিয়া তাঁহার বিশ্বাস হইল কি না, বলিতে পারি না। গুজরাতী রমণীরা হিন্দুস্থানী প্রণালীতে সাড়ী পরিধান করে। উহা দেখিতে ছিটের মত। কঞ্চুলিকা কিছু অদ্ভুত প্রকারের। তাহার পৃষ্ঠদেশ খোলা, সূত্র দ্বারা পরিধি রক্ষিত। ভূষার মধ্যে কাঁটা অর্থাৎ মুক্তা-পঞ্চক যুক্ত ফুল সকল স্ত্রীলোকেই পরিধান করে। যে দীন, সেও অন্ততঃ কৃত্রিম মুক্তার কাঁটা পরিবে। এখানে পুরুষ অপেক্ষা রমণী বিক্রান্ত। ভারবহন প্রভৃতি দৈনিক শ্রমসাধ্য অনেক কর্ম্মই স্ত্রীলোকে করিয়া থাকে। এখানে অবগুণ্ঠন প্রথা নাই। রমণীরা দন্তে স্থায়ী লাল রঙ্গ দিয়া থাকে। ছেলেগুলির মাথা কামান, বাঙ্গালীর চক্ষে অতি কদর্য্য দেখায়। টুপি মাথা ঢাকিতে সমর্থ হয় না। বেণিয়ান ভাল দেখায় না। অনেক ব্যক্তি কাণের উপর মুক্তা দেওয়া (বালী) মাকড়ি পরে। বৈষ্ণব বলিয়া সকলেই মালা ও তিলক ব্যবহার করিয়া থাকে।

সুপ্রসিদ্ধ দয়ানন্দ সরস্বতী গুজরাতী ছিলেন। তাঁহার আচার্য্য মথুরা নিবাসী একজন জন্মান্ধ। তিনিও মূর্ত্তি পূজার খণ্ডন করিতেন। কাশীধামে উক্ত বিষয়ে দয়ানন্দ যে বিচার করেন, তাহাতে বামনাচার্য্য ও মাধবাচার্য্য ভ্রাতৃদ্বয় বেদের নিম্নলিখিত স্থানে প্রতিমার উল্লেখ দেখান।

স পরং দিব মন্বাবর্ত্তে তাথ যদা স্থায়ুক্তানি যানানি প্রবর্ত্তন্তে,
দেবতায়তনানিকং পেন্তে (?) দৈবত প্রতিমা হসন্তি রুদন্তি গায়ন্তি,
নৃত্যন্তি স্ফুটন্তি খিদ্যন্ত্যুন্মীলন্তি নিমীলন্তি প্রতি প্রয়াস্তিনস্তঃ
কবন্ধ মাদিত্যো দৃশ্যতে বিজনেব পরিবিয্যত।

—(সামবেদীয় অদ্ভুত শান্তিপ্রকরণ)

মুম্বই।*

৪ঠা কার্ত্তিক রাত্রি ৯ ঘটিকার সময় বরোদা ত্যাগ করিয়া, উষাকালে নিদ্রা ভঙ্গ হইলে, বাষ্পীয় শকট হইতে অবলোকন করিলাম, আমরা নারিকেল, তাল, কদলী ও জম্বীরবৃক্ষ-পূরিত ভূভাগে সমুপস্থিত হইয়াছি। বুঝা গেল, এ কঙ্কণ প্রদেশ। বান্দরা প্রভৃতি গ্রাম ও কয়েকটা সমুদ্রের খাড়ি ছাড়াইয়া চরণীরোড ষ্টেশনে অবরোহণ করা গেল। 'রেকড়া' অর্থাৎ গরুর গাড়িওয়ালাকে গন্তব্য স্থানে লইয়া যাইতে কহা হইল। আহারাদির পর সমুদ্র দেখিয়া ট্রামকার যোগে কোলাবা হইতে ভাই-কাল-আ পর্য্যন্ত ভ্রমণ করা গেল।

কেহ কেহ বলেন, 'বুত্তন বহিয়া' এই পোর্ত্তুগীজ শব্দ হইতে বোম্বে নাম উৎপন্ন হইয়াছে। কিন্তু মুম্বা দেবীর নামানুসারে মুম্বই অভিধান হওয়াও আশ্চর্য্য নহে। চিরকাল বোম্বাই নগরের সৌন্দর্য্যের কথা শুনিয়া আসিতেছি। এই সহর খাপরায়চালময়। পাকা বাটী অতি বিরল। বাটীর মুখভাগ প্রায় আপাদমস্তক নানা বর্ণের কাচ দ্বারা মণ্ডিত। ঔজ্জ্বল্যে নয়ন ঝলসাইয়া যায়। ভিতরে যাইয়া দেখ,—সঙ্কীর্ণ ঘর, মাটীর মেঝে, কাঠের দেওয়াল্। গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নির্ম্মিত নূতন বাটীগুলি প্রস্তরময় ও প্রকৃত প্রশংসার বস্তু বটে। স্পে্লনেড্

---

* (১) Hand Book of the Bombay Presidency.—Edward B. Eastwick প্রণীত। (২) A guide to Bombay—James Mackenzie Maclean প্রণীত। (৩) Gujarat and the Gujratis—Behrmji M. Malabari প্রণীত। (৪) Essay on Indian Antiquary—K. Raghunathji প্রণীত। (৫) সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিত 'ভারতী'তে প্রবন্ধ। (৬) রজনীনাথ রায় লিখিত 'নব্যবার্ষিকি'তে প্রবন্ধ। (৭) Local daily newspaper.

বা ময়দানটির আয়তন ক্ষুদ্র, যেন মুষ্টিমেয়। উদ্যান তিন খানিও তদ্রূপ সঙ্কীর্ণ। কলিকাতার সহিত প্রতিযোগিতা করিতে পারে, বোম্বাই ভিন্ন ভারতে অপর কোন নগর নাই। কিন্তু কলিকাতা শ্রেষ্ঠতর। কলিকাতার অপর নাম বৈজয়ন্ত নগর। বোম্বাই অতি পরিষ্কৃত স্থান বলিয়া খ্যাত। বাস্তবিক তাহা সত্য। তবে পথিপার্শ্বে পয়ঃপ্রণালী আছে। কলিকাতার মত ড্রেনেজ্ হয় নাই। ভঙ্গিগণ অনাবৃত ভাবে পুরীষ বহন করিয়া থাকে। বাটীর নম্বর দেওয়া নাই। ষ্ট্রীটের নাম থাকা, না থাকার মধ্যে। জলের কল আছে; সে জল পরিস্রুত নহে। গ্যাসের আলো আছে, তাহারও যেন দীপ্তি কম। বোম্বাই কলিকাতা অপেক্ষা ছোট, অথচ উহার লোকসংখ্যা অধিক। সেই জন্য বাটীগুলি বহুজনাকীর্ণ। যান, বাহন, কলিকাতার মত অধিক নাই। অমিচন্দ্ নামা এক হালওয়াইর দোকানে কেবল ঘৃতপক্ক নিম্‌কি পাওয়া যায়। আর সকল দোকানে তৈলপক্ক। বোম্বাইএর পোতাশ্রয়ে কলিকাতার মত অধিক বাণিজ্যতরি আসে না সে বিষয়েও বোম্বাই কলিকাতা অপেক্ষা হীন।

বোম্বাই ও কলিকাতার দ্রাঘিমান্তর অতি অল্প। একারণ, বাঙ্গালায় যে সকল ফল মূল জন্মে, এদেশেও তাহা উৎপন্ন হয়। বাঙ্গালা ভিন্ন ভারতের আর কোন স্থানে আনারস জন্মিতে দেখি নাই, এখানে তাহা উৎপন্ন হয়। কমলা লেবু ও কদলী প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে জন্মে। এদেশে কমলার ত্বকে সৌগন্ধ নাই। কদলী নানাবিধ এবং বাঙ্গালা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। একরূপ কদলী আছে, তাহা অতি সুমিষ্ট, অথচ পরিপক্ক হইলেও হরিদ্বর্ণ থাকে, তাহাকে কোকণী কলা অর্থাৎ কঙ্কণদেশজ কদলী কহে। লোহিদ্বর্ণ রম্ভা আছে। মাহিমের নারিকেল অতি উৎকৃষ্ট। এদেশে কেহ ডাব খায় না। দ্রাক্ষা জন্মে, কিন্তু মাল্‌টা

হইতে যাহা আসে, তাহাই উপাদেয়। কলিকাতা ও বোম্বাইএর নিরক্ষান্তর ১৫ অংশ, অতএব কলিকাতায় যখন সূর্য্য উঠে, তাহার এক ঘণ্টা পরে এখানে সূর্য্যোদয় হয়। পৃথিবী, পূর্ব্বপশ্চিমে গোল বলিয়া, পূর্ব্বদিক্‌বাসীদিগের পরে পশ্চিমদিক্‌বাসিগণ সূর্যোদয় অনুভব করে। হিমালয় পর্ব্বত প্রতিবন্ধক থাকায়, ভারতসমুদ্রে 'বাণিজ্য বায়ু'র প্রবাহ নাই। তাহার পরিবর্ত্তে মৌসুমী নামে খ্যাত এক প্রকার বায়ু বহিয়া থাকে। ইহা কার্ত্তিক হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত ঈশান কোণ হইতে এবং বৈশাখ হইতে আশ্বিন পর্য্যন্ত নৈর্ঋত কোণ হইতে বহিয়া থাকে। বৈশাখ হইতে আশ্বিন পর্য্যন্ত যে বায়ু বহিয়া থাকে, এদেশে চলিত কথায় তাহাকেই মৌসুমী বা মনসুন কহে। মনসুন বাণিজ্যের কাল নহে, সেই জন্য পোতাধিষ্ঠানে অধিক বাণিজ্যতরি উপস্থিত দেখি নাই।

বোম্বাই নগরে প্রধান দর্শনীয় স্থান 'হারবর'। ইহা ভারত সমুদ্রের খাড়ি। একটি বন্দরে দাঁড়াইলে অন্য বন্দর দেখা যায় না। বোধ হয় যেন, আর নাই। বন্দরের সংখ্যা বহু। প্রত্যেক বন্দরে বিভিন্ন প্রকারের দ্রব্যজাত আমদানী হয়। অনেক স্থানে সেই বন্দরের সন্নিকটেই আনীত বস্তুর পণ্যশালা। বন্দরের মধ্যে প্রিন্সেস্ ডক্ সর্ব্বপ্রধান; উহা নির্ম্মাণ করিতে ৬৮ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে। ত্রিংশৎখানি বৃহৎ জাহাজ ইহার মধ্যে দাঁড়াইয়া কূলে মাল নামাইতে পারে। জলকর ৯০ বিঘা। ইংরেজী ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে দেড়কোটি টন মাল আমদানী ও রপ্তানী হইয়াছিল। সন্ধ্যাকালে বায়ু সেবনার্থ ওয়েলিংটন পায়ার অর্থাৎ পালাবন্দরে নাগরিকগণ সমবেত হন। তথায় ব্যাণ্ড বাজিয়া থাকে। ইংলিশ মেলষ্টীমার এই ঘাটের সম্মুখে দাঁড়ায়। আমরা এলিফেণ্টা গমন উদ্দেশে, একখানি করাচীদেশীয় নৌকায় আরোহণ করিলাম। নৌকা কম্পিত হইতেছে, মাঝিরা পাল তুলিয়া দিল। সমুদ্রে নৌকায় উঠা এই প্রথম,

এজন্য কিঞ্চিৎ আতঙ্ক অনুভূত হইল। নদ্যম্বু অপেক্ষা সমুদ্রাম্বুতে তরণী অনায়াসে চালিত হয়। কারণ, সমুদ্রজলে লবণাদি নানাবিধ পদার্থের স্থিতি প্রযুক্ত, তাহা বিশুদ্ধ জল অপেক্ষা অধিক ভারী। পুরুষোত্তমে বঙ্গোপসাগরের বর্ণ দেখিয়াছি,—নীলাক্ত হরিৎ। তটসন্নিকটে যে বীচিমালা নিরন্তর আহত হইয়া বুকে ফেন তুলিয়া আসিত, তাহার বর্ণ ম্লান দেখিতাম। কিন্তু, এ সাগরের জল তদপেক্ষা গৌর। সমুদ্রের করাল মাধুরী এখানে দেখিবার উপায় নাই। বেলা (জোয়ার) অতীত হইলে, প্রায়মৎস্যমাত্রভোজী কোকণী মুসলমান নাবিকগণ গীতের সহিত ক্ষেপণী চালন করিতে লাগিল। জল অগ্রে প্রক্ষিপ্ত হওয়ায়, পশ্চাদ্বর্ত্তী জলরাশি তাহার স্থান পূরণ করিবার নিমিত্ত অগ্রগামী হইল; ইহাতে তরঙ্গোৎপত্তি হইয়া নৌকাকে আগাইয়া দিতে লাগিল। একপারে মুম্বই নগর, অপরপারে পর্ব্বতমালা, মধ্যস্থলে সাগরগর্ভে বুচর, হগ ও ছিনারটিকরি প্রভৃতি জনশূন্য দ্বীপ। বোম্বাইটিও ঐরূপ দ্বীপপুঞ্জের উপর নির্ম্মিত। যেখানে সমুদ্রে মগ্ন-গিরি আছে, সেখানে তৎপরিজ্ঞানের জন্য স্তম্ভ স্থাপিত আছে। প্রোং-লাইট হাউসটিও ঐ কারণে স্থাপিত। উহা সমুদ্র হইতে হারবরে প্রবেশ পথে রহিয়াছে। এস্থানে খাড়িটি তিন ক্রোশ বিস্তৃত। আলোকস্তম্ভের চারিধার ঘেরিয়া তরঙ্গমালা লুটিতেছে দেখিয়া, বিশেষতঃ সোপানের উপর উৎক্ষিপ্ত জলরাশি নিরীক্ষণ করিয়া, হৃদয়ে অভূতপূর্ব্ব ভাবের উদয় হইল। উপরে উঠিয়া অকূলপারের দিকে দৃষ্টি করিয়া, সমুদ্র যে কি সামগ্রী, তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে লাগিলাম। আলোক-রক্ষীকে বলিলাম, দেখ আমি অর্ণববক্ষে দণ্ডায়মান হইতে সমর্থ হইয়াছি। স্তম্ভের সর্ব্বোপরিস্থ কক্ষ কাচনির্ম্মিত। তাহার অভ্যন্তরে মনুষ্য সমান উচ্চ অতি উজ্জ্বল কাচের কলম দ্বারা সম্পূর্ণ নির্ম্মিত, অষ্টকোণ বিশিষ্ট, যন্ত্রচালিত-ল্যান্টরণ বিদ্যমান। দশ সেকেণ্ডে একটা চমক প্রদান করে; আশি

সেকেণ্ডে ল্যান্‌টরণটা সম্পূর্ণ ঘুরিয়া আসে। স্তম্ভের উচ্চতা ১৫০ ফিট। ভিতরের পরিধি ১২ ফিট। নির্ম্মাণ ব্যয় ছয় লক্ষ টাকা। একজন ইংরেজ ও পাঁচ জন খালাসী ইহাতে বাস করে। য়্যাপোলো বন্দর হইতে দ্বারপুরী তিন ক্রোশ। নৌকায় বসিয়া ক্লান্তি অনুভূত হইল না। নয়ন ফিরিতে লাগিল। কত জাহাজ নীরবে দাঁড়াইয়া ভবিষ্যৎ ভাবিতেছে। দূরে কচ্ছদেশীয় ধাও (নৌকা) গুলি, মাণ্ডুই বন্দর দেখাইয়া দিতেছে। কোথাও মক্কাযাত্রিগণ নিবিড়ভাবে জাহাজ বোঝাই হইতেছে। শ্রমজীবীরা নিকটবর্ত্তী কোনও পার্ব্বত্য দ্বীপ হইতে প্রত্যাগমন করিতেছে। বোম্বাই, ইংরেজ রণতরীর নিবাসস্থান। আবিসিনিয়া ও ম্যাগডালা নামে দুইখানি টরেট্ শিপ্ আছে। তাহার একখানি এক্ষণে পারস্য উপসাগরে গিয়াছে। অন্যখানি রহিয়াছে। এই যুদ্ধজাহাজ অতি আশ্চর্য্য বস্তু। ইহাতে অতি প্রকাণ্ড চারিটি কামান আছে, দুইটি সম্মুখে ও দুইটি পশ্চাদ্ভাগে। এই কামানদ্বয়, এক চক্রাকার প্ল্যাটফরমের উপরে স্থাপিত। প্ল্যাটফরমের নীচের চাকা লোহার রেলের উপর ঘুরিতে পারে। ইহা ঘুরাইবার জন্য কল আছে; তদ্দ্বারা যে দিকে ইচ্ছা, সেই দিকে প্ল্যাটফরমের সহিত কামানের মুখ সহজে ফিরান যায়। সুতরাং, শত্রু যে দিকে থাকুক না কেন, তাহাদিগকে অনায়াসেই আক্রমণ করা যাইতে পারে। এই জাহাজের চারিদিকে দৃঢ়লোহনির্ম্মিত জল-প্রণালী আছে; তাহাতে জল ভরিলে জাহাজের ডেক পর্য্যন্ত জলে ডুবিয়া যায়। কেবল টরেট ও কামানের মুখ জলের উপরে থাকে। সুতরাং শত্রুরা গুলি করিয়া জাহাজের কোন অনিষ্ট করিতে পারে না। টরেটের এক উচ্চ প্রদেশে কাপ্তেনের দাঁড়াইবার স্থান আছে। এই টরেট্ অত্যন্ত দৃঢ়, লৌহ ও কাষ্ঠের আবরণে আবৃত। গুলিতে তাহা ভেদ করিতে পারে না। ইহাতে দুইটি ছিদ্র আছে, তদ্দ্বারা কাপ্তেন শত্রুদিগের গতি

বিধি দেখিয়া, নিজের লোকদিগকে হুকুম দেন। এই সকল অতিক্রম করিয়া ঘারপুরির সেতুবন্ধে উপস্থিত হওয়া গেল। উপরে উঠিয়া দর্শনী দিতে হইল। একজন প্রহরী দেখাইতে চলিল। শৈল বিদারণ করিয়া অতি সুবৃহৎ দেবালয় খোদিত হইয়াছে। মূর্ত্তিগুলি অতি বৃহৎ, ১২ হস্ত উচ্চ হইবে। মধ্যস্থলে যে গৃহ, তাহাতে এক প্রকাণ্ড শিবলিঙ্গ আছে। ভিত্তিগাত্রে বহুবিধ মনোহর ভাবের বিগ্রহ খোদিত হইয়াছে। যথা—ত্রিমূর্ত্তি, অর্দ্ধনারীশ্বর, হরপার্ব্বতী, শিবের বিবাহ, গণেশজননী, রাবণের কৈলাস উত্তোলন, দক্ষ যজ্ঞ নাশ, মহাদেবের তপস্যা, ও ভৈরব প্রভৃতি। শিরোভূষণ দেখিলে এগুলি দ্রাবিড় স্থপতির কার্য্য বলিয়া বোধ হয়। অনুমান সহস্র বৎসর হইল, ইহা নির্ম্মিত হইয়াছে। কে করিয়াছে, তাহা কেহ জানে না। এই জন্য এই অমানুষিক ব্যাপার, পাণ্ডবগণ কর্ত্তৃক সম্পন্ন হইয়াছে বলিয়া, স্থানীয় লোক নিরস্ত থাকে। কএকটা স্তম্ভ স্খলিত হইয়া গিয়াছে। মূর্ত্তিগুলিও স্পর্শদোষ বিশিষ্ট হইতেছে। স্থানে স্থানে পর্ব্বত বিদীর্ণ হইয়া জল পড়ে। শৈল স্খলন হইতে যেন আর বিলম্ব নাই। এই দ্বীপে পর্ব্বতে হস্তী খোদিত ছিল, একারণে ইহার 'এলিফেণ্টা' নামকরণ হইয়াছে। ইদানীং সে হস্তী ভগ্ন হইয়া গিয়াছে।

চৌপাটি ও পশ্চাৎদিকের খাড়ির সৈকতকূলে দিবাবসানকালে ভ্রমণ অতি রমণীয়। পূজারী, ঘণ্টা বাজাইয়া সগন্ধ পুষ্প দিয়া সাগরের পূজা করিতেছে। ধর্ম্মপরায়ণ পারসিক উপাসনা করিতেছেন, কখনও বক্র হইতেছেন, কখনও বা অভিবাদন করিতেছেন। পারসী রমণীরা রামধনুর মত নানাবর্ণের উজ্জ্বল শাড়ী পরিয়া লাবণ্যরাণীর মত বিচরণ করিতেছেন। আইস্ ক্রিম্ ও গণ্ডেরি বিক্রেতা পণ্যাখ্যাপন করিয়া চলিয়াছে। এই যে সুখদস্থান, কতলোক ইহাতে সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছে। হারবর ভরাট করিয়া বহু মূল্যবান ভূমি উৎপন্ন করা হইয়াছে দেখিয়া, ব্যাক বে রিক্লেমেশন

কোম্পানি জমি প্রস্তুত করিলেন। কিন্তু এখানে বসতি হইল না। ব্যাণ্ড ষ্ট্যাণ্ড অতি সঙ্কীর্ণস্থান। ঘেঁসাঘেঁসি করিয়া বেড়াইতে হয়। সিকিম প্রত্যাগত সৈন্য দেখিতে বহু লোকের সমাগম হইয়াছে। জনতার মধ্যে মিশরকাহিনী চলিতেছে। সান্ধ্য বায়ুসেবন কার্য্যের ভার বোম্বাইনিবাসিগণ পারসিদিগের প্রতি দিয়া অবসর লইয়াছেন। পারসিদিগের পূর্ব্বের মত আর বাণিজ্যে অনুরাগ নাই। অধুনা তাঁহারা ৫০।৫৫টাকার কেরাণীগিরি পাইলেই সন্তুষ্ট এবং ইংরাজি বিলাসিতা টুকু দেখাইতে পারিলেই কৃতার্থ হন। ব্যাক বের উপর নগর-শোভাসম্বর্দ্ধক-সভার সূচীবৎ প্রস্থ-রহিত একখানি উদ্যান আছে। উহাতে ভ্রমণ করা অতৃপ্তিকর নহে। বম্বে-বরোদা ও সেণ্ট্রল-ইণ্ডিয়ান-রেলওয়ে শকট অনবরত গমনাগমন করিতেছে, দেখিতে পাওয়া যায়। কোলাবা হইতে বন্দরা পর্য্যন্ত বাইশ খানি ট্রেণ নিত্য যাতায়াত করে। প্রকৃত সমুদ্র দর্শনাশায় বালুকেশ্বর হইয়া মহালক্ষ্মী গমন করিলাম। মন্দিরের নীচে মহোদধি বেলাভূমির নিম্নে গর্জ্জন করিতেছে। কৃষ্ণবর্ণ সুবৃহৎ উপলখণ্ড তটদেশ আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে। দূরে মৎস্যজীবিগণের নৌকার পাল দেখা যাইতেছে। এস্থানটি অবশ্য গম্ভীর ভাবের আকর বলিতে হইবে। অনন্ত জলরাশি প্রাণ ভরিয়া দেখিতে লাগিলাম। এছবি যে কখন ভুলিব, এমন বোধ হয় না। সূর্য্যদেব দিগ্বলয়ে পারাবারে নিমগ্ন হইতেছেন। মূর্ত্তি রক্তবর্ণ হইয়া গিয়াছে। একটু একটু করিয়া ডুবিতে-ছেন। যখন অর্দ্ধ অংশ ডুবিয়াছে, অর্দ্ধ অংশ জলে ভাসিতেছে, আহা তখন কি সুষমার উদয় হইল!

"নিতান্ত কি দিনমণি ডুবিলে এবার;
ডুবাইয়া আজি সবে শোকসিন্ধুজলে?
যাও তবে, যাও, দেব কি বলিব আর;
ফিরিও না পুনঃ—উদয় অচলে।

কি কাজ বল না, আহা, ফিরিয়া আবার ?
ভারতে আলোকে কিছু নাহি প্রয়োজন ;
আজীবন কারাগারে বসতি যাহার,
আলোক তাহার পক্ষে লজ্জার কারণ।"

ম্যালাবার শৈল হইতে বোম্বাইএর পশ্চিমদিক্ ধনুর মত দেখায়। এক দিকে কোলাবা, অন্য দিকে ম্যালাবার পয়েণ্ট। পূর্ব্বদিকে হারবর। এখান হইতে নিম্নস্থ নারিকেল-তরুরাজি অতি সুন্দর দেখায়। এই পর্ব্বতের উচ্চ প্রদেশে পারসিদের 'দখমা' অর্থাৎ শব-প্রক্ষেপ-স্থান। প্রাচীরবেষ্টিত একটি বৃত্তাকার স্থান ক্রমশঃ নিম্ন হইয়া মধ্যস্থ কূপে মিলিত হইয়াছে। একটি ক্ষুদ্র দ্বার দিয়া প্রাচীরের মধ্যে শব নিক্ষেপ করা হয়। গৃধ্র ও চিল কর্ত্তৃক মাংস ভক্ষিত হইলে, অস্থিগুলি কালক্রমে কূপে যাইয়া পড়ে। একটি ইংরাজ পল্লী এই পর্ব্বতে স্থাপিত। কলিকাতার মত অধিক সংখ্যক গৌরাঙ্গ এ নগরে নাই। ক্রফোর্ড মার্কেট অবশ্য দেখিবার স্থান। বহুবিধ ফল ও নানা জাতীয় শাকসবজী এবং মৎস্য, মাংস, পুষ্প, প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে হর্ম্ম্যতলস্থ অসংখ্য মঞ্চ সজ্জিত করিয়া, দেশের সমৃদ্ধি ঘোষণা করিতেছে। বাজার রাত্রিকালে তাড়িতালোকে আলোকিত হয়। বাণিজ্যের অবস্থা-পরিজ্ঞাপনের জন্য মাণ্ডুই বন্দর সন্নিহিত ভাটিয়া ও খোজা পল্লীতে বিচরণ করিতে হয়। এল্‌ফিন্‌ষ্টোন্ সারকেলের মধ্য স্থানে একটি বৃত্তাকার ছোট বাগান আছে। তাহার চতুর্দ্দিকে রাস্তার অপরপার্শ্বে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অট্টালিকা। এই অট্টালিকা সকল এরূপ চক্রাকারে গঠিত যে, তাহারা যেন সকলে মিলিয়া বাগানের চতুর্দ্দিকে একটি বৃত্ত অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছে। এই সমুদায় অট্টালিকার উচ্চতা, নির্ম্মাণ-প্রণালী ও গঠন একবিধ। এইরূপ সৌসাদৃশ্য প্রযুক্ত স্থানটি দেখিতে অতি সুন্দর হইয়াছে। বাটীর

বহির্ভাগ সম্পূর্ণ প্রস্তর-নির্ম্মিত ও বোধ হয়, এই সকল বাটীতে খোলার চাল নাই। ব্যাঙ্ক প্রভৃতি এই সকল বাটীতে স্থাপিত। আমেরিকার সহিত যুদ্ধ কালে, ইংরাজের সহিত তূলার বাণিজ্যে বোম্বাই যে সময়ে বিপুল ধন উপার্জ্জন করিয়াছিল, তখন এই প্রাসাদাবলী বিনির্ম্মিত হয়। ভিক্টোরিয়া উদ্যান ও মিউজিয়াম এক দিন দেখিতে গিয়াছিলাম। খণ্ডেরাও গায়কোয়াড় কর্ত্তৃক স্থাপিত মহারাণী ভিক্টোরিয়ার শ্বেতপ্রস্তর-নির্ম্মিত মূর্ত্তি, শিল্পকার্য্যের চরমোৎকর্ষ খ্যাপন করিতেছে। আমরা আবুজীতে যে অভাবনীয় নৈপুণ্য দেখিয়াছি, তাহার সহিত ইহার তুলনা হইতে পারে। পরিচ্ছদের কারচুপির কর্ম্ম পর্য্যন্ত খোদিত হইয়াছে। নির্ম্মাণব্যয় এক লক্ষ অশীতি সহস্র টাকা। রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ কৃত রাজাবাঈ টাওয়ার আর একটি গণনীয় সামগ্রী।

আমাদিগের বাটীর নিকটে মাধব বাগ। একজন বণিক্ পিতার স্মরণ-চিহ্ন স্বরূপ, তাঁহার পিতার নামে এই ধর্ম্মশালা, সভাগৃহ ও উদ্যান স্থাপন করিয়াছেন। উদ্যানের মধ্যস্থলে লক্ষ্মীনারায়ণের মণিমুক্তাভূষিত শ্বেত বিগ্রহ। এ প্রদেশে দেবতার অলঙ্কার দেখিলে, দেশটি যে বহু ধনী লোকের বসতিস্থান, তাহা অনায়াসে বুঝা যায়। ইহার অনতিদূরে পিঁজরাপোল অর্থাৎ পশুর জন্য চিকিৎসা ও প্রতিপালন-গৃহ। তাহার পর বণিয়াদের পঞ্চায়ত-শালা ও সমুদ্রাধিষ্ঠাত্রী দেবীর মন্দির। এখানে একটি বাটী আছে, তাহাতে ভোজ হয়। বোম্বাই নগরে স্ব স্ব বাটীতে স্থানের সঙ্কুলান হয় না বলিয়া, পল্লীর মধ্যে ভোজের জন্য পৃথক স্থান নির্দ্দিষ্ট আছে। ভুলেশ্বর মহাদেবের মন্দিরে বহুজন সমাগম হইয়া থাকে। প্রবেশ-দ্বারে লেখা আছে,—'হিন্দু ভিন্ন অন্যের প্রবেশ নিষিদ্ধ।' অনেক ভিক্ষুক এখানে বসিয়া উদরান্নের সংস্থান করে। শিবলিঙ্গের উপর অর্দ্ধমণ ঘৃতের জমাট শিরোভূষণ দেখিলাম। বোধ হয়, কাহারও মানত ছিল।

এ পল্লীতে তিনটি বল্লভাচারী দেবমন্দির আছে। তাহার মধ্যে জীবন-লালের মন্দির সর্ব্বপ্রধান। যে কোনও স্থানে এই সম্প্রদায়ের দেবালয় দেখিয়াছি, কোথাও শিখর বা চূড়া নাই। সাধারণ গৃহের মত সমতল ছাদবিশিষ্ট। স্ত্রীপুরুষের মিশ্রভাব অতি বিস্ময়কর। বাঙ্গালা ভাষায় মাথায় পাগড়ি 'ঙ' যেমন কোনও কার্য্যে লাগে না, এখানে নারীকুলের নিকট পুরুষ তেমনি উপেক্ষণীয়। গুজরাতী রমণীরা পুরুষের নিকট কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হয় না। আমি সেই জনতার মধ্যে গিয়া বালগোপাল দর্শন করিতে পারিতেছি না দেখিয়া, একজন বৈষ্ণব কহিলেন, দেবদর্শনে আসিয়া ভিড়ের ভয় করিও না। মুম্বাদেবী পূর্ব্বে ফোর্টে ছিলেন, এক্ষণে এদিকে আসিয়াছেন। এখানে অনেকগুলি জৈন মন্দির আছে। এক-স্থানে দেখিলাম, পার্শ্বনাথের দেহ সম্পূর্ণ হীরক মণ্ডিত। জ্যোতির্ম্ময় দেহ, প্রকোষ্ঠ উজ্জ্বল করিয়া বিরাজ করিতেছে। পারসি দেবালয়ের নাম অতেশ বেহরম। অন্য ধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তি ইহার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না। সন্নিকটে চন্দনকাষ্ঠ ও ধর্ম্মপুস্তকের পণ্যশালা দেখিয়া কোন্‌টি অগ্নি-দেবতার মঠ, তাহা স্থির করিতে হয়। একদা প্রার্থনা-সমাজ দেখিতে যাইলাম। সেই দিন উড়িষ্যা হইতে আগত অনৈক নববিধানী বাঙ্গালী হিন্দী-ভাষায় উপাসনাদি কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছিলেন। তাঁহার সহচর একটি উড়িয়া গীত গাইয়া আমাদিগকে হাসাইলেন। পরে মহারাষ্ট্রীয় সঙ্গীত হইল। ১৮৭২ অব্দে প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের সহায়তায় এই মন্দিরের ভিত্তি-প্রস্তর নিহিত হয়। ডাক্তার আত্মারাম পাণ্ডুরঙ্গ এই সমাজের প্রধান নেতা। তাঁহার পুত্র খৃষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছেন। কন্যা একজন ইংরাজকে বিবাহ করিয়াছেন। রাজপথে বাঙ্গালী দেখিলে, প্রথমতঃ তাঁহাকে স্বর্ণ-কার বলিয়া বিবেচনা করা উচিত, তাহার পর পরিচয়ে যাহা স্থির হয়। ন্যূন চত্বারিংশ স্বর্ণকার কালবা দেবীরোড প্রভৃতি স্থানে কার্য্য করে।

তাহাদের আট খানি দোকান আছে। তাহারা মাসিক বেতন চল্লিশ হইতে এক শত কুড়ি টাকা পর্য্যন্ত পাইয়া থাকে।

আমাদের বাসস্থান সদর রাস্তার উপর। বাতায়নে বসিয়া নগরের লীলা দিব্য নয়নগোচর হয়। নিশার অবসান হইয়াছে। পারসী নরনারী ভজনালয়ে ও সিন্ধুতীরে উপাসনা জন্য গমন করিতেছে। হিন্দুস্থানী দ্বিজ সফেন দুগ্ধ যোগাইতে চলিয়াছে। গুজরাতী ব্রাহ্মণ পুষ্পপাত্র লইয়া সমুদ্র-পূজা করাইতে যাইতেছে। "বাটলে, বাটলে হোসে" এই বলিয়া খালি-বোতলক্রেতা ফিরিতেছে; কচুর শাকওয়ালী এবং মিঠা অর্থাৎ লবণ বিক্রেতা ভার মাথায় করিয়া যাইতেছে। কুণবী জাতীয় শব অনাবৃত মুখে গীত-বাদ্য সহযোগে চিতাভূমি অভিমুখে বাহিত হইতেছে। সীতাফল-বিক্রেতা গ্রাহক অনুসন্ধান করিতে অপারগ হইতেছে না। হলুয়া-বিক্রেতা বাটীর উপর পর্য্যন্ত উঠিতে ক্ষান্ত হইতেছে না। বোম্বাইয়ের মিষ্টান্নের মধ্যে 'হলুয়া' অতি প্রসিদ্ধ। উহা তিন চারি প্রকারের প্রস্তুত হয়। অধিকাংশ হিন্দুস্থানী সোহন হলুয়ার ন্যায়। গ্রীষ্মকালে মধ্যাহ্ন সময়েও মহারাষ্ট্র-সীমন্তিনীগণ শাল গায়ে না দিয়া বাটীর বাহির হন না। আমাদের বাটীর সম্মুখে জনৈক রাজকর্ম্মচারী বাস করিতেন। তিনি দ্বিতীয় পক্ষে বিধবা বিবাহ করিয়াছেন। গৃহিণী অঙ্গরাগ করিয়া সর্ব্বদা দর্পণে মুখাবলোকন করেন। কর্ত্তা দোলায় বসিয়া দুলেন। গুজরাতে হিন্দু মুসলমান সকলের ঘরে দোলনা আছে। আমার প্রতিবেশী কিন্তু মহারাষ্ট্রী। ভৃত্যবর্গ কেবল কৌপীন পরিধান করিয়া অনায়াসে নারীসমক্ষে বিচরণ করিতেছে। বালকগণ কোট-পেন্‌টুলন পরিয়া খালি পায়ে বিদ্যালয়ে চলিয়াছে। অপরাহ্নে বস্ত্রবিক্রেতা "এ বাঁধড়ি" বলিয়া চীৎকার করে। পুষ্পবিক্রেতা মহারাষ্ট্র-রমণীর শেণ্ডা (কবরী) ভূষিত করিবার জন্য মোগরি, চম্পেলি, যুঁই, চম্পা, গুলছেড়ি ও গুলাব বিক্রয় করিতেছে। ঘটনাক্রমে যদি সকল

পুষ্পাভরণ বিক্রীত না হয়, তাহা হইলে মালাকার ঐ পুষ্প কোন দেবালয়ে দান করে। ধনবতী রমণীরা মাসিক ১০।১৫ টাকা মালিকে দেয়। 'পিস্তাচু' বিক্রেতা কবিতা আবৃত্তি করে—

"খারা পিস্তা ভুঁজেলা,
মগজনা ফাঁটেলা।
দুনিয়ানা সুধরেলা,
সুরত থী আবেলা।
এক খায় তো বীজানু মন ধায়,
তো বীজো পৈসা লেবা যায়।
চখে সো ইয়াদ রখে বারা বরষ।"

অর্থ,—লবণমাখা পেস্তাভাজা ও মাথা ফাটা। দুনিয়া সুধরান, সুরত হইতে আনান। একজন যদি খায়, তবে আর জনের মন ধায়। অন্য জন পয়সা আনিতে যায়। চাখে যে, স্মরণ রাখে বার বরষ। চীনের-বাদামওয়ালা হাঁকিতেছে,—"লে তিনি ভুঙ্গেলি সিঙ্গা, গরম, গরম।" তুষারবাহী,—"এ আইস্ এ আইস্" করিয়া ক্লান্ত হইতেছে। রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় নিদ্রাভঙ্গ হইলেও আইস্‌ক্রীম ও গণ্ডেরি রব শ্রুতিগোচর হইয়া থাকে। মেহতাজীর পত্নী একদিন কয়েক প্রকার মিষ্টান্ন প্রস্তুত করিয়া আমাদিগকে দিলেন। তাহার মধ্যে বিশেষরূপে কথিত গন্ধ-দ্রব্য যুক্ত আমিক্ষা (ছানা) ছিল। মেহতাজীর পুত্র আমাদের জ্ঞান-সহায়। তিনি বাঙ্গালী ও হিন্দুস্থানীতে কি প্রভেদ, তাহা বুঝেন না; এজন্য একদা কহিলেন,—"তোমাদের ভৃত্য কটিদেশে বস্ত্র জড়াইয়া কাপড় পরে, কিন্তু তোমরা সেরূপ পর না কেন?" তাঁহাকে একদিন জিজ্ঞাসা করিলাম,—'এ মহানগরীতে খাপরার চাল করে কেন?' তিনি কহিলেন, 'তবে কিসের চাল করিবে?' ছাদ যে পাকা হইতে পারে, এ জ্ঞান তাঁহার

জন্মিবার সম্ভাবনা নাই। বণিয়াদের মধ্যে সুরাপানের পরিবর্ত্তে কেহ কেহ "ইউ-ডি-কলোন" পান করেন। এদেশে ক্ষৌরকারের বেতন সুলভ নহে। নাপিতের নিকট অনেক তত্ত্ব জ্ঞাত হইবার কথা। এখানকার নাপিত দেখিতেছি, সেরূপ সামাজিক নহে। গুজরাতের গ্রামে হাজাম ক্ষৌর ব্যতীত অন্যান্য কর্ম্মও করে। চিকিৎসাকর্ম্ম তাহা দ্বারা কিছু না কিছু সম্পন্ন হয়। সে প্রেমিকের উকীল। হাজাম নহিলে বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হয় না। তাহারা পুরুষানুক্রমে গ্রামে মশালচীর কর্ম্ম করে। তাহাদিগের স্ত্রী ধাত্রীর কর্ম্ম করে। সকল দেশেই নাপিতের নিকট দর্পণ থাকে, এক বাঙ্গালায় তাহা নাই। আমাদের বাটীটি এত বড় যে, ইহাতে ৪।৫ শত লোক বাস করে। আমরা দুইটি ঘর লইয়াছিলাম, তাহার ভাড়া সাত টাকা দিতে হইত। দুই দিন থাকিলেও এক মাসের ভাড়া দিতে হয়। মিউনিসিপাল কমিটির টেক্স কলিকাতা অপেক্ষা কম। বাটীর ভাড়ায় শতকরা ১৪ টাকা দিতে হয়।

গ্র্যাণ্ট রোডে পাঁচটি দেশীয় নাট্যশালা আছে। এই সকল নাট্যশালায় মহারাষ্ট্রী, গুজরাতী ও হিন্দুস্থানী ভাষায় লিখিত নাটকের অভিনয় হয়। অভিনয় প্রায় প্রত্যহই হইয়া থাকে। আমরা রিপণ রঙ্গভূমির দ্বারে যাইয়া উপনীত হইলাম। ইহা ইংরাজী প্রণালীতে গঠিত; গ্যাস-আলোকে প্রভাময়; অঙ্গনে সরবত, চা ও কাফি পানের স্থান। প্রোগ্রাম পাওয়া গেল না। ঐকতান-বাদন নাই। ড্রেস সার্‌কেলের একদিকে পুরুষ, অন্য দিকে মহিলাগণের স্থান। বলা বাহুল্য যে, স্ত্রীলোকের স্থানে যবনিকা দেওয়া আবশ্যক হয় নাই। দর্শকবৃন্দ সকলেই উষ্ণীষ উন্মোচন করিয়া বসিয়াছেন। বিচিত্র মস্তকশ্রেণী শোভা পাইতেছে। সঙ্গীত-শাকুন্তল মহারাষ্ট্রী ভাষায় অভিনীত হইতেছে। দৃশ্যপট ও অভিনয় উৎকৃষ্ট। স্ত্রীলোকের অংশ পুরুষে অভিনয় করিতেছে, এই দোষ। পাত্রী

অর্থাৎ স্ত্রীবেশধারী অভিনেতাদিগকে দেখিলেই ব্রাহ্মণ কন্যা বলিয়া বোধ হয়। কচ্ছ-বিলোলিত কবরী মেষশৃঙ্গবৎ। আর এক দিন একটি হিন্দুস্থানী নাট্যমন্দিরে গিয়া প্রথম শ্রেণীর টিকিট ক্রয় করিলাম; পরে জানিলাম সে শ্রেণী নাই; সুতরাং বাদানুবাদ করিয়া মূল্য হ্রাস করিতে হইল। প্রথমে মুজরা, পরে নাটক আরম্ভ হইল। এ দলে স্ত্রী-অভিনেত্রী ছিল। অঙ্গে বর্ণক লেপন করায় স্ত্রীলোকের সৌকুমার্য্য একেবারে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। ধীবরের নৃত্য দেখিয়া স্থানীয় জ্ঞান বৃদ্ধি করা হইল। শ্রোতৃগণ সকলেই প্রায় মুসলমান। কোলাহল-নিবারণের জন্য দ্বারবান যষ্টি উত্তোলন করিয়া হুঙ্কারবে ইতস্ততঃ ধাবমান হইল।

পারসিরা ইংরাজের মত গম্ভীর। দুই একটি বৃদ্ধ ব্যতীত কেহ আপনা হইতে আমাদের সহিত আলাপ করে নাই। বণিয়াদের মধ্যে অনেকে ডাকিয়া কথা কহিয়াছে। লোকে যেমন বর্ত্তমান অবস্থায় সন্তুষ্ট নহে, তদ্রূপ উপস্থিত সামগ্রীকেও তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া থাকে। দুই তিন ব্যক্তি আলাপ করিয়া কহিলেন, এখানে এমন কি দৃশ্য আছে যে, তোমরা কলিকাতা হইতে মুম্বই দেখিতে আসিয়াছ? তাঁহারা কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। আমরা জনৈক পরিচিত মহারাষ্ট্রীয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিবার অভিলাষে নওয়ারিতে পঁহুছিলাম। দেওয়ালী উপলক্ষে বাটীর পুরোভাগে বেদি রচনা করিয়া যোষাগণ বিবিধ বর্ণের চূর্ণ দ্বারা আলিপনা দিতেছে। আমি বাহিরে বসিতে চাহিলে, তিনি কহিলেন, তোমাদের দেশের মত আমাদের দেশে আবরু পরদার ব্যবহার নাই। বিদায় কালে তিনি আমাকে পান সুপারী দিলেন। প্রাতঃকাল,—স্নানাদি হয় নাই,—এই হেতু আমরা তাম্বুল গ্রহণ অনাবশ্যক বিবেচনা করিলাম। তাহাতে তিনি কহিলেন, উহা অবশ্য গ্রহণীয়, কারণ উহা সম্মানের বস্তু। এক জন মহারাষ্ট্রীয় তাঁহার দোকানে ডাকিয়া স্বদেশ-জাত আগপেটি অর্থাৎ বিলাতি দিয়াসলাই ও আতর

দেখাইলেন। রঙ্গসংস্কৃত ছুরী কাঁচির ন্যায় বাঙ্গালায় যে সকল অস্ত্র প্রস্তুত হইয়াছে, তিনি তাহা দেশীয় বলিয়া বিক্রয়ের জন্য সাজাইয়া রাখিয়াছেন।

এ সময় হাইকোর্ট প্রভৃতি বন্ধ থাকায় পুলিস ধর্ম্মাধিকরণে বিচার দেখিতে যাইলাম। গাইকোয়াড়ের এক থানি হীরকের ধুকধুকি হারাইয়া যায়। সেই হীরা থানি ৩ খণ্ড হইয়া বিক্রীত হইয়াছে। তাহার একখণ্ড দিল্লী নিবাসী জনৈক সাধুর নিকট আর এক জন হিন্দুস্থানী সরাওগী (শ্রাবক) ক্রয় করিয়া অভিযোগে পতিত হইয়াছে। মণিটি বিচার-পতিকে প্রদর্শিত হইল। সম্প্রতি একটি বিচারের জন্য এই স্থানে অত্যন্ত আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল। দাদাজী ভীকাজী তাঁহার পত্নী, (ডাক্তার সথারাম অর্জ্জুনের স্ত্রীর পূর্ব্ব স্বামীর কন্যা) রুক্মা বাঈএর নামে বিবাহ সম্বন্ধীয় স্বত্ব পরিণত করিবার জন্য অভিযোগ করেন। রুক্মাবাঈ বিদ্যাবতী ললনা। দশ বৎসর হইল, তাঁহার বয়ঃক্রম যখন এগার বৎসর, সেই সময় দাদাজীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। বালিকা বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে, স্বামিগৃহে যাইতে ও তাঁহার সহিত একত্র থাকিতে অসম্মতা হন। তিনি কহেন,—উক্ত ব্যক্তির শ্বাসরোগ আছে এবং ক্ষয়-রোগের লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে; অপিচ সে স্ত্রীর ভরণপোষণ করিতে অপারগ। বিশেষতঃ যে সময় তাহার বিবাহ হইয়াছিল, তখন স্বাধীন-মত দিবার তাহার (স্ত্রীর) বয়স হয় নাই; অতএব সে বিবাহের জন্য তিনি দায়ী নহেন। ইহাতে বিচারপতি পিন্‌হে স্বামীর পক্ষে কোনও কথা না শুনিয়া, খরচা সমেত স্ত্রীর পক্ষে ডিক্রী দিলেন। জজ বিবেচনা করিলেন, যখন রুক্মা দাদাজীর গৃহে যাইতে সম্মত নহেন, তখন একটা ঘোড়া বা বলদের দখল পাওয়ার অধিকারের মত দাদাজী উহার দখল পাইতে পারেন না। বিচারটা বুঝি 'ইকুইটি' অনুসারে হইয়াছে। এই নিষ্পত্তিতে বাল্যবিবাহ নিবারণার্থ

রাজনিয়মপ্রার্থী বেহরামজী মলবারি প্রভৃতি 'সুধরাণেওয়ালা' অর্থাৎ সমাজ-সংস্কারকগণ জয়লাভ করিলেন।

বাণিজ্যের অবস্থা সর্ব্বত্র সমান। মালের কাট্‌তি বৃদ্ধি পাইয়াছে, লাভ কমিয়াছে। তাড়িতবার্ত্তা ও বাষ্পীয়যান, সকল দেশেই দ্রব্যের মূল্য একরূপ করিয়া দিয়াছে। যাহাদের ঘরে দ্রব্যজাত উৎপন্ন হয়, তাহারা বিলক্ষণ সম্পত্তিমান হইতেছে। যাহারা ক্রয় বিক্রয় করে, তাহারা যৎকিঞ্চিৎ লাভের ভাগী হয়। বাঙ্গালা হইতে এখানে চাউল, রেশম ও চটের ব্যবসায় চলিতে পারে। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে আমেরিকার সহিত ইংলণ্ডের যুদ্ধ উপস্থিত হয়। তাহাতে উক্ত স্থান হইতে ইংলণ্ডে তুলার আমদানী একেবারে রহিত হইয়া যায়। কেবল ভারত হইতে রপ্তানি চলিতে থাকে। ইহাতে বোম্বাই আশী কোটী টাকা উপার্জ্জন করে। একবারে এত অর্থ পাইয়া বোম্বাই সুদের ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হয়। বহু ব্যাঙ্ক স্থাপিত হয়। ভূমি ভরাটের জন্য নানাবিধ সম্ভূয় স্থাপনা হইয়া যায়। ব্যাক বে রিক্লেমেশন কোম্পানীর অংশপত্র পাঁচগুণ অধিক মূল্যে বিক্রীত হইয়াছে। বিবিধ জয়েণ্ট ষ্টক কোম্পানীর শেয়ার অর্থাৎ অংশ অসম্ভবরূপ অতিরিক্ত মূল্যে বিক্রীত হইতে থাকে। এই সময় বোম্বাইবাসিগণ কলিকাতার পোর্ট-ক্যানিং সম্ভূয়ের সৃষ্টি করেন। ১৮৬৫ অব্দে আমেরিকার যুদ্ধাবসান-সংবাদ বোম্বাই নগরীতে প্রচারিত হইবামাত্র তুলার বাজার এককালে পড়িয়া যায়। সেই সঙ্গে সর্ব্বপ্রকার সম্ভূয়ের অংশমূল্য অত্যধিক পরিমাণে খর্ব্ব হইয়া পড়ে। ইহাতে শেয়ারের অধিকারিবর্গ বুঝিল যে, তাহাদের টাকা কেবল কতকগুলি কাগজ মাত্র। সুতরাং সমস্ত ভূমি-ভরাটের কোম্পানী দেউলিয়া হইয়া পড়িল। ব্যাঙ্কওয়ালারা উহাদিগকে টাকা ঋণ দিয়া কুসীদ লাভ করিত, অতএব কয়েকটি ব্যতীত সকল ব্যাঙ্ক ফেল হইয়া গেল। যাহা হউক, এই বিপত্তিতে এখানকার বাণিজ্যের স্থায়ী ক্ষতি কিছুই

হয় নাই। তুলার রপ্তানি যত কমিবে বলিয়া অনুমিত হইয়াছিল, তত কমে নাই। এদেশ হইতে তুলা যাইয়া ম্যান্‌চেষ্টারে বস্ত্রে পরিণত হয় এবং পুনর্ব্বার এখানে আসিয়া লাভের সহিত বিক্রীত হইয়া থাকে, ইহা দেখিয়া, তত্রত্য অধিবাসিগণ কাপড় ও সূতার কল করিতে আরম্ভ করিলেন। যাহাতে লাভ দেখে, সমস্ত লোকই সেই কর্ম্ম করিতে যায়। অধুনা এত বস্ত্র প্রস্তত হইতেছে যে, বিক্রয়ের স্থান-সঙ্কুলন হইতেছে না। ইংরাজের রাজ্য এতদূর বিস্তৃত যে, তাহাদের দেশে সূর্য্য কখনও অস্ত যান না। উঁহাদের বিক্রয়ের স্থানের অভাব কি ? এখানে আর নূতন কলের আবশ্যক নাই, নূতন হট্টের অনুসন্ধান হইতেছে। অত্রত্য জনৈক অধিবাসীর সহিত আমরা মানকজী পেটীটের কল দেখিতে যাইলাম। তুলা ধোনার স্থান হইতে, তন্তু নির্ম্মাণ, বস্ত্রবয়ন, কাপড় ভাঁজ করা পর্য্যন্ত দেখা হইল। এই যন্ত্রের মূলধন চল্লিশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা। চারি হাজার পঞ্চাশ অংশে বিভক্ত। প্রতি অংশের কল্পিত মূল্য সহস্র মুদ্রা। ঐ মূল্যই প্রদত্ত হইয়াছে। দুইখানি এঞ্জিন বা কল চলিতেছে। এই এঞ্জিন দুই শত সপ্ততি অশ্বের বল ধারণ করে। একষট্টি হাজার দুই শত আটচল্লিশটি টাকু ঘুরিতেছে। এগার শত চুরাশী খানি তাঁত আছে, বার্ষিক চুরানব্বই হাজার মণ তুলা ব্যবহৃত হয়। প্রত্যহ আটাইশ শত লোক কাজ করে। এতদ্ভিন্ন এই নগরে আটচল্লিশটি কাপড় ও সূতার কল আছে। প্রদর্শককে বিদায় দিয়া, আমরা ফিটন যোগে করাতের কল দেখিতে যাত্রা করিলাম। অধ্যক্ষের অনুমতি লইয়া যন্ত্রশালায় প্রবেশ করিতে হইল। এখানে সর্ব্বপ্রকার কাষ্ঠই বাষ্পীয় যন্ত্রের বন্ধনী সহ যোজিত হইয়া নানা প্রকার অস্ত্রের সাহায্যে কর্ত্তিত হইতেছে। দেখিয়া অত্যন্ত আহ্লাদ হইল। মরিশশ ও চীন হইতে গত বৎসর প্রায় দশ লক্ষ মণ চিনি আমদানী হইয়াছে। আগরা বিভাগ হইতে ঘৃত আনাইয়া

এখানে ব্যবসায় করা যাইতে পারে। এদেশে ঘৃতের কাটতি অল্প। ভূসি মালের ব্যবসায় অতি সমৃদ্ধ দেখিলাম।

ব্যবসায়ীদের মধ্যে মানকজী দিনশা পেটিট নামক পারসি সর্ব্বাপেক্ষা ধনবান্। 'কিংবদন্তি' অনুসারে ইঁহার সম্পত্তি দুই কোটী টাকা। সরজম শেঠজী জিজিবাইএর বংশে ইদানীং কার্য্যক্ষম কেহ নাই। সৎকর্ম্মে ব্যয়িত হইলেও, ইঁহাদের বহু অর্থ নিঃসৃত হইয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে ইঁহারা চীনের সহিত বোতলের ব্যবসায় করিয়া উন্নতিলাভ করেন। যে প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়কে ২২ লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন, তিনি এখন যোত্র-হীন হইবার উপক্রম হইয়াছেন। প্রেমচাঁদ স্বয়ং উপার্জ্জন করিয়া উক্তবিধ ও অন্যান্য দান করেন। কাপোল বণিয়াদের অগ্রণী সর মঙ্গলদাস নাথু ভাই। ধনগর্ব্ব অধিক হওয়ায় কুটুম্বদের সহিত অসদ্ব্যবহার করাতে বণিয়াদের মধ্যে আর একটি দল হইয়াছে। সেই দলের অধিপতির নাম ত্রিভুবন দাস। বণিয়ারা বল্লভাচারী বৈষ্ণব। বৈষ্ণব বলিলে, উগ্র হিন্দুস্থানীর দেশে রাম-সীতার উপাসক বুঝায়। বাঙ্গালা অথবা এখানে তাহা নহে। ঐশ্বর্য্যবান্ ও ভোগবান্ বণিয়া রাধাকৃষ্ণের উপাসক।

বিষ্ণু স্বামীর অনুশিষ্য তৈলঙ্গদেশীয় ভট্টবল্লভাচার্য্য, শকাব্দের পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে প্রাদুর্ভূত হন। তিনি গোকুলে বাস করিতেন। প্রথমে সন্ন্যাসী হইয়া পরে তিনি গার্হস্থ্যাশ্রম অবলম্বন করিয়াছিলেন। আচার্য্য কহিয়াছেন, পরমেশ্বরের উপাসনাতে উপবাসের আবশ্যকতা নাই। অন্ন বস্ত্রের ক্লেশ পাইবারও প্রয়োজন নাই। বনবাস স্বীকার পুরঃসর কঠোর তপস্যাতেও ফলোদয় নাই। উত্তম বসন-পরিধান, সুখাদ্য অন্ন ভোজনাদি সমস্ত বিষয়সুখ সম্ভোগ পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের সেবা কর। শ্রীআচার্য্যের শিষ্য রাণাব্যাস সহমরণোদ্যতা এক রাজপুতনীকে কহিয়াছিলেন, তোমার রূপলাবণ্য শ্রীঠাকুরজীর সেবায় সমর্পণ না করিয়া, শবের উপর নিক্ষেপ করা

অতিশয় অনুচিত। রূপলাবণ্য দ্বারা ঈশ্বরের সেবা কথাটি ক্রমশঃ বহুবিপত্তির মূল হইয়া পড়িল। রাধাকৃষ্ণের,—পুরুষপ্রকৃতির কু-কবি কল্পিত অমন কুৎসিত মূর্ত্তি যখন আদর্শ, তখন আর শ্রেয়ঃ কোথায়? বৈষ্ণবদের রাধা ধ্যান, রাধা জ্ঞান। এমন কি, গোকুলস্থ গোস্বামীরা ভৃত্যকে আহ্বান করিতে হইলে, রাধা বলিয়া ডাকেন; শ্রীবৃন্দাবনে গভীর রাত্রিতে প্রহরী রাধে, রাধে, বলিয়া রব করে। বল্লভাচারীদের গুরু মহারাজ নামে অভিহিত। শক্রর মুখে ছাই দিয়া উঁহাদের সংখ্যা ৩০।৪০ হইবে। শিষ্যগণ তাঁহাদিগকে সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় বিবেচনা করে। ভক্ত শিষ্য স্ত্রী বা পুরুষ হউন, গুরুকে তনু, মন, ধন উৎসর্গ করিয়া থাকেন। মহারাজ অতিশয় সমৃদ্ধ অবস্থায় কালযাপন করেন। ইহা অতিশয় ব্যয়সাপেক্ষ; এজন্য নানাবিধ উপায়ে শিষ্যদিগের নিকট হইতে ধন দোহন করা হয়। তৎসমুদায় যথা;—গুরু দর্শন ৫৲, স্পর্শ ২০৲, গুরুপদ প্রক্ষালন ৩৫৲, গুরুকে দোলায় বসাইয়া দোল দেওয়ার জন্য ৪০৲, চন্দনলেপন ৪২৲, একাসনে উপবেশন ৬০৲, মদন মূর্ত্তির সহিত অর্থাৎ গুরুর সহিত এক গৃহে অবস্থিতির জন্য স্ত্রীলোক শিষ্যের পক্ষে ৫০৲ হইতে ৫০০৲, গুরু বা তাঁহার সেবকের পদাঘাত খাইবার জন্য ১১৲, কোড়া আঘাত খাওয়া ১৩৲, রাস-ক্রীড়ার জন্য স্ত্রীলোক শিষ্যের পক্ষে ১০০৲, ২০০৲, গুরুর প্রতিনিধি দ্বারা রাসক্রীড়া ৫০৲, ১০০৲, গুরুর পানের পিক খাওয়া ১৭৲, মহারাজের স্নানোদক পান অথবা যে জলে মহারাজের বস্ত্র ধৌত হইয়াছে, সেই জলপান জন্য ১৯৲ টাকা দিতে হয়। কৃষ্ণচরিত্রের কলুষিত মূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়া বৈষ্ণবের হৃদয় এমনই কলুষিত করা হইয়াছে যে, মহারাজের ব্যবহারে তাহারা কিছু দোষ দেখে না। গুরু, ধর্ম্মের নামে অনায়াসে রমণীর সতীত্ব হরণ করিতে পারেন। করষণ দাস মুলজী নামক বণিয়াসমাজসংস্কারক, এই গুরু-ভক্তির বিশেষ প্রতিবাদ করিয়া-

ছিলেন। উক্ত বিষয়ে তিনি বহু প্রবন্ধ লিখেন। ভক্তবৃন্দ ইহাতে বিরক্ত হইয়া তাঁহার নামে অভিযোগ উপস্থিত করেন। এই বিষয় আদালতে যাওয়াতে নানা কুৎসা প্রকাশ হইল। এক্ষণে করষণ দাস জীবিত নাই। মহিপৎরাম রূপরাম নামা আর একজন সংস্কারক অধুনা দেখা দিয়াছেন; তবে তিনি এবিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন কি না বলিতে পারি না।

জ্যেষ্ঠা ও মূলা নক্ষত্র অশুভ-ফলপ্রদ। উহাতে জন্ম হইলে দোষ-প্রতিপ্রসবের জন্য সেই নক্ষত্রের নামানুসারে সন্তানের নাম রাখা হয়। যথা জেঠাজী, মূলজী। এদেশে গুজরাতী ও মহারাষ্ট্রীয়েরা আপন নামের পর পিতৃনাম যোগ করিয়া তাহার পর কৌলিক উপাধি সংযোজন করে। অনেকের কৌলিক উপাধি নাই, কেবল পিতার নাম ব্যবহার করে। বিবাহিতা স্ত্রী পতিগৃহে নামান্তর গ্রহণ করেন। বধূর নাম ধরিয়া ডাকা ভাল দেখায় না, একারণ একটি নূতন সংজ্ঞা প্রদান করিতে হয়। বিবাহের দিন কন্যা পতিগৃহে উপস্থিত হইলে, গৃহদেবতার সম্মুখে দম্পতী উপবিষ্ট হন। বরের মাতা তাঁহার বধূর যে নাম রাখা স্থির করেন, তাহা এক-পাত্রে তণ্ডুল রাখিয়া তদুপরি অঙ্কিত করতঃ জায়া-পতির কাণে সেই নাম বলিয়া দেন। স্বামীর নাম বিশ্বেশ্বর হইলে স্ত্রীর নাম অন্নপূর্ণা, শঙ্কর হইলে উমা, কৃষ্ণ হইলে রাধা, বিঠোবা হইলে রুক্মাবাঈ অবধারিত হইয়া থাকে।

কুনবী দুই প্রকার। লেওয়া ও কড়ুয়া। কুনবী জাতির বিবাহ লগ্ন বড়ই চমৎকার। ১২ বৎসর অন্তর সিংহ রাশির সহিত বৃহস্পতির সমাগম হইলে, গায়কবাড় পরগণার উমা-গ্রামস্থ ভবানীর পূজারিগণ কর্ত্তৃক বৈবাহিক-ক্ষণ স্থিরীকৃত হয়। সেই দিন দুগ্ধপোষ্যা হইতে যুবতী পর্য্যন্ত পরিণয়সূত্রে বদ্ধ হয়।

দ্বিজাতি ভিন্ন বিধবাবিবাহ নিষিদ্ধ নহে। বিধবা বিবাহকে নাত্রা বলে। বরের ধুতির অঞ্চল ও কন্যার শাড়ীর অঞ্চলে গ্রন্থি দেওয়া হয়। গ্রন্থিবদ্ধ দম্পতি, এক অশ্বে আরোহণ করিয়া জনতার মধ্য দিয়া গীত বাদ্যের সহিত গৃহে প্রবেশ করে। তথায় পুরোহিতগণ পতি-পূজা করাইয়া নাত্রা কার্য্য সমাপন করেন। বিবাহানুষ্ঠানে অন্য কিছু আবশ্যক হয় না। স্ত্রী পুরুষ পরস্পর সম্মতিক্রমে বিবাহবন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারে। স্বামীকে অর্থলালসায় বশ করিতে পারিলে, স্ত্রী আপনার অভিলষিত নায়-কের নিকট গমন করিতে সমর্থ হয়। কেহ কেহ গর্ভস্থ ভ্রূণের বিবাহ সম্বন্ধ করেন। উভয়েরই যদি একবিধ সন্তান জন্মে, তবে বিবাহ অসিদ্ধ হয়, নচেৎ বিকলাঙ্গ প্রভৃতি উৎপন্ন হইলেও বিবাহের অন্যথা হয় না। কোনও পামরের স্ত্রী দশ বৎসরের একটি পুত্র রাখিয়া পরলোক গমন করিলেন, স্বামী সেই বালকের একটি তের বা পনর বৎসর বয়স্কা কন্যার সহিত বিবাহ দিলেন। ইহাতে এক কার্য্যে দুইটি প্রয়োজন সিদ্ধ হইল। সে ব্যক্তি গরিব বলিয়া দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহে অক্ষম, আজ হউক, কাল হউক, পুত্রের জন্য একটি স্ত্রী চাই। সুতরাং দুই কার্য্য সমাধার জন্য উক্ত প্রণালী শীঘ্রই অবলম্বন করে। এরূপ ঘটনা অবশ্য অল্প, কিন্তু প্রকৃত বটে।

এখানে প্রতারণা করিয়া ইন্‌সলভেন্সি লওয়া অর্থাৎ দেউলিয়াপড়া, বিলক্ষণ চলিত আছে। হিন্দু, মুসলমান ও পারসী সকলেই এ বিষয়ে পটু। কেহ কেহ পাঁচ ছয় বার দেউলিয়া হইয়াছেন। গুজরাত ও গুজরাতী নামক গ্রন্থপ্রণেতা ঐ কার্য্যকে কলিচুণফিরান নাম দেন। তিনি বলেন, ঐ আইনের আশ্রয় লইয়া শুদ্ধ হইলে যোত্রহীন ব্যক্তিও হঠাৎ ভাগ্যবান্ হইয়া উঠে। কেহ পত্নী বা মাতাকে অতুল স্ত্রী-ধন করিয়া দেয়। কেহ বা ধর্ম্মশালা নির্ম্মাণ করিয়া দেয়। ঐরূপ ব্যক্তি প্রায়শঃ নূতন আবাস প্রস্তুত করে। নব ব্যবসায় আরম্ভ হয়।

গুর্জ্জর ব্রাহ্মণের মধ্যে নাগরগণ অতি রূপবান্। আবু শৈলের নিকট তাঁহাদের আদি বাস স্থান। মহম্মদ গজনি উক্ত প্রদেশ আক্রমণ করিলে, যে সকল নাগর মুসলমানপক্ষে সহায়তা করিয়াছিলেন, তাঁহারা পৃথক্ জাতিরূপে পরিগণিত হইয়াছেন। তাঁহারা বাণিজ্য ও লিপি কার্য্য করিয়া থাকেন। তাঁহারা বেহতা শ্রেণী নামে অভিহিত। অপর শ্রেণীর নাম ভিক্ষু। তাঁহারা শাস্ত্রব্যবসায়ী। ভারতের মধ্যে সামবেদের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এই জাতির মধ্যে আছে।

ইউরোপীয় উপনিবেশীদের ঔরসে এতদ্দেশীয় অন্ত্যজ নারীর গর্ভে যে বর্ণসঙ্কর উৎপন্ন হইয়াছে, তাহারা ভারতীয় পর্ত্তুগীজ বা গোয়ানী নাম ধারণ করে। স্ত্রীলোকে দেশী পরিচ্ছদ পরে ও খ্রীষ্টীয় দেবালয়ে উপাসনা করিতে যাইবার সময় আপাদমস্তক শুক্লাম্বরে আচ্ছাদিত করিয়া থাকে। পুরুষে হ্যাট্ কোট্ ধারণ করে। আমাদের দেশে রেলওয়ে ষ্টেশন প্রভৃতিতে উক্ত পরিচ্ছদধারী ফিরিঙ্গিরা যেরূপ জেতার সম্মান লাভ করিয়া থাকে, এখানে তদ্রূপ নহে। ইহারা এখানে সাধারণ লোকের মধ্যে গণ্য। কারণ, ইহারা অনেকেই পরিচারকের কর্ম্ম করিয়া থাকে। সেই জন্য টুপির মান হইতে পারে নাই।

ধনবান্ মুসলমানগণ মদিরা ও কামিনীরাজ্যে বাস করে। গ্রাম্য মুসলমান সকলেই পূর্ব্বে হিন্দু (অবশ্য হীন) ছিল। এখনও তাহারা অনেকটা হিন্দুবৎ চলে। কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই নির্ধন। খোজা ও বোরা প্রভৃতি জাতির মধ্যে বহু আঢ্য ব্যক্তি আছেন। মোল্লাকে ১০।১২ বার যিনি আমন্ত্রণ করিয়া গৃহে আনিতে পারিয়াছেন, তিনি অতি ভাগ্যবান্। বহুবার তদীয় সমীপে উপস্থিত হইতে পারাও প্রশংসার বিষয়। মৃত্যুর পূর্ব্বে ঈশ্বরের দূত জেব্রাইলের নামে একখানি অনুরোধ পত্র লওয়া আবশ্যক। এজন্য মোল্লাকে প্রভূত অর্থ দিতে হয়। সমাধির সহিত

উক্ত পত্রখানি প্রোথিত করিতে পারিলে, শেষ বিচারের দিন মৃত ব্যক্তি তাহা দূতকে দিতে পারে। তখন জেব্রাইল আল্লার নিকট ভালরূপ অনুরোধ করিয়া স্বর্গলাভ করাইয়া দেন। বোরা শব্দের অর্থ ফড়িয়া। তাহাদের নাম যথা,—আদমজী, বিনজিদমজী ইত্যাদি। বিন বলিতে জনক বুঝায়। ধনহীন গুজরাতী মুসলমান এক ব্যক্তি প্রথমে বিলাতি দিয়াসলাই বেচিতে আরম্ভ করিল। দিন এক আনা উপার্জ্জন হইল। উহার সমস্ত খরচ না করিয়া কিছু বাঁচাইল। দুই আনায় সে একটি পরিবার চালাইতে পারে। শেষে ছোট খাট দোকান হইল। ক্রমশঃ অর্থ যেন আপনা হইতেই সঞ্চিত হইতে লাগিল। খরচ যতই অধিক হউক না কেন, আয়ের সমস্ত টাকা কখন ব্যয় করিবে না। সে লিখাপড়া জানে না, কিন্তু জ্ঞানবান্ হইয়াছে। সে পরিমিত ব্যয় করে বলিয়া কৃপণ নহে। যদিও অর্থ কি বস্তু তাহা সে বিলক্ষণ বুঝিয়াছে, কিন্তু যখন মনে করে, তখন প্রচুর ব্যয় করিয়া থাকে। গরিবানাটা অতি কষ্টকর বোধ করে না, এবং বড়মানুষীটাও অতি প্রবলভাবে খুঁজে না। সে ব্যক্তি জনপদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান্ ব্যবসায়ী বলিয়া প্রসিদ্ধ, কিন্তু অন্য বিষয়ে নিতান্ত সরলবুদ্ধি। রাজনৈতিক বিষয়ে কিছুমাত্র অনুরাগ রাখে না। যতই অসুবিধা হউক না কেন, যতদূর ত্যাগ স্বীকার করিতে হউক না কেন, শান্তির জন্য সে তাহা করিতে প্রস্তুত। বোম্বাই নগরের বিত্তশালী মুসলমানের প্রকৃতি উক্তবিধ নিরীহ ভাবের নহে। তাহা অনেকটা উগ্র। স্ত্রীলোকের অবরোধ-প্রথা ইহাদের মধ্যে অত্যন্ত প্রচলিত। এখানে আসিলে ঐ প্রথাটিকে মুসলমানী বলিয়া প্রত্যক্ষ জ্ঞান জন্মে। চতুর্দ্দিকে অসংখ্য হিন্দু সম্ভ্রান্ত নারী অনাবৃত বদনে বিচরণ করিতেছেন, আর দীন মুসলমানের ভার্য্যা অবগুণ্ঠনে রহিয়াছেন। হিন্দু রাজ-পরিবারের মধ্যে বাদসাহী সম্ভ্রমের

অনুকরণে আবৃত শকট, বা শিবিকায় রমণীর গতায়াত প্রথা প্রচলিত আছে।

ইউরোপীয় শব্দবিদ্যা অনুসারে পারসী জাতি আমাদের সহোদর। তাঁহারা বলেন, কীলক-রূপা শিল্প লিপি, অবস্তা নামক পারসিক শাস্ত্রের যশু-নামক বিভাগের গাথ সংজ্ঞক প্রাচীন ভাগ ও ঐ শাস্ত্রের অবশিষ্ট ভাগ এই তিনটির এক একটি ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় রচিত। এ তিন পারসীক ভাষার সহিত ভারতবর্ষীয় বৈদিক সংস্কৃতের এরূপ সৌসাদৃশ্য দৃষ্ট হইয়া থাকে যে, এই চারিটি ভাষাকে একটি মূল ভাষা হইতে উৎপন্ন দেশভাষা বিশেষ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারা যায়। অবস্তার কিয়দংশ পহ্লবী ভাষায় অনুবাদিত হয়; ঐ অনুবাদ ভাগের নাম জেন্দ্। পহ্লবী অর্থাৎ জেন্দ বাহ্লীক (বাল্‌থ) অঞ্চলের প্রাচীন ভাষা ছিল। অত্রত্য অগ্নি দেবালয়ে ঐ ভাষা শিক্ষার জন্য দুই একজন পুরোহিত নিয়োজিত আছেন। বর্ণমালা সেমেটিক প্রণালীতে দক্ষিণ দিক্ হইতে লিখিত হয়। যেমন ফারসি সেমেটিক নহে, অথচ আরব্য বর্ণমালা গ্রহণ করিয়াছে। ইহাদের পয়গম্বরের নাম জোরো অস। সেই জন্য পারসীদিগকে জোরোঅসট্রীয়ন বলে। এজাতিতে দুই লক্ষ লোক আছে। তাহাদের অধিকাংশ বোম্বাই সহরে বাস করে। ইঁহাদের মধ্যে উকিল, ডাক্তার, হাকিম অনেক আছেন। যদি কাহারও ভিক্ষাজীবীর অবস্থা ঘটে, তাহার সহায়তার জন্য ধর্ম্মশালা আছে। কেহ কখন কোন পারসীকে ভিক্ষা করিতে দেখিতে পাইবে না। সেই জন্য পারসী অঙ্গনার মধ্যে বেশ্যা নাই। ইরাণী পারসী হইতে গুজরাতী পারসী কিছু বিভিন্ন। এদেশের প্রাকৃতিক ধর্ম্ম ও হিন্দুরমণীর পাণিগ্রহণকেই তাহার কারণ বলিতে হইবে। অধুনা বিশুদ্ধ পারস্য-রক্তের শরীর অতি বিরল। কিন্তু এখন আর ইহারা অন্য জাতির সহিত বিবাহসূত্রে বদ্ধ হয় না। পারসীদের পঞ্চায়েৎ সভা আছে। তাহা দ্বাদশ জন শেটিয়া শ্রেণীস্থ

প্রবীণ পুরুষদ্বারা সংগঠিত। পুরোহিত অর্থাৎ দস্তুর সাহেব সমাজের নানা কার্য্য করেন। যে টাকা দেয়, তাহার জন্য তিনি রাত্রি দিন উপাসনা করেন। ইঁহাদিগকে শব বহন করিতে হয়। বিবাহ সম্বন্ধ করা ও বিবাহ ভঙ্গ করা, এতদুভয়ের ইঁহারাই কর্ত্তা। পারসী নরনারী ঢাকাই মসলিন বা অন্য সূক্ষ্ম বস্ত্র নির্ম্মিত অঙ্গরক্ষা ধারণ করেন, তাহার নাম সদরো। স্ত্রী-পুরুষের কটিদেশে উর্ণা নির্ম্মিত উপবীত থাকে। তাহাকে কুস্তি বলে। যশ্ন পুস্তকের ২২ অধ্যায় আছে, এজন্য কুস্তির ২২টি থেঁই; বৎসর দ্বাদশ মাসাত্মক, একারণ উহাতে ১২টি গ্রন্থি দিতে হয়। মস্তক অনাবৃত রাখা স্ত্রীপুরুষের পক্ষে অতিশয় দোষাবহ। তাহাতে শয়তানের দৃষ্টি হয়। সেইজন্যই বুঝি ইহারা যতদূর হইতে পারে, পাগড়ি উচ্চ করিয়াছে। স্ত্রীলোকে এক খণ্ড শ্বেত বস্ত্র মস্তকে জড়াইয়া রাখে। ইদানীং রমণী সমাজ কুন্তলদাম সম্পূর্ণ আচ্ছাদিত রাখা অন্যায় বিবেচনা করিতেছেন, তাহাতে বন্দ ক্রমশঃ পশ্চাৎ ভাগে সরিয়া যাইতেছে। কালক্রমে হয়ত একবারে শাড়ীর মধ্যে লুকায়িত হইবে। বাটীতে অবস্থান কালে ইঁহারা ইজার পরিধান করিয়া থাকেন; বাহির হইবার সময় তাহার উপর রেশমি চীনের শাড়ী চড়াইয়া দেন। পারসী অঙ্গনার মুখ খানি যেন সরলতার ছবি। (গুজরাতী হিন্দু ললনার মুখ বিলাসপূর্ণ। মহারাষ্ট্র-সুন্দরী জ্যোতির্ম্ময়ী, দেবী প্রতিমার মত আমার সম্মুখে এক একবার প্রতিভাত হয়। তাহার মুখ গাম্ভীর্য্যপূর্ণ।) ধর্ম্মনিরত পারসী প্রাতরুত্থান করিয়া ত্রিদণ্ডী কুস্তি উন্মোচন করতঃ দিবাকর যে দিকে উদিত হইতেছেন, সেই দিকে চাহিয়া তিনবার ঝাপটা দিয়া জেন্দ্ ভাষায় বলেন, "শয়তানকে পরাজয় কর"। তাহা হইলে শয়তান সে দিন তাঁহার আর কোনও অনিষ্ট করিতে পারে না। স্নানের পর প্রকৃত উপাসনা আরম্ভ হয়। প্রার্থনাপুস্তক জেন্দ্ ভাষায় গুজরাতি অক্ষরে লিখিত। উহা অগ্নির নিকট আবৃত্তি করা আবশ্যক।

রন্ধনশালা, বৈঠকখানা বা আলো যে রকম হউক, অগ্নি থাকিলে এ সকল স্থানেও আবৃত্তি চলে। অন্য সময় সূর্য্য, চন্দ্র, নক্ষত্র, বাপী, তড়াগ, সমুদ্র, নদী, তরু, গুল্ম বা পর্ব্বত সন্নিধানে আরাধনা হইতে পারে। দিবসের বিভাগ অনুসারে পাঁচবার নমাজ করা আবশ্যক। তাঁহারা বহুক্ষণ আবৃত্তি করেন, কিন্তু কি বলিতেছেন, তাহার একটি বাক্যও বুঝিতে পারেন না বলিয়া, নিজ কামনা গুজরাতি ভাষায় বলিয়া উপসংহার করা হয়।

দেওয়ালী পর্ব্ব উপস্থিত। এ নগরে বৎসরের মধ্যে এইটি প্রধান উৎসব। গৃহসংস্কার ও নূতন খাতা, এই দুইটি প্রধান ব্যাপার। আলোক মালার কথা বলা আবশ্যক, কারণ তাহা এখনকার প্রাণ। বোম্বাই চারি-রাত্রি দীপ-নগরী বলিয়া অভিহিত হইতে পারে। অমাবস্যার দিন 'ক্রথ-মারকেট্', মাড়ওয়ারি বাজার ও পারসীবাজারে উপস্থিত হইলে, বোধ হইল যেন আলোকের নদীতে নিমগ্ন হইয়াছি। ইহা কাশীধামের দেওয়ালী নহে; সর্ব্বত্র কাচপাত্রে দীপ সন্নিবেশিত। পূর্ব্বে এই দিনে ঠগ সম্প্রদায় ভবানীর নিকট নরবলি দিত। প্রাকৃত আচারে সমুদ্র জলে প্রদীপ ভাসান হয়। ঐ দীপ জ্বলা বা নির্ব্বাণ হওয়া দেখিয়া শুভাশুভ নির্ণয় হয়। পরদিন বর্ষ আরম্ভ হইবে, কিন্তু চতুর্দ্দশীর রাত্রিতে নূতন বহির অর্চ্চনা হইল। আরও আশ্চর্য্য এই যে, বর্ষগণনায় যে সম্বৎ ব্যবহৃত হয়, তাহা চৈত্র শুক্ল-প্রতিপদে আরম্ভ। আর্য্যজাতির পুরাকালে অগ্রহায়ণ মাসে নববর্ষের আরম্ভ হইত, সেই জন্য মাসের নাম অগ্রহায়ণ। নতুবা কেবল মার্গশীর্ষ বলিলে চলিত। পূর্ণিমার দিন, মাস শেষ হয় বলিয়া তিথির নাম পৌর্ণমাসী। এদেশে অমাবস্যায় মাস পূর্ণ হয়। বর্ষ আরম্ভের উক্ত সময় অনুসারে বোধ করি দেওয়ালীর দিনে ব্যবসায়ীদের অব্দ আরম্ভ করিবার প্রথা আছে। কিন্তু অঙ্ক ব্যবহারের জন্য বিক্রমা-দিত্যের সম্বৎ লইতে হয়। দেওয়ালীর জন্য আত্মীয়ের বাটীতে নানা

মিষ্টান্ন উপহার যাইতেছে। নরনারী বেশভূষা করিয়া কুটুম্বের সহিত সাক্ষাৎ করিতে চলিয়াছেন। এই উৎসবটা এমন ব্যাপক যে, ঘরের মধ্যে ও বাহিরে সমান স্রোত বহিয়া থাকে। এই আহ্লাদ-সমুদ্রের সমুদয় দীপ নির্ব্বাণ না হইতে দিয়া উষাকালে পুনরাগমন উদ্দেশে বোড়ি বন্দর ষ্টেশনে যাত্রা করিলাম। ভারতের মধ্যে এত বড় ও বহুব্যয়সাধ্য রেলওয়ে ষ্টেশন আর দ্বিতীয় নাই।

মহারাষ্ট্র। *

মনুষ্যদেহে যেমন অস্থি, পৃথিবীর স্থলভাগে সেইরূপ পর্ব্বত। এই জন্য পর্ব্বতের নাম ভূধর। ঘাটাখ্য পর্ব্বত অওরঙ্গাবাদ হইতে কন্যাকুমারী পর্য্যন্ত বিশাল প্রাচীরবৎ দণ্ডায়মান রহিয়াছে। বোধ হয়, সমুদ্রকে ভারত প্লাবিত করিতে নিষেধ করিতেছে। এই পর্ব্বতের উত্তর ভাগকে সহ্যাদ্রি কহে। বদলাপুর অতিক্রান্ত হইলে পর্ব্বতের শোভা নয়নগোচর হইতে লাগিল। ভোরঘাট উত্তানপথে উঠিবার জন্য করজট নামক স্থানে যাইয়া বৃহৎ এঞ্জিন লওয়া হইল এবং নামিবার কালে শকট শ্রেণী যদি গড়াইয়া পড়ে, সেই জন্য পশ্চাৎ হইতে আকর্ষণার্থ কয়েকখানি ব্রেক-শকট যোজিত হইল। এখান হইতে লনৌলি পর্য্যন্ত ১৬ মাইল অদ্রিবক্ষে লৌহবর্ত্ম উন্নত এবং আনত ভাবে চলিয়াছে। ঘাট-পর্ব্বতের পশ্চিম হইতে পূর্ব্ব ধারে যাওয়া আবশ্যক। অবশ্য প্রাকৃতিক ছেদ আছে, তাহার নাম ভোরঘাট। সেই সরণি অবলম্বন করিয়া সানুনির্ম্মাণ করতঃ গিরি কটক ভেদ করিয়া পথ গিয়াছে। চড়াই দুই সহস্র ফিট। এক পর্ব্বত হইতে অন্য পর্ব্বতে যাইবার জন্য বহু সেতু আছে। মোহকামলি সেতু ১৬৩ ফিট উচ্চ। সহ্যাদ্রির শোভা অবশ্য মোহজনক। তরুগুল্ম ও নির্ঝর, এ সকলের অপ্রতুল নাই; কিন্তু আমরা পর্ব্বত বলিলে; হিমবৎ স্মরণ করি। বড় বড় পাইন জাতীয় বৃক্ষ দেখিতে ইচ্ছা হয়। চক্ষু নীহার মণ্ডিত শৃঙ্গ দেখিতে চায়। ভৈরব ভাব যদি না দেখিতে পাইলাম, তবে আর অদ্রির সৌন্দর্য্য কি? অনেক শৈল দেখিলাম, হিমালয়ের ছবি অন্যত্র মিলিল না। ঘাট পর্ব্বত, আর

---

* (১) শিবজী চরিত (গার্হস্থ্য বাঙ্গালা পুস্তক সংগ্রহ)। (২) History of the Mahrattas—J. Grant Duff প্রণীত।

এক বিষয়ে বিশেষ আগ্রহের কারণ হইতেছে। এমন পর্ব্বতগাত্রে পথ (রেইল) কোথাও দেখি নাই। ভারতের মধ্যে ইহা একটি প্রধান দর্শনীয় স্থান। বাষ্পীয় যান এখানে ব্যোমযান স্বরূপ হইয়াছে। আকাশে গাড়ী ছুটিতেছে, মর্ত্ত্যলোকে গ্রাম, শস্যক্ষেত্র ও অবিরল বৃক্ষশ্রেণীর মধ্যবর্ত্তী রাজপথ কঙ্কণ প্রদেশ শোভা করিয়া বিরাজ করিতেছে। যে স্থলে প্রভূত প্রস্তর কর্ত্তন করিতে হইবে, সেখানে স্বড়ঙ্গ নির্ম্মাণ করিয়া পথ হইয়াছে। দ্বিদশতি (বিংশতি) সংখ্যক বা ততোধিক টনেল। অন্ধকারে যখন ঐ পথে যাইতে হয়, আরোহিগণ "বিঠ্ঠল হরি" বলিয়া চিৎকার করিতে থাকে। 'রিভরসিং' ষ্টেশনে যাইয়া দেখা গেল, আর সম্মুখে পথ নাই। যে পথ আসিয়াছি, তাহারই উপরিস্থ স্তর দিয়া চলিতে হইল। বহু উচ্চে খণ্ডালার বাঙলা দেখা যাইতেছে। ক্রমশঃ তথায় পৌছিলাম। এই স্থান মৃগয়াপ্রিয় মানবের বাঞ্ছনীয়। ব্যাঘ্র ও হরিণ প্রভৃতির অভাব নাই। এ বনে বারশিঙ্গা পাওয়া যায়। বেলা দুইটার সময় পুণ্যপত্তনের গণেশ খিন্দ্ প্রাসাদ দৃষ্টিগোচর হইল। মহারাষ্ট্র রাজধানী পুনানগরে অবতরণ করিয়া এক ব্রুহাম্ ভাড়া করিয়া "রাজমান্য রাজেশ্বরী" অর্থাৎ শ্রীল শ্রীযুক্ত সাঠে মহাশয়ের বাটীতে যাত্রা করিলাম। পথি মধ্যে কয়েকখানি মাড়ওয়ারির মুদিখানার দোকান দৃষ্ট হইল। ইহারা দেখিতেছি সর্ব্বত্র আছে। সকলেই ইহাদিগকে ঘৃণার চক্ষে দেখে, কিন্তু ইহারা নহিলেও চলে না।

সর্ব্বপ্রথমে পর্ব্বতী (পার্ব্বতী) দর্শন করিতে যাওয়া হইল। পর্ব্বতের উপর এই পার্ব্বতীর মন্দির সাতারা রাজের স্মরণার্থ বালাজী বাজীরাও কর্ত্তৃক পাণিপথের যুদ্ধের পূর্ব্বে নির্ম্মিত। পাণিপথের যুদ্ধস্থলে মহারাষ্ট্র গৌরব চিরদিনের জন্য বিসর্জ্জন দিয়া বালাজী ভগ্নমনে প্রত্যাগমন করিয়া রোগ-শয্যায় শয়ন করিলেন এবং এই শৈলে প্রাণত্যাগ করিলেন।

হরিগোবিন্দ আমাদিগকে দেবালয় প্রভৃতি দেখাইয়া একটি বাতায়নের নিকট লইয়া গেলেন ও ইংরাজী ভাষায় কহিতে লাগিলেন,—এই স্থান হইতে পেশোয়া বংশের শেষ ভূপতি, ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে দুই সহস্র আটশত সৈন্য কর্তৃক তাঁহার অষ্টাদশ সহস্র যোদ্ধাকে খিরকি নামক স্থানে পরাজিত হইতে দেখিয়াছিলেন। ইংরাজ যে বৎসর বাজীরাওয়ের রাজ্য গ্রহণ করিলেন, সেই বৎসরেই বজ্রাঘাতে এই বাটী ভগ্ন হইয়া যায়। মন্দিরজীবী অনাথ-গণের সাহায্যের নাম করিয়া প্রদর্শক ঠাকুর আমাদের নিকট কিঞ্চিৎ সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। এখান হইতে অবতরণ করিয়া মূলামুতা তটিনীর উপরে বন্দ্ উদ্যান-ভূমিতে বিচরণ করিবার সঙ্কল্প হইল। পুনার নরনারীগণ সন্ধ্যাকালে এই স্থানে ভ্রমণার্থ উপস্থিত হন। তখন এখানে ইংরাজী বাদ্যো-দ্যম হয়। উদ্যানের নূতনত্ব এই যে, টবে বসান গাছ দ্বারা উপবন রচিত হইয়াছে। একটি প্রস্রবণ হইতে ছত্রের আকারে বারিধারা উত্থিত হইতেছে। বন্দ্ জল-প্রপাত অতি সুন্দর দৃশ্য। দেখিয়া কিছুক্ষণের জন্য বিমুগ্ধ হইলাম। প্রভূত জলরাশি মহাবেগে সশব্দে পতিত হইয়া ফেনিল ভাবে যেন দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া ধাবমান হইয়াছে। বাঁধ ছাপাইয়া ধারাগুলি স্ফটিক রেখার মত নিপতিত হইতেছে। জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে প্রপাতের সৌন্দর্য্য আর-একরূপ দেখিলাম। আলোক ক্ষীণ বলিয়া বাঁধ বা জল দেখা যাইতেছে না। কেবল জলের যে ভাগ ক্ষুব্ধ হইয়া শ্বেত হইয়াছে, তাহাই চন্দ্রিকা মাখিয়া নয়ন-পথগামী হইতেছে। দৃশ্য অতি অপূর্ব্ব।

চতুঃশিঙ্গি দেবীর মন্দির "ডোঙ্গরের" (পাহাড়) উপর। সোপানা-বলীর উভয় পার্শ্বে সানুদেশে ইতস্ততঃ কুনবী মরঠগণ আহারান্তে কাদম্বরী সেবা ও তাস ক্রীড়া করিতেছে। সে দিন দেবীর পর্ব্বাহ। দেবালয়ের অভ্যন্তরে যাইয়া মদিরার গন্ধ পাইতে লাগিলাম। এটি বীরমার্গানুবর্ত্তী-দের স্থান। দেবীর গলদেশে তাম্বূলবল্লীর মালা। ভাত, লুচি ও মদ্য দিয়া

নৈবেদ্য হইয়া থাকে। একটি স্ত্রীলোকের উপর দেবীর আবির্ভাব হইয়াছে, সে নানা প্রশ্নের উত্তরে দুই একটি শব্দ উচ্চারণ করিতেছে। পূজা করিয়া পূজারী রমণীর নিকট এক খণ্ড নারিকেল প্রসাদ পাইলাম। পর্ব্বতের নিম্নে একটি চত্বর আছে, উহাতে বলিদান হয়। নানা ফড়নবিশ-কৃত দেবায়তনের নাম বেলবাগ। প্রাতঃকালে মৃদঙ্গ ও বীণা সহযোগে নারায়ণ সমক্ষে স্তুতি গীত হয়। একাদশীর দিন অপরাহ্নে বিপুল জনতা দৃষ্ট হয়। চন্দ্রাতপতলে অসংখ্য নরনারী উপবেশন করিয়া কথকতা শ্রবণ করিতেছেন। কথক দণ্ডায়মান হইয়া মহাভারত কীর্ত্তন করিতেছেন। তাঁহার সঙ্গীতের সাহায্য করিবার জন্য কয়েকজন করতাল ও মৃদঙ্গ লইয়া পশ্চাদ্ভাগে রহিয়াছে। কথক যদি ব্রাহ্মণ হন, তাহা হইলে কীর্ত্তনান্তে ব্যক্তি বিবেচনায় আলিঙ্গন ও প্রণাম গ্রহণ করেন। শ্রোতৃবর্গ দেবতার কিছু প্রসাদ লইয়া বিদায় হন। কীর্ত্তন সরস করিবার জন্য কথক মহাশয় মধ্যে মধ্যে তুকারামের অভঙ্গ নামক কবিতা ব্যবহার করেন। (তুকারামের ইষ্টদেবতা বিঠোবা পানঢরপুরে অবস্থিত। সম্প্রতি তত্রত্য মহোৎসব উপস্থিত। বিসূচিকা রোগ প্রাদুর্ভূত হওয়ায়, শান্তিরক্ষক কর্ত্তৃক তথায় গমন নিষিদ্ধ হইয়াছে।) তুলসীবাগ পুনার মধ্যে প্রধান দেবালয়। একজন "সাউকার" কয়েক বর্ষ হইল, ইহা প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। মন্দিরের আকার —রাজসিংহাসনের ন্যায় কতকগুলি তোরণ (খিলান) উপর্য্যুপরি গ্রথিত হইয়াছে। মন্দির উচ্চ হওয়ায় সেইরূপ আকারের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অবয়ব স্তরে স্তরে নির্ম্মিত হইয়া শিখর দেশ ক্রমশঃ সূক্ষ্ম হইয়াছে। মঙ্গল-চিহ্ন স্বরূপ প্রত্যহ মন্দিরের সমুদয় প্রকোষ্ঠে আলিপনা দেওয়া হয়। ইহা সুখসাধ্য করিবার জন্য ছিদ্রযুক্ত "রোলর্"-মধ্যে চূর্ণ রক্ষিত হইয়া থাকে, তাহাতে আপনা হইতে চিত্র অঙ্কিত হইয়া যায়। গর্ভগৃহে রাম লক্ষ্মণ ও জানকী বিরাজ করিতেছেন। অবশ্য তাঁহারা মহারাষ্ট্রীয় পরিচ্ছদে ভূষিত

মহারাষ্ট্রীয় মহিলা

(ভারত প্রদক্ষিণ)

হইয়াছেন। প্রাঙ্গণের প্রাচীরে রামায়ণ-প্রতিপাদক চিত্র অঙ্কিত আছে এবং ইহার নিম্নে লীলার নাম লিখিত হইয়াছে। যে দেবালয়ে সমারোহ আছে, আগন্তুক ব্যক্তি সে স্থানে কিয়ৎকাল অবস্থান করিলে, নগর দেখার অর্দ্ধেক ফল লাভ করিতে পারেন। এই স্থান ও বাঁধ সন্নিহিত উদ্যান এখানকার মধ্যে ভ্রমণের বিলাস-ভূমি।

বোম্বায়ের অনেক প্রধান ব্যক্তি এখানে বাস করেন। প্রাবৃট্‌কালে পুনায় গবর্ণরের নিবাস হয়। বোম্বাই অপেক্ষা এখানকার জলবায়ু উত্তম। বোম্বাই প্রদেশের ইংলণ্ডীয় সৈন্য এখানে অবস্থিতি করেন। সহরে বিজাতীয় হর্ম্ম্যনির্ম্মাণপ্রণালী প্রবেশ করে নাই। অবশ্য একথা ইংরাজপল্লী সম্বন্ধে প্রযোজ্য নহে। জোশী হল বা সার্ব্বজনিক সভাগৃহ ও স্বাস্থ্যরক্ষকের কার্য্যালয়টি বোম্বাই-প্রণালীর কাচের শার্শী মণ্ডিত। অধিবাসিগণের পরিচ্ছদেরও সেইরূপ কোন পরিবর্ত্তন নাই। তবে উহাদের মধ্যে কেহ কেহ কোট পেণ্টুলেন পরিধান করিয়া থাকেন। আমাদের দেশে পরিচ্ছদ দেখিলে, যে ইংরাজী-নবিশ নহে, তাহাকে চেনা যায়। এখানে 'সুধারণে আলা'কে ও (সংস্কারক) মস্তক মুণ্ডিত করিয়া দীর্ঘ শিখা রাখিতে হয়। পায়ে দেশীয় উপানৎ পরিতে হয়। পরিধেয় বস্ত্র কখন রজকালয় দর্শন করে নাই। সকলেই এইরূপ পুরস্ত্রী ধৌত প্রশস্ত বক্রকুল বস্ত্র ও উত্তরীয় ব্যবহার করেন। দীর্ঘ অঙ্গরক্ষাটি কিন্তু পরের বাড়ী দিতে হয়। মস্তকে রথচক্রের মত শিরোবেষ্টন। স্ত্রীলোকে কাছা কোঁচা দিয়া গাত্র আবৃত করিয়া যে দেশী রঙ্গিন সাড়ী পরিধান করে, কখন তাহার অন্যথা হইবার নহে। আমরা পারসী মহিলার সাড়ী দেখিয়া মোহিত হইয়া, আপনার গৃহিণীর জন্য ক্রয় করিতে পারি, কিন্তু মরাঠি অঙ্গনা কদাপি তাহা ব্যবহার করিবেন না। শ্লথ পাদুকা ব্যবহার করা স্ত্রীলোকের পক্ষে দূষ্য নহে। বাঙ্গলার ন্যায় ছত্রদণ্ডের বহুল

ব্যবহার আর কোথাও নাই। সুদরিদ্র কৃষকগণ সজ্জা করিয়া কোন স্থানে যাইতে হইলে ছাতাটি লইবে। কিন্তু এ বিষয়ে কলিকাতা বাসীদের এক কৌতুকাবহ ব্যবহার আছে। তাঁহারা রৌদ্র বা বৃষ্টিতে পারগ পক্ষে আতপত্র লইয়া যাইবেন না, যদি বা লইলেন, বৃষ্টি রৌদ্র না থাকিলেও উহা মাথায় দিয়া যাইতে হইবে। কলের জল লইবার জন্য ব্রাহ্মণ ও শূদ্রের পৃথক পৃথক কুণ্ড নির্দ্দিষ্ট আছে। লিখিত আছে, "ব্রাহ্মণাচা হৌজ" "শূদ্রাচা হৌজ"। যখন এপথে প্রবেশ করিয়াছি, বস্ত্র-প্রক্ষেপের শব্দ কর্ণে প্রবেশ করিয়াছে। বোধ হইতেছে, ব্রাহ্মণ জাতি এখানকার আদিম অধিবাসী নহেন; নতুবা যে মরঠ জাতির বাস বলিয়া দেশের নাম মহারাষ্ট্র বা মরঠ্ঠা হইয়াছে, সে মরঠ শব্দে কেবল শূদ্র বুঝাইবে কেন? একদা শ্মশান দেখিতে যাওয়া হইল—এখানে গোময়গণ্ড (ঘুঁটে) দ্বারা চিতা প্রস্তুত হয়। ডাল ও রুটী দ্বারা পৃথক পিণ্ড প্রদত্ত হইয়া থাকে।

গভর্ণরের কাউন্সিল হল অতি বৃহৎ গৃহ। এখানে অনেকগুলি তৈল-চিত্র আলম্বিত আছে। ইহাতে দেশের খ্যাতিমান্ ব্যক্তিদিগকে দর্শন করিবার কার্য্য নির্ব্বাহ হইল। যাঁহাদের চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, তাঁহাদের নাম, যথা—খান বাহাদুর পদমজী পেসতনজী, খান বাহাদুর নৌশির ওয়ানজী, পেসতন্‌জী, সোরাবজী, ফ্রামজী পটেল, ত্রিবাঙ্কুরের যুবরাজ, সর মঙ্গল দাস নাথুভাই, ডাক্তার ভাউদাজি, কোচি-নের রাজা, সর সালার জঙ্গ, ভাউনগরের ঠাকুর, মোরভীর ঠাকুর, খণ্ডে-রাও গায়কোয়াড় এবং সর ত্র্যম্বক মাধবরাও ও শঙ্কর শেঠ। এই বিপুল সমৃদ্ধিসম্পন্ন প্রাসাদ অবলোকন করিয়া যদি পেশওয়ার ভবন দর্শন করিতে যাওয়া হয়, তাহা হইলে জগতের চমৎকার-জনক বৈচিত্র্য অনুভূত হইবে। শনিবার-পেট আমাদের বাটীর অতি নিকটে অবস্থিত; এখানে একটি

প্রাকার-বেষ্টিত বাটীতে মহারাজ পেশওয়া বাস করিতেন। প্রহরীর অনুমতি লইয়া সিংহদ্বার অতিক্রম করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখা গেল, কাল সমস্তই গ্রাস করিয়াছে। দুর্ভেদ্য প্রস্তর নির্ম্মিত প্রাচীরের মধ্যে কেবল পতিতভূমি অবশিষ্ট রহিয়াছে। আর সকল আগুন লাগিয়া পুড়িয়া গিয়াছে। এই স্থানে ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে অক্টোবর প্রাতঃকালে তরুণ পেশওয়া মধুরাও অট্টালিকার উপর হইতে পতিত হইয়া আত্মহত্যা করিয়াছিলেন। প্রধান মন্ত্রী নানা ফড়নবিশ রাজকীয় সমুদয় ক্ষমতা ধারণ করিতেন। তিনি পেশওয়ার ভ্রাতাকে বন্দী করায় মধুরাও অত্যন্ত ব্যথিত হন এবং আপনাকে কর্ম্মচারীর অধীন দেখিয়া মর্ম্মাহত হইয়া সভায় আসা ত্যাগ করেন। সেই সময় হইতে তিনি শয়ন গৃহের বাহির হইতেন না। বিজয়াদশমীর দিন বাহির না হইলে নয় বলিয়া সৈন্যগণের সমক্ষে দেখা দিলেন এবং রাত্রিকালে দরবারে সর্দার ও দূতগণের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। কিন্তু তাঁহার মন কিছুতেই শান্তিলাভ করিতে পারিল না। এই ঘটনার দুই দিন পরে তিনি ইহলোক ত্যাগ করিবার জন্য ছাদের উপর হইতে পতিত হন। ফুহারার উপর পতিত হওয়ায় দেহ অতিশয় ক্ষত হইল ও দুই খানি অস্থি ভগ্ন হইয়া গেল। তারপর দুই দিন গত হইলে প্রাণ বহির্গত হইল। তাঁহার অতি প্রিয় বাবারাও ফড়কের ক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া মরিবার সময় বলিয়াছিলেন, নানার শত্রু বাজীরাও মস্‌নদের উত্তরাধিকারী হইবেন। আর এই 'জুনাবাড়া'তেই ১৭৭৩ খ্রীঃ অঃ ৩০শে আগষ্ট ঊনবিংশ বর্ষ বয়সে, নয় মাস মাত্র রাজ্য ভোগ করিয়া নারায়ণ রাও তাঁহার রক্ষক সোমর সিংহ ও এলিয়া কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছিলেন। নারায়ণ স্বীয় পিতৃব্য রঘুনাথ রাওকে এই বাটীর এক দেশে বন্দী দশায় রাখিয়াছিলেন। তাহাতে তিনি আপন মুক্তি কামনায় ঐ ঘাতক-

দ্বয় দ্বারা পেশওয়াকে ধৃত করিবার জন্য আজ্ঞা লিপি দেন। রঘুনাথের পত্নী আনন্দী বাই গোপনে সেই লিপির 'ধৃত' শব্দটি 'হত' শব্দে পরিবর্ত্তিত করিলেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে নারায়ণ পিতৃব্যকে জড়াইয়া ধরিয়াছিলেন। তিনি নিষেধ করিলেও সোমর সিংহ অনুমতি-পত্রের নির্দ্দেশ অনুসারে নারায়ণের দেহে অস্ত্রাঘাত করিল। এই সকল চিন্তা ত্যাগ করিয়া বাহিরে আগমন করিলাম। এই বাটীর চতুর্দ্দিকে বাজার, সেই জন্য এই স্থানের অপর নাম মণ্ডি। সম্মুখে তরকারী ও বিবিধ ফল এবং লঙ্কামরিচ ও পলাণ্ডু,—সকল বস্তুই অপরিমিত ভাবে বিক্রীত হইতেছে। এক পার্শ্বে কুম্ভকারের দ্রব্যজাত, অন্য পার্শ্বে ইন্ধন বিক্রয়ের স্থান। বাড়ীর পশ্চাদ্ভাগে শুষ্ক মৎস্য বিক্রীত হয়। লিমজীর হোটেল এই দিকে। অধিক রাত্রিতে এখানে আসিলে বিলক্ষণ কৌতুক দেখিতে পাওয়া যায়। লিমজী পরিহাস করিয়া বলেন, আমার হোটেল কেবল ব্রাহ্মণ জাতির জন্য স্থাপিত। আমি অন্যকে মদ্য মাংস বিক্রয় করি না; ফলতঃ ইংরাজি-শিক্ষিত নিরামিষ-ভোজী পুনার ব্রাহ্মণগণ এক্ষণে গোপনে মদ্য মাংস ব্যবহার করা অন্যায় বিবেচনা করেন না।

পুনা নগরে তিনখানি নাট্যশালা আছে। বাজারে টিকিট বিক্রীত হয়। আমরা একজন মহারাষ্ট্রীয় সহচরের সহিত কর্ণপর্ব্বের অভিনয় দর্শন করিতে গেলাম। নিয়মিত সময়ে নাট্য আরম্ভ না হওয়ায় কিয়ৎকাল বহির্দ্দেশে থাকা হইল। পার্শ্ববর্ত্তী ভবন হইতে ঘরট্ট-সঞ্চালিনীর কোকিল-কণ্ঠ-গীতি-নিঃস্বন আগমন করিয়া কর্ণ পরিতৃপ্ত করিতে লাগিল। রঙ্গভূমির মুখপটের চিত্রের দৃশ্য অতি ভয়ানক দশভুজা অসুর সংহার করিতেছেন। প্রথমতঃ শঙ্খ ঘণ্টা বাজাইয়া গণপতির পূজা হইল। তাহার পর সরস্বতী বন্দনা করায়, তিনি স্বয়ং কটিদেশে বাহনের অবয়ব সংলগ্ন করিয়া আগমন করতঃ মহানৃত্য

করিতে লাগিলেন। একজন ইংরাজ সাজিয়া আসিয়া ব্রাহ্মীর সহিত পরিহাস করিতে লাগিল। সরস্বতী পুনঃ পুনঃ কহিতে লাগিলেন, আমরা দেবতা; আমার সহিত এরূপ ব্যবহার করিও না। এইরূপ ভাবে প্রস্তাবনার আরম্ভ ও শেষ হইয়া কাব্য আরম্ভ হইল। পাত্রের গেয় গানগুলি পটের বাহিরে মহারাষ্ট্রীয় কীর্ত্তনের প্রণালীতে মুরজ ও মন্দিরা সহযোগে অপর ব্যক্তি কর্ত্তৃক গীত হইতে লাগিল। অভিনেতাদের অঙ্গবিক্ষেপ এমন প্রবল যে, তৎপ্রভাবে আলোকের একটি কাচনালি পতিত হইল। এ দলে দুই একটি স্ত্রী অভিনেত্রী আছেন। এতদ্দেশে অবরোধ প্রথা না থাকায় কুলবতীর দ্বারা অভিনয় হওয়ার প্রতিবন্ধক নাই। তথাপি সে বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে দেখা যাইতেছে না। বাঙ্গলায় যাঁহারা বারস্ত্রী কর্ত্তৃক অভিনয়ের বিরোধী, তাঁহারা এই বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিবেন। বিশেষতঃ কলিকাতার মত স্থান, যে স্থানের রুচিতে বেশ্যাবৃত্তি-নিরতা ঠিকে চাকরাণী পুরস্ত্রীগণের সহিত থাকিতে পায়, সেখানে নটী কুলটা হইলে নীতি-বিরুদ্ধ হয় না। স্ত্রী চরিত্র পুরুষে অভিনয় করিলে, দৃশ্য অস্বাভাবিক হয় বলিয়া অভিনয়ে স্ত্রীলোক গ্রহণ করা হইয়াছিল। পরন্তু অধুনা কলিকাতার রঙ্গভূমিতে স্ত্রীলোকে পুরুষ সাজে; এ কুদর্শনও অসহ্য। রাত্রি শেষ পর্য্যন্ত আমরা থাকিতে অক্ষম; এজন্য আমাদিগকে কুঞ্চিকা আনাইয়া দ্বারের তালকোদ্‌ঘাটন করতঃ বিদায় লইতে হইল।

এদেশের প্রাকৃত লোক মল্লযুদ্ধকে অতিমাত্র প্রিয় জ্ঞান করে। তাহারা নাটকের অভিনয় দেখিতে যায় না। পরন্তু কুস্তি অবশ্যই দেখিবে। রঙ্গস্থলে প্রবেশের মূল্য এক আনা বা দুই আনা। প্রবর্ত্তক জয়ীকে কিঞ্চিৎ অর্থ পুরস্কার দিয়া থাকেন।

রঙ্গভূমির দ্বারে নিবিড় জনতার মধ্য দিয়া প্রবিষ্ট হইয়া, অসংখ্য

দর্শকের মধ্যে দণ্ডায়মান থাকিয়া, বহুক্ষণ প্রতীক্ষা করিতে হয়। এক-জন পঞ্জাবীর শিষ্যের সহিত এক মরঠ্‌ঠার শিষ্য ক্রীড়া করিল। শেষোক্ত ব্যক্তি জয়লাভ করিবামাত্র তাহার ওস্তাদ সাগ্‌রিদকে লুফিয়া লইলেন ও গুম্ফে চাড়া দিতে লাগিলেন। তৎপরে আত্মীয় লোকের সহিত অভিবাদন ও করমর্দ্দন হইতে লাগিল। কেহ জয়ীকে ব্যজন করিতেছে, কেহ বা তাহার অঙ্গের ধূলা মুছাইতেছে, তাহার আজ আহ্লাদের সীমা নাই। যে পরাভূত হইয়াছে, সে কোথায় লুকাইল, দেখিতে পাওয়া গেল না। যখন উভয়ে মল্লভূমিতে অবতরণ করিয়া পরস্পরের করস্পর্শ করিয়াছিল, তখন তাহাদের হৃদয়ে বৈরভাব ছিল না। এক্ষণে অবস্থার ব্যতিক্রমে একে অন্যের পৃষ্ঠে পতিত হইয়া মুখে ধূলি প্রক্ষেপ্ন করিতেছে ও মণিবন্ধ দ্বারা প্রহার করিতেছে। দেখিলে জ্ঞান হয়, অনিচ্ছা সত্ত্বেও ঘটনাচক্র মনুষ্যকে বিপথে লইয়া যায়। জেতার বন্ধুগণ তাহাকে সুপরিচ্ছদ ও জরির পাগড়ী পরিধান করাইয়া বাদ্যোদ্যম সহকারে পুরমধ্যে লইয়া চলিল। এ ক্ষেত্রে কোনও উচ্চ বর্ণের লোক দেখিলাম না। এই মহাপুরুষেরাই বাঙ্গালায় যাইয়া বর্গির হেঙ্গাম করিতেন। ইহাদিগকে দলবদ্ধ দেখিলে রঘুজী ভোঁসলে ও ভাস্কর পণ্ডিতকে (১৭৪৩—৫১ খৃষ্টাব্দ) স্মরণ হয়। এই কুস্তি দেখার দিন প্রাতঃকালে আমরা অত্রত্য প্রার্থনা সমাজে গিয়া-ছিলাম। অনারেবল রাওসাহেব মহাদেব গোবিন্দ রানড়ে আচার্য্যের কার্য্য নির্ব্বাহ করিলেন। আমার পরিচিত একটি বাঙ্গলা ব্রহ্মসঙ্গীত মরাঠীতে গীত হইল। ব্রাহ্মধর্ম্ম বাঙ্গলার বস্তু বলিয়া আমি প্রার্থনা সমাজে বসিয়া আত্মগৌরব অনুভব করিলাম।

দাদোবা পাণ্ডুরঙ্গ জাতিভেদ প্রভৃতি নিবারণের উদ্দেশ্যে প্রথমে ১২ জন ছাত্রকে লইয়া পরমহংস সভা স্থাপন করেন। সভায় ঈশ্বরের

নিকট প্রার্থনার পর সামাজিক বিষয়ে তর্ক বিতর্ক হইত। পাঁউরুটি ভক্ষণ ও মুসলমানের হস্তে জল গ্রহণ করিতে হইত। ঐ সভার ভগ্নাবশেষ হইতে বোম্বাইয়ে 'প্রার্থনাসমাজ' স্থাপিত হইয়াছে। এক্ষণে সভ্যেরা বিবেচনা করেন, সামাজিক নিয়মে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে হস্তক্ষেপ করা উচিত নহে। ধর্ম্মোন্নতি সাধন হইলে, সমাজসংস্কার আপনি হইতে পারে। তাঁহারা বলেন, ধর্ম্মোৎকর্ষ, বিদ্যা বিস্তার, স্ত্রী শিক্ষা ও গার্হস্থ্য প্রণালীর সংশোধন হইলে, জাতিভেদ, বাল্যবিবাহ, চিরবৈধব্য প্রভৃতি আপনি উঠিয়া যাইবে। ইদানীং যাঁহারা ইংলণ্ড হইতে প্রত্যাগমন করিয়া থাকেন, তাঁহারা নাসিক যাইয়া প্রায়শ্চিত্ত করতঃ হিন্দুসমাজে গৃহীত হন। দুই একটি ব্রাহ্মণ বিধবা বিবাহ করিয়াছে, কিন্তু সমাজে তাহারা স্থগিত আছে। মহাদেব গোবিন্দ রানড়ের স্ত্রীবিয়োগ হইলে অনেকে আশা করিয়াছিলেন, ইনি কুমারী বিবাহ করিবেন না; কিন্তু তিনি সমাজ ভয়ে বিধবা বিবাহ করিতে পারিলেন না। রাজনৈতিক শিক্ষায় পুনা বিশেষ পারদর্শী হইয়া উঠিয়াছে। যে মহাশয় সার্ব্বজনিক সভার প্রাণ, সভ্যশ্রেণীতে তাঁহার নাম নাই। রাজসদনে উক্ত সভা হইতে যে সকল আবেদনপত্র পাঠান হয়, তৎসমুদয় তাঁহার লিখিত। দেশ-হিতকর কোন সমিতি বা অপর কার্য্যে যাইয়া যদি তিনি ইংরাজ রাজপুরুষ দেখিতে পান, তাহা হইলে অদৃশ্য হন। মনে করিয়াছিলাম, এখানে আসিয়া সংস্কৃতের বিলক্ষণ চর্চ্চা দেখিতে পাইব। বেদ-ধ্বনিতে কর্ণ পবিত্র হইবে। যজ্ঞীয় ধূমের দর্শনলাভ হইবে। কিন্তু ইংরাজ অধিকারে সে সমস্ত লোপ পাইয়াছে। 'বেদোত্তেজনী সভা'কে বেদ-পাঠীদের জন্য পুরস্কারের ব্যবস্থা করিয়া পাঠানুরাগ বৃদ্ধি করিতে হইতেছে। সময়ে সময়ে এক এক জন বৈদিক ভ্রমণ করিতে আসিয়া কিছু অর্থ সংগ্রহ করিয়া যান।

প্রভু জাতি এদেশের কায়স্থ। মদ্য মাংস ভক্ষণ ইঁহাদের মধ্যে প্রচলিত আছে, কুক্কুট মাংস ভক্ষণ নিষিদ্ধ নহে। ইঁহারা লেখা পড়া দ্বারা জীবিকা উপার্জ্জন করিয়া থাকেন। শেনেবি ব্রাহ্মণও মৎস্য-মাংস-ভোজী। এদেশের বিদ্যাসাগর মহাশয় রামকৃষ্ণ গোপাল ভণ্ডারকর ও মৃত ভাউদাজী এই শ্রেণীস্থ ব্রাহ্মণ। চিতপাবন ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে ক্যাম্বেল কহেন, মনুষ্যজাতির আদিম জন্মস্থান হইতে সরস্বতী ও সিন্ধুনদ বহিয়া সমুদ্রপথে এই জাতি কঙ্কণ ভূভাগে আসিয়া আবাস স্থাপন করিয়াছেন। হিন্দুস্থানে বাস না করায় ইঁহাদের সহিত অনার্য্য রক্তের সংমিশ্রণ হয় নাই। দেশস্থ প্রভৃতি শ্রেণীর ব্রাহ্মণেরা চিতপাবনদিগকে অধম বিবেচনা করেন। পেশওয়া এই শ্রেণীতে জন্মগ্রহণ করায় কোকনস্থ ব্রাহ্মণের গৌরব বৃদ্ধি হইয়াছে। সহ্যাদ্রিখণ্ড নামক গ্রন্থে চিতপাবনদের উৎপত্তি সম্বন্ধে কিছু অপকর্ষ বর্ণিত থাকায়, বাজিরাও ঐ পুস্তকের সমুদয় খণ্ড নষ্ট করেন। চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রী চাণক্য কোকন দেশীয় ছিলেন। কল্যাণ নামক স্থানে তাঁহার বাটী ছিল। রাজ-নীতিতে মহারাষ্ট্র ব্রাহ্মণ অত্যন্ত পটু। রাজা যে জাতীয় হউন, তরবারি তাঁহার হস্তে থাকুক; কিন্তু ব্রাহ্মণ মেধা ও লেখনীর বলে রাজ্যের শাসন কার্য্য করিবেন। ইদানীং বোম্বাই রাজ্যে অধিকাংশ লেখাপড়ার কার্য্য এই জাতি দ্বারা সম্পন্ন হয়। শিক্ষা-বিভাগের নিয়ন্তা 'লি ওয়ার্ণর' আজ্ঞা করিয়াছেন, অতঃপর পারদর্শিতা অনুসারে না দেখিয়া নির্দ্দিষ্ট বৃত্তির এক ভাগ বিদ্যোপার্জ্জনবিমুখ কুনবি প্রভৃতি জাতির ছাত্রকে দেওয়া হইবে। সার্ব্বজনিক সভা অতি কঠোর ভাষায় ইহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। এই প্রতিবাদের উত্তর আরো কর্কশ হইয়াছে। ডিরেক্টর বলেন, সমস্ত লিখন পঠনের কর্ম্ম ব্রাহ্মণেরা একচেটিয়া করিয়া রাখিতে চায়। উহাতে হস্তক্ষেপ হইলেই ব্রাহ্মণ জাতির যন্ত্র পুনার

দেশীয় সংবাদপত্রগুলি তারস্বরে চীৎকার আরম্ভ করে। সার্ব্বজনিক সভারও ঐ কর্ম্ম। এখানে হাই স্কুল নাম দিয়া একটি বিদ্যালয় স্থাপন করা হইয়াছে। প্রথম হইতে শেষ শ্রেণী পর্য্যন্ত সকল শিক্ষক গ্রাজুয়েট্। তাঁহাদের সংকল্প গভর্ণমেণ্টের চাকরি করিবেন না। এই বিদ্যালয়ে যাহা লাভ হইবে, তাঁহারা তাহা তুল্যাংশ করিয়া গ্রহণ করিবেন। স্ত্রীজাতির কিঞ্চিৎ বিদ্যাশিক্ষা পূর্ব্বাপর প্রচলিত আছে! পণ্ডিতের ঘরের কন্যা হইলে তাহাকে কিছু সংস্কৃত পঠন অভ্যাস করিতে হয়। বোধ হয় এক বৎসর পূর্ণ হয় নাই, ইংরাজী শিক্ষার জন্য 'ফিমেল হাই স্কুল' স্থাপিত হইয়াছে। সম্প্রতি বিদ্যালয়ের পারিতোষিক বিতরণ উপলক্ষে মহা আন্দোলন হইয়া গিয়াছে। এই সময় সয়াজীরাও গায়কওয়াড় এখানে আগমন করেন। তাঁহার অভ্যর্থনা জন্য রেলওয়ে ষ্টেশন সজ্জিত করা, সার্ব্বজনিক সভা হইতে পান সুপারি দেওয়া প্রভৃতি নানা আয়োজন হইয়াছিল। ইংরাজগণ তাঁহাকে অধিকক্ষণ পান নাই। উক্ত বিদ্যালয়ের পারিতোষিক বিতরণ সভায় মহারাষ্ট্র ভূপতি সভাপতির আসন গ্রহণ করিবেন, স্থিরীকৃত হইল। ইতিপূর্ব্বে স্কুল ইনস্পেক্টর কর্ত্তৃক সেদিনকার সভায় কি কার্য্য হইবে, তাহার অনুষ্ঠান-পত্র মুদ্রিত হইয়া প্রচারিত হইয়াছিল। ছাত্রীগণ কর্ত্তৃক 'ন্যাশন্যাল অ্যান্‌থেম্' গীত হইবে লিখিত ছিল। ডিরেক্টর বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষদিগকে কহেন, উক্ত সঙ্গীতের সময় সভাস্থ সকলকে ইংরাজী প্রথা অনুসারে মহারাণীর প্রতি সম্মান দেখাইবার জন্য দণ্ডায়মান থাকিতে হইবে। তাহাতে অধ্যক্ষগণ কহিলেন, দর্শকদের মধ্যে বহু বৃদ্ধ ও স্ত্রীলোক থাকিতে পারে; দণ্ডায়মান থাকিতে হইলে, তাহাদিগের অত্যন্ত কষ্ট হইবে; সুতরাং "জয়শ্রী ভিক্টোরিয়া" গান হইয়া কাজ নাই। নিয়মিত সময়ে সভায় যে অনুষ্ঠান-পত্র দেওয়া হইল, তাহাতে

যে স্থানে সঙ্গীতের নাম ছিল, তাহা কাটিয়া দেওয়া হইল। তদ্দর্শনে লি ওয়ার্ণর অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হইয়া উক্ত সঙ্গীতের এক অংশ বালিকা-দিগকে গাওয়াইয়া তবে ছাড়িলেন, এবং গভর্ণমেণ্টকে এ সংবাদ জ্ঞাপন করিলেন। ঋগ্বেদের মরাঠী অনুবাদক (বেদার্থরত্ন সম্পাদক) ও হাইকোর্টের অনুবাদক শঙ্কর পাণ্ডুরঙ্গ পণ্ডিত 'ন্যাশন্যাল অ্যান্থেম্' গীত হইবার কথা মসীদ্বারা কর্ত্তিত করিয়াছেন বলিয়া রাজকীয় কর্ম্ম হইতে অবসৃত হইলেন। লি ওয়ার্ণর কহিলেন, গায়কওয়াড়কে সন্তুষ্ট করিবার জন্য ইঁহারা এই কর্ম্ম করিয়াছেন। মহারাষ্ট্রীয়েরা কহিলেন, "জয়শ্রী ভিক্টোরিয়া" গীত ন্যাশন্যাল অ্যান্থেমের অনুবাদ নহে। উহা দিল্লীর দরবার উপলক্ষে রচিত হইয়াছে; অতএব সে স্থলে দণ্ডায়মান হইবার প্রথা রক্ষা না করা দূষ্য হইতে পারে না। গুজরাতিরাও কহিলেন, "রাণী জীনো ছন্দ্" গাইবার কালে শ্রোতৃবর্গকে দাঁড়াইতে হয় না। এই বিতণ্ডা সমাধানের জন্য ভিক্টোরিয়া গীতিকা ত্যাগ করা শ্রেয়ঃ বোধ হওয়ায়, কাটিয়া দেওয়া হইয়াছিল। এ বিষয়ে বহু বাদানুবাদ হইল, তথাপি শঙ্কর পাণ্ডুরঙ্গ কর্ম্ম পাইলেন না।

কলিকাতার প্রথানুসারে আমরা পার্শ্বের বাটীর লোকের সহিত আলাপ করিতাম না, এবং তাঁহাদের সংবাদ রাখিতাম না। ধারণা ছিল, এ নগরে বুঝি বাঙ্গালীর সহিত সাক্ষাৎ হইবে না। একদিন পথিমধ্যে একজন বাঙ্গালীর সহিত সাক্ষাৎ হইল। আলাপ নাই, কি করিয়া সম্ভাষণ করিব, এ বিলাতী ভাব, প্রবাসে মনে উদয় হইতে পারে না; অথবা পরিচিতের সহিত সাক্ষাৎ হইলে কেবল মাত্র দন্ত বিকাশ করিয়া সম্ভাষণ করিলে চলে না। দক্ষিণ মহারাষ্ট্র রেলপথ প্রস্তুত উপলক্ষে দশ বার জন বাঙ্গালী এখানে বাস করিতেছেন। তাঁহাদের মধ্যে একজনকে জিজ্ঞাসা করিলাম, এদেশের বৈচিত্র্য কি?

তিনি স্ত্রীলোকের বস্ত্র-পরিধান প্রণালীর কথা বলিলেন। কাশীতে অনেক দক্ষিণী আছেন। সুতরাং আমার চক্ষে এ দৃশ্য অভ্যস্ত হইয়াছে। শেরিং সাহেব কাশীকে Type of India কহিয়াছেন।

অনাবৃত মুখে সর্ব্বসমক্ষে বহির্গত হওয়াকে যদি স্ত্রী-স্বাধীনতা বলে, তাহা দক্ষিণাপথে আছে। এতদ্ভিন্ন আর কিছুতেই নাই। স্ত্রীলোক সকল বিষয়ে পরাধীন, বাস্তবিক প্রকৃত স্ত্রী-স্বাধীনতা কোনও দেশে হইতে পারে না। দুর্ব্বল বলবানের অধীন হইবে, ইহা প্রাকৃতিক নিয়ম। মানুষ যখন ইচ্ছাশক্তি বিশিষ্ট, তখন একেবারে সকল বিষয়ে অন্যের অধীন হইতে পারে না। বাঙ্গালীর গৃহে কি স্ত্রী স্ব—অধীন নহে? সর্ব্বপ্রকার কুসংস্কার বর্জ্জিত গৃহস্থকেও স্বামিনীর অনুরোধে পৌত্তলিক অনুষ্ঠান করিতে হয়। বাল্যবিবাহ যে রহিত হইতেছে না, তাহার মূল স্ত্রীলোকের অমত। মহারাষ্ট্রে সধবার চিহ্ন "কুঙ্কু" ও "বাঙ্গড়ি"। অবশ্য কুমারীতেও তাহা ব্যবহার করে। বিধবা দর্পণে মুখাবলোকন করিতে পায় না। ভোজে যায় না। বরযাত্রী প্রভৃতির দলে যাইতে পারে না। সধবার পক্ষে কুঙ্কু অর্থাৎ টিপ না পরিয়া মুখ দেখান নিষিদ্ধ। প্রাতঃকালে শয্যা হইতে উঠিয়াই করণ্ডি হইতে উপকরণ বাহির করিয়া তিলক করা আবশ্যক। বিলাসিনী রমণী অতি ক্ষুদ্র বিন্দুবৎ তিলক পরে। কিন্তু অন্যে আধুলি পরিমাণ পর্য্যন্ত পরিয়া থাকে। সন্তান হইলে ৪০ দিন অশৌচান্তে নূতন চুড়ী পরা আবশ্যক। তাহাকে বালন্ত চুড়া কহে। রমণী চাউল, পান, সুপারী একটা নারিকেল এবং কয়েকটা পয়সা দিয়া সিধা সাজাইয়া, চুড়ী বিক্রেতার সম্মুখে রাখিয়া, হাত যোড় করতঃ তাহাকে অভিবাদন করে। বাঙ্গড়ি বিক্রেতা বলে, জন্ম এয়োতী হইয়া থাক। অন্য সময় প্রকৃত মূল্য দিয়া চুড়ী পরিবার কালেও অভিবাদন করিতে হয়।

হাতের চুড়ী যে মূল্য দিয়া ক্রয় করিয়াছে, এ কথা বলিতে নাই। কারণ চুড়ি যে এয়োতী। স্বামীর জন্য যদি কাহারও নিকট অনুরোধ করিতে হয়, তবে কহে, আমার হাতের চুড়ি রক্ষা কর। স্বামী মরিলে শব বাটী হইতে লইয়া যাইবার পূর্ব্বে বাঙ্গড়ি ভাঙ্গিয়া মাথার চুল মুড়াইয়া একত্র করিয়া "চোলিতে" বাঁধিয়া দেয়। কুঙ্কু মুছিয়া এক অন্ধকার গৃহে প্রবেশ করিতে হয়। অন্যের সে মুখ নিরীক্ষণ করা দূষ্য। বাটীতে অপর কোন বিধবা থাকিলে, সেই ঘরে খাবার দিয়া আসে, নতুবা পুরুষে দেয়। সধবা বা কুমারী সেই ঘরে যায় না।

গণেশ বাসুদেব জোশী প্রভৃতি যে লওয়াদ অর্থাৎ সালিসী আদালত স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহার কোন সংবাদ পাইলাম না। যে সময়ে বাঙ্গালায় পাবনার প্রজা বিদ্রোহ ঘটে, তাহার কিছু পূর্ব্বে এ দেশে মহাজনদের বিরুদ্ধে রায়তেরা উপদ্রব করিয়াছিল। হাটেব দিন মাড়ওয়ারি ও মহারাষ্ট্রীয় বণিকের দোকান লুণ্ঠন আরব্ধ হইল। খাতা-পত্র, কাপড় ও অন্যান্য সামগ্রী একত্র করিয়া তাহাতে অগ্নি সংযোগ করিয়া দিল। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিবার জন্য কমিশন নিযুক্ত হইয়াছিল। তাঁহাদের বিজ্ঞাপনী দৃষ্টে বৃটিশরাজ দক্ষিণী কৃষকের কষ্ট-নিবারণী বিধি প্রচার করিলেন। এই আইন অনুসারে আদালতে অভি-যোগ উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে বাদীকে মধ্যস্থের নিকট যাইতে হয়। তিনি আপসে না মিটাইতে পারিলে, বিচারালয়ে যাইবার অনুমতি দেন, তাহার পর আদালতে আবেদন গৃহীত হইতে পারে। সুদের সুদ কিংবা অতিরিক্ত হারে সুদ চুক্তিসম্মত হইলেও গ্রাহ্য নহে। রায়তের ভূমি-সম্পত্তি বন্ধক না থাকিলে, তাহা দেনার জন্য বিক্রীত হইবে না। দেনার জন্য ডিক্রীজারী জনিত কারাবাস নিষিদ্ধ। অন্যূন পঞ্চাশ টাকার ঋণ-পীড়িত কৃষিজীবী ইন্‌সলভেন্সি লইতে পারে।

মহাজন সম্বন্ধে যেরূপ প্রজার কল্যাণকর বিধান হইল, গভর্ণমেণ্ট আপন রাজস্ব আদায় ব্যাপারে তদ্রূপ উদার আইন করিতে পারেন নাই।

ভূমির রাজস্বের বন্দোবস্ত অস্থায়ী। রায়তওয়ারি বন্দোবস্ত ত্রিংশৎ বৎসর ব্যাপী। সুখের জন্য মনুষ্য শ্রম স্বীকার করে। ইহাতে যে সুবিধা ঘটে, তাহাতে সে ব্যক্তির স্বত্ব জন্মান উচিত। সে সুবিধাটুকু যদি বলপূর্ব্বক অন্যে অধিকার করিতে চায়, তাহা হইলে, সে ব্যক্তি আবার অপরের দ্বারা অন্য বিষয় হইতে বঞ্চিত হইতে পারে। সুতরাং কেহই সুখী হইতে পারে না। এ জন্য অন্যের স্বত্বে হস্তক্ষেপ করা মনুষ্যসমাজে নিষিদ্ধ হইয়াছে। এতাবতা ভূমির উপর প্রজার চিরস্থায়ী স্বত্ব হওয়া প্রাকৃতিক নিয়ম। ভূমির উৎকর্ষ হইলে যদি খাজনা বৃদ্ধি হয়, তবে প্রজার স্বত্ব অক্ষুণ্ণ রহিল না। প্রজার জীবন ও সম্পত্তি রক্ষা করিয়া থাকেন বলিয়া রাজা সেই কার্য্যের বেতন স্বরূপ কর পাইতে পারেন। তাই বলিয়া রাজা ভূম্যধিকারী নহেন। যে ভূমি আবাদ করিয়াছে, সে-ই ভূমির অধিকারী। অদ্যাপি তাতার জাতি যে ভূমিখণ্ড দখল করিয়া কৃষিকার্য্য করে, তাহার শস্য গৃহীত হইলেই অন্য লোকে সে ভূমি ব্যবহার করিতে পারে। কিন্তু তাহারা এক স্থানে স্থায়ী হয় না বলিয়া, স্বামিত্ব হারায়। ভূমি অধিকারের মূলে বল প্রয়োগের পরিবর্ত্তে শ্রমশীলতা দেখা যায়, পরিশ্রম করিলে স্বাভাবিক স্বত্ব জন্মে। সাঁওতাল পরগণায় কমিশনর সাহেবের নিকট কতকগুলি সাঁওতাল একখানি থালে একটু মৃত্তিকা ধান্য ও টাকা রাখিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, আমরা খাটিয়া ভূমিতে শস্য উৎপাদন করি, তবে সে জন্য আপনারা টাকা লন কেন?

ভারতের অপর স্থানের ন্যায় পূরাকালে মহারাষ্ট্র রাজ্য খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত হইয়া পরস্পর সম্পর্কশূন্য ছিল। মহারাষ্ট্র ইতিহাস-লেখক গ্রাণ্ট ডফ কহেন, সম্ভবতঃ গোদাবরীর তীরে আধুনিক ভীর নগরের সমীপে

টগর নামক রাজধানীতে রাজপুত ভূপতি বর্ত্তমান ছিলেন। তাহার পর কুহমার বা কুনবী জাতীয় শালিবাহন সেই রাজাকে বধ করিয়া, গোদাবরী-তীরস্থ বর্ত্তমান মুঙ্গীপাটন অর্থাৎ প্রতিষ্ঠান নগরে রাজধানী স্থাপন করেন। অতঃপর দেবগিরি অর্থাৎ দৌলতাবাদের দেবগড়ে মহারাষ্ট্র রাজধানী স্থাপিত হয়। খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগে যখন মুসলমানেরা এদেশে আসেন, তখন দেবগিরিতে যাদব রাম দেবরাও রাজত্ব করিতেছিলেন। মুসলমানী রাজ-প্রণালী সর্ব্বসংহারক ছিল না। দেশীয় লোকে সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন করিত, মুসলমান কেবল সর্ব্বোপরি কর্তৃত্ব করিতেন। তাঁহাকে রাজা বলিয়া মানিলেই তিনি সন্তুষ্ট থাকিতেন। গ্রাম্য কর্ম্মচারীর মধ্যে মহার বা ধেড় সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট; সে পথ-প্রদর্শক, চৌকিদার ও চরের কর্ম্ম করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে। তাহাকে ভ্রমণকারীর অশ্বের জবস আনয়ন প্রভৃতি কার্য্য করিতে হয়। যদি অন্য উপায় না থাকে, ভ্রমণকারীর দ্রব্যজাত তাহাকে বহন করিয়া আপন সীমার বাহিরে দিয়া আসিতে হইত। গ্রামাধিকারীর অপর নাম মকদম, পটেল বা দেশমুখ। কৃষিকার্য্য পর্য্যবেক্ষণ, চৌকিদার নিয়োগ ও বিবাদভঞ্জন প্রভৃতি কার্য্য ইহার দ্বারা নির্ব্বাহ হইত। যে বিরোধ পটেল দ্বারা না মিটিত, তিনি পঞ্চায়তের হস্তে তাহার মীমাংসা করিতে দিতেন। ফৌজদারী ব্যাপারের মীমাংসাভার উপরিতন কর্ম্মচারীর উপর অর্পিত হইত। গ্রামলেখকের অপর নাম কানুন গো, দেশ পণ্ডা বা কুলকরণী। পটেল, কুলকরণী ও চৌগুলাতে গ্রামের পঁচিশ ভাগের এক ভাগ ভূমি নিষ্কর ভোগ করিতে পাইত। বার্ষিক হিসাব রাখাই কুলকরণীর কাজ। তাহার পুস্তিকায় ভূমি সম্বন্ধীয় সমস্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ থাকিত। কোনও সময়ে গ্রামাধিকারী ও গ্রাম-লেখক কর্ম্মচারীর উপর দেশাধিকারী ও দেশলেখকের পদ ছিল। উক্ত সকল পদই পুরুষানুক্রমে চলিত। গ্রামাধিকারীর ক্ষমতা ক্রমে বৃদ্ধি

পাইয়া দেশাধিকারিরূপে পরিণত হইতে পারিত। অধিরাজের ক্ষমতা দুর্ব্বল হইলে, সেই দেশাধিকারী স্থায়ী হইয়া রাজা হইয়া পড়িতেন।

মুসলমান সাম্রাজ্য ক্রমশঃ এমন হীন হইয়া গিয়াছিল যে, খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে সেই অধীন মহারাষ্ট্রীয়েরা পার্ব্বত্য ভূমি হইতে যথন বহির্গত হইয়া মস্তক উন্নত করিতে লাগিল, তথন লোকে তাহাদিগকে এক অপরিচিত নূতন জাতি বলিয়া জ্ঞান করিতে লাগিলেন।

১৬২৭ খ্রীষ্টাব্দে সিউনেরী দুর্গে শিবাজী ভোঁসলে জন্মগ্রহণ করেন। প্রবাদ আছে, তিনি আপন নাম পর্য্যন্ত স্বাক্ষর করিতে পারিতেন না ; পরন্তু অল্পবয়সেই অস্ত্রশস্ত্র চালনায় এবং ধনুর্ব্বিদ্যায় অসামান্য নিপুণতা লাভ করেন। কুরুপাণ্ডব ও রাম-রাবণের যুদ্ধ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া শিবাজী অতিশয় উত্তেজিত হইতেন। কেহ কেহ বলেন, সেই উত্তেজনায় তিনি ষোড়শ-বর্ষ বয়ঃক্রম কালে এক দস্যুদলে মিলিত হন। তাঁহার পিতা বিজাপুরের নিজামশাহি রাজ্যে চাকরি করিতেন। শিবাজী নানা কৌশল করিয়া রাজ্য লাভ করেন। সকল রাজ্য স্থাপনেরই মূলে ছলনা প্রবঞ্চনা প্রভৃতি আছে। রাজ্যের সুশাসন জন্য প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে প্রজাগণ রাজাকে আপন আপন ক্ষমতা অর্পণ করিয়াছে ; পরন্তু রাজা আপনাকে প্রকৃতিবর্গের সেবক স্বরূপ জ্ঞান করেন, এমন দেখিতে পাওয়া যায় না। প্রজা একটি নরহত্যা করিলে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয় ; কিন্তু রাজা সহস্র মানবকে যুদ্ধস্থলে বিনাশ করিলেও অপরাধী নহেন। তার কারণ, দেশের হিতসাধন জন্যই উক্ত যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হইয়াছে, বলিয়া কথিত হয়। এ সকল কারণে শিবাজী নিন্দনীয় না হইয়া প্রশংসাভাজনই হইয়াছেন। তিনি আপনাকে রাজপুত বংশীয় বলিয়া পরিচিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। বস্তুতঃ তিনি মরঠ। শিবাজীর গূঢ়চর হাইয়াজী ; ভবানী দেবী কর্ত্তৃক প্রত্যাদিষ্ট হইয়াছে, এমন বাক্য প্রচার জন্য তিনি নানা কাহিনী গ্রন্থন করিতেন। ১৬৮০ খ্রীষ্টাব্দে ৫৩

বৎসর বয়সে ছত্রপতি শিবাজী যবন-মর্দ্দন ব্রত সমাপ্ত করিয়া প্রাণত্যাগ করেন। কোকনে রায়গড়ে তাঁহার মৃত্যু হয়। চৈত্য নির্ম্মাণ করিয়া তদীয় চিতাবশেষ রক্ষিত হইয়াছে। স্বদেশবৎসল শিক্ষিত নব্য মরঠগণ অধুনা উক্ত মহাত্মার দেহাবশেষ পুনায় স্থানান্তরিত করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। নেপোলিয়ান বোনাপার্টির দেহ সমাধি হইতে উত্তোলন করিয়া, ফরাসি-ভূমিতে নীত হইয়াছে সত্য, কিন্তু তাহা তদীয় নির্ব্বাসন স্থানে ছিল বলিয়াই আনিত হইয়াছিল। ছত্রপতি শিবাজী রায়গড়ে বাস করিতেন এবং তাঁহার মহৎ কার্য্যকলাপ ঐ স্থান হইতে অনুষ্ঠিত হয়; এজন্য এই মহাপুরুষের স্মৃতিচিহ্ন ঐ স্থানে থাকাই উচিত বলিয়া বিবেচিত হইল। রায়গড় বিজন স্থানে অবস্থিত থাকায় শিবাজীর দেহাবশেষ পুনায় আনয়নের প্রস্তাব হইয়াছিল। শিবাজী অতিশয় দক্ষ ও অনলস পুরুষ ছিলেন। সেই সকল গুণে তদীয় উত্তরাধিকারিগণের কেহই তাঁহার তুল্য হয় নাই। শম্ভাজী ধৃত হইয়া আওরঙ্গজেবের নিকট প্রেরিত হইলে, সম্রাট তাঁহাকে মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে কহিলেন। তাহাতে শম্ভাজী বিদ্রূপ করায় কঠোর-প্রকৃতি আওরঙ্গজেব তাঁহার শিরচ্ছেদনের আজ্ঞা দিলেন।

শাহুর সময়ে মহারাষ্ট্রীয় মন্ত্রি-সমাজে এই কয় ব্যক্তি প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। প্রতিনিধি—পরশুরাম ত্র্যম্বক। অষ্ট প্রধান মধ্যে, মুখ্য প্রধান—বালাজী বিশ্বনাথ (অন্য উপাধি পেশওয়া)। অমাত্য—অম্বারাও বাপুরাও হনবন্তি। সচিব—নারুশঙ্কর। মন্ত্রী—নারুরাম শেনবী। সেনাপতি—মানসিং মোরে। সামন্ত—আনন্দ রাও। ন্যায়াধীশ—হোনজী অনন্ত। পণ্ডিত—রাও মুদ্গল-ভট্ট উপাধ্যায়। রাজপ্রতিনিধির বল খর্ব্ব করিয়া মুখ্যপ্রধান অর্থাৎ পেশওয়া ক্রমশঃ রাজ্যের বিধাতা হইয়া উঠিলেন। রাজা জগদীশ্বরের ন্যায় সাক্ষি স্বরূপ রহিলেন। তাহার পর যাহা হইবার কথা, তাহাই হইল। পেশওয়া রাজ্যের স্বামী হইলেন। তাঁহার পাদুকা হৃদয়ে ধারণ

করিয়া হোলকর ও সিন্ধিয়া মহত্ত্ব লাভ করিলেন। জন্মগুণে সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হওয়ায় কিছু গৌরব নাই। ক্ষমতা না থাকিলে বা ঘটনাচক্র (যাহাকে অদৃষ্ট কহে) অনুকূল না হইলে সে বিভব রক্ষা পায় না। মহারাষ্ট্র রাজ্যে শিবাজী ভোঁসলে ও বালাজী বিশ্বনাথের ন্যায় তৃতীয় ব্যক্তি জন্ম গ্রহণ করিলেন না। পেশওয়া বাজীরাও হোলকারের শাসনার্থ বৃটিশ রাজ্যের সহায়তা যাচ্ঞা করিলেন। অবশেষে ক্ষুদ্র বল সেই মহাবলে লীন হইয়া গেল। হায়! মহারাষ্ট্র রাজ্য কয় দিন থাকিল! ১৬৬৪ খ্রীষ্টাব্দে মহারাষ্ট্র রাজ্যের সংস্থাপক শিবাজী রাজোপাধি গ্রহণ করেন। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে বাজীরাও হইতে ইংরাজ সে রাজ্যটি আপন অধিকারভুক্ত করিলেন। ১৫৪ বৎসর মাত্র সময়। কেহ কেহ কহেন ভারতে বৃটনবাসী প্রবেশ না করিলে, মুসলমানের পর মহারাষ্ট্রীয়েরা সম্রাট হইতে পারিতেন। দিল্লী হইতে বহু দূরবর্ত্তী হওয়ায় দক্ষিণাপথে মুসলমান পরাক্রম দৃঢ় হইতে পারে নাই। এই সুযোগে শিবাজী দেশীয় ছিন্নভিন্ন দল একত্র করিতে সমর্থ হওয়ায় মহারাষ্ট্র রাজ্যের অভ্যুদয় হয়। তাঁহা হইতে এবং তাঁহার পর বালাজী বিশ্বনাথ হইতে উক্ত রাজ্যের সমুন্নতি হইয়াছিল। তদানীন্তন রাজ-নীতি অনুসারে ভূপতি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সমুদয় সেনাকে প্রতিপালন করিতেন না; কর্ম্মচারীদিগকে নিরূপিত সংখ্যক বল পোষণের জন্য ভূসম্পত্তির অধিকার দিয়া রাখিতেন। রাজা ক্ষীণ হইলে, উক্ত সেনাপতিরা স্বয়ং সেই প্রদেশের অধিকারী হইতে পারিতেন। মহারাষ্ট্র রাজ্যের উৎপত্তির এই একটী কারণ। যে কারণে উক্ত রাজ্যের অভ্যুদয় হইয়াছিল, সেই কারণেই উহার অবনতি হইল। নেতার ক্ষমতা বিসদৃশ হওয়ায় বিভিন্ন ফল উৎপন্ন হইল। অবশেষে পেশওয়া এমন ক্ষমতাবান্ হইয়াছিলেন যে, ভদ্রলোকে তাঁহার বাটীতে স্ত্রী পঠাইতে সাহস করিতেন না।

মহারাষ্ট্রীয়দের বখর নামক জাতীয় ইতিহাসে "সিংহ"গড় পুনরধিকারের

শৌর্য্য-বৃত্তান্ত অতি শ্লাঘার সহিত বর্ণিত হইয়াছে। ইষ্টউইক্ কৃত বোম্বাই প্রদেশের বিবরণ-পুস্তক পাঠে সিংহগড় পুনার সন্নিহিত জানিয়া, উক্ত স্থানে যাওয়া একান্ত উচিত মনে করিলাম। সহ্যাদ্রি ও তাহার সমুদয় প্রত্যন্ত শৈলের উর্দ্ধ ভাগ প্রায় সমতল, কিন্তু অত্যন্ত দুরারোহ। এদেশে তাহার উপর অসংখ্য দুর্গ নির্ম্মিত হইয়াছে। এটি তাহার অন্যতর। পুনা, সিংহগড় হইতে ৬ ক্রোশ ব্যবহিত। ৪ ক্রোশ যাইয়া খড়কবাসলা জলাশয় দেখিতে পাওয়া গেল। পুনার নালোত্থিত জল এইস্থান হইতে যায়। একটী স্রোতস্বতীর মুখে পর্ব্বতাকার বাধ দিয়া হ্রদ নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। বাঁধটি অর্দ্ধক্রোশ হইবে। উহার গাত্রে অপূর্ব্ব কৌশল সম্পন্ন বারি মধ্যস্থ ছিদ্র-পরম্পরা দ্বারা জল বাহির হইতেছে, যেন পর্ব্বতের গাত্র ভেদ করিয়া উৎসগুলি হইতে স্রোত নির্গত হইয়াছে। কেবল খড়ক বাসলার স্থাপত্য-কৌশল দেখিবার জন্য এক জন বাঙ্গালী ইঞ্জিনিয়ার এদেশে আসিয়াছিলেন। আমরা সিংহগড়ের পাদদেশে যাইয়া শকট ত্যাগ করতঃ চেয়রবাহীদের সাহায্যে শৈলে উঠিতে লাগিলাম। পর্ব্বতের উচ্চতা সমুদ্র-পৃষ্ঠ হইতে ৪১৬২ ফিট্। কিন্তু এখানে ভূমির উচ্চতা স্বভাবতঃ সমুদ্র-পৃষ্ঠ হইতে ১৮২৫ ফিট্ হইবে; সুতরাং ২৩৩৭ ফিট্ (প্রায়ঃ অর্দ্ধ ক্রোশ) উর্দ্ধে যাইতে হইবে। পূর্ব্বকথা স্মরণ করাইবার জন্য এখনও দুর্গের প্রাচীর রহিয়াছে। দুইটি তোরণের মধ্য দিয়া যাইয়া অবতরণ করা হইল। শিবাজীর সিংহগড়ে এক্ষণে ইংরাজের গ্রীষ্মাপনোদন জন্য কয়েকখানি বাঙলা পরিদৃষ্ট হইতেছে। আমরা আহারীয় সমভিব্যাহারে লইয়া গিয়াছিলাম, প্রথমতঃ তাহার সৎ ব্যবহার করিবার জন্য এখানে "জিতাপানি" পাওয়া যায় কি না, জিজ্ঞাসা করিলাম। ঘাটিরা একটি কুণ্ডের নিকট লইয়া গেল। তাহার জল অত্যন্ত স্নিগ্ধ ও স্বচ্ছ। সেই "ঘাট মাথায়" প্রস্রবণ-জলে মৎস্য ফর্ ফর্

করিতেছে। দুই একটি প্রাচীন মন্দির দেখিলাম, তাহাতে বিগ্রহ নাই। রামরাজার (শিবজীর প্রপৌত্র·) মন্দির ভাল অবস্থায় আছে। ছত্রপতির পাদুকা (খড়ম) শিবলিঙ্গের নিকট রক্ষিত হইয়াছে। গ্রাণ্ট ডফ্ বথর পুস্তক হইতে এই স্থানের সংগ্রাম-বৃত্তান্ত উদ্ধৃত করিয়া লিখিয়াছেন;—"মাঘ মাসের কৃষ্ণপক্ষীয় নবমী তিথিতে (১৬৭০ খ্রীঃ) রজনী সমাগত হইলে, রায়গড় হইতে এক দল মাওলী সৈন্য লইয়া তন্নাজী মালুশ্রে সিংহগড় লক্ষ্য করিয়া অভিযান করিলেন। তিনি সেনা দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া, কিছু দূরে একদল রাখিয়া অপরগুলি পর্ব্বতের পাদমূলে স্থাপন করিলেন। যে ভাগ সর্ব্বাপেক্ষা বন্ধুর ও দুর্গম, সে দিকে হঠাৎ প্রকাশ হওয়ার সম্ভাবনা নাই বলিয়া একজন যোদ্ধা সেই দিক্ দিয়া অদ্রিশিখরে আরোহণ করিয়া রজ্জু নির্ম্মিত অধিরোহণী বাঁধিয়া দিল। তদবলম্বনে একে একে সকলে উঠিয়া রজ্জু নিম্নে নিক্ষেপ করিল। দুর্গমধ্যে তিন শত লোক প্রবেশ করিতে না করিতে তত্রত্য রক্ষী রাজপুত সৈন্য সন্ধান পাইল। একজন ব্যাপারটা কি জানিবার জন্য অগ্রসর হইল, অমনি একটা শাণিত বাণ ধানুকীর হস্ত-মুক্ত হইয়া, নীরবে তাহার প্রশ্নের উত্তর দিল। অস্ত্র-নিস্বন ও কোলাহল শুনিয়া তন্নাজী তাহাদিগকে স্তম্ভিত করিবার জন্য আরও অগ্রসর হইতে লাগিলেন। শব্দ লক্ষ্য করিয়া বাণ ত্যাগ করা হইতে লাগিল। শীঘ্রই মশালের আলোকে উভয় পক্ষই প্রকাশিত হইলেন। মরিয়া হইয়া যুদ্ধ চলিল। মাওলিয়া সম্পূর্ণ সজ্জিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছিল, এজন্য বিপক্ষগণ সংখ্যায় অধিক হইলেও তাহারা যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছিল। কিন্তু এই যুদ্ধে তন্নাজী মালুশ্রে নিহত হইলেন। তাহাতে যোদ্ধৃবর্গ সাহসহীন হইয়া রজ্জুময়ী অধিরোহণীর দিকে ধাবমান হইলেন। এমন সময়ে তন্নাজীর ভ্রাতা সূর্য্যাজী সসৈন্যে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইলেন। তিনি ব্যাপার দেখিয়া ক

লাগিলেন, "বীরগণ! তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে যে, আপন পিতার শব মাহার কর্তৃক গর্ত্তে নিহিত হওয়া দেখিতে পার?" * "সকলকে কহ অবতরণের সোপান বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে তাহারা যে শিবাজীর প্রকৃত মাওলী সৈন্য, তাহা প্রমাণিত করিবার অবসর উপস্থিত।" এই উৎসাহ বাক্য, তন্নাজীর শোক, নূতন সেনার আগমন ও সেনা-নায়কের উপস্থিতি এই কয়েকটা কারণে তাহারা এমন স্থির-সংকল্প হইল যে, আর কিছুতেই তাহাদিগকে নিবৃত্ত করিতে পারিল না। তাহাদের "হর হর মহাদেব"রবে আকাশ প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। অনতিবিলম্বে জয়লাভ হইল। দূরস্থ শিবাজীকে সে বার্ত্তা জানাইবার জন্য একখানি তৃণ-নির্ম্মিত গৃহে অগ্নি সংযোগ করিয়া সঙ্কেত করা হইল। মাওলীদের হতাহতের সংখ্যা তিন শত। সূর্য্যোদয় হইলে দেখা গেল, পাঁচশত রাজপুত তাহাদের অধ্যক্ষ উদয়নামা যোধের সহিত নিহত হইয়া বীর-শয্যায় শয়ান রহিয়াছেন। কয়েকজন মাত্র ধৃত হইয়া আত্মসমর্পণ করিল। অনন্যোপায় শত শত লোক পর্ব্বত হইতে অবতরণ করিতে যাইয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল। শিবাজী কহিয়াছিলেন, এ যুদ্ধে আমা আর কি লাভ হইল, তন্নাজী মালুশ্রে মরিয়াছেন। সিংহ হত হইয়াছে আমাকে কেবল তাহার গহ্বর অধিকার করিতে হইল।

জিজুরি জনপদ পুনা হইতে ১৪ ক্রোশ। যাতায়াতের ফিটন ভাড়া ১০৲ দশ টাকা। চালক প্রত্যূষে ছাড়িয়া রাত্রি ১১ টার সময় বাটীতে

* মহারাষ্ট্রীয়েরা যুদ্ধে পতিত হইলে যদি সম্ভব হয়, তবে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য সঙ্গে লইয়া যায়। সেনাপতির মৃতদেহ ত্যাগ করিয়া যাওয়া অতি নীচতার কার্য বলিয়া গণ্য। ভারতীয় সৈন্যমধ্যে সম্মান ও উৎসাহ প্রকাশার্থ 'বাপ' শব্দটি ব্যবহৃত হয়। ইংরাজ সেনাপতি যুদ্ধকালে "চলো মেরা বাপ" বলিয়া দেশীয় সেপাইগণকে আহ্বান করেন। ইংরাজীতে Come on my boys বাক্য ব্যবহৃত হয়।

পৌঁছিয়া দিবে কহিল। ডেক্যানি অশ্বের বিক্রম অদ্ভুত। দূর হইতে দেখিলে পথের তরঙ্গায়িত আকার দৃষ্ট হয়। অনেক স্থানে পার্ব্বত্য সরিৎ পথের উপর দিয়া পথ করিয়াছে। সকল কথা বলিবার না হইলেও, যাহাতে অতিশয় আরাম লাভ করা গিয়াছে, তাহার উল্লেখ না করিয়া থাকা যায় না। সেই পাষাণময়ী ভূমির উচ্ছ্বাসময়ী ক্ষুদ্র তরঙ্গিণীর তটে প্রাতঃকৃত্য করিয়া মন বড় প্রীত হইল। মধ্যাহ্নকালে "পার্ব্বতী"র ন্যায় শৈলোপরি খণ্ডবার দেবালয় পরিদৃশ্যমান হইল। তীর্থ স্থানে পাণ্ডার অভাব হয় না। আমরা তাহাদের সহিত কথোপকথন করিতে করিতে সোপানশ্রেণী অধিরোহণ করিতে লাগিলাম। ভক্তগণ মানসিক পূর্ণ হওয়ায় দেবোদ্দেশে পর্ব্বতের নানাস্থানে সোপান, তোরণ ও দীপদান নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। খণ্ডবা মহারাষ্ট্রীয়দের কুলস্বামী অর্থাৎ গ্রাম্যদেবতা। ইনি শিবের অবতার বিশেষ। খণ্ডেরাও ঠাকুরের মন্দির হোলকর কর্ত্তৃক নির্ম্মিত। সেবার নিয়ম রাজোচিত ভাবে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সোমবতী অমাবস্যায় সাসওয়াড় গ্রামের নিকট করা নদীতটে মেলা হইয়া থাকে। খণ্ডবার সওয়ারি সে সময় তথায় উপস্থিত হয়। মন্দিরের বাহিরে খণ্ডবার বড় অসি রক্ষিত আছে। তাহা কোষনিষ্কাসিত করিয়া রক্ষী কহিল, ইহা দ্বারা মহাদেব দানব সংহার করিয়াছিলেন। আমি কহিলাম, অসুরবধের জন্য কি তাঁহাকে শস্ত্রের সাহায্য লইতে হয়?

এই খড়্গের সহিত মুরলীগণের বিবাহ হইয়া থাকে। হরিদ্রা প্রদান করিয়া কার্য্য সম্পূর্ণ করা হয়। কুনবি প্রভৃতি অশিক্ষিত জাতির সন্তান না হইলে মানিয়া থাকে,—আমার সন্তান হইলে প্রথমটি খাণ্ডবাকে দান করিব। মনস্কামনা সিদ্ধ হইলে কন্যাটি আনিয়া মহাদেবের সহিত বিবাহ দেওয়াইয়া তাহার গলদেশে তাগা বাঁধিয়া বাটী লইয়া যায়। তাহার আর অপর পুরুষের সহিত বিবাহ হইবার সম্ভাবনা থাকে না। বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে,

দেবতার সেবার জন্য, পিতা মাতা তাহাকে গৃহ হইতে বাহির করিয়া দেয়। পুত্র সন্তানও, দেবতাকে দান করিয়া বিদায় দিয়া থাকে। ঐরূপ স্ত্রীর নাম মুরলী ও পুরুষের নাম বঘা অথবা বাঘিয়া। জিজুরীতে অনুমান ১৫০ মুরলী আছে। অনেকে ভিক্ষা করিবার জন্য স্থানান্তরিত হইয়া থাকে। ব্যভিচার তাহাদিগকে অবশ্যই করিতে হয়। এতদ্ভিন্ন তাহারা নৃত্যগীতের ব্যবসাও করে। অনুসন্ধান করিয়া জানিলাম, এখন আর কেহ মুরলী ছাড়ে না। সংবাদদাতা কহিল, তাহার জ্ঞানে বার বৎসর হইল, শেষ একজনকে মুরলী করিতে দেখিয়াছে। অপ্রত্যক্ষমূলক অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া মানুষ যে কত ভ্রান্তিজালে জড়িত হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। মানুষ কেহ কল্পনা-প্রধান, কেহ বা সন্দেহ-প্রধান। এজন্য অতি বিদ্বান্ লোকও কুসংস্কারাপন্ন হয়। প্রথম হইতে যাহা বিশ্বাস হইয়া গিয়াছে, তাহার বিপরীত ভাবনা গ্রহণ করিতে মনুষ্যের প্রবৃত্তি হয় না।

সাসওয়াড় গ্রামের মধ্য দিয়া পথ; একারণ উক্ত গ্রাম দর্শন করিবার জন্য গাড়ী হইতে অবতরণ করা হইল। এদেশে দেখিতেছি, গ্রাম ও নগর একই ভাবে গঠিত। সহরে খোলার ঘর, গ্রামেও তাই। গ্রামে ভূমি সুলভ; কিন্তু বাটীগুলি সহরের মত একস্থানে সন্নিবেশিতঃ পথ সঙ্কীর্ণ। গৃহস্থের ফল মূলের বৃক্ষ নাই; সুতরাং গ্রাম শোভা-রহিত। পেশওয়াদের পারিবারিক বাটী এই গ্রামে। এখানে অবস্থানকালে পেশওয়া পুরন্দরের দুর্গ উপহার পান। ১৭৪৯ খৃষ্টাব্দে রাজ্যলক্ষ্মী তাঁহার করায়ত্ত হন। অদ্যাপি তাঁহার সেই বাটী ধরাশায়ী হয় নাই। পুনায় পেশওয়ার স্মৃতিচিহ্ন সমুদয় অগ্নি কর্ত্তৃক বিলুপ্ত হইয়াছে। যাহা হউক, আমি এখানে আসায় কিঞ্চিৎ দেখিতে পাইলাম। বাটীর প্রাচীর প্রস্তর গ্রথিত। লক্ষ্ণৌ নগরে দেশীয়দিগের দৌরাত্ম্যচিহ্ন চিরস্মরণীয় করিবার জন্য ভগ্ন বাটী রক্ষা করা হইতেছে, দেখিয়া আসিয়াছি। আর এখানে পেশওয়ার প্রাসাদে

ইংরাজের গুলিগোলার চিহ্ন দেখিলাম। সিংহদ্বারের কবাট তীক্ষ্ণাগ্র কীলক জালে আচ্ছন্ন। প্রদর্শক কহিল, শত্রুপক্ষীয় হস্তীতে ভগ্ন করিতে না পারে, এই অভিপ্রায়ে এরূপ কীলক দেওয়া হইয়াছে। তখন বেলা নাই, তথাপি বাটীর মধ্যে যাইয়া উপরে উঠিলাম। সেই বাটীতে সন্ধ্যাকাল উপস্থিত দেখিয়া, সেই সঙ্গে পেশওয়ার পরাক্রম অস্তমিত হওয়ার ভাবটি মনে জাগিয়া উঠিল। তথায় জন মাত্র নাই, পেশওয়ার কুলেও কেহ নাই। বাটী চারি মহল, দ্বিতল, মেরামত শূন্য। সময় হইয়াছে, ভাঙ্গিয়া পড়িলেই হইল। মানুষের শক্তি কি ক্ষণভঙ্গুর! হে কাল, তুমিই বলবত্তর।

থল ঘাট দেখিতে হইবে বলিয়া প্রাতঃকালে পুনা হইতে রেলপথে যাত্রা করা হইল। সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে কথিত স্থানে গাড়ী আসিল। বোরঘাটের ন্যায় থলঘাটের পর্ব্বতের উপর দিয়া লৌহ-পথ। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে বোরঘাটই শ্রেষ্ঠ বলিয়া অনুমান হইল। রাত্রি ১০ টার সময় নাসিক রোড ষ্টেসন হইতে টাঙ্গাযোগে তিন ক্রোশ যাইয়া উপাধ্যায়ের বাটীতে বাসস্থান পরিকল্পিত হইল। এই নাসিক দক্ষিণবাসীদের কাশী। কথিত আছে, শ্রীরামচন্দ্রানুজ এই স্থানে শূর্পণখার নাসিকা ছেদন করিয়াছিলেন বলিয়া জনস্থানের নাম নাসিক হইয়াছে। এখানে গোদাবরীকে গঙ্গা কহে। এই স্থান হইতে ৮ ক্রোশ দূরবর্ত্তী চক্রতীর্থ হইতে গোদাবরী উৎপন্ন হইয়া, মহারাষ্ট্র, নিজাম রাজ্য, সরকাস প্রদেশ দিয়া বঙ্গোপসাগরে পতিত হইয়াছে। দৈর্ঘ্য ৮৫০ ক্রোশ হইবে। বাটীর জল যেমন পয়ঃপ্রণালী দিয়া বাহির হইয়া বাটী পরিষ্কৃত রাখে, পৃথিবীর জল নদী দিয়া বহিয়া সেইরূপ ধরা পবিত্র করে। উৎপত্তিস্থান নিকট বলিয়া এখানে গোদাবরীর পরিসর ও গভীরতা অল্প। সেজন্য স্নানাদির সুবিধা করণার্থ কুণ্ড ও প্রণালী নির্ম্মাণ করিতে হইয়াছে। স্থান-বিশেষ উচ্চ নীচ হওয়ায় জলের পতন সুন্দর দেখায়। নদীর উভয় পারে বসতি ও দেবমন্দির;

সুতরাং জল ভাঙ্গিয়া কুণ্ডের আলবালের সাহায্যে পার হইতে হয়। এখানে নানা স্থানের রাজগণ দেবালয় স্থাপন করিয়াছেন; সুতরাং মন্দিরের গঠন বহুবিধ। আমরা অতি আগ্রহের সহিত পঞ্চবটী দর্শন করিতে গেলাম। কিন্তু সেখানকার দৃশ্য অতি অকিঞ্চিৎকর! অতি অল্প দিনের পাঁচটি বটবৃক্ষ সমীপে এক খানি খোলারঘরে সীতাদেবীর গহ্বর আছে। রামচন্দ্র যে রথে আরোহণ করিয়া অযোধ্যা হইতে আসিয়াছিলেন, ভক্তগণ অদ্যাপি এখানে তাহা দেখিতে পান। নাসিকে গোদাবরী-তীর অতি রমণীয়। নগরে দর্শনীয় কিছুই নাই। অনেক দেশ ভ্রমণ করিয়া জ্ঞান হইয়াছিল, কাশীর ন্যায় মনোরম নদীতীর জগতে আর নাই। এক্ষণে দেখিতেছি, নাসিক সে বিষয়ে হীন নহে। এখানে আমার চক্ষে কোনও কোনও বিষয় কাশীর গঙ্গাতীর অপেক্ষা অধিকতর সুন্দর দেখাইল। এখানকার গঙ্গার প্রবাহ সংকীর্ণ; সেজন্য উভয় পারে ঘট্ট ও মন্দির রচিত হইয়া বারাণসী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়াছে। অসংখ্য জ্যোতির্ম্ময়ী মরাঠী ব্রাহ্মণ-ললনা সতত গোদাবরীকুল আলো করিয়া রহিয়াছেন। গৃহদেবীগণকে স্নানের পর পূজাদি করিতে প্রায় দেখা যায় না। তাঁহারা গৃহকর্ম্মেই ব্যস্ত থাকেন। দিবাভাগে যে কোন সময়ে তীর্থ দর্শন করিতে যাও, দেখিবে, বাইরা বস্ত্র ধৌত করিতেছেন ও দূর হইতে সোপানের উপর বস্ত্র তাড়নের পটাপট শব্দ শ্রুতিগোচর হইতেছে। নদীর তট এক স্থানে পর্ব্বতময়, সেইখানে পাহাড় কাটিয়া সোপান খোদিত হইয়াছে। চন্দ্রমাশালিনী সন্ধ্যাকালে তদুপরি উপবেশন করিয়া দেবালয়ের রোশন-চৌকী শুনিতে শুনিতে এবং রামকুণ্ডের উপর প্রদত্ত দীপমালার জল মধ্যে নিক্ষিপ্ত রশ্মি নিরীক্ষণ করিতে করিতে কাশীর অহল্যা বাইয়ের ঘাট মনে আসিল। কার্ত্তিকী পৌর্ণমাসীতে মহাদেব ত্রিপুরাসুর বধ

করেন। তজ্জন্য গোদাবরী তট দীপাবলিতে মণ্ডিত হইয়াছে ও দেওয়ালির উপঢৌকন দারুকাম অর্থাৎ পতাকা রমণী হস্তে পর্য্যন্ত শব্দায়মান হইয়া আনন্দলহরী তুলিতেছে। অদ্য রাত্রিকালে কপালেশ্বর রাম লক্ষ্মণ প্রভৃতির শৃঙ্গার বেশ হইয়াছে। বহু নরনারী ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছে। রাম লক্ষ্মণের মন্দিরে দুইটি অশ্ব সজ্জিত করিয়া সেবার জন্য বিগ্রহের সম্মুখবর্ত্তী প্রাঙ্গণের দুই পার্শ্বে রাখা হইয়াছে। নদী তীরে শিবলিঙ্গের উপর পিত্তলের শিবমূর্ত্তি বসাইয়া দিয়াছে। আতুর সন্ন্যাসীদের সমাধিস্থান মার্জ্জিত করিয়া, সন্তানগণ দীপ দিয়া উজ্জ্বল করিয়াছেন। পঞ্চ দ্রাবিড়দিগের মধ্যে প্রথা আছে, প্রাচীন গৃহস্থ মোক্ষ লাভ করিবার জন্য মৃত্যুকালে শঙ্করমার্গানুযায়ী সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করেন। সেই কারণে নাসিকে দুই চারি জন দণ্ডী থাকিলেও (গঙ্গাতীরে) বহু সমাধি দৃষ্ট হয়। ইংলণ্ড যাত্রাকালে এডেন নগরে কপুরথলার রাজার মৃত্যু হয়। গোদাবরীতীরে যে স্থানে তাঁহার শব দাহ করা হইয়াছে, তথায় একটি বেদী নির্ম্মিত হইয়াছে ও অন্য স্থানে তাঁহার স্মরণার্থ ইংরাজী প্রথানুযায়ী মন্দির রচিত হইয়াছে। এই স্থানে ফল মূল বিক্রয়ের হট্ট সমাবেশ হইয়া থাকে। পর পারে সাপ্তাহিক হট্ট হয়। নদীতীরে আসিলে, এই জনপদের সকল লীলা দেখিতে পাওয়া যায়। এখানকার জন সংখ্যা ২২৪৩৬।

পাণ্ডুলেনা অবশ্য দর্শনীয়। প্রথমতঃ বিবেচনা করিয়াছিলাম যে, পর্ব্বতে আরোহণ করিতে সমর্থ হইব না। চটি জুতা পায়ে থাকিলেও বোধিসত্ত্বের কৃপায় উঠিতে পারিলাম। আমি যত গুলি পর্ব্বত-খোদিত দেবালয় দেখিয়াছি, তাহার মধ্যে এইটি সর্ব্বাপেক্ষা দুরারোহ। ইহাতে অনেক গুলি বিহার নির্ম্মিত হইয়াছে। তদভ্যন্তরে নানাবিধ বৌদ্ধ মূর্ত্তি অধুনা ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের দেবতা হইয়াছেন। একটি কন্দরের বাহিরে

পালি অক্ষরে অতি বিস্তৃত লিপি উৎকীর্ণ দেখিলাম। রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর তাহার অর্থ প্রচার করিয়াছেন। খ্রীষ্টীয় শতাব্দীর প্রথম কালে এদেশে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচলিত ছিল। এই লিখনে ভূমি প্রভৃতি দানের উল্লেখ আছে এবং যে অব্দ আছে, তাহা খ্রীষ্টীয় ১১৮ হইতে ১২০ দৃষ্ট হয়। বিদেশীয় কোন কোন পণ্ডিত কহেন, আশোকের অনুশাসন লিপির পূর্ব্বে লিখন প্রথা দৃষ্ট হয় নাই। উক্ত অক্ষর আর্মেনিয়ন বর্ণমালা হইতে উৎপন্ন। ভারতীয় সকল প্রকার অক্ষরই সেমেটিক বর্ণমালা হইতে জন্ম লাভ করিয়াছে। যাঁহারা ধর্ম্মে ইহুদি, দর্শনশাস্ত্রে গ্রীক, রাজনীতিতে রোমান ও নীতিশাস্ত্রে স্যাক্সন্ জাতিকে উত্তমর্ণ করিয়াছেন, তাঁহাদের ন্যায় পরদ্রব্যগ্রাহী ব্যক্তি যদি কহেন, আমরা গ্রীকদিগের নিকট জ্যোতিষ এবং আর্ম্মানিদের নিকট লিপি-কার্য্য শিক্ষা করিয়াছি, তাহা সহসা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। পাণ্ডুলেনায় এক জন "ঘাটির" সহিত সাক্ষাৎ হইল, বোধ হয় তিনি প্রহরী; কিন্তু আমাদের কাছে পাওনার দাবি করিতে লাগিলেন। এ সকল মঠে আর বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী লোকের সহিত সাক্ষাৎ হইবার সম্ভাবনা নাই। কলিকাতায় একজন পীতবাসা যতিকে দেখিয়া তাঁহার পরিচয় লইয়াছিলাম। তিনি নেপালি বৌদ্ধ, তাঁহার নাম জিজ্ঞাসা করায় কহিলেন, শাক্য বংশ স্বাতিধর্ম্ম-ভিক্ষু। তিনি প্রত্যহ প্রসন্নকুমার ঠাকুরের ঘাটে স্নান পূজা করিতে আসেন। শেষগর্ভ নামক শালগ্রাম শিলার গাত্রে চন্দনের সহিত কুঙ্কুম কর্পূর প্রভৃতি মিশ্রিত করিয়া, লেখনী দ্বারা ভগবান্ বুদ্ধের মূর্ত্তি অঙ্কিত করেন। তদনন্তর পঞ্জিকা উদ্ঘাটন করতঃ তিথি নক্ষত্রের উল্লেখ করিয়া সঙ্কল্প করা হইলে গন্ধপুষ্প অক্ষত সহকারে পূজা করিয়া থাকেন। এক প্রকার সুগন্ধ চূর্ণের বর্ত্তি দ্বারা আরতি শেষ করিয়া "দেব লোকং

গচ্ছ” প্রভৃতি উচ্চারণ করেন। ইত্যাকার অর্চ্চনাকে ভিক্ষু মহাশয় রত্নমণ্ডল সমাধি কহেন। শালগ্রামের গাত্রে বুদ্ধ মূর্ত্তি অঙ্কিত হইল দেখিয়া, বোধিসত্ত্বকে বিষ্ণুর অবতার বলিয়া জ্ঞান হইল। শালগ্রাম শিলা এক প্রকার ত্বগাধার দেহ (Mollusca), শিরঃপদী (Cephalopoda), বর্গের বহু কোষ্ঠী (Ammoniteda) জীবের দেহাবশেষ মাত্র। গঙ্গাপুরা নামক স্থানে গোদাবরীর একটি জল-প্রপাত দেখিতে যাত্রা করা হইল। পাহাড়ের উপর হইতে অনেক নীচে, সুতরাং প্রবলবেগে জলরাশি উজ্জ্বল বর্ণ ধারণ করিয়া মহাশব্দে পতিত হইয়া ফেনিল হইয়া উঠিতেছে ; সেই জন্য এই প্রপাতের নাম দুধস্থলি হইয়াছে। মন যদি নিতান্ত নীরসও হয়, তথাপি জলের এই উচ্ছ্বাসের সহিত হৃদয়কে উথলিয়া উঠিতে হইবে। বারিধারা ক্ষুব্ধ হইয়া যে স্থানে পতিত হইয়া নয়ন ভুলাইতেছে, সেখানে অবতরণ করিয়া কিছুক্ষণ নীরবে শিলাতলে উপবেশন করতঃ ছবিখানি হৃদয়ে আঁকিতে চেষ্টা করিলাম। একজন জালিক জলের পতন মুখে মৎস্য ধরিতে লাগিল।

ত্র্যম্বক ক্ষেত্র নাসিক হইতে ১০ ক্রোশ। এতদ্দেশীয় লোকের ভ্রম আছে যে, গোদাবরী শৈল-দুর্গোপরি উড়ুম্বরী মূলে উৎপন্না হইয়াছেন এবং সেই জন্য তীর্থজীবিগণ কর্ত্তৃক উক্ত স্থানের নাম গঙ্গাদ্বার ও তন্নিম্নে তদনুযায়ী কুশাবর্ত্ত প্রভৃতি স্থান কল্পিত হইয়াছে। বাস্তবিক গৌতমী গঙ্গা এখানে উদ্ভূতা হন নাই। এখান হইতে যে ধারা বহির্গত হইয়া পয়ঃপ্রণালী দিয়া যাইতেছে, তদ্দ্বারা নালার কঙ্কর সিক্ত হইতেছে না। স্থানীয় লোককে জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর পাওয়া যায়, এখানে গঙ্গা গুপ্তা হইয়া যাইতেছেন। আমরা যখন ত্রি-অম্বকে পৌঁছিলাম, তখনও কার্ত্তিকী পূর্ণিমার উৎসব শেষ হয় নাই। ত্র্যম্বকেশ্বর

জ্যোতির্লিঙ্গের মধ্যে গণ্য। ব্রাহ্মণেতর বর্ণ, এমন কি পট্ট বস্ত্র পরিহিত না হইলে ব্রাহ্মণগণও, দেবসমীপে উপস্থিত হইতে পারে না। বাজিরাও কর্ত্তৃক নির্ম্মিত ত্র্যম্বকেশ্বরের সুবৃহৎ মন্দির দর্শন করিয়া, আমরা প্রকৃত প্রস্রবণের উপর শয়ান শেষশায়ী প্রভৃতি অনেক বিগ্রহ যুক্ত, চৌদিকে মণ্ডপ বিশিষ্ট, উৎসজল পূর্ণ কুশাবর্ত্ত নামক মনোহর কুণ্ড সমীপে মহামরীদেবীর বলি প্রেরণ দেখিতে উপস্থিত রহিলাম। এ গ্রামে তিন সহস্র লোকের বাস। প্রত্যেক গৃহস্থের নিকট এক মুষ্টি তণ্ডুল গ্রহণ করিয়া অন্ন পাক করা হইয়াছে। একখানি গরুর গাড়ীতে ভাত বোঝাই দিয়া তাহার উপর রক্তবর্ণ চূর্ণ প্রক্ষেপ করিয়া ইক্ষু দণ্ড ও প্রজ্বলিত মশাল প্রোথিত করিয়া দিলে, অগ্নিহোত্রী ও দেশমুখ সেই স্থানেই দেবীকে বলি [ভাতের গাড়ী] নিবেদন করিয়া দিলেন। যুগন্ধরের উপর একটি নারিকেল ভগ্ন করিয়া বাদ্যোদ্যমের সহিত শকট পরিচালন করা হইল। গ্রামের বাহির দিয়া বলি আসিলে, তবে জানপদগণ অন্ন ভোজন করিতে পাইবেন। পাণ্ডা গণপতি শঙ্কর শুকুল মহাশয়ের বাটীতেই আমাদের আহার করা স্থির হইল। আমার সহচর বিদেশীয়ের অন্ন গ্রহণ করিবেন না বলিয়া, “মুরমুরে” [মুড়ী] ও পেঁড়া খাইলেন। উপাধ্যায় পত্নীরা পরিবেশন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রথমতঃ একটি বধূ পাতের উপর দুই তিন প্রকার চাটনি দিয়া গেলেন। অন্য জনে প্রত্যেক পাত্রে একটি করিয়া দোনা রাখিয়া দিলেন। তৃতীয় বাতা অন্ন আনিলেন। ভাত অতি অল্প পরিমাণে দিতে দেখিয়া ভাবিলাম এ দেশের লোকের আহার কি এত কম? আমাদের গ্রাম্য ভাষায় যাহাকে ডাবু বলে, সেই হাতায় করিয়া চাপিয়া এক হাতা ভাত পাতের উপর উল্টাইয়া ঢালায় মাথাটী গোল হইয়া রহিল; যে দোনা দেওয়া হইয়াছিল, তাহাতে তরল ঘৃত প্রদত্ত হইলে

এবং অধিকাংশ ব্যঞ্জন দিলে পর ভোজন আরম্ভ হইল। যে উপকরণটি ওদনের সহিত মুখে দেওয়া যায়, হয় কটু নতুবা অম্ল। এত ঝাল যে, কিছুতেই আমি গলাধঃকরণ করিতে সমর্থ হইলাম না। পরিবেশন-কারিণী জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুপ" চাই। আমি বুঝিতে না পারায়, কি বস্তু প্রশ্ন করিলে, তিনি কহিলেন, ঘৃত। ভোজনের প্রথম অবস্থায় ঘৃত আবশ্যক হয় জানি, সুতরাং কহিলাম, না। তাহার পর "পোলি" দিয়া গেল। সিদ্ধ বুটের ডাল শর্করা যোগে দলিয়া যে রুটিতে পুর দেওয়া হয়, তাহার নাম "পুরন্‌-চ্যা পোলি"। উষ্ণ ঘৃতে নিমজ্জিত করিয়া তাহা খাইতে হয়। পুনর্ব্বার ঘৃত আনিলে আমি ঘি চাহিয়া লইলাম এবং পোলি দ্বারা উদর পূরণ করিলাম। যে পোলি পরিবেশন হইতেছিল, তাহাও উষ্ণ। এখন বুঝিতে পারিলাম যে, রুটি মহারাষ্ট্রীয়দের প্রধান খাদ্য; এই জন্য প্রথমে ভাত অল্প করিয়া দিতে হয়। একটি বৌ ক্লান্ত হইয়া আমার সম্মুখে আসিয়া বসিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, বাইজি তুমি আহার করিতে বস নাই কেন? তিনি কেবল 'না' কহিলেন। পার্শ্বে একটি স্ত্রীলোক আহার করিতেছিলেন, তিনি কহিলেন. ইনি দেবরাণী, অর্থাৎ কনিষ্ঠ ভ্রাতার স্ত্রী, কে তাঁহাকে অগ্রে দিবে? পুনায় একদিন মরাঠী আহার করিয়াছি, তাহার উপস্কর ও চুক্র আমাদের পক্ষে অখাদ্য। সূপ ও শাক একসঙ্গে—কচু শাক কুটিয়া দিয়া ডাল রন্ধন হইয়াছিল। তাহা এত ঝাল যে, দুই একবারের অধিক মুখে দেওয়া সম্ভব নহে। অকিঞ্চিৎকর 'কড়ী' খাইয়া দেখিলাম। একটি চুক্রের অত্যন্ত গুণ শুনিলাম, তাহার নাম 'সার'। পাচক কহিলেন, এদেশে সকলে ইহা পাক করিতে জানে না। ইহা কর্ণাট দেশীয় সামগ্রী। ইহাতে আবার ঔষধের কাজ হয়; জ্বর হইলে সার উপকারী। এই অমূল্য বস্তু জিহ্বায় প্রদান করিয়া দেখিলাম, পক্ব তিন্তিড়ী গুলিয়া লঙ্কা

সহযোগে ধনিয়াশাক বাসিত করা হইয়াছে। সে দিন ভাতে অম্ল ও কটু রস বিহীন ডাল পাইয়াছিলাম বলিয়া, কিছু ওদন উদরস্থ করিতে পারিলাম। স্বাদ গ্রহণের জন্য একখানি জওয়ারা ও একখানি গোধূমের রোটিকা দিয়াছিলেন। জওয়ারার রুটি দেখিতে মলিন, কিন্তু গোধূম অপেক্ষা মিষ্ট। রুটি ঘি মাখা নহে, কিন্তু দুধে ফেলায় ময়ানের ঘৃত ভাসিতে লাগিল। বাজরার রুটি তৃতীয় স্থানীয়, কৃষাণ প্রভৃতি এতদ্দেশীয় অধিকাংশ লোকে তাহা দ্বারা জীবন ধারণ করে। চৌধরি নামক এদেশের এক তরকারি আমরা পুনা ও বোম্বাইতে রাঁধিয়া খাইয়াছি। শিখরেণ বড় প্রসিদ্ধ খাদ্য, দধি জলহীন করিয়া শর্করা এলাফল এবং কুঙ্কুম মিশ্রিত করিয়া ইহা প্রস্তুত করিতে হয়। আমরা বাজারে ক্রীত যে শিখরেণ খাইয়াছি, তাহা বিশেষ সুখাদ্য নহে। বোম্বাই প্রভৃতি স্থানে অনেক হিন্দুর চা ও কাফি পানীয়ের দোকান আছে। ত্র্যম্বকে গঙ্গাদ্বারের ৩২টি সোপান উঠিয়া "ধর্ম্মাধ্যক্ষ ধর্ম্মখাতা চেমালক" রঘুনাথ বাপু শাস্ত্রী কবীশ্বর "ধর্ম্মপেটী" লইয়া বসিয়া আছেন ; তিনি তাঁহার সহধর্ম্মিণী কর্ত্তৃক প্রস্তুত চা পান করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন, এবং বিদায় কালে কহিলেন, আমার বাটীতে পান সুপারী লইতে যাইও।

দেবগিরি। *

অপরাহ্নে আমরা নান্দগাঁও ষ্টেশনে পৌছিয়া মেল-কণ্ট্র্যাক্টরের কার্য্যালয়ে অবস্থিতি করিলাম, তিনি পারসী। আমরা জলযোগের উদ্যোগ করিলে অংশুমৎফল উপহার পাইলাম। ঔরঙ্গাবাদ এখান হইতে ২৮ ক্রোশ। একখানি ডাকের টাঙ্গায় যাতায়াতের ভাড়া ৫০৲ টাকা। আমরা রাত্রি ৮টার সময় "টপালে" উঠিলাম। শকটচালক স্থানে স্থানে অশ্ব পরিবর্ত্তন করিতে লাগিল ও বিউগল ধ্বনিত করিয়া "ডুমনি" পরিচালকের ত্রাস উৎপাদন করতঃ অর্দ্ধনিদ্রিত অবস্থায় আমাদিগকে গন্তব্য স্থানে লইয়া চলিল। পর্ব্বত সন্নিহিত স্থানে শীতের জন্য কষ্ট বোধ হইতে লাগিল। মুখাবরণ মুক্ত করিয়া চক্ষুরুন্মীলন করতঃ দুই এক বার দেখিলাম, ধরা জ্যোৎস্নাময়ী, 'ছুটিছে চন্দ্র ঘনদলে দলি'। ৫ ক্রোশ পরে কাসরি গ্রাম অতিক্রম করিয়া নিজাম রাজ্য আরব্ধ হইয়াছে। উভয় রাজ্যের সীমা গোলাকার প্রস্তরের স্তূপ দ্বারা চিহ্নিত হইয়াছে। বেলা ৯টার সময় ঔরঙ্গাবাদের পরপারে গণ্ডানালা তীরে উপস্থিত হইলাম ও তথায় বৃটিশ সেনানিবাসে বালাজীর মন্দিরে অবস্থান করিলাম। ইংরাজ মিত্ররাজ্য রক্ষার জন্য একটু স্থান অধিকার করিয়া, তথায় আপন অনুচর স্থাপন করেন। সে স্থান দেশীয় রাজার হইলেও শাসনভার ইংরাজের হস্তে থাকে। বিবি মকবরা অর্থাৎ সম্রাট ঔরঙ্গজেবের তনয়া রবিয়া গোরস্থান ও পনচক্কি দর্শন করিয়া, ঔরঙ্গাবাদে তালুকদার*

---

* (১) Caves of Elora—Jas. Burgess প্রণীত। (২) বিবিধার্থ সংগ্রহ—শ্রীরাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্পাদিত।

(৩) ভূগোল হস্তামলক— রাজা শিবপ্রসাদ প্রণীত।

দোয়েম মহাশয়ের নিকট হইতে দৌলতাবাদের দুর্গ প্রবেশার্থ অনুমতি পত্র গ্রহণ করিলাম। রজনীর শেষ যামে প্রত্যাবর্ত্তনের পথ অনুসরণ করিয়া যাত্রা করা হইল।

কিছু বেলা হইলে প্রাচীরবেষ্টিত দৌলতাবাদের বিধ্বস্ত পুরী মধ্যে প্রবেশ করা গেল। এই না সেই স্থান, যেথানে মহম্মদ তোগলক শা (যিনি রৌপ্যমূল্যে তাম্রমুদ্রা প্রচলিত করেন) দিল্লীর অধিবাসীদিগকে বলপূর্ব্বক উদ্‌বাস্ত করিয়া আনয়ন করতঃ রাজধানী স্থাপন করিয়া দেব-গড়ের দৌলতাবাদ নামকরণ করিয়াছিলেন? ঔরঙ্গাবাদ প্রদেশে আগমন করিয়া আমি এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিতেছি, যেন মরাঠী ভূমিতে হিন্দুস্থানী জনপদ তুলিয়া আনা হইয়াছে। সর্ব্বত্র টুপি ও পায়জামা পরিহিত মুসলমান নয়নগোচর হওয়ায়, বিশেষতঃ তাহারা হিন্দি ভাষা ব্যবহার করায়, ঐ ভাব মনে উঠিয়াছে। পূর্ব্বদিন ঔরঙ্গাবাদ যাইবার সময় ও অদ্য বহুদূর হইতে প্রাসাদ শোভিত কর্ত্তিত-বপু বৃত্তাকার উত্তুঙ্গ দেবগিরি দর্শন করিয়া কৌতূহলী হইয়া রহিয়াছি, এক্ষণে তাহার সমীপে উপস্থিত হইতে পারিলাম। দুর্গের প্রথম ভিত্তির মধ্যে প্রবেশ করিয়া শুনিলাম, ঔরঙ্গাবাদের তালুকদার দুর্গ পরিদর্শনে আসিয়াছেন। অদ্য তিনি এখানে মোকাম করিয়া, দুর্গরক্ষী সেনাগণের শিক্ষা-কৌশলাদি দেখিবেন। নিজাম-উল্‌-মুল্‌কের সৈন্যদিগের পরিচ্ছদ ও অস্ত্র ইংরাজ-দিগের সিপাহীর ন্যায়। প্রবেশপথে কয়েকটি ক্ষুদ্র তোপ দেখিলাম। তালুকদার এক জন পারসী। আমরা কোথা হইতে আসিয়াছি, জিজ্ঞাসা করিলেন। দারোগা দুর্গ দেখাইবার জন্য এক জন অনুচর ও মশালচি সঙ্গে দিলেন। কিয়ৎদূর যাইয়া একটি জয়স্তম্ভ অর্থাৎ মিনার নয়নগোচর হইল। প্রথম মুসলমান অধিকারকালে ঐ স্তম্ভ স্থাপিত হয়। তাহার পর আর একটি প্রাকার। দ্বার রুদ্ধ; কাটা কপাটের মধ্য দিয়া প্রবেশ

করিতে হয়। দ্বার-রক্ষক সান্ত্রী কহিল,—"তোমাদের নিকট যদি বিলাতি দিয়াসলাই বা কোন প্রকার শস্ত্র থাকে, বাহিরে রাখিয়া যাও।" পথ ক্রমশঃ উচ্চ হওয়াতে এখন আমাদিগকে সোপান দ্বারা অবতরণ করিতে হইল। তৎপরে পরিখা। খাতের উপর সেতু আছে। প্রকৃত দেবগড় এখন আরম্ভ হইল। পর্ব্বতটি একখণ্ড প্রস্তরে নির্ম্মিত। পিণ্ডাকার শিবের মত। অগ্রভাগ সঙ্কীর্ণ। মূল হইতে ১২০ ফিট উর্দ্ধে চতুর্দ্দিকে প্রস্তর কর্ত্তিত করিয়া সম্পূর্ণ সরল করা হইয়াছে। সেতু রক্ষার জন্য অস্ত্র প্রক্ষেপার্থ পরপারে ছিদ্রসমন্বিত গৃহ অতিক্রমণ করিয়া কয়েকটি সোপানযোগে উপরে উঠা হইল। তাহার পর গিরির অন্তরে প্রবেশ করিয়া উপরে যাইতে হইবে। দ্বারদেশে শিলায় খোদিত কার্য্য দেখিলেই, হিন্দু শিল্প বলিয়া চিনিতে পারা যায়। প্রথমে মশালের আলোক সাহায্যে সুড়ঙ্গপথে দুই একটি গৃহ পার হইয়া উপরে উঠা গেল। শৈলতলে পাষাণ খুদিয়া এই পথ ও গৃহ প্রস্তুত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন কেল্লায় উঠিবার দ্বিতীয় পথ নাই। রিপু যদি তমসাচ্ছন্ন পথে এ পর্য্যন্ত অগ্রসর হইতে সমর্থ হয়, তাহার প্রতিবিধানের জন্য, সুড়ঙ্গ মুখে উপর হইতে লৌহ-খর্পর রক্ষা করিয়া অগ্নি স্থাপনের ব্যবস্থা ছিল। উপরে সোপানের সংখ্যা এত অধিক যে, মধ্যে আমাকে বিশ্রাম করিতে হইল। দুর্গ নামটি অন্বর্থ হইয়াছে বটে। ক্রমশঃ বারদ্বারিতে পৌঁছিলাম। ইহার মধ্যস্থলে প্রাঙ্গণ, চতুর্দ্দিকে আলয়। দুর্গ মধ্যে এইটি কেবল আশ্রয় স্থান। অন্য সমতল ভূমি বিরল। এখানে জীবনধারণের জন্য একটি উৎস আছে। আরও কিছু উঠিয়া গিরিরাজের শিখরদেশে সমুপস্থিত হইলাম। ভিন্ন ভিন্ন স্থানে তিনটি প্রাচীন শতঘ্নী পূর্ব্ব মহিমা প্রকাশ করিতেছে। একটির নাম কালাপাহাড়। দ্বিতীয়টির নাম মেড়া; এই তোপের যে দিকে ঔর্ব্বাস্ত্র প্রয়োগ করিতে হয়, তাহার বিপরীত ভাগে মেষের মুখ নির্ম্মিত

আছে বলিয়া ইহার ঐ নাম হইয়াছে। তৃতীয় শতঘ্নীটি সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ স্থানে নিজামের ধ্বজতলে রক্ষিত। ইহার নাম বালাহিশার; কিন্তু মহারাষ্ট্রী মুণ্ডা অক্ষরে শ্রীদুর্গা অভিহিত হইয়াছে। পারস্য লিপি তিন তোপেই আছে। শ্রীদুর্গা বা বালাহিশার হিন্দু ও যবন উভয় রাজ্য দেখিয়াছে। কত লোক ইহাকে আপন বলিয়াছে, ইনি বসিয়া রহস্য দেখিতেছেন। এত বড় তোপ এরূপ দুর্গম স্থানে আনয়ন অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়। অনুমান হয়, ইহা পর্ব্বতের উপরেই ঢালাই হইয়া থাকিবে। বন্ধ-দুর্গ হইতে বহির্গত হইতে পারিয়া যে, আমরা গিরিদুর্গের এ সকল ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হইয়াছি, ইহা সৌভাগ্যের কথা। এইটি লইয়া আমি তিনটি পার্ব্বত্য দুর্গের উপরে উঠিয়া দেখিয়াছিলাম ;—তারা-গড়, সিংহগড় ও দেবগড়। বলা বাহুল্য যে, দেবগড় সর্ব্বপ্রধান। দেব-গিরির ন্যায় স্থানকে পরাজিত করিবার, পূর্ব্বকালের একমাত্র উপায়, দুর্গ অবরোধ করিয়া ভক্ষ্য দ্রব্যের আগমন রহিত করা; তাহা হইতে অধিবাসিগণকে আত্মসমর্পণ করিতে হইত। নতুবা তখন আক্রমণ করিয়া কেহ দুর্গ জয় করিতে পারিতেন না। পূর্ব্বে যখন কেবল ধনুর্ব্বাণ ও তরবারির সাহায্যে যুদ্ধ হইত, তখন দুর্গ নিতান্ত প্রয়োজনীয় ছিল। অধুনা 'মাউনটেন ব্যাটারি' সৃষ্ট হইয়া দুর্গ অকিঞ্চিৎকর হইয়াছে। ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগে আলাউদ্দিন খিলজি অষ্ট সহস্র সামন্ত সহ উপনীত হইলে, রাজা রামদেব রাও যদুনগরী রক্ষণে অপারগ হইয়া, এই দেব-গিরিতে আশ্রয় লইয়াছিলেন। যবন হস্ত হইতে এই দুর্গ উদ্ধার করিবার মানসে নরপুঙ্গব হরপাল দেব প্রভৃতি দুর্গ অবরোধ করিয়াছিলেন। দিল্লীশ্বর জীবদ্দশায় হরপালের সম্পূর্ণ চর্ম্মোত্তোলন করিয়া, তাঁহাকে বধ করেন। তাহার পর ১৬৩১ খ্রীষ্টাব্দে, শাহজি বিজয়পুরের সুলতান মহম্মদ আদিল শা'র পক্ষ হইয়া এই দুর্গ আক্রমণ করেন।

রৌজা একটি বিনষ্ট নগর। এই স্থানে ঔরঙ্গজেব বাদসাহের সমাধি আছে। রৌজায় তাঁহার গুরুর কয়েকটি প্রস্তরময় শৃঙ্খল দেখিলাম। আশ্চর্য্যের বিষয়, উহা অখণ্ড প্রস্তর কাটিয়া প্রস্তুত করা হইয়াছে। যে পর্ব্বতে ইলোরার গুহা খোদিত হইয়াছে, তাহার মস্তক-মার্গে অবতরণ করিয়া বিরুল গ্রামে স্নানাহারের জন্য যাওয়া হইল। গ্রামের বাহিরে স্থান প্রাপ্ত হইলাম। বিটপি যুক্ত বাপীতটে অহল্যা বাঈ নির্ম্মিত খণ্ডবা-দেবের মন্দিরে আশ্রয় লইয়া, ভক্ষ্য আহরণার্থ ভৃত্যকে গ্রাম মধ্যে পাঠাইলাম। অগ্নিহোত্র-নিরত গজানন শাস্ত্রী আসিয়া ঘুস্মেশ্বর দর্শন ও সেখানে রুদ্রী পাঠ করাইবার জন্য প্রবৃত্তি লওয়াইতে লাগিলেন। তিনি কহিলেন, নিজামের শাসন প্রণালী উদার; হিন্দুর দেব-সেবার জন্য তিনি বৃত্তি দিয়া থাকেন। এই গ্রামে ১৫৯৪ খৃষ্টাব্দে সাহজী জন্মগ্রহণ করেন। মন্দিরে বসিয়া শুনিলাম, একজন গুরু জলাশয়ের বিভিন্ন প্রদেশে পৃথক্ পৃথক্ তীর্থের নাম করিয়া যাত্রীদিগকে স্নান করাইতেছেন। ধন্য বিশ্বাস! স্বপান্ন দ্বারা উদরের পূজা করিয়া উঠিতে বেলা প্রায় দুইটা হইল। এক্ষণে চিরপ্রার্থিত ইলোরার গুহা দর্শন করিতে চলিলাম।

প্রকৃত দেবগিরি অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি। পূর্ব্ব পশ্চিমে ব্যায়ত, কিন্তু উচ্চ নহে। মধ্যভাগ অপেক্ষা ভুজদ্বয় অধিক উচ্চ। ইহার অধিকাংশ ক্রমশঃ অবনত। বিস্তার অর্দ্ধ ক্রোশ। ভারতের আশ্চর্য্য স্থানের মধ্যে এ শৈল অবশ্য গণনীয়। এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত পর্ব্বতের অঙ্গ খোদিত করিয়া ৩৪টি বাটী প্রস্তুত করা হইয়াছে। ইহার কোন অংশও গ্রথিত নহে। প্রাচীর, স্তম্ভ, ছাদ ও মেজিয়া সকলই একখণ্ড প্রস্তরে প্রস্তুত। প্রিন্স অফ্ ওয়েলসের ইহা দেখিবার কথা ছিল বলিয়া, তদবধি স্যার সালার জঙ্গ এই স্থানটি পরিষ্কৃত করিয়া রক্ষক নিযুক্ত করিয়া রাখিয়াছেন। ৩৪টি দেবায়তনের মধ্যে ১২টি বৌদ্ধ, ১৭টি শৈব ও

৫টি জৈন। বর্জেস্ সাহেব দর্শকবর্গের সুবিধার জন্য যে পুস্তিকা প্রচার করিয়াছেন, তাহাতে ঐ সকল গুহা কাহাকর্ত্তৃক কোন্ সময়ে নির্ম্মিত, তাহার কোন উল্লেখ করেন নাই। এ বিষয়ে কেবল ইলু নামক রাজার উপাখ্যানই ইতিহাস। নির্ম্মাতারা অবশ্য ভাবিয়াছিলেন, আমাদের কীর্ত্তি চিরস্থায়ী হইয়া চিরদিন সংসারে আমাদের খ্যাতি রাখিবে। খ্যাতি অবশ্য আছেই, কিন্তু কাহার, একথা বলিবার উপায় নাই। একস্থানে ধর্ম্মের বিভিন্ন স্তর অনুসারে কেমন পূর্ব্বাপর ভাবে বৌদ্ধ, শৈব ও জৈন ভজনালয় গুলি রচিত হইয়া উঠিয়াছে। এক মতের পর কালসহকারে অন্য মতের উদ্ভব হইল; ইলোরার গিরি তাহার নিদর্শন রাখিতে লাগিলেন। ভিন্ন ভিন্ন সময়ে এক স্থানের কার্য্য কিছু বিচিত্র। শাক্যমুনি ৬২৩ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়া, ৮০ বৎসর বয়সে অর্থাৎ ৫৪৩ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে নির্ব্বাণ লাভ করেন। খৃঃ সপ্তম শতাব্দীতে তাঁহার ধর্ম্ম অবনত হইতে আরম্ভ হয়। অষ্টম শতাব্দীতে ক্রমে তিরোহিত হইতে আরম্ভ হইয়া, নবমে উহা ভারতবর্ষ হইতে লুপ্ত হইল। তবে বারাণসী প্রভৃতি স্থানে একাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত বৌদ্ধ ধর্ম্ম দেখা দিয়াছে। চট্টগ্রামে বাঙ্গালী বৌদ্ধ আছে। তাহাদের ধর্ম্মভাষা তুরাণীয় বা মগ। নেপালে ১৪০০ ঘর বৌদ্ধের বাস। তাহারা অনার্য্যবংশীয়। বৌদ্ধভাব রক্ষা ও মূল ভাষায় ধর্ম্মশাস্ত্র ব্যবহার করিয়া থাকে। কিন্তু নেপালীরা তুরাণীয় জাতি। বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতে কখনও সর্ব্বব্যাপী হয় নাই। যে সময় ঐ ধর্ম্ম উন্নত হইতে ছিল, তখন শৈব সম্প্রদায় বর্দ্ধিত হইতেছিলেন।

এক জরাগ্রস্ত ব্যক্তিকে দেখিয়া মায়াদেবীসুত সংসারের প্রতি বীত-রাগ হন। সেই ভাবটি তাঁহার হৃদয়ে আঘাত করিয়া, এমন স্থায়ী হইল যে, উহার প্রভাবে তিনি অস্থির হইয়া পড়িলেন এবং চিরজীবন তাহা দ্বারা পরিচালিত হইলেন। উপদেশ প্রচার করিলেন,—সংসারের সকল

বস্তুই ক্ষণভঙ্গুর, অতএব তোমরা নির্ব্বাণ কামনায় যত্নশীল হও। অতি ভয়ানক উপদেশ। ইহাতে উন্নতির চেষ্টা একেবারে নিবৃত্তি পায়। মায়াবাদের মূল, ঐ উপদেশের উপর জন্মলাভ করিয়াছে। বৈরাগ্য, মুক্তি প্রভৃতি অজ্ঞাত-পূর্ব্ব বিষয় যাহা হিন্দু যতির সেবনীয়, তাহা বুদ্ধ কর্তৃকই উপদিষ্ট। সিদ্ধার্থ বুদ্ধ হইয়া কহিয়াছেন, বীজ যে অঙ্কুরকে জন্মায়, তাহাতে বীজের এমন জ্ঞান হয় না যে, অঙ্কুরকে জন্মাইতেছি। অঙ্কুরেরও এমন জ্ঞান হয় না যে, আমি বীজ হইতে জন্মলাভ করিয়াছি। অতএব বীজাদিতে চৈতন্য ও চেতনান্তরের অধিষ্ঠান না থাকিলেও তাহাদের মধ্যে কার্য্য-কারণ ভাবের ব্যাঘাত নাই। যেমন বাহ্য কার্য্যের জ্ঞান পূর্ব্বক উৎপত্তি নাই, তেমনি আধ্যাত্মিক কার্য্যেরও নাই। অর্থাৎ বলা হইল যে, জগতের কোনও চৈতন্যবান্ স্বতন্ত্র কর্ত্তা নাই। পূর্ব্বজন্ম ও পরজন্মে অতি দৃঢ় বিশ্বাস থাকায়, জীব নিজ কর্ম্ম দ্বারা সুখ দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে বুঝিয়া, বুদ্ধ, তাহার মূল যে জন্ম, যাহাতে তাহা আর না হয়, তজ্জন্য নির্ব্বাণ কামনা করা একান্ত কর্ত্তব্য জ্ঞান করিলেন। নিঃ-শ্রেয়স লাভের জন্য ধ্যানযোগ আবশ্যক বিবেচিত হওয়ায়, বৌদ্ধ ধনিকেরা যতিদিগের জন্য নিভৃত স্থানে, গিরিকন্দরে বিহার নির্ম্মাণ করিতে লাগিলেন। তাহাতেই আমরা উপস্থিত স্থানের অতি চমৎকার নৈপুণ্য দর্শন করিতে সমর্থ হইয়াছি। যদি ঐ সকল ও অন্যবিধ সংস্কার না থাকিত, তাহা হইলে দিলওয়াড়া ও দেবগিরির মন্দির কোথায় পাইতাম ?

একজন প্রদর্শক আমাদের সঙ্গ লইলেন। স্থানীয় লোকে প্রধান দেবালয় গুলির বিবিধ নাম রাখিয়াছে। আমরা ধেড়ওয়াড়া পরিত্যাগ করিয়া মহারওয়াড়া, বিশ্বকর্ম্মা বা 'সুতার কা ঝোপড়া' এবং দোথাল প্রভৃতি দর্শন করিয়া তিনথাল নামক বৌদ্ধ মঠে প্রবেশ করিলাম।

এই গুহা তিন তলা,—প্রথম তলার নাম পাতাল, দ্বিতীয় তলার নাম মর্ত্ত্য লোক এবং তৃতীয় তলার নাম স্বর্গ; এই জন্য নাম হইয়াছে তিন থাল অর্থাৎ তিন লোক। ইহার গর্ভগৃহে বুদ্ধদেবের দিগম্বর মূর্ত্তি ধ্যান মুদ্রা ধারণ করিয়া যোগাসনে উপবিষ্ট। প্রাচীরের সর্ব্বত্র পদ্মাসনোপবিষ্ট স্ত্রী মূর্ত্তি, তাহাদের মস্তকে বুদ্ধ দেবের অবয়ব খোদিত রহিয়াছে। বিরুল গ্রামের ব্রাহ্মণেরা বুদ্ধদেবের মূর্ত্তিকে রামচন্দ্র বলিয়া সিন্দুর দ্বারা তাঁহার হস্ত পদ ও গলদেশ রঞ্জিত করিয়া দিয়াছেন। প্রবেশ দ্বারে দুই প্রকাণ্ড দ্বারপাল স্থাপিত আছে। মর্ত্ত্যলোক স্বর্গের তুল্য। গর্ভস্থানে বুদ্ধমূর্ত্তি। প্রাচীরে স্ত্রী পুরুষ দ্বারা উপাসিত হস্ত্যাদি বাহন বিশিষ্ট বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি। প্রধান প্রতিমা স্বর্গলোকে স্থাপিত মূর্ত্তির তুল্য, কিন্তু ব্রাহ্মণেরা তাঁহাকে লক্ষ্মীদেবী কহেন; পাতাল লোকে নিবিষ্ট তদ্রূপ বিগ্রহকে নাগরাজ কহে। মন্দিরে যাইয়া ছত্র বন্ধ করিলে অদ্ভুত শব্দ হয়। তৎপরে রাবণকা কর ও দশ অবতার দেখিয়া নবম শতাব্দীতে নির্ম্মিত কৈলাস রঙ্গমহলে পৌঁছিলাম। দেবগিরিস্থ দেবালয় সকলের মধ্যে এইটি সর্ব্বোৎকৃষ্ট। উড়িষ্যার খণ্ডগিরি, বোম্বাইয়ের ঘারাপুরী বা নাসিকের পাণ্ডুলেনা,—আমি যে কয়টি পর্ব্বতখোদিত বিমান দেখিয়াছি, এখানকার মত এমন বিস্ময়জনক স্থাপত্য দ্বিতীয় দর্শন করি নাই। কৈলাস, শৈলতলে খোদিত হইয়া মস্তকের পাষাণ ভাগ হইতে নিষ্কাষিত হইয়াছে। যেন শূন্য স্থানে, আনীত প্রস্তর দ্বারা গ্রথিত মন্দির। একটি বৃহৎ চতুঃশাল ভবন মধ্যস্থলে, প্রাঙ্গণ মধ্যে শিখর-চূড়া সম্বলিত অত্যুচ্চ মন্দির দিবাকর-প্রভায় বিরাজ করিতেছে। উঠান ৩৬৭ হস্ত দীর্ঘ। ইহার সম্মুখে এক অপূর্ব্ব তোরণ, বাদ্যশালা ও মন্দির গৃহ আছে। উঠানের অপর তিন দিকে অতি সুরম্য স্তম্ভ দ্বারা নির্ম্মিত অলিন্দ। উহার প্রাচীরে অর্দ্ধ স্তম্ভ-আকারে বহু ছড় থাকাতে তাহা অসংখ্য চতুষ্কোণাকার স্থানে

ইলোরা—কৈলাস
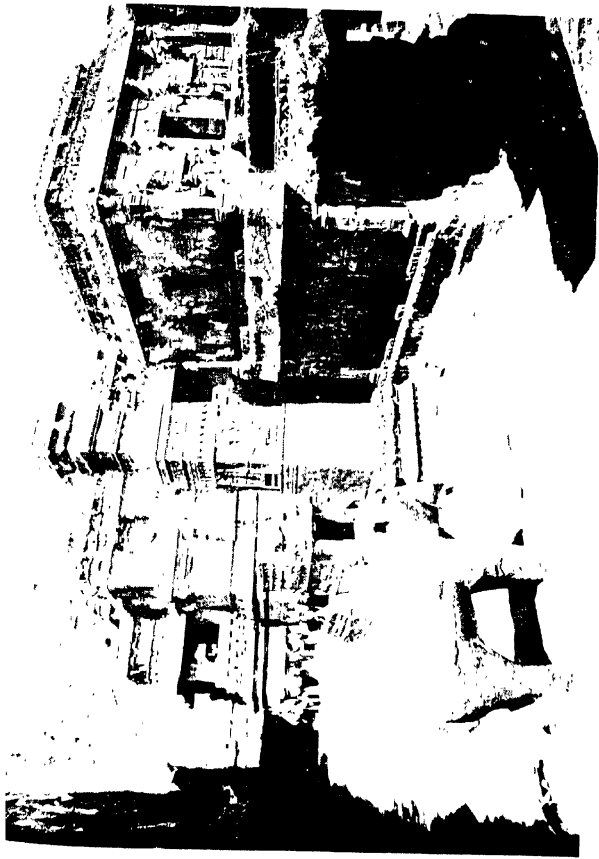
(ভারত প্রদক্ষিণ)

বিভক্ত হইয়াছে। উহার মধ্যে ব্রহ্মা, বিষ্ণু মহেশ্বরাদি মূর্ত্তি আছে। কোন স্থানে রাবণ আপন মুণ্ডচ্ছেদ করতঃ মহাদেবের পূজা করিতেছেন। কোনও স্থানে পার্ব্বতীর শিবলিঙ্গ পূজা। কোথাও বা হরপার্ব্বতী একাসনে উপবিষ্ট হইয়া পাশ-ক্রীড়া করিতেছেন, সম্মুখে নাগ ও নন্দী উপস্থিত; ঐরূপ অন্যত্র ক্ষীরোদশায়ী, বরাহ অবতার, নৃসিংহ, কৃষ্ণ কর্ত্তৃক কালিয় দমন, বটুক ভৈরব, কপাল ভৈরব, নবযোগিনী ভৈরব ইত্যাদি বহুল মূর্ত্তি, এবং রাবণ কর্ত্তৃক কৈলাসোত্তোলন প্রভৃতি। এখানে রামায়ণ ও মহাভারতের নানা পৌরাণিক ব্যাপার খোদিত হইয়াছে। ইহাতে কি পর্য্যন্ত শ্রম ও ব্যয় হইয়াছে, তাহা অনুমান করিতে হইলে মন ভ্রান্ত হইয়া পড়ে! যে রাজার আজ্ঞায় এই অদ্বিতীয় কীর্ত্তি নিষ্পন্ন হইয়াছিল, তাঁহার সম্পত্তি অনুভব করিতে গেলে স্বপ্নের ন্যায় বোধ হয়। বাদ্যশালার সেতু অতিক্রম করিয়া (নিম্নদেশে) নন্দিগৃহের তলভাগে, যেখানে মন্দিরের উপর উঠিবার সোপান, সেই স্থানটি গাড়ি-বারান্দার ন্যায়। তাহার সম্মুখে অর্থাৎ প্রবেশ দ্বারের পার্শ্বে দিক্-হস্তী কর্ত্তৃক স্নানীয় জলপূর্ণ উত্তোলিত কুম্ভতলে, কমল বনে, নলিনীদল যুক্ত জলোপরি মহালক্ষ্মী উপবেশন করিয়া রহিয়াছেন। ভাস্কর্য্য বিদ্যার অতুল ক্ষমতায় জল পর্য্যন্ত পাষাণে খোদিত হইয়াছে। কমলদলে কয়েকটি অক্ষর দেখিতে পাওয়া যায়। তৎপশ্চাতে কৈলাস প্রাসাদ। ঐ প্রাসাদ মন্দির-পঞ্চকের মধ্যগত একশত হস্ত উচ্চ এক অপূর্ব্ব মন্দির; এবং তচ্চতুষ্কোণে তদপেক্ষা ক্ষুদ্র কিন্তু তত্তুল্য সুচারুরচিত মন্দির-চতুষ্টয়, হস্তী ও ব্যাঘ্র পৃষ্ঠে স্থাপিত। প্রধান মন্দির ৪৪ হস্ত দীর্ঘ ও ৩৭ হস্ত প্রশস্ত। গর্ভস্থানে প্রকাণ্ড শিবলিঙ্গ স্থাপিত আছে। দীপ জ্বলিতেছে। নিত্য পূজা হয়। পূজারি দীপের জন্য ঘৃত ক্রয় করিতে হইবে বলিয়া আমাদের নিকট কিছু অর্থ যাচ্ঞা করিলেন। গৌরী-পট্ট পরীক্ষা করিয়া

দেখিলাম, কাশীস্থ প্রাচীন আকারের বটে। প্রাচীর ও ছাদের সর্ব্বত্র অপর্য্যাপ্ত দেবমূর্ত্তিতে পরিপূর্ণ। ছাদ ষোড়শ স্তম্ভ ও দ্বাবিংশতি অর্দ্ধ-স্তম্ভোপরি স্থাপিত। ছাদের মধ্যভাগে লক্ষ্মী নারায়ণের মূর্ত্তি বিরাজমান আছে। কৈলাসের দক্ষিণ পার্শ্বস্থ ভবন দুই তলা। দ্বিতীয় তল ৬৮ হস্ত দীর্ঘ ও ৬৫ হস্ত প্রশস্ত। গর্ভস্থানে শিবলিঙ্গ আছে। প্রাচীর নানা-বিধ দেবমূর্ত্তিতে পূর্ণ; তাহাতে দশাবতার আছেন। স্তম্ভগুলি এত উচ্চ, স্থূল ও সংখ্যায় অধিক যে, সাদৃশ্য স্মরণ করিতে গিয়া কলিকাতার টাউন হল ভিন্ন আর কিছু মনে আসিল না। হিন্দু-স্থাপত্যের এক দোষ আছে যে, তাহা আলোক হীন হয়, এই কথা ইংরাজ কহেন। এখানে সে কথা প্রযুক্ত হইবার নহে। দ্বারগুলি অতিশয় উচ্চ ও প্রশস্ত এবং অসংখ্য। স্তম্ভ সকল অতি মনোহর। অগ্রভাগে চমৎকার কারুকার্য্য নিবেশিত হইয়াছে। অধুনা এই প্রকার প্রস্তরের স্তম্ভ কোন স্থানে রচিত হইতে দেখা যায় না। এখনকার স্তম্ভের প্রণালী অন্যরূপ হইয়াছে। রামেশ্বর, নীলকণ্ঠ, তেলিকাগান, কুম্ভারবাড়া ও জনবাসা প্রভৃতি গুহা দর্শন করিয়া ডুমারলেনায় প্রবেশ করিলাম। ডুমারলেনা একটি প্রশস্ত দেবায়তন। ইহার মূর্ত্তিগুলি অত্যন্ত বৃহৎ; দ্বারপুরীর সহিত তুলনীয়। ভিত্তিতে এক স্থানে হরপার্ব্বতীর বিবাহ অতি সুন্দর খোদিত হইয়াছে। পার্ব্বতীর পিতা মহাদেবের হস্তে কন্যার পাণি সংলগ্ন করিয়া দিতেছেন। পুরোহিত বাক্য পড়াইতেছেন। উমা শিবের দিকে চাহিতেছেন। মূর্ত্তিগুলি অত্যন্ত বৃহৎ বলিয়া অবিবাহিতা উমাকে বাঙ্গালীর চক্ষে ডাগর বোধ হইল। তবে, পর্ব্বতের কন্যা, এই জন্য বাড়ন্ত গঠন। দিনমণি অস্ত যাইতেছেন, দেখিয়া আমরা ব্যস্ত হইলাম। ছোট কৈলাস, ইন্দ্রসভা ও জগন্নাথ সভা দেখা হইল না। ইহাতে পারশনাথ অধিষ্ঠিত।

"দুকূলবাসাঃ স বধূ সমীপং
　　নিন্যে বিনীতৈরবরোধদক্ষৈঃ।
বেলাসমীপং স্ফুট ফেন রাজি-
　　র্নবৈ রুদন্বানিব চন্দ্রপাদৈঃ॥
তয়া প্রবৃদ্ধানন-চন্দ্রকান্ত্যা
　　প্রফুল্লচক্ষুঃ-কুমুদঃ কুমার্য্যা।
প্রসন্নচেতঃ-সলিলঃ শিবোঽভূৎ
　　সংসৃজ্যমানঃ শরদেব লোকঃ॥
তয়োঃ সমাপত্তিষু কাতরাণি
　　কিঞ্চিদ্ ব্যবস্থাপিত-সংহৃতানি।
হ্রী-যন্ত্রণাং তৎক্ষণমন্বভূব-
　　ন্নন্যোন্যলোলানি বিলোচনানি॥
তস্যাঃ করং শৈলগুরুপনীতং
　　জগ্রাহ তাম্রাঙ্গুলিমষ্টমূর্ত্তিঃ।"

* * *

জব্বলপুর।

নন্দগ্রাম হইতে জব্বলপুরের পথে রাত্রি প্রভাত হইলে মধ্য ভারতবর্ষের প্রাকৃতিক অবস্থা দেখিতে লাগিলাম। চৌদিকে পতিত ভূমি ও গুল্মরাজি নয়নগোচর হইতে লাগিল। পরদিন রাত্রি ৮টার সময় জব্বলপুরে শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটীতে উপস্থিত হইলাম।

পূর্ব্বাহ্ণে কিঞ্চিৎ প্রাতরাশ সঙ্গে লইয়া নর্ম্মদা উদ্দেশে যাত্রা করিলাম। এখানে মিষ্টান্ন অত্যন্ত সুলভ, বোধ হয় চারি আনা সের। এখান হইতে ভেড়া ঘাট ৫ ক্রোশ দূর। প্রধান রাজপথ দিয়া টাঙ্গা চলিল। চতুষ্পথে ফুহারা ধারা উৎসিক্ত করিয়া নৃত্য করিতেছে। দেশ সম্পূর্ণ হিন্দুস্থানী; তথাপি নীচ জাতীয়া স্ত্রীলোকের মধ্যে দুইএক জনকে কচ্ছ দিয়া বস্ত্র পরিধান করিতে দেখা গেল। পার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশ বলিয়া দাক্ষিণাত্য প্রথার ঐটি অবশিষ্ট রহিয়াছে। ভৃগুক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া বাণগঙ্গা সঙ্গমস্থলে নর্ম্মদার প্রসন্ন সলিলে অবগাহন করিলাম। নিমজ্জিত শরীর জল মধ্যে দৃশ্য হইতে লাগিল। স্নানের কল্পনা ছিল না, কিন্তু মার্ব্বল পুলিনে শ্যামল দর্পণের ন্যায় প্রশান্ত সরিতের রূপমাধুরী দেখিয়া স্থির থাকা গেল না। এখানে নর্ম্মদা নাব্য। গর্ভের একস্থান উচ্চ হওয়ায়, তাহা অতিক্রম করিয়া মারবল শৈল বিহারার্থ নৌকা আরোহণ করিতে হইল। নৌকার বেতন দুই টাকা দেয়। পুটভেদ মধ্যে নৌকা চলিল। যত অগ্রসর হইতে লাগিলাম, উভয় পার্শ্বে শুভ্র শৈল ব্যক্ত হইতে লাগিল। পর্ব্বত বিশেষ উচ্চ। যেন দেবরাজ ইন্দ্র ঐরাবত-আরোহণে অবতরণ করত হস্ত দ্বারা খনিত্র ধারণ করিয়া নর্ম্মদার জন্য পথ কর্ত্তন করিয়া দিয়াছেন।

বিন্ধ্যগিরি ;—জব্বলপুর, শ্বেতশিলা গর্ভে নর্ম্মদা

(ভারত প্রদক্ষিণ)

শ্বেতবর্ণের উপর রৌদ্রের ছটা পড়িয়া মসৃণ অঙ্গকে দীপ্তিমান্ করিয়াছে; সেই আভা জলে পড়িতেছে, এবং পর্ব্বতের পরপার্শ্বকে উজ্জ্বল করিয়াছে। যে দিকে রৌদ্র লাগিতেছে, তাহার সম্মুখস্থ অপর দিক বরং আরও সুন্দর দেখাইতেছে। যেন চন্দ্রমার মত তেজোময় অথচ নয়ন ঝলসায় না। এমন অদৃষ্টপূর্ব্ব স্থানে আসিলে ভ্রমণ সার্থক বলিয়া বোধ হয়। অহো! আমরা যেন স্বর্গে মন্দাকিনী বক্ষে বিহার করিতেছি। এখানে বুঝি মানুষ আসিতে পারে না, কেবল শুক্লকান্তি গিরি, নর্ম্মদা ও আমরা রহিয়াছি। পৃথিবীর কোলাহল কোথায় পড়িয়া রহিয়াছে, তাহার চিহ্নমাত্র নাই। উপরে উঠিয়া নর্ম্মদার জল-প্রপাত দেখিতে যাওয়া হইল। প্রভূত জল জীমূত-মন্দ্রে পতিত হইতেছে। আবর্ত্ত ঊর্ম্মি তুলিয়া ফেনিল বক্ষে অগণনীয় বুদ্বুদ অবিরাম প্রকাশ করিতেছে। অগ্নির উপর কটাহে যেমন দুগ্ধ ধুক্ষিত হইয়া থাকে, অবিকল তদ্রূপ দেখাইতেছে। অনেক প্রপাতে সুন্দর ধারার শোভা দেখিয়াছি, কিন্তু বুদ্‌বুদের এমন শোভা কুত্রাপি দেখি নাই। কাশ্মীরের বেরনাগ ও নাসিকের দুধ-স্থলী অপেক্ষা ধুঁয়াধার প্রপাতে জল নির্গম বহুল; আর এক বিশেষত্ব এই যে, ইহার নিকটস্থ হইলে বাষ্পাকারে নীত সীকর দ্বারা শরীর আর্দ্র হয়। সূর্য্যকিরণে সেই বাষ্প নিয়ত দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়া এই প্রপাতের নাম ধুঁয়াধার হইয়াছে। যাহা হউক, হ্লাদিনীর তীরে বসিয়া উথ্‌লান দেখা বড় আমোদ জনক হইল। প্রপাতের উপর রেবা গভীর নহে, ইহার প্রশস্ত বক্ষে ইতস্ততঃ উপল খণ্ড দেখা যাইতেছে। সন্নিকটে এক উদাসীন আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়াছেন। আমাদিগকে দেখিয়া তিনি হর হর মহাদেব ধ্বনি করিলেন। স্থানের গম্ভীরতার সহিত নর্ম্মদার কল্লোলে সে শব্দ মিশাইল। এখান হইতে বাণকুণ্ড দেখিতে গেলাম। ইহাতে বাণলিঙ্গ নামক শিলা উৎপন্ন হইয়া থাকে। নর্ম্মদাতীরে জন-

সমাগম-রহিত বন মধ্যে বায়ান্নটি কুণ্ড আছে। তাহারা পাশাপাশি ভাবে অবস্থিত। উহাদের গর্ভদেশ নাতিশ্বেত প্রস্তর-খণ্ড দ্বারা পূর্ণ। বর্ষাকালে বায়ান্নটিই জলপূর্ণ হওয়ায় জলস্রোত নদীর আকারে নর্ম্মদায় পতিত হয়। যেটিতে বাণ উৎপন্ন হয়, তাহার নাম লিঙ্গ কুণ্ড; তাহাতে সকল সময় জল থাকে। দিবা অবসান হইয়াছে; আমাদের যে পথ প্রদর্শক, সে বালক,—কদাপি উক্ত কুণ্ড পর্য্যন্ত গমন করে নাই; এবং যে পথে চলা হইতেছিল, তাহা অত্যন্ত বন্ধুর,—প্রতিপদে পৃথক্ শিলাখণ্ডে পাদ রক্ষা করিতে হয় বলিয়া সে পর্য্যন্ত যাইতে পারিলাম না। গৌরী-শঙ্করের মন্দির উচ্চ পাহাড়ের উপর স্থাপিত; সোপান গ্রথিত আছে; চতুর্দ্দিকে বৃক্ষ-বিতান, অতি রম্য স্থান। আমার শীঘ্র দেখা শেষ করিতে কষ্ট বোধ হইতে লাগিল। মন্দিরের অভ্যন্তরে বৃষভাসনে হরগৌরী বিরাজিত; বাহিরে মণ্ডপতলে চতুর্দ্দিকে অসংখ্য দ্রাবিড় গঠনের দেবমূর্ত্তি অন্য স্থান হইতে আনয়ন করিয়া সাজাইয়া রাখা হইয়াছে। সকল গুলিই খণ্ডিত।

অন্ধ্র।

ভারত প্রদক্ষিণ করিলে পৃথিবী প্রদক্ষিণের ফললাভ হয়। ইহা ভূপৃষ্ঠের সমমণ্ডলে অবস্থিত হইলেও কোন স্থানে প্রচণ্ড তাপ, কোথাও বা দুরন্ত শীত অনুভূত হয়। পর্ব্বত, সাগর, মালভূমি ও মরু, তুষার, উপত্যকা, সিকতা, নিম্নভূমি এবং দ্বীপ সমন্বিত হইয়া এই স্থান এত রমণীয় হইয়াছে। উদ্ভিদ্ ও জীব-সংস্থানে ভারতভূমি বৈচিত্র্যপূর্ণ। উষ্ণ ও হিম কটিবন্ধে আমাদের যাইবার প্রয়োজন নাই; ভারত-ভূমির তুল্য আছে কোন্ স্থান!

তৎকালে পূর্ব্ব উপকূল হইতে চেন্নপট্টন পর্য্যন্ত রেলপথ না হওয়ায় আমরা কালিকাক্ষেত্র হইতে রায়চুরের পথে যাত্রা করিলাম। জব্বলপুর হইতে খাণ্ডব পর্য্যন্ত প্রবেশিকা (টিকিট্) ক্রয় করা হইল। অধ্বপার্শে মালব অরণ্যানী! প্রস্তরখণ্ড সমূহের মধ্য দিয়া স্রোতস্বতী চলিয়াছে, একটি মৃগ নয়নপথের পথিক হইয়া অদৃশ্য হইল। এ দেশে আসিলে, ঠগীদের কাহিনী বিস্তর শুনিতে পাওয়া যায়। দূরে তাহাদের ভগ্নদুর্গ স্মৃতি জাগ্রত করিয়া রাখিয়াছে। ক্ষেত্রে কার্পাস-প্রসূন পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিয়া প্রস্ফুটিত। উষ্ণীষধারী কৃষক ভূমিকর্ষণে ব্যস্ত আছে। তদীয় পত্নী হলের মধ্যভাগে উত্থিত কাষ্ঠ ধারণ করিয়া করগুম্ফ গোধূম বপনের জন্য নিক্ষেপ করিয়া যাইতেছে। সেই স্ত্রীলোক লাল সাড়ী কাছা দিয়া পরিধান করায়, মহারাষ্ট্র দেশের নৈকট্য সূচিত হইল। দেশজ ভাষার নাম নিমাড়ি। বিচারালয়ে হিন্দী প্রচলিত। আমরা জব্বলপুরের মত খণ্ডোয়ার রেলওয়ে পান্থনিবাসে আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। রাজপথে বহির্গত

হইয়া কি দেখিয়াছিলাম, এক্ষণে স্মরণ হয় না। স্মারক লিপিতে লিখিত আছে, মহাদেব রামেশ্বর ছত্তরের পশুব্যায়াম বিজ্ঞাপনী প্রথমে দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল; রামেশ্বরের নিকটবর্ত্তী এক কুণ্ড আছে। তন্মধ্যে কোন উৎস থাকায় প্রভূত জল বহির্গত হইতেছে। নগর মধ্যে নলযোগে ইহা নীত হয়। কোন বাঙ্গালী ব্যবহারাজীবের গৃহে কালী-প্রতিমা নির্ম্মিত হইতেছে, দেখিয়া আসিলাম। "বিশ্বকোষে" দেখিতেছি,—এখানে আরও দ্রষ্টব্য আছে, কিন্তু আমরা সেখানে যাই নাই, অতএব তাহার উল্লেখ করিব না।

নিমাড় মালবের অন্তর্গত, মধ্যভারতে অবস্থিত। উজ্জয়িনী নাতি-দূরবর্ত্তিনী, সম্মুখস্থ অন্যতর লৌহবর্ত্ম ইহা স্মরণে আনিয়া দিল। তথায় গমন ও থাণ্ডবে উপবিষ্ট হইয়া নিমীলিত নেত্রে অবন্তিকা দর্শন, এতদুভয়ে ভেদ নাই। প্রাচীন উজ্জয়িনী আপন গৌরবের সহিত ধরণীগর্ভে লুক্কায়িত হইয়া গিয়াছে। মহাতেজস্বী বিক্রমাদিত্য ও কালিদাসের মহিমা কেবল তথায় আবদ্ধ নহে। সমস্ত ভারতে তাহা পরিব্যাপ্ত। রাজপাট খনন করিয়া প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ গ্রীক, বাহ্লীক, শক ও দেশীয় রাজাদের সময়ে প্রচলিত প্রাচীন মুদ্রা বহিষ্কৃত করিয়াছেন। শকারি বিক্রমার্কের পূর্ব্বে বহু নৃপতি অবন্তী নগরে আধিপত্য করিয়াছিলেন। বিক্রম ও কালি দাসের নামে মুগ্ধ হইয়া দেশের কত মহীপাল ও সাহিত্যিকগণ তত্তন্নাম ধারণ করিয়া ধন্য হইলেন। ইহাতে শিলালিপি এবং কাব্যক্ষেত্রে কয়েকজন বিক্রমাদিত্য ও কালিদাসকে প্রত্যক্ষ করিয়া পণ্ডিতসমাজে কালনির্ণয়ের পক্ষে বিশেষ মতভেদ হইয়াছে। কবি কহেন, "বিক্রমাদিত্য, অত্যুন্নত দ্রাবিড় বৃক্ষের কুঠার স্বরূপ, লাটাটবীর দাবাগ্নি, বলবৎ বদ্ধ ভুজঙ্গরাজ্যের গরুড়, সমুদ্রের অগস্ত্য, গর্জ্জিত গুর্জ্জর-রাজ করীর হরি, ধারান্ধকারের অর্য্যমা, কাম্বোজাম্বুজের চন্দ্রমা ছিলেন। উজ্জয়িনী নিবাসী কালিদাস

সংবৎ-সংস্থাপক বিক্রমের রাজ্যকালে, খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন সন্দেহ নাই। মানব চরিত্র চিত্রনে, স্বভাব বর্ণনে ও সুমধুর ছন্দো-গ্রন্থনে তাঁহার তুল্য কবি সংস্কৃত সাহিত্যে দ্বিতীয় কেহ নাই।

প্রাচীন উজ্জয়িনীর সন্নিকটে, আধুনিক নগরে সপ্তপুরী দর্শনকারিগণ অবন্তীতীর্থ-যাত্রা সম্পন্ন করেন। মহারাষ্ট্ররাজ সিন্ধে রাইহার অধিপতি। অদ্যাপি জ্যোতির্বিদ্‌গণ মাধ্যায়ন বৃত্ত বা প্রাথমিক দ্রাঘিমা এখান হইতে গণিয়া থাকেন। এক সময়ে ভারতের কেন্দ্ররূপ মধ্যভারতে বিক্রমার্ক উদিত হইয়া চতুর্দ্দিকে তেজ বিকীর্ণ করিয়াছিলেন; তৎকালে আদিত্যের গ্রহ হইয়া কালিদাস তাঁহার পার্শ্বচর হন। কিয়ৎকাল পরে সে সূর্য্য তেজোহীন হইলে তিনি গ্রহস্বরূপে মহাকবির আলোকে দীপ্তিমান থাকিয়া পারিপার্শ্বিকভাবে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। রাজার বিক্রম অপেক্ষা সাহিত্যিকের বিক্রম দীর্ঘকাল স্থায়ী।

প্রসহ্যচোর তাঁতিয়া ভীল, এখানকার নিকটবর্ত্তী এক গ্রামে ধৃত হয়। এক ব্রাহ্মণীর সহিত তাহার ভ্রাতৃসম্পর্ক ছিল। আষাঢ়ী পৌর্ণমাসীতে সে ভগিনী দ্বারা হস্তে রাখিবন্ধন করাইতে আসিত; নিয়মিত কালে আগমনের সন্ধান পাইয়া, নাকাধ্যক্ষ একশত প্রহরী দ্বারা সেই গৃহ বেষ্টন করিল। তদ্দর্শনে প্রচণ্ড সাহসী তাঁতিয়া কহিল, "তোমরা ভীত হইও না; আমার আহার শেষ হইলে ধৃত করিও। আমি আর পলায়ন করিব না।" ভগিনীপতি অর্থলোভে দণ্ডশক্তিকে সংবাদ দিয়াছিল। ভগিনী তাহা জ্ঞাত ছিলেন না। কথিত আছে, তাঁতিয়া সক্ষমের বিত্ত অপহরণ করিয়া অক্ষমকে দান করিত। সে বাজরার রোটিকা লবণ ও লঙ্কা সহযোগে আহার করিত; সুতরাং তাহার নিজের জন্য অতি সামান্য অর্থের প্রয়োজন হইত।

ভীল জাতি নিকটবর্ত্তী খান্দেশস্থিত বনভূমিতে বাস করে। আরাবলী

পর্ব্বতমালা হইতে সিন্ধু ও রাজস্থানের মরুস্থলী এবং গুজরাতের গিরি-কানন ইহাদের আবাস। রাজপুতানা তাহাদের অধিকারভুক্ত ছিল। স্থানবিশেষে সিংহাসনারোহণকালে, ভীল সামন্ত আসিয়া রাজতিলক প্রদান না করিলে, তথায় অদ্যাপি রাজন্যের অভিষেক-ক্রিয়া সম্পন্ন হয় না। ইহারা আদিম নিবাসী জাতিসমূহের অন্যতম। ভারতের আদিম নিবাসী মাত্রেই দ্রাবিড় শব্দ বাচ্য। ভীলগণ কৃষি, মৃগয়া ও দস্যুবৃত্তি দ্বারা জীবন-ধারণ করে। ইহারা শরণাগতের প্রতি এমনি দয়াবান, যে নিজ প্রাণ দিয়া তাহার মঙ্গল বিধানে তৎপর হয়।

অত্রত্য পুরুষের পরিচ্ছদ ও বাক্য আলোচনা করিলে হিন্দুস্থানী, ও তাহার ভাষাকে ভারতের মধ্যবর্ত্তী বলিয়া বোধ হয়। দ্রাবিড় আর্য্য-ভারতী হইতে এত বিভিন্ন প্রকৃতি যে, মধ্যভারতের অধিবাসীতে তাহার চিহ্ন অতি অল্প। আর্য্যপুরুষ মহারাষ্ট্র পর্য্যন্ত আপন ভাষা লইয়া গিয়া কর্ণাটে পরাস্ত হইয়াছে।

কয়েকটি রেলওয়ে ষ্টেশন অতিক্রম করিয়া আমরা অসেরগড় দেখিতে পাইলাম। গণ্ড শৈলের উপর কতকগুলি আবাস ও মহম্মদীয় ভজনালয়ের চূড়া দৃষ্ট হইতেছে। দুর্গমূলে নদী প্রবাহিতা। ক্রমশঃ সাতপুরা নামধেয় বিন্ধ্যগিরি শ্রেণী দর্শন করি। খান্দেশ প্রাকৃত সৌন্দর্য্যে মালওয়া সদৃশ। মৃত্তিকা কৃষ্ণবর্ণ; তাহাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জোয়ারা মঞ্জরী অঙ্কুরিত হইয়াছে। স্থানে স্থানে ঈষৎ নিম্ন কৃষ্ণ কঙ্করাচ্ছাদিত রথ্যা। বন মধ্যে পথ কেন, এবং ইহা প্রস্তুত করিবার উদ্দেশ্য কি, বুঝিলাম না। পরে বুঝা গেল, সে গুলি নদীগর্ভ; প্রবাহ না থাকায় অতি সুন্দর অধ্ববৎ প্রতীয়মান হইতেছে। ধুণ্ডমনমাড় সরল পথ আমাদিগকে মোহময়ী ও পুণ্যপত্তনে যাইতে নিষেধ করিল। জি, আই, পি, রেলপথ মহারাষ্ট্র অতিক্রমণ করিয়া আমাদিগকে কর্ণাটের নিজাম রাজ্যে অবতরণ করাইয়া দিল। তত্র

বিক্রেতার রব দেশভেদ বুঝাইয়া দিতেছে। আমাদের অবতরণ করিবার পূর্ব্বে, নিম্নতন শান্তিরক্ষক আসিয়া গাড়ীর স্নানগৃহ প্রভৃতি উদ্‌ঘাটন করতঃ পরিদর্শন করিলেন।

রায়চুর।—চেন্নপট্টনিবাসী গুর্জ্জর বণিক্ খোসালদাস খানদাসের ধর্ম্মশালায় আমরা অবস্থিত রহিলাম। বাত্যা ও বারিপাত নিবন্ধন বিজা-পুরাধিপ প্রভৃতি রাজন্য-সেবিত দুর্গ দেখিতে যাওয়া হইল না। ধর্ম্মশালা-ধ্যক্ষ কহিলেন, "সেখানে দর্শনীয় আর কি থাকিতে পারে। তথাকার অধিবাসিবর্গ অর্থলালসায় প্রস্তর পর্য্যন্ত বিক্রয় করিয়া থাকেন।" আদিল শাহী বিজয়পুর ১৪৮৯ হইতে ১৬৮৬ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত বিজয় ঘোষণা করিয়া আওরঙ্গজেবের প্রতাপভরে অবসন্ন হইয়াছে। সেই আওরঙ্গজেবের প্রতাপ মহারাষ্ট্রীয় অভ্যুদয়ে খর্ব্ব হইল; আসফ্‌জা স্বাধীন হইয়া নিজাম-উল্‌মুল্‌ক হইলেন; হায়দরাবাদ তাঁহারি স্থাপিত। এক্ষণে মোগল সাম্রাজ্যের অবশিষ্টাংশ দেখিতে হইলে ঐ স্থানে যাওয়া উচিত। নিজাম ভারতীয় সামন্ত-রাজন্যবর্গের শীর্ষস্থানীয়। রাজ্যের আয় বার্ষিক চারি কোটি মুদ্রা।

ক্ষণিক কর্ণাট পরিদর্শনে বঙ্গীয় একটি দৃশ্য লক্ষিত হইয়াছে। ক্ষেত্রের এক স্থানে আমাদের পৌষপার্ব্বণে ব্যবহৃত, মৃৎপাত্র-আচ্ছাদন দ্বারা চক্রাকার পিষ্টক প্রস্তুতীকৃত হইতেছে। ইহা কি বঙ্গের দ্রাবিড় চিহ্ন নহে?

রেলষ্টেশনে, ম্লেচ্ছগণ হিন্দুকে মিষ্টান্ন বিক্রয় করিতেছে। ইহা রায়চুর গ্রামের এক জঙ্গম কর্ত্তৃক প্রস্তুত। তাহা বিক্রেতার সংস্পর্শে অখাদ্য হইতেছে না। অপরাহ্ণে মন্দ্রাস লৌহপথের গাড়ী ছাড়িল। কিছুক্ষণ পরে তুঙ্গভদ্রার পাষাণবদ্ধ কান্তির চমৎকারজনক দৃশ্য অবলোকন করিয়া আমাদিগকে তমসাবৃত হইতে হইল।

গ্রাম্য ভৌগোলিক মতে, পৃথিবী ত্রিকোণ। ভারত-জগৎ প্রায় সেই-রূপ, সন্দেহ নাই। তন্মধ্যে দক্ষিণাপথ অবশ্যই তদ্বৎ। ইহার পর্ব্বতমালা ত্রিভুজাকৃতি। উত্তরে বিন্ধ্য, পূর্ব্ব পশ্চিমে ঘাট দক্ষিণে নীলগিরিতে মিলিত হইয়া সাগর-বলয়ান্বিত হইয়াছে। পৌরাণিক যুগে আর্য্যীকরণ প্রভাবে এই ভূমি ভারতবর্ষের অন্তর্গত হয়। দক্ষিণাবর্ত্তের প্রধান নদীগুলি গিরিদ্বয়ের বিচ্ছেদভাগ অবলম্বন করিয়া প্রবাহিত। এই বিচ্ছেদের জন্য পর্ব্বতের নাম ঘাট হইয়াছে। যমল ভূধরের মধ্যভাগে তিনশত ক্রোশ মালভূমি নামে খ্যাত। উত্তর-পূর্ব্ব হইতে ক্রমশঃ দক্ষিণ-পশ্চিমে নিম্নাভিমুখ, দক্ষিণদেশ। তাহার বহির্ভাগে, দক্ষিণপ্রান্ত। স্থানভেদে প্রাকৃতিক দৃশ্যে যথেষ্ট প্রভেদ আছে। নীলগিরি ভিন্ন প্রায় সর্ব্বত্র সম-শীতোষ্ণ। আর্য্য জাতি তাঁহাদের দক্ষিণাবর্ত্তে ঋতু-বৈষম্যের অভাবনিবন্ধন নানাপ্রকারের খাদ্যসামগ্রী আনয়ন করিতে অসমর্থ হইয়াছেন। কেরল, দ্রবিড়, কর্ণাট ও তৈলঙ্গ—এই দেশচতুষ্টয় বহুল অংশে সদৃশ। দেবালয়-নির্ম্মাণ প্রণালী, পরিচ্ছদ, ভাষা ও আচারগত মৌলিক ভেদ নাই। জাতিত্বে দ্রাবিড়ের প্রসার, মিশ্রভাবে ভারতে প্রায় সর্ব্বব্যাপী। আর্য্য ও মঙ্গোলিয়ার স্থান-সন্নিবেশ অতিমাত্র হ্রস্ব। ভাষা ও বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম সম্বন্ধে ভারত বহুল পরিমাণে আর্য্যপ্রভাব-সমন্বিত হইয়াছে।

তিরুপতি।—তিরুপতি তৈলঙ্গ দেশের প্রান্তভাগে অবস্থিত। তিরুমলয়ে বেঙ্কটরাম দর্শনাভিলাষে হিন্দুস্থানী বৈষ্ণব এখানে আসিয়া থাকেন। দেব নামের কঠোরতার অপনোদনার্থ তাহারা ইহাকে বালাজী কহে। ইহার শাস্ত্রীয় সংজ্ঞা, শ্রীনিবাস। ত্রিপতি গ্রাম ও ত্রিপতি শৈল পূর্ব্বঘাট গিরির মধ্যে। বেঙ্কটাচল-মাহাত্ম্যে নাগ কথাটি সন্নিবেশিত করিবার জন্য পর্ব্বতকে শেষাচল হইতে হইল। আমরা যাঁহার বাটীতে অতিথি হইয়াছি, তাঁহারও নাম বেঙ্কট রাও। তিনি ঊর্দ্ধে উঠিবার

আয়োজন করিয়া দিলেন। পাদুকা ত্যাগ করিতে হইল। যবনের উত্থান নিষিদ্ধ। অর্দ্ধক্রোশ-ব্যাপী সোপান-পরম্পরা অতিক্রম করিয়া বহু স্তরে সজ্জিত মহাশিখর বিশিষ্ট পুরদ্বার পাইলাম। তলদেশে তিরুপতি গ্রামের শোভা অতি সুন্দর বলিয়া ক্ষান্ত হওয়া যাউক। হৃদয়ের মধ্যে এক্ষণে সে চিত্র নাই। শিবিকা পর্ব্বত হইতে পর্ব্বতান্তরে লইয়া যাইতেছিল। জনৈক বাহক এই মলয় উপত্যকায় উদ্ভূত চন্দন-বৃন্ত আনিয়া দিল।

তোরণের সমৃদ্ধি দেখিয়া বোধ হইয়াছিল, সেইটি মন্দির। এই প্রণালীতে গঠিত গোপুর এবং সমধিক প্রাকার বিস্তৃতি, দ্রাবিড়-স্থাপত্যের বিশেষ ভাব। দেবায়তন এত অধিক স্থানে ব্যাপ্ত হয়, যে ইহা ওড্রে পুরী নামে খ্যাত হইয়াছে। এই দেবালয় প্রাচীরত্রয়ে বেষ্টিত। গোপুরের শিল্প নৈপুণ্য ও চিত্র-কার্য্য দেখিয়া বিস্মিত হইতে হইল। কর্ণাট্ট শব্দের অর্থে তোরণের বর্ণনা হইয়া যায়। আমার বোধ হয়, ইহা হইতেই দেশের নাম কর্ণাট হইয়া থাকিবে। কর্ণ—তির্য্যক রেখা, অট্ট—উচ্চগৃহ। গৃহের চতুর্দ্দিকস্থ উপরিভাগ, তির্য্যক্ ভাবে, বহুস্তর বিশিষ্ট হইয়া উত্থিত হয়। প্রথম প্রাকার কৃষ্ণপ্রস্তর নির্ম্মিত। উহার এক স্থানে অনুশাসন-লিপি উৎকীর্ণ আছে। প্রাচীরের দৈর্ঘ্য ২৭৫ হস্ত, প্রস্থ ১৭৫ হস্ত। গর্ভ-গৃহের পাষাণ-মূর্ত্তি অতি বৃহৎ। দক্ষিণের এক হস্তে চক্র, অপর হস্ত পৃথিবীর দিকে, এবং বাম হস্তের একটিতে শঙ্খ, অপরটিতে পদ্ম। সচল মূর্ত্তিটি কিন্তু অন্যরূপ; শিরে শেষনাগ, হস্তে গদা চক্র, ও বরাভয়দান মুদ্রা। তাঁহার সেবা বিশেষ ব্যয়সাধ্য; এক টাকা দিয়া, কর্পূরালোকে সাক্ষাৎ করা গেল। সদাশিবের মত, শ্রীনিবাস সদা অধিগম্য নহেন। সাধারণের অর্চ্চনার জন্য অর্দ্ধঘণ্টা কাল নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কুলোত্তুঙ্গ চোলের পুত্র তোণ্ডমন চক্রবর্ত্তী এই প্রসিদ্ধ মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা। সে

চারিশত বৎসরের কথা। দেবালয়ের উন্নতিকল্পে যাঁহারা বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন, আজি পর্য্যন্ত মন্ত্র-পুষ্পের সহিত তাঁহাদের নাম উচ্চারিত হইয়া থাকে। মঠের আয় বার্ষিক ২১ হাজার, ব্যয় ১৫ হাজার টাকা। মন্দির পার্শ্বে সহস্র-স্তম্ভ মণ্ডপের কারুকার্য্য অতি পরিপাটি। তাহার বহির্দ্দেশে প্রত্যেকটিতে বৃহৎ বৃহৎ মূর্ত্তি খোদিত। এখানে পক্কতণ্ডুলের প্রসাদ বিক্রীত হইতেছে। এক হিন্দুস্থানী ব্রহ্মচারী আমাকে ভাত কিনিয়া দিতে কহিল; এখানে স্পর্শ দোষ নাই। এক প্রকোষ্ঠে চন্দ্রগিরির রাজা, তাঁহার ভ্রাতৃদ্বয় ও তদীয় পত্নীর ধাতুমূর্ত্তি দেখা গেল। আর একস্থানে রামানুজ স্বামী পূজার্হ হইয়াছেন। ভগবান্ দাস মহান্ত স্বর্ণ-ধ্বজস্তম্ভের নিম্নে প্রোথিত উদ্বৃত্ত অর্থের অপহরণাপরাধে কারাদণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। নব অধ্যক্ষের সহিত তাঁহার বিবাদ হইতেছে; মহাবীর দাসের নামে পরস্ত্রী হরণের অভিযোগ উপস্থিত!

বেঙ্কটেশের জন্য সহস্রাধিক লোক পর্ব্বতে বাস করিতেছেন। থিরু-বাঙ্কোড়, মহীশূর, কালহস্তী ও বেঙ্কটগিরি নৃপতির পান্থশালা সকলের জন্য উন্মুক্ত। এক রাত্রি বাস করিয়া, আমরা তৈলঙ্গ ভূমিতে অবতরণ করি।

কুচ্চি বেঙ্কট রাও মহাশয়ের উপবেশন গৃহ রাজসভার মত গঠিত। তিনি কতকগুলি পূরাণ স্বর্ণ মুদ্রা, রামটেঁকির সহিত হিরণ্য হরপার্ব্বতী মূর্ত্তি একত্র করিয়া, কৌষেয় কোষে রক্ষণ করিয়াছিলেন; নিষ্কাসন করিয়া আমাকে দর্শন করাইলেন। ইহার মধ্যে কলিঙ্গ, অন্ধ্র, পাণ্ড্য, চোল, চালুক্য ও কদম্ব বংশীয় মুদ্রা ছিল কি না, আমি মুদ্রাতত্ত্ব জ্ঞাত না থাকায়, তাহা পরীক্ষা করিতে পারিলাম না। রামটেঁকি, বোধ করি কান্যকুব্জের রঘুবংশীয় মুদ্রা হইবে। রাম-চরিত্রের মাধুর্য্য গুণে, কৃত্রিম রামটঙ্ক নির্ম্মিত হইয়া দেশ বিদেশে অধিক মূল্যে বিক্রীত হইতেছে।

তদ্দ্বারা নির্ম্মিত স্বর্ণালঙ্কার অতি মহার্ঘ। রামটেঁকির আকৃতি ম্যুজ ও বৃহৎ। এই সকল মুদ্রা ও অনুশাসন লিপি, ভারতীয় পুরাবৃত্ত সঙ্কলন-কল্পে অতীব হিতকারী। নন্দ, গুপ্ত, পাল, নাগ ও মৌথরি মুদ্রা আবিষ্কৃত না হইলে, অনেক ঐতিহাসিক রহস্য প্রচ্ছন্ন থাকিত। বেঙ্কট রাওয়ের কৌলিক উপাধি, কুচ্চি। এতদ্দেশে নামের পূর্ব্বে উপাধি ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বিদায় কালে, আমরা তিরুমলয়ের অধিষ্ঠাতৃদেবের অঙ্গে প্রদত্ত কেশর ও অগুরু মিশ্রিত চন্দন, তাম্বূল, পূগ এবং পুষ্প-গন্ধ-নির্যাস উপহার প্রাপ্ত হইলাম।

ত্রিপতির তিন ক্রোশ পশ্চিমে চন্দ্রগিরি। চোলগণ একাদশ হইতে পঞ্চদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত এইস্থানে রাজত্ব করিয়াছিলেন। পরে অন্য বংশ চন্দ্রগিরির প্রভু হন। ১৬৪৯ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী অত্রত্য রাজা রঙ্গরায়ের নিকট হইতে চোলমণ্ডল উপকূলে মান্দ্রাজ বন্দর স্থাপনের জন্য সনন্দ গ্রহণ করেন। ২৪৭ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে চোল বীর কর্ত্তৃক সিংহল অধিকৃত হয়। মধ্যে, তাহারা হীনবল হইয়াছিল। একাদশ শতাব্দীতে পাণ্ড্য ও চোলগণ পুনরায় প্রবল হইয়া কঙ্গু রাজ্য আক্রমণ করেন। তাহার পূর্ব্বেই ইহারা বঙ্গ মগধ পর্য্যন্ত জয় করিয়াছিল। দ্রাবিড়ের একমাত্র দর্শনীয় বস্তু দেবালয়-নিচয় তাঁহাদেরই নির্ম্মিত।

তৈলঙ্গ প্রাচীন অন্ধ্র। অন্ধ্র নৃপতিগণ চোলদিগের পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের বিশেষ বিবরণ নাই। তিরুপতির মঠাধ্যক্ষের নিকট দ্বিশকটীক শিলা লিপি ও তাম্রশাসন আছে। পাঠক আসিলে, নানা তত্ত্ব প্রকাশিত হইবার সম্ভাবনা আছে। আন্ধ্রগণ বৌদ্ধ ও মগধের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। চোল ও অন্ধ্র জাতি, অন্ত্যজ এবং ম্লেচ্ছ-ক্ষত্রিয় বলিয়া পুরাণে উল্লিখিত হইয়াছেন। চালুক্যরাজ চোল-দৌহিত্র। চালুক্য-বংশের সহিত কাদম্বদিগের বৈবাহিক সম্বন্ধ এবং পাণ্ড্য ও চোলে উক্ত

সংস্রব দেখিয়া, তাহাদিগকে দ্রাবিড় জাতীয় বলিবার হেতু মিলে। রাজন্য-পদবাচ্য ব্যক্তিকে মীমাংসকগণ ক্ষত্রিয় বলিতে পারেন, সন্দেহ নাই। যদি কেহ, চালুক্য বংশকে বৈশ্য বর্ণে স্থান দেন, তাহা কিঞ্চিৎ অদ্ভুত হইবে।

চালুক্য বংশের আদি পুরুষ, চুলুক শৈলে রাজছত্র তলে অধিষ্ঠিত হন। পুলকেশী বল্লভ ৪৮৯ খৃষ্টাব্দে গুর্জ্জরে রাজ্য আরম্ভ করেন। ৫৫৬ খৃষ্টাব্দে কীর্ত্তিবর্ম্মার পুত্র সত্যাশ্রয় বল্লভ প্রতীচ্য ও কুব্জ বিষ্ণুবর্দ্ধন প্রাচ্য-চালুক্য রাজ্যের অধিনায়ক হইলেন। তৈলঙ্গে, কুব্জের বংশাবলীতে সর্ব্বশেষে দ্বিতীয় কুলত্তুঙ্গ চোড়দেব ১০৬২ খৃষ্টাব্দে প্রাদুর্ভূত হন। পঞ্চশত বর্ষ কাল দাক্ষিণাত্য-শাসন-দণ্ড যাঁহাদের হস্তে ছিল, তাঁহাদের বিবরণ, কেবল সময় নির্ণয়ে পর্য্যাপ্ত হইলেও উল্লেখ যোগ্য হইয়াছে। চোল-সাম্রাজ্য অষ্টাদশশত বর্ষ ব্যাপী হইয়াছিল। এত দীর্ঘকাল যে শক্তি কার্য্যকরী ছিল, তাহার রাজনীতি, পরাক্রম ও সুযোগের ইতিহাস শূন্য রহিয়াছে।

পৌরাণিক যুগ আরব্ধ হইবার পূর্ব্ব হইতে আর্য্যজাতি দক্ষিণাবর্ত্তন আরম্ভ করেন। আপস্তম্ব ও বৌধায়ন তিনশত পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন; তৎকালের সাহিত্যিকগণ যাহা লিখিতেন, তাহা সূত্রাকারে গ্রথিত হইত। আপস্তম্ব কল্পসূত্র ও বৌধায়ন স্মার্ত্তসূত্রের প্রণেতা। তিনি লিখিয়াছিলেন, অদীক্ষিত ব্যক্তির সহিত আহার, সস্ত্রীক ভোজন, পর্য্যুষিত দ্রব্য আহার, মাতুলী ও পিতৃস্বসার কন্যা বিবাহ দক্ষিণে প্রচলিত।

আর্য্যগণের আগমনের পূর্ব্বে ও অব্যবহিত পরে ভারতে কেবল ব্যবহার মাত্র প্রচলিত ছিল। স্থানবিশেষে তাহা উদার ভাবানুসারে সংশোধন করিতে হইয়াছে। যে পর্য্যন্ত ভিন্ন মতাবলম্বী লোকের প্রভাব উপস্থিত হয় নাই, ততদিন ব্রাহ্মণগণ সরল হৃদয়ে ব্যবহার লিপি-বদ্ধ করিতেন; পরে আধিপত্য রক্ষার জন্য উহাকে অপৌরুষেয় কহিতে লাগিলেন। কিন্তু আচার সর্ব্বদাই পরিবর্ত্তনশীল। প্রয়োজনানুরূপ না করিলে চলে না।

মন্বাদির মত কদাপি সম্পূর্ণ ভাবে প্রচলিত ছিল না; এক্ষণেও কোন দেশে চারিশত বৎসরের অধিক প্রাচীন নিবন্ধ প্রচলিত নাই। দায় সম্বন্ধে বোম্বাই প্রদেশে ময়ুখ, বঙ্গের জীমূতবাহন ও কাশীরাজ্যে মিতাক্ষরা টীকা বা সংগ্রহ আকারে প্রচলিত হইয়া দেশাচারকে দৃঢ় করিয়াছে। যাহা শ্রেয় অবলম্বনীয়, তদনুসারে শাস্ত্র প্রস্তুত হইবে। শাস্ত্র নাই বলিয়া, পরাঙ্মুখ হওয়া উচিত নহে। একজন নিবন্ধকার কহিয়াছিলেন,—

মন্বাদিশাস্ত্রাণি গুরোরধীত্য,
সম্যক্ তথাভ্যস্য চিরং প্রযত্ন্য।
দৃষ্ট্বা চ শিষ্টাচরণং করোমি,
শ্রীবিশ্বনাথস্মৃতিসারসংগ্রহম্॥

সমাজের হিতের জন্য কখন শাস্ত্র, কোন সময়ে বা ব্যবহারকে অবলম্বন করিয়া লোকরঞ্জন করা আবশ্যক। শ্রেয়ঃ কি তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয়; অতএব, কিছু দিন উভয়ের সংঘর্ষ দ্বারা অতিবাহিত করা সঙ্গত। নব্যভারত প্রতিষ্ঠাতা মেকলে, ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি প্রণয়ন কালে, কেবল প্রচলিত লোক-স্থিতি প্রকরণের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া, ভবিষ্যতে কি হিতকর হইবে, তাহা চিন্তা করিয়াছিলেন। দীর্ঘকাল বিবেচনার পর তাহা বিধিবদ্ধ হইয়াছিল।

আপস্তম্ব যজ্ঞানুষ্ঠান-প্রতিপাদক কল্পসূত্র রচনা করিয়াছিলেন। বৈদিক সাহিত্যে জ্ঞানলাভ করিতে হইলে, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, জ্যোতিষ ও ছন্দস্ এই ষট্শাস্ত্র অধ্যেতব্য। প্রথমে বৌদ্ধ, পরে মুসলমান প্রভাবে জগতের এই প্রাচীন সাহিত্য লুপ্ত হইয়াছিল। আর্য্যাবর্ত্তে, বিক্রমাদিত্য জৈনমত পরিত্যাগ করিলে, ব্রাহ্মণ-প্রভাব পুনরুত্থান করে। দক্ষিণাপথে, ত্রয়ী চতুষ্টয় অবচ্ছেদানবচ্ছেদে বিদ্যমান আছে। দাক্ষিণাত্যের ভট্টাচার্য্য বেশ, এই রক্ষণশীলতার নিদর্শন। হিন্দুস্থানীরা দক্ষিণীদের

নিকট যজুস্ অধয়ান করিয়া, ইদানীং অগ্নিহোত্রী হইতেছেন। অনার্য্য দেশে যাইয়া, আর্য্যধন রক্ষিত হইল। সাম সাহিত্য গুর্জ্জরে চলিত। অথর্ব্ববেদী অতি দুর্ল্লভ হইয়াছে। কাশীর মত স্থানে বসন্ত পূজা কালে দুই জন মাত্র অথর্ব্ববেদী পাইয়াছিলাম।

বেদ আমরা কথায় মানি; কার্য্যতঃ নহে। কাশীতে তিন সহস্র দক্ষিণী আছেন; তাঁহারা বেদকে পুরুষানুক্রমে রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। অধ্যয়নশালা ক্রমশঃ হ্রাস পাইতেছে। শাস্ত্রব্যবসায়িগণ বেদপাঠী সম্প্রদায় হইতে বিচ্ছিন্ন। তাঁহারা দান সভায় সমবেত হইতে ইচ্ছা করেন না; গুরু-পরম্পরায় অর্থবোধ প্রচলিত না থাকায়, বৈদিকগণ বেদ-কণ্ঠাভরণ হইয়াও অনভিজ্ঞ। বেদাঙ্গের সাহায্যে অর্থ করা ভিন্ন বেদজ্ঞ হইবার অন্য উপায় নাই। চেষ্টা দ্বারা স্মরণ শক্তি বর্দ্ধিত হয় মাত্র।

আন্ধ্র ভাষার নাম তেলিগু। তৈলঙ্গ, ইহারই সংস্কৃত। অনূদিত মহাভারত, ইহাতে আদিগ্রন্থ।

কেশরী বংশ অন্ধ্র হইতে উৎকলে গিয়াছিলেন। তৈলঙ্গ ও বঙ্গের মধ্যে উড়িষ্যা মাত্র ব্যবধান। দ্রাবিড়ের হরিদ্রা-ম্রক্ষণ প্রথা, ওড্র ভেদ করিয়া বাঙ্গালা পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

কর্ণাট। *

বেঙ্গলুর কর্ণাট দেশের মধ্যে এক্ষণে প্রধান নগর। আমাদের প্রতিবেশী সেনাবধানী মহাশয়ের যত্নে, কৃষ্ণমূর্ত্তির নামে লিখিত পরিচয়-পত্র পাইয়াছিলাম। তিনি যাঁহাকে আমাদের যে বাসস্থান মনোনীত করিয়া দিতে কহিলেন, তাঁহার বিবেচনায়, ইহা অপেক্ষা ধর্ম্মশালা শ্রেষ্ঠ। ইহাতে উকীল কহিলেন, সে স্থান দেখাইয়া দিলে তাঁহার শিষ্টাচারের হানি হইবে। কৃষ্ণমূর্ত্তির ব্রাহ্মণ দেহ, গৌর, বিশুদ্ধ আর্য্যবংশীয়।

এই স্থান ঘাট-গিরিযুগলের মধ্যস্থ মালভূমির ঊর্দ্ধে অবস্থিত; সমুদ্রতল হইতে দুই হাজার পাদ উচ্চ; অপেক্ষাকৃত শীতল ও অনাময়। রাত্রিকালে বিলক্ষণ শৈত্য বোধ হইতে লাগিল। বৃটিশ রাজ্যের প্রতিনিধি সেনাসহ এখানে বসতি করেন। মহীশূর রাজ্যের বিচার-বিভাগ এখানে অবস্থিত। সমগ্র মহীশূর প্রদেশ আটানব্বইটি নগর ও ১৬,৭৮৪ গ্রামে বিভক্ত। ভূপরিমাণ, আনুমানিক ২৭,৯৩৬ বর্গমাইল। রাজ্যের আয় এক কোটীর অধিক। এখন আর শস্য দ্বারা রাজস্ব গৃহীত হয় না। এক সহস্র অশ্বারোহী, দুই সহস্র পদাতিক ও দুই সহস্র প্রহরী দেশরক্ষায় নিযুক্ত আছে। রাজা বার্ষিক তের লক্ষ টাকা বৃত্তি পান। দেওয়ান শেষাদ্রি আইয়া মাসিক সার্দ্ধ পঞ্চসহস্র মুদ্রা বেতন গ্রহণ করিয়া, রাজার নামে ভারত-সম্রাটের অধীনতায় তাঁহার প্রতিনিধির পরামর্শানুসারে রাষ্ট্রশাসন করিতেছেন। মহীশূরের রাজা ও রাজার গবর্ণমেণ্ট পৃথক সামগ্রী।

---

* (১) বিশ্বকোষ—শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত।

(২) ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়—শ্রীঅক্ষয় কুমার দত্ত প্রণীত।

নৃপতির অতিরিক্ত ব্যয় ও দুর্গসংস্কার করিতে হইলে, ভারতীয় রাষ্ট্র-শাসককে জানাইতে হয়।

আমরা প্রথমে লালবাগ দর্শন করিতে যাই। উপবন সৌন্দর্য্যশালী করিতে হইলে, দূর্ব্বাক্ষেত্র, গালিচা, ফিতা প্রভৃতি যাহা কিছু প্রয়োজনীয়, সকলই আছে। হুক অর্কেরিয়া, ম্যাগনোলিয়া, ক্যামোলিয়া ও রোটিকাবৃক্ষ না থাকিবে কেন? বাজারে যে সকল তরকারী বিক্রীত হইতেছে, তাহার সকলগুলি আমাদের পরিচিত নহে। কাশ্মীরের 'সেও' এখানে রোপিত হইয়া অম্লগুণ প্রাপ্ত হইয়াছে। মিষ্টান্নের মধ্যে, এ দেশে একমাত্র মহীশূর পাক্ উল্লেখযোগ্য। এই জন্য, হিন্দুস্থানী মিষ্টান্নকারগণ স্থানে স্থানে তাহাদের দেশীয় পক্কান্ন বিক্রয় করিবার সুযোগ পাইয়াছে। রসনাকে তৃপ্ত করিয়া উদর পূর্ত্তি করিতে হইলে, অনেক আড়ম্বর করিতে হয়। সম্প্রতি 'আলবুমেন' ও 'প্রোটিড' যে প্রকারে প্রস্তুত হইতেছে, তাহাতে মনে হয়, অম্লজান, যবক্ষারজান জলজান-বাষ্প ও অঙ্গারাম্ল দ্বারা শীঘ্র রাসায়নিক কৃত্রিম খাদ্য প্রস্তুত হইবে। কিন্তু তাহাতে বিবিধ স্বাদসুখ মিলিবে না। সুতরাং রুচি ও ক্ষুধা নিবৃত্তির ব্যাঘাত ঘটিবে।

দুর্গ মধ্যে হায়দর আলির পিতা কর্ত্তৃক ব্যবহৃত কাষ্ঠনির্ম্মিত জনাশ্রয় আছে। এখানে মহারাজের বন-বিভাগের লেখশালা প্রতিষ্ঠিত। স্বকীয় ও 'ইনাম' বন হইতে গৃহীত চন্দন বৃক্ষ এখানে আনীত হইয়াছে। বৃক্ষকাণ্ড কাগজ দ্বারা বেষ্টিত। এই দারুসম্ভার নিলামে বিক্রীত হইয়া থাকে।

শ্রীনিবাস মন্দির সংশ্লিষ্ট পুস্তকালয় বিলক্ষণ চিত্তাকর্ষক হইল। দেবালয় যদি করিতে হয়, তাহাতে দাতব্যশালা থাকিলে ও তৎসহ পুস্তকালয় করিয়া দিলে, জ্ঞানদানের পথ প্রশস্ত হয়। এই কার্য্যের জন্য মথুরার শেঠগণ দেবভাণ্ডারে ত্রিশ হাজার টাকা দিয়াছেন। পুস্তকালয়ের

দ্বারে তত্ত্ব-সভার যন্ত্র অঙ্কিত আছে। বেঙ্গলুর নগরে প্রকাশিত দুইখানি প্রাত্যহিক সংবাদপত্র আছে। দেশীয় ভাষায় লিখিত কোনও কাগজ দেখিলাম না; কেবল রাজার গবর্ণমেণ্ট গেজেট,—তাহা মূল না অনুবাদ, বলিতে পারি না,—সেই অভাব পূরণ করিতেছে।

চিত্রশালিকায় হলেবিদ্ হইতে আনীত প্রস্তরের কারুকার্য্য অতি মনোহর। তবে, অর্ব্বুদাচলের মত হইতে পারে না। শিবসমুদ্র ও কেটভেশ্বর মন্দির দর্শন করিবার বাসনা ছিল, এই স্থানে তাহা পূর্ণ করিয়া লইলাম। সৌরচিত্রে কাবেরী প্রপাতকে অধিকতর সুন্দর বা কুৎসিত করিয়াছে, তাহা কেমন করিয়া বলিব?

রাজহর্ম্ম্য ত্রিশ লক্ষ মুদ্রা ব্যয়ে সম্প্রতি নির্ম্মিত হইয়াছে। রাজা ও রাণীর প্রকোষ্ঠ দর্শন করিয়া আমি সভাগৃহে প্রবেশ করিলাম। রাজপুত্র ও রাজকন্যার পৃথক্ পৃথক্ পাঠাগার ও পরিচ্ছদ-গৃহ আছে। রাজার পুস্তকালয়ের নিকটে 'বিলিয়র্ড'-শালা। গৃহোপকরণের মধ্যে উদ্যানবৎ তরুবিতান ও শস্পের অভ্যন্তরে একটি ক্ষুদ্র পল্লীর আদর্শ রক্ষিত হইয়াছে। শয়নগৃহে স্ফটিক নির্ম্মিত খট্টা; ইহা আমি কলিকাতার আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে দর্শন করিয়াছিলাম। তদুপরি কৌষেয়-রচিত শয্যা শোভা বিস্তার করিতেছে।

রাজার প্রকৃতি নম্র। তিনি বিচারকার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন না। ব্রাহ্মণ কর্ম্মচারীদিগকে সম্মান বা ভয় করিয়া থাকেন। প্রতিনিধির নিবাস পালঘাট; তত্রত্য ব্রাহ্মণ অধিবাসিগণ সর্ব্বোতমুখ প্রাধান্য লাভ করিতেছেন দেখিয়া, অপরেরা অসূয়াপর হইরা উঠিতেছেন।

মহীশূর রাজ্যে কোলার প্রদেশের নানা স্থানে স্বর্ণখনি আছে। তাহা হইতে মাসিক বারো লক্ষ টাকার সুবর্ণ উত্তোলিত হইয়া, বিক্রয়ার্থ ইংলণ্ডে প্রেরিত হয়। ভারতে হিরণ্যের আধিক্য করিতে দেওয়া হয় না।

খনি-সত্ত্বয়ের অংশপত্র বিদেশে বিক্রীত হইয়া থাকে। তবে মহীশূর-রাজ কতকগুলি অংশখণ্ড গ্রহণ করিতে পারিয়াছেন।

রাজার প্রতিনিধি-সভা ৩৪০ জন প্রতিনিধি দ্বারা গঠিত। তাহাতে ইউরোপীয় ধর্ম্মপ্রচার, কফি প্রভৃতি ব্যবসায়ের প্রয়োজন ও প্রজার হিতাহিত সমালোচিত হইয়া থাকে। দেওয়ান উপস্থিত থাকেন। বৎসরে চারিদিন মাত্র সার্ব্বজনিক সভার অধিবেশনের কাল নির্দ্ধারিত আছে। সচিব শেষাদ্রি বিবিধ প্রশ্নের উত্তর দেন। আয় ও ব্যয় সমালোচিত হয়। সে বিষয়ে প্রতিনিধিগণের সম্মতি-সংখ্যা গণনা করিয়া কার্য্য করিবার নিয়ম নাই। রাষ্ট্রের জনসংখ্যা ৫০ লক্ষ। যাঁহারা এবার প্রধান প্রধান স্থানের প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিতে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের সংখ্যা ১,০৩৯। নির্ব্বাচন প্রথার স্বরূপ কি, এই সংখ্যা হইতেই তাহা বুঝা যায়। মন্ত্রিসভা নিযুক্ত করিবার ক্ষমতা অবশ্য প্রজার নাই। এইরূপ সঙ্কীর্ণ ব্যবস্থায় জনসাধারণের রাজনৈতিক শিক্ষা ও জাতীয় ভাবের উন্মেষ হইবার নহে।

দক্ষিণ-পশ্চিম বায়ু-প্রবাহ হীনবল হওয়ায়, সমুদ্রজাত মেঘ মহীশূরে প্রবাহিত হয় না। উত্তর-পূর্ব্ব মৌসমী-বায়ু চালিত পর্জ্জন্যও বিমুখ হইয়াছে। ফলে শস্যক্ষেত্র প্রান্তরে পরিণত, সরোবর শুষ্ক, তৃণাভাবে পশু বিগ্রতপ্রাণ ও মানব দুর্ভিক্ষে ক্লিষ্ট হইয়াছে। রাজা কিয়ৎকালের জন্য কর-গ্রহণ স্থগিত রাখিয়াছেন। স্থানান্তর হইতে শস্য আহরণ করিয়া আনয়ন করিতেছেন। অবাধ-বাণিজ্য না থাকিলে লোকে প্রাণ হারাইত। বাণিজ্যনীতি অতি জটিল। রাজনীতি উহাতে সম্বদ্ধ হইয়া কার্য্য করে। সবাধ ও নির্ব্বাধ, কোথায় কি প্রয়োজনীয়, এ স্থলে তাহা বিচার্য্য নহে। এখানে আমাদের হেমন্ত ও শিশির ঋতুতে বাতাবরণে তাপের হ্রাস হইয়া থাকে। তৎকালে উহা মেঘধারণে অক্ষম হয়। তখন কুজ্ঝটিকা বা মে

বৃষ্টি রূপে পতিত হইতে থাকে। সমুদ্রের নিকটবর্ত্তী অন্ধ্র দ্রবিড়ের মত, কর্ণাটে ঘূর্ণীবায়ু উৎপন্ন হইতে পারে না।

মহীশূরের প্রাকৃতিক অবস্থা স্কটল্যাণ্ডের তুল্য। এক জন মুসলমান মক্কাযাত্রী তথা হইতে কফী ফল আনয়ন করিয়া সামান্য কৃষিক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়াছিলেন। অধুনা স্কচ্ বণিকগণ প্রভূত পরিমাণে কফী উৎপাদন করিতেছেন। ইয়ুরোপীয় বণিকগণ মহারাজের প্রতি বিলক্ষণ প্রসন্ন। তাঁহারা কহেন, এই রাজ্য স্বায়ত্বশাসনসুখ ভোগ করিতেছে। বস্তুগত্যা ভারতে ইহা অন্যতর আদর্শ রাজ্য। ঋণগ্রস্ত কৃষিজীবী বিচারালয়ের ব্যয় সহ্য করিতে পারিবে না বলিয়া, বিবাদ-মীমাংসার জন্য পল্লীসমাজ আহূত হইয়া থাকে। শিল্পের উন্নতিকল্পে ক্রিয়াসিদ্ধ উপদেশ দিবার জন্য দেশীয় ভাষায় লিখিত সাময়িক পত্র প্রকাশিত হইতেছে। অসহায় বৃদ্ধদিগকে অবদান-বৃত্তি দিবার প্রস্তাব হইয়াছে। রেশম ও লৌহের ব্যবসায় লাভ-জনক হইবে না, বিবেচনা করিয়া, তাহার প্রতি আর মনোযোগ নাই। দেওয়ান প্রতিনিধি-সভায় বাল্য ও বার্দ্ধক্য বিবাহ নিবারণ করিবার চেষ্টা পাইয়াছেন। কর্ণাটপতি পণ্ডিতরত্নম্ কস্তুরী রঙ্গাচারীকে প্রয়াগের সামাজিক সম্মিলনে প্রেরণ করিয়াছিলেন। তিনি সমুদ্রযাত্রার বৈধতা ও বাল্যবিবাহের অশাস্ত্রীয়তা প্রতিপন্ন করিবেন। মঠের মোহন্ত নিয়োগ সম্বন্ধে রাজ-সম্মতি প্রয়োজনীয়, প্রতিনিধি-সভা এই প্রস্তাব করিয়াছেন। এই রাজ্যে আটশত দেবমন্দির ও সপ্ততি সত্রের জীর্ণসংস্করণের জন্য বার্ষিক আটচল্লিশ হাজার টাকা ব্যয়ের জন্য ভারত গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রার্থনা করা হয়। চল্লিশ হাজার টাকা ব্যয়ের অনুমতি হইয়াছে। ধর্ম্মাম্বুধি সরোবরের পঙ্কোদ্ধার হইবে।

মহীশূর কর্ণাটপতির রাজধানী। আমরা নন্জরাজ ভূম্যধিকারীর সত্রে আশ্রম পাইলাম। ভারত-রাজপ্রতিনিধির সমাগম-উৎসব উপলক্ষে

মণিকার গোপীনাথ চেন্নপট্টন হইতে আসিয়া এই বাটীতে অবস্থিতি করিতেছেন। তিনি দুগ্ধ আহরণ করিতে পারেন নাই। আমি তাঁহার সে অভাব দূর করিলাম। তিনি তাঁহার সূপকার দ্বারা আমাকে কয়েক খানি ব্যঞ্জন পাঠাইয়া দিলেন। কচুরশাক দিয়া ডাইল পাক করিয়াছে; ইহা কটুরসে লঙ্কা ও তিন্তিড়ী সহযোগে প্রস্তুত পানীয়ের তুল্য; সুতরাং আমাদের অখাদ্য।

ভোজনে তৃপ্তি না হইলে বহির্দ্দেশে যাইয়া দ্রাবিড়ভোগ্য তিল-তৈল-পক্ক ফুলুরী ইত্যাদি গ্রহণ করিতে হইবে। আমাদিগকে লুচি ভাজিতে দেখিয়া একজন চমৎকৃত হইলেন। ঘোল দিয়া ভাত পাইলেই তাঁহার যথেষ্ট। এক ডাইল ভিন্ন মাংসপেশী নির্ম্মাণকারী যবক্ষারজানময় খাদ্য এ প্রদেশে নাই।

আমাদের রাজ্যের প্রধান শাসনকর্ত্তা সিমলা শৈল হইতে অবতরণ করিয়া শারদীয় ভ্রমণ আরম্ভ করিয়াছেন। ভূপালের বেগম জানাইয়াছেন "গতবার লেডী ল্যান্‌স্‌ডাউন আসিতে পারেন নাই; এবার রেলষ্টশনে আপনার সাক্ষাৎ হইলে কৃতার্থ হইব।" বেগমের রাজ্য দিয়া আসিবেন, অথচ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইবে না, ইহা অপমানজনক। লাট সাহেব অবতরণ করিয়া আহার করিলেন। তাহাতে লক্ষ টাকা ব্যয় হইল। তিনি নিজামের রাজধানীতেও গিয়াছিলেন। ভারত-সাম্রাজ্যের জন্য যোল শত যোধ-রক্ষণের ব্যয়ভার দিয়া আসিয়াছেন। পূর্ব্বতন রাষ্ট্রপতিগণ সাধ্যপক্ষে সম্রাট-স্থানীয় ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ করিতেন না। মহীশূর-রাজকে এই উপলক্ষে দুই চারি লক্ষ টাকা ব্যয় করিতে হইবে।

নগরের চতুর্দ্দিকে আনন্দজ্ঞাপক পতাকা উত্তোলিত হইয়াছে। মহারাণীর হিন্দু বালিকা-বিদ্যালয়,—হিন্দু বলিলে জাতি আসে, তজ্জন্য ইহার নাম হিন্দু না হইয়া জাতি-ঘটিত পাঠশালা হইয়াছে,—এবং

রাজপথের পার্শ্বস্থ অধিকাংশ প্রকোষ্ঠ মঙ্গলভাবসূচক পীতবস্ত্রে মণ্ডিত হইয়াছে। পথিমধ্যে কয়েকটি বিজয়-তোরণ লতাপল্লব ও পুষ্পদামে সজ্জিত হইয়াছে। তন্মধ্যে একটি কর্ণাটের আকারে আপাদমস্তক চন্দ্রমল্লিকা দ্বারা সজ্জিত হইয়াছে। বনমালী বাবু কহিলেন, আমরা যখনই আসি, প্রতিবারেই হেমন্তসুন্দরী-বিভূষিত পুরদ্বার দর্শন করি। ল্যান্‌স্‌ডাউন নগরের মার্কুইস মহীশূরপতি চমরাজেন্দ্র ওড়েয়রের সহিত চতুরশ্বযোজিত এক যানে উপবেশন করিয়া, অগ্রপশ্চাতে অশ্বারোহী সৈন্যে পরিবৃত হইয়া আসিতেছেন। অগ্রে গজোপরি রৌপ্যবিনির্ম্মিত ঢক্কা ও উষ্ট্রসজ্জা গিয়াছিল, তাহা দেখিতে পাই নাই। প্রতিহারীর দল মৎস্যলাঞ্ছিত সুবর্ণ-যষ্টি ও রৌদ্ররোধক আনতভাবে বহন করিতেছে। তন্মধ্যে কর্ণাটেশ্বরের দ্বিগ্রীব পক্ষিধ্বজ সভয়ে বক্র হইয়া চলিতেছে। পণ্যবীথিকা পীত রেখা বিশিষ্ট কৃষ্ণাম্বর পরিহিতা, অনবগুণ্ঠিতা, মণি মুক্তাধারিণী শ্যামাঙ্গীদের প্রদর্শনীক্ষেত্র স্বরূপ হইয়া উঠিয়াছিল; তাহা এক্ষণে ক্রমশঃ শূন্য হইতে লাগিল। পথিপার্শ্বে মঞ্চ রচনা করিয়া, আপাদলম্বিত-শোকবস্ত্রধারী রোমীয় খ্রীষ্টান প্রচারক ছাত্রসমূহ লইয়া উপবিষ্ট ছিলেন; তিনি করবস্ত্র আন্দোলন সহকারে তিন বার আনন্দধ্বনি করিয়া অভ্যর্থনা করিলেন। জনতার মধ্যে তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইলাম। আমরা লোক-তরঙ্গ ভেদ করিয়া রাজভবনের সম্মুখীন হইলাম। বৃহৎ প্রাঙ্গণে অশ্বারোহী সৈন্য সকল শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে; তৎপরে চাকচিক্য-বিশিষ্ট ভল্লধারী, তদনন্তর পদাতিক সৈন্য, সর্ব্বশেষে রাজ নাম খ্যাপনকারী ও ধ্বজবাহকগণ। স্থানে স্থানে ছত্রধারিগণ ও একপার্শ্বে সজ্জিত হস্তিযূথ উপস্থিত। তাড়িত আলোকের স্নিগ্ধোজ্জ্বল অংশুমালায় সকলই আচ্ছন্ন। বিজয়ার দিনও এইরূপ সমারোহ হইয়া থাকে। তৎকালে মহারাজ বহুমূল্য অলঙ্কার ও পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া প্রাসাদোপরি

হস্তিদন্ত নির্ম্মিত সিংহাসনে উপবেশন করেন। তোপধ্বনি হইতে থাকে। ব্রাহ্মণগণ বেদগান করিয়া আশীর্ব্বাদ করিলে, বাদ্যধ্বনি হয়। সেনাগণ জয় উচ্চারণ করে। তাহার পর রাজা সিংহাসন প্রদক্ষিণ করিয়া প্রণতি করেন। এক্ষণে সে কথায় প্রয়োজন নাই। বিবিধ ক্রীড়া আরম্ভ হইল। রাজা ও গবর্ণর উপরে সেই স্থলে আসীন। আমি কুর্গবাসীর সামরিক নৃত্য দেখিয়া প্রস্থান করিলাম।

পর-রজনীতে আগ্নেয়ক্রীড়া ও দীপান্বিতা উৎসব। দেবরাজ-হ্রদের বক্ষে তরণীর উপর রঞ্জিত কাচাধারে আলোকের দেবালয় নির্ম্মিত হইয়াছে। উহা ঘূর্ণ্যমান হইলে জলাশয়ে রামধনুবর্ণে চিত্রিত প্রতিবিম্ব অতি রমণীয় দৃশ্য ধারণ করিতে লাগিল। দুর্গোপরি নবরত্নের মত রঞ্জিত কাচপাত্রের আলোকবর্ত্তিকা-সমাবেশ তামিস্রের মধ্যে অত্যুজ্জ্বল অলঙ্কারবৎ প্রতিভাত হইল। এই চমৎকার দৃশ্য দেখিতে দেখিতে নাট্যশালার পার্শ্ব দিয়া পান্থনিবাসে উপনীত হইলাম। একবার পশ্চাদ্‌বর্ত্তী হইয়া, দূরস্থ দীপমালার সৌন্দর্য্য উপভোগ করিলাম; নিকটে তেমন দেখায় না।

জগন্মোহন নামক অট্টালিকার অভ্যন্তরস্থ গৃহগুলির প্রাচীরে অত্যুৎকৃষ্ট ঐতিহাসিক ঘটনার চিত্র সমুদায় সুসজ্জিত আছে।

যে চামুণ্ডা শৈলের সানুদেশস্থ বিস্তীর্ণ উপত্যকা মধ্যে এই নগর স্থাপিত, আমরা সেই দেবমূর্ত্তি দর্শন করিবার জন্য পর্ব্বতের উপর উঠিতে আরম্ভ করিলাম। নিম্নে মেষ ও কুক্কুট বলি প্রদত্ত হয়। এই রাজ্যের অধিষ্ঠাত্রী ও রাজাদিগের কুলদেবী চামুণ্ডা মহিষাসুরকে নিহত করিয়া যে স্থানে বিশ্রাম করিয়াছিলেন, তথায় প্রস্তর-প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত উচ্চ মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। সন্নিকটে পুরোহিতদিগের বাস এবং রাজকুমার ও রাজকুমারীগণের নামকরণের জন্য বিশ্রামভবন। দেবী প্রস্তরময়ী,

অষ্টভুজা ও সিংহবাহিনী। বঙ্গদেশের ন্যায় দশভুজা নহেন। নবরাত্রিতে বিশেষ সমারোহে দেবীর অর্চ্চনা হইয়া থাকে। গণপতি, লক্ষ্মী, ষড়ানন ও সরস্বতী মূর্ত্তি সহযোগে মৃন্ময়ী মাকে বাঙ্গালী যেমন ভাবোচ্ছ্বাস লইয়া দেশের মা বলিয়া বন্দনা করিতে পারে, এখানে তেমন শারদীয় উৎসব হয় না।

শ্রীরঙ্গপত্তনম্।—স্বাগতের উৎসব-ভঙ্গে, বিপুল জন-স্রোত লৌহ-পথে প্রবাহিত হইয়াছে। আমাদিগকে দায়গ্রস্ত হইয়া প্রথম শ্রেণীতে যাইতে হইল। এখানকার স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য বড়ই মনোরম। পার্ব্বতীয় অধিত্যকা ও উপত্যকা ভূমি, নিবিড় বনমালা, সুজলা, শস্য-শ্যামলা বসুন্ধরা ও প্রখরবেগে নিঃসৃতা পার্ব্বত্য জলধারা, প্রকৃতির নিত্য অভিনব শোভা সম্পাদন করিতেছে।

বাষ্পীয়-শকট হইতে অবতরণ করিয়া, আমরা আপ্‌পার বাটীতে উপস্থিত হইলাম। উদ্যানের মধ্যেও ভদ্র-সমাগমে মধ্যাহ্নকাল যাপিত হইল। শেষশায়ী রঙ্গনাথের মুখ কি সুন্দর! বারংবার দেখিতে ইচ্ছা হইতে লাগিল। কিন্তু অশ্লীল মূর্ত্তির জন্য রথ তেমনি অশ্রদ্ধেয়। আমরা কাবেরীতে স্নান করিলাম। সিন্ধু অবশিষ্ট রহিয়া গেলেন। অনন্তর বিধ্বস্ত দুর্গের প্রাকারোপরি ভ্রমণ করিলাম। লালবাগে, হাইদর, টিপু ও তদীয় মাতার সমাধি আছে। দর্শনকালে প্রদর্শক কহিয়াছিল, ইহা কারবালার তুল্য; কারণ টিপু যুদ্ধে হত হইয়া সহিদ হইয়াছেন; এখানে সম্মার্জ্জনী-বাহক হইয়া থাকিতে পারিলেও, সম্মান জ্ঞান করি। সমাধি-গৃহটি মসৃণ কৃষ্ণ-প্রস্তর নির্ম্মিত স্তম্ভে বেষ্টিত। আবলুসের কবাট হস্তিদন্ত-খচিত কারুকার্য্যে শোভিত। মৃতের প্রতি গৌরব প্রদর্শনার্থ এস্থলে সকলেরই ছত্র ব্যবহার নিষিদ্ধ। সম্প্রতি মহীশূররাজ ত্রিশ হাজার টাকা ব্যয়ে, দরিয়া দৌলৎবাগের সংস্কার করাইয়াছেন। এখনও দর্পণা-

ধারে লর্ড ডেলহাউসির অনুজ্ঞাপত্র রক্ষিত হইতেছে। তাহাতে লিখিত আছে,—হাইদর ও টিপুর এই স্থানটি এক দর্শনীয় সামগ্রী; ইহা কেহ যেন নষ্ট না করেন। কাশ্মীরের মণ্ডী বা অমৃতসরের গুরুদরবারের সোনালি ও রঙ্গীন কাজ, ইহার তুলনায় অকিঞ্চিৎকর। এই স্থানটি দর্শনীয়,—কিন্তু বর্ণনীয় নহে। বহির্ভাগ হইতে, আমরা বিবেচনা করিয়াছিলাম, বুঝি এখানে কিছুই দর্শনীয় নাই। এখানেও রাজার চন্দনের কুঠি আছে। এই দ্রব্যের ব্যবসায়, রাজার একায়ত্ত। তাহাতে বার্ষিক দশ লক্ষ টাকা লভ্য হয়। বল্কল ছিন্ন না করিলে, কাষ্ঠের সৌগন্ধ মিলে না। ষাট টাকায় এক "টন্" কাষ্ঠ বিক্রীত হয়।

অবসরকালে আপ্পা মহাশয়ের সহিত দেশের কথা হইতে লাগিল। প্রথমে ১৬১০ অব্দে মহীশূর রাজ্যের রাজধানী এখানেই ছিল। বর্ত্তমান রাজার আদিপুরুষ, বিজয় ১৩৯৯ খৃঃ অব্দে প্রভুশক্তি প্রাপ্ত হন। তিনি দ্বারকার যদুবংশীয় ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচিত। কিন্তু কুম্ভকার জাতির সহিত তাঁহাদিগকে বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করিতে দেখা যায়। ১৭৬১ অব্দে হায়দর আলী তিমল রাওকে পরাজিত করিয়া, তাঁহার রাজ্য আত্মসাৎ করিয়াছিলেন। ব্রিটিশ-সূর্য্যের অভ্যুদয় হইলে, হায়দর আলীর পরাক্রম বিধ্বস্ত হয়। রাজ্য বহুবিস্তৃত হইলে পর্য্যবেক্ষণ বা রক্ষা করা কঠিন, এইরূপ বা অন্য কিছু বিবেচনা করিয়া ব্রিটিশরাজ ১৭৯৯ অব্দে, পূর্ব্ব অধিপতির বংশধর পঞ্চমবর্ষীয় বালক কৃষ্ণরাজ ওড়েয়রকে অধিপতির পদে বরণ করিয়া, রাজক্ষমতা স্বহস্তে গ্রহণ করিলেন। ইহাতে এই বংশাবলী ইংরাজের চিরানুগত থাকিল। কথিত আছে, এই অভিশপ্ত রাজপরিবারকে এক পুরুষ অন্তর দত্তক গ্রহণ করিতে হয়। বর্ত্তমান অধীশ্বর চামরাজেন্দ্র ওড়েয়র এক কৃষিজীবীর সন্তান। ১৮৬৮ অব্দে তিনি দত্তকরূপে পরিগৃহীত হইয়াছেন। তাঁহার সময় রথ্যা প্রস্তুত ও

কুল্যা খনন জন্য ভূমিতে শস্যোৎপত্তি দ্বিপাদ-পরিমাণে বর্দ্ধিত হওয়াতে, রাজস্বের পরিমাণও তদনুপাতে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে।

কর্ণাটের প্রাচীন সীমা, রাজধানী ও ইতিহাস বিস্মৃতি গর্ত্তে লীন। রামায়ণে, কিষ্কিন্ধ্যা ও সুগ্রীব, এই ভূভাগের বিষয়ীভূত হইয়াছিল। অধুনা বৌদ্ধ, জৈন ও ব্রাহ্মণ্য মতাবলম্বী চের, চোল, চালুক্য ও কদম্ব-দিগের আংশিক বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। তাহাতে কথঞ্চিৎ ইঁহাদিগের ক্রমনির্ণয় হইতে পারে। মুসলমানবিজয়ী বিজয়নগরাধিপতির প্রতাপ খর্ব্ব হইলে, পলীগার-নেতারা স্বাধীনতা অবলম্বনে প্রয়াসী হন। কেলডিওবলমের নায়ক, চিত্তল দুর্গ এবং তারিকেরের বেদ্দর নেতাদিগের সহিত সম্মিলিত হইয়া, ওড়েয়ারগণ এই স্থান আক্রমণ করিয়াছিল এবং বর্ত্তমান ভগ্ন দুর্গ অধিকার করিয়া বিজয়নগরপতির শাসন উচ্ছেদ করিয়াছিল।

পূর্ব্বকালে চের, চোল ও পাণ্ড্য এই তিনটি রাজবংশই বিখ্যাত হইয়াছিল। সময়ক্রমে ইহাদের মধ্যে কোনটি প্রাধান্য লাভ করিয়া অপরকে বশে আনিত। কলিঙ্গ ও বঙ্গের সহিত ইহাদের ঘনিষ্ঠতা ছিল; গঙ্গা-বংশের মূল নাম কেঙ্গু। দ্রাবিড় উচ্চারণে গঙ্গা কঙ্গাত্ব প্রাপ্ত হয়। কোন সময়ে কেরল কেঙ্গুরাজ্য নামে অভিহিত ছিল। কর্ণাটের চের বংশ, কেরল পর্য্যন্ত বিস্তৃত। বঙ্গীয় রাঢ়ে, চোল বংশের অভ্যুদয় হয়, ইহা সকলেই জ্ঞাত আছেন। গাঙ্গেয় ভূভাগে আধিপত্য-নিবন্ধন, চের বা চোলগণের গঙ্গা উপাধি হওয়া সম্ভবপর। স্থানবিশেষে চের ও চোল অভিন্ন দেখি।

বিজয়নগর অবশ্য দর্শনীয়। কিন্তু আমরা তথায় যাইতে পারি নাই। উহার বর্ত্তমান নাম হাম্পি। এক্ষণে উহা ধ্বংসস্তূপে পরিণত, একটি গণ্ডগ্রাম বলিয়া প্রতীয়মান হয়। লৌহপথ 'তুঙ্গভদ্রাতীরে, হস্পেট

নগরের অধিষ্ঠান হইতে দুই যোজন অন্তরে অবস্থিত। জগতে জলবুদ্‌বুদের মত কত নৃপতি উত্থিত ও বিলীন হইয়াছেন; তাঁহাদের সম্বন্ধে অধিক বক্তব্য থাকে না। কিন্তু, এখানে দ্বিতীয় রাজর্ষি জনক আবির্ভূত হইয়াছিলেন। বিদ্যারণ্য মুনির শাসন-কাহিনী অতি অদ্ভুত।

বিজয়ধ্বজ ১১৫০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্ব হইতে এই সমৃদ্ধ পুরীর সহিত আপন নাম যোজনা করিয়াছিলেন। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ বাহ্লীক হইতে আসিয়াছিলেন। ১৩৩৪ খৃষ্টাব্দে সে বংশাবলীর অবসান হইলে, দেশে অরাজকতা উপস্থিত হয়; অশান্তির অনল জ্বলিয়া উঠে।

মাধবাচার্য্য (বিদ্যারণ্য মুনি) যখন শুনিলেন, বিজয়নগরে রাজা জম্বুকেশ্বরের মৃত্যু হওয়ায়, মুসলমান দাক্ষিণাত্যে স্বকীয় প্রভাব বিস্তার করিতে অগ্রসর হইয়াছে এবং সনাতন ধর্ম্মের যথেষ্ট গ্লানি হইতেছে, তখন, তিনি শৃঙ্গেরী মঠের নিভৃত সাধন-পীঠ পরিত্যাগ করিয়া, কক্ষ ভ্রষ্ট গ্রহের ন্যায়, বিষয়-ব্যাপারময়ী রাজধানীর অভিমুখে ধাবিত হইলেন। নিষ্কাম সন্ন্যাসী, বিষয়ে সম্পূর্ণ বিগতস্পৃহ হইলেও, সাম্রাজ্যের হিতের জন্য, নির্লিপ্তভাবে রাজ্যভার স্বীয় স্কন্ধে গ্রহণ করিলেন। বিদ্যারণ্য মাধবের নামেই স্থানটি বিদ্যানগর সংজ্ঞা লাভ করিল। 'বিজয়নগর' আখ্যাটিও অদ্যাপি লুপ্ত হয় নাই।

বিদ্যারণ্য দশ বৎসর প্রজাপালন করিয়া, উপযুক্তবোধে বুক্করায়ালুকে সিংহাসন প্রদান করিয়া, স্বয়ং মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিলেন। এই কার্য্যে তাঁহার স্বার্থশূন্যতা প্রমাণিত হইয়াছে। বর্ত্তমান মহীশূর রাজ্যের অধিকাংশ বিদ্যানগরের অধীন হইল। বুক নৃপতি অন্যান্য সহযোগিগণের সহিত মিলিত হইয়া দিল্লীর সুলতানকে একবার পরাস্ত করেন। ১৩৪৭ অব্দে দক্ষিণাপথ হইতে একেবারে যবনদিগকে দূরীভূত করিয়া দেওয়া হয়। বুক উড়িষ্যা পর্য্যন্ত জয় করিয়া, অখিল দক্ষিণাপথের সম্রাট হইয়াছিলেন।

তাঁহার বংশ জাতিবর্ণ-নির্ব্বিশেষে প্রজাপালন করায়, তাঁহার রাজ্যে শিল্প সাহিত্য প্রভৃতির যথেষ্ট উন্নতি হয়।

মুসলমানেরা, গোমন্ত বা গোয়া অধিকার করিয়া, হিন্দু দেবালয় নষ্ট ও হিন্দু নিগ্রহে প্রবৃত্ত হইলে, বিদ্যারণ্য ভারতীর প্রাণ আকুল হইল। স্বয়ং বহুসংখ্যক সৈন্য লইয়া গিয়া, তিনি গোমন্তের উদ্ধার-সাধন পূর্ব্বক শান্তিলাভ করিলেন। মাধব একজন প্রসিদ্ধ রাজনীতিজ্ঞ, পরম তাপস এবং স্বজাতি ও স্বধর্ম্মের রক্ষায় তৎপর ব্যক্তি ছিলেন। ইনি মায়নের পুত্র এবং সায়নের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। তৎকালে ভারতের মধ্যে তিনি একজন অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। হুক বুকবংশে সায়নাচার্য্য পরে মন্ত্রী হইযাছিলেন। বেদভাষ্য কেবল তদীয় পরিশ্রমের ফল নহে। মাধব ও তাঁহার অনেক শিষ্য দ্বারা এই কার্য্য পরিসমাপ্ত হয়। আচার্য্য মাধব পঞ্চবিবেক, পঞ্চদীপ, পঞ্চ-আনন্দাত্মিকা, পঞ্চদশী প্রভৃতি বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। এক হস্তে শাস্ত্র ও অন্য হস্তে শস্ত্র ব্যবহার করিতে ইদানীং অন্য কোন ব্যক্তিকে দেখা যায় নাই।

তাঁহার দেশবাৎসল্য ও স্বধর্ম্মরক্ষার বাঞ্ছা অবশ্য কর্ম্মমার্গের বিষয়ীভূত; পরন্তু তাহাতে ব্যক্তিগত হিতাকাঙ্ক্ষা না থাকায়, উহা তাঁহার জ্ঞানপথের বিরোধী হয় নাই। তাঁহার অন্তিম জীবনের কথা আমরা জ্ঞাত নহি, বোধ হয় তখন সর্ব্বপ্রকার কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া তিনি আত্মতৃপ্ত অবস্থায় যাপন করিয়াছিলেন।

পরবর্ত্তী কালে রামদাস স্বামী ও শিবাজী ঐ প্রকার কার্য্যে প্রবৃত্ত হন। মাধব ও বুক্কের ন্যায় কিয়ৎকালান্তে, তাঁহাদের সে পরিশ্রম অনেকাংশে পণ্ড হইয়া গেল। ভারত হইতে মুসলমান দূর হইল না। অনেকে মনে করিয়াছিলেন, শ্রীভগবান্ দাক্ষিণাত্যে হিন্দুরাজত্বের মূল দৃঢ় করিবার জন্য অভিনব উপায় করিতেছেন। কিন্তু পারমার্থিকতায়

একান্ত অভিনিবিষ্ট হওয়ায়, তাঁহারা 'যোগ্যতরের সংরক্ষণ-তত্ত্ব' বুঝেন নাই। তাঁহারা রণ-নীতি ও সমাজ-নীতিতে উদাসীন ছিলেন। রাজা যদি শিক্ষা দিতেন, দেশ-প্রজার তবে এমন হইত না। একজন যাইবে অপরে রাজা হইবে, ইহাতে আমাদের ক্ষতি বৃদ্ধি নাই, সাধারণে ইহাই ভাবিত। ব্যক্তিবিশেষ, প্রকৃতি-প্রভাবে পরিচালিত হইয়া, স্বকীয় জীবনকে নিয়মিত করিতে পারে না। একটি দেশ ব্রহ্মাণ্ডের প্রভাবকে কেমন করিয়া আয়ত্ত করিবে। লোকের কর্ম্মে অধিকার আছে,—তাহা না করিলে দোষী হইবে; কর্ম্মফলে কদাচ অধিকার নাই। ব্যক্তিত্বকে সার্ব্বজনিকত্বের মধ্য দিয়া লইয়া যাওয়া আবশ্যক। তাহা হইলেই দেশভক্তি আসিয়া পড়ে। হিন্দু জাতি, নানা বর্ণ, বিবিধ ভাষা ও বহু মতের আশ্রয় লইয়াছিল বলিয়া, এক সাধারণ উদ্দেশ্যকে লক্ষ্য করিয়া এক প্রাণ হইতে পারিত না, এমন নহে। সে বোধ যখন ছিল না, তখন মুসলমান অধিকার অবশ্যম্ভাবী। ১৫৬৫ অব্দে ব্রাহ্মণী মুসলমান-রাজ কর্ত্তৃক বিজয়নগর উৎসন্ন হইল। এই বংশের দৌহিত্র আনগুণ্ডি নামক স্থানে রাজ্য করিতেছিলেন। অদ্যাপি বংশপরম্পরাক্রমে তাঁহারা সেখানে আছেন। হুক বংশ চন্দ্রগিরিতে যাইয়া লোপ পাইয়াছে।

দ্রাবিড় জাতির সমুদয় শাখা অদ্যাপি আর্য্যমত গ্রহণ করে নাই। মহীশূরের জনসংখ্যায় বোকলিগ-জাতি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। তাহাদে হোলীয়ারু, মন্নালু এবং হোন্নালু নামে কয়েকটি উপজাতি আছে; ইহারা প্রায়শঃ ভূম্যধিকারীর অধীনতায় দাসত্ব-সূত্রে আবদ্ধ। কৃষ্ণবর্ণ করুব দিগের সংখ্যা অধিক। তাহারা ক্ষুদ্রকায়, ধম্মিল্লধারী। তদ্ভিন্ন ইলিরগার শোলিগার প্রভৃতি অসভ্য আদিম নিবাসী উল্লেখযোগ্য।

আর্য্য ও অনার্য্য-লক্ষণাক্রান্ত কায়-ধারীদের মধ্যে, বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম,—স্মার্ত্ত, মাধ্ব, শ্রীবৈষ্ণব ও জঙ্গম ভেদে চতুর্ব্বিধ। বণিকজাতির অধিকাং

শেষোক্ত সম্প্রদায়ভুক্ত। দ্বৈত ও অদ্বৈতের মধ্যপন্থী বিশিষ্টাদ্বৈত সম্প্রদায়ের ললাটমধ্যস্থ দীর্ঘতিলক, অবশ্যই, বিশিষ্টভাব প্রদর্শন করিয়া থাকে। শ্বেত প্রশস্ত রেখাদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তিনী, লক্ষ্মীস্বরূপা পীতরেখা দ্বারা পিঙ্গল, এবং সিংহাসন বিহীন তিলক, বড়্‌গল শ্রেণীর নির্দ্দেশক। বড়গলগণ শ্রীকে অর্চ্চনা করেন না; একমাত্র বিষ্ণু তাঁহাদের আরাধ্য। পিঙ্গলগণ, লক্ষ্মী কেন,—ভগবান্‌কেও পশ্চাতে রাখিয়া, তদ্ভক্ত হনুমানের পূজা করিতেছেন। অযোধ্যায়, হনুমানগঢ়ীতে, এইরূপ দেখিয়া, চমৎকৃত হইয়াছিলাম। চিৎ ও অচিৎ দুইই ঈশ্বরের শরীর। এই অদ্বৈত-বোধের মধ্যে, ভক্তি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি বিভাগ করিয়া, জীবকে ঈশ্বরের দাস বলিয়া দিলেন। এইজন্য, শ্রীবৈষ্ণব বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী। বাৎসল্য দাস্য হইতে সখ্যে যাইয়া, মধুররস পর্য্যন্ত উত্থিত হইবে। ভক্তির মধুর ভাবটি, কামানুগ বলিয়া, অনেক সময় অনর্থের মূল হইয়াছে। শৈবগণ বামাচারী নহেন। বাম অর্থে, প্রতিকূল। শিষ্টাচার স্মৃতিতে, বাম দক্ষিণ, অর্থাৎ অনুকূল, সেই পক্ষাবলম্বী হওয়ায়, ইঁহারা স্মার্ত্ত। যাহারা স্বভাবতঃ কুৎসিত আচারে রত, তাহাদের সংযম-শিক্ষা ও উদ্ধারের জন্যই বামাচার। সেই কারণে তান্ত্রিক বলেন,—

যদ্যপি সিদ্ধং লোকবিরুদ্ধং নো করণীয়ং নো চরণীয়ম্।
করণীয়ং চরণীয়ং চেৎ তদপি রহস্যং নো বক্তব্যম্॥

স্মার্ত্তগণ, ভস্ম ধারণ করিতে বাধ্য। তাঁহাদের ত্রিপুণ্ড্র, কৃষ্ণবর্ত্তুল দ্বারা চিহ্নিত। তাঁহাদের অদ্বৈতবাদ, সাধারণের বোধগম্য নহে; নামে মাত্র স্বীকৃত। দ্রাবিড়ে, শিব-মন্দির থাকিলেই, অদূরে, বিষ্ণু মন্দির প্রতিষ্ঠিত করিয়া, বৈষ্ণব সাধকগণ, আপন প্রাধান্য রক্ষার্থ চেষ্টা করেন। মাধ্বগণ প্রকৃত পক্ষে, ইঁহাদের মধ্যবর্ত্তী। সুতরাং তাঁহারা মঠস্থ পীঠে, হরিহর উভয়কেই, স্থান দিয়াছেন। তাঁহারা যূপাকার তিলক মধ্যে,

সমন্বয় প্রদর্শনের জন্য ভস্ম রেখা অঙ্কিত করেন। দ্বৈতবাদী মধ্বাচার্য্য, প্রাকৃত জনের মত, জড় ও চৈতন্য পৃথক্ বোধ করিয়াছিলেন; পাণ্ডিত্য প্রকাশের দিকে যান নাই। লিঙ্গায়েৎগণ, জঙ্গম বা অসাম্প্রদায়িক। ব্রাহ্মণ মতাবলম্বী বাসব, জৈন মতের উচ্ছেদ সাধনোদ্দেশে, এই সম্প্রদায়ের স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি ১১৬৮ খৃঃ অব্দে মানবলীলা সংবরণ করেন। জঙ্গমেরা গলে ক্ষুদ্র শিবযন্ত্র ধারণ করেন। পূর্ব্ব মত, সম্পূর্ণ ত্যাগ করিতে না পারায়, তাঁহাদের মধ্যে বর্ণাশ্রমবিরুদ্ধ অনেক আচার প্রচলিত দৃষ্ট হয়। জৈন ও বৌদ্ধভাব যে একই সময়ে, বিভিন্ন প্রদেশে, ধর্ম্মসংস্কারকদিগের মনে উদিত হইয়াছিল, ইহা এক্ষণে স্থিরীকৃত হইয়াছে। মহাবীর নাকি শাক্যসিংহের পূর্ব্ববর্ত্তী। জৈন গ্রন্থের ভাষা প্রাকৃত, পালী নহে। ১৬৮৭ খৃঃ অব্দে, রাজপ্রভাবে অধিকাংশ মহীশূরবাসী, শৈব মত ত্যাগপূর্ব্বক, বৈষ্ণব হইয়াছে।

কর্ণাটী ভাষার প্রাদেশিক ভাব ত্রিবিধ। স্থানভেদে আদি, মধ্য ও ইদানীন্তন, তিন প্রকার বাণী ব্যবহৃত হয়। সপ্তম শতাব্দীর শিলালিপিতে প্রথম প্রকার এবং চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে প্রবর্ত্তিত কর্ণাটী জৈনশাস্ত্রে ও মহীশূরের অধিকাংশ শিলালিপিতে দ্বিতীয় প্রকার প্রচলিত। অধিকাংশ স্থলে, জানপদগণ তৃতীয় প্রকারের ভাষাতে কথোপকথন করিয়া থাকে।

কেরল। *

(আদ্য)

আমরা এক্ষণে দক্ষিণাপথের মালভূমিতে উত্তীর্ণ হইয়া, মলয় পর্ব্বতে বিহার করিতেছি। বামে পশ্চিম ঘাট কুলপর্ব্বত, একটির পর আর একটি স্তূপ অগ্রসর করিয়া দিতেছে। গিরিপরম্পরা মধ্যে কাক-ডিম্বাভ মেঘমণ্ডল আনত হইয়া রহিয়াছে। ক্বচিৎ এক একখানি অখণ্ড প্রস্তর-শৈল দৃষ্ট হইতেছে। কোন দেবালয়-নির্ম্মাতা নরপতিকে পাইলে, পর্ব্বত খুদিয়া, ইহা একটি দিব্য দর্শনীয় স্থান করিয়া তুলিতে পারা যাইত। সত্য বটে—"সুচন্দন-বনোদ্দেশো মার্গিতব্যো মহাগিরিঃ।" কিন্তু আমাদের ঘ্রাণেন্দ্রিয় মলয়ানিলে চন্দনের সৌরভ পাইয়া পুলকিত হইতেছে না। মলয়ার দেশের বনে যে চন্দন জন্মে তাহা সুগন্ধি নহে। কর্ণাটে কাবেরী নদীর উৎপত্তিস্থান-সন্নিহিত ভূভাগ সদগন্ধশালী চন্দনের আকর। শকটশ্রেণী নিবিড় বন ভেদ করিয়া চলিয়াছে, জনসমাগমের চিহ্ন নাই। পূর্ব্বে লৌহাদ্ধ আশ্রয়-ভবনে বন্যহস্তী ও বাইসন্ আসিয়া উপস্থিত হইত। ক্রমে "বাজরা" শ্রেণীর "কম্বু" বা "রাগী" শস্যক্ষেত্র ও কচ্ছবিরহিতা স্ত্রীকুল সম্মুখীন হইল। গ্রামবাসিগণের পালিত হস্তী ইতস্তত: ভ্রমণ করিতেছে। কল্য আমরা কর্ণাটে ছিলাম। রজনী প্রভাতা হইলে দৃষ্ট হইয়াছে, আমরা দ্রাবিড়ে,—অধুনা কেরলে উপনীত হইয়াছি। দৃশ্য সম্পূর্ণ ভিন্নাবয়ব। ফলপুষ্প-সমন্বিত বৃক্ষবাটিকার অন্তরে

---

* (১) ব্যবস্থা কল্পদ্রুম—শ্রীযোগীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য প্রণীত। (২) তীর্থদর্শন—শ্রীবরদাপ্রসাদ বসু প্রণীত। (৩) Commentary on Malabar Law and Custom—Herbert Wigram প্রণীত। (৪) Journal of the Asiatic Society of Bengal (৫) Nineteenth Century.

মধ্যে মধ্যে উচ্চ দেহ বিশিষ্ট বাঙ্গলার তৃণাচ্ছন্ন গৃহের মত তালপত্রে আচ্ছাদিত বাসস্থান। ধান্যক্ষেত্রে কটিবসনা স্ত্রীজাতি দণ্ডায়মান।

তুলামাসের শেষ দিন উপলক্ষে উৎসবের জন্য নিকটবর্ত্তী জনপদের বহু লোক সমবেত হইয়াছিলেন, তাঁহারা এই ট্রেণে উঠিলেন। আমাদের দ্বিতীয় শ্রেণীর শকটে দুইটি পুরুষ ও একটি কিশোরীসহ মহিলা উঠিয়াছেন। মলয়ারি পুরুষটির মস্তকের মধ্যস্থলে শিখা; মস্তকের অপর ভাগ ও শ্মশ্রু গুম্ফ মুণ্ডিত। তাঁহার কর্ণে ক্ষুদ্র লিপ্ত কুণ্ডল আছে। পরিধানে কৌপীনসহ বহির্বাস। বৈদেশিক প্রভাবে তিনি কোট্ ও টুপি ধারণ করিয়াছেন। স্ত্রীলোকটির পরিধান পুরুষের মত, মস্তকে চিকুরদাম চূড়ার ভাবে সজ্জিত, শ্বেত বস্ত্রখণ্ড মস্তকের উপরিভাগ হইতে গাত্র আচ্ছাদন করিয়াছে; কর্ণে সুবৃহৎ হিরণ্য-কর্ণিকা কর্ণপত্র বিচ্ছিন্ন করিয়া, ত্বকের পরিধি মধ্যে অবস্থান করিতেছে। গলে সুবর্ণ মাল্য; মণিবন্ধ অলঙ্কারবিহীন।

সোরনুর ষ্টেশনে অবরোহণ করিয়া গো-যানে উঠিতে হইল। কুচি এখান হইতে ৩৬ ক্রোশ। সুরী নদীর উপর সেতু আছে। পরপার হইতে বোধ হয়, কুচিরাজ্য আরম্ভ হইল। ত্রিচুরের পথ অরণ্য ভেদ করিয়া চলিয়াছে। বনদেবীগণ অনাবৃতবক্ষে সঞ্চরণ করিতেছেন। আমাদের সেদিক চাহিতে লজ্জাবোধ হইতে লাগিল। কিন্তু তাঁহারা সে বিষয়ে ভ্রূক্ষেপ করেন না। কোন যুবতী মস্তকে কাষ্ঠভার লইয়া মন্দগতিতে আসিতেছেন, কেহ বা অন্য কার্য্য ব্যপদেশে স্থানান্তরে যাইতেছেন। সৌন্দর্য্যের ছাঁচগুলি নিটোলভাবে দেহযষ্টি আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে। নগ্নমাধুরী বীভৎস না হইলে বিশেষ তৃপ্তিকর হয়। আমার সহচর অবাক্ হইয়া গেলেন; আমি তাঁহাকে বুঝাইলাম, সভ্যতার ছলনা অদ্যাপি এখানে প্রবেশ করে নাই। যে ব্যবহার দূষ্য বলিয়া বিবেচিত

হয় না, তাহা কেন লজ্জাকর হইবে? পূর্ব্বে থিরুবাঙ্কোরে রাজসমক্ষে নায়ার-সীমন্তিনী বক্ষোদেশ আবৃত রাখিলে, অসম্মান প্রদর্শন করা হইতেছে বলিয়া গণ্য হইত।

তাপাসহিষ্ণু মলয়ারিগণ তালপত্রের আতপত্র পরিগ্রহ করিয়া চলিয়াছেন। কেরল-ভূপতি পর্য্যন্ত তালপত্রের ছত্র ব্যবহার করিয়া থাকেন। খদিরবিহীন তাম্বূল সেবনার্থ অপক্ক সুপারী কর্ত্তন ও লিখন-সৌকর্য্যের জন্য একখানি ক্ষুদ্র ছুরিকা কটিসংলগ্ন দৃষ্ট হইতেছে। সৎপথের উভয় পার্শ্বে নাস্রানী (খ্রীষ্টান) গণের বসতি ও পণ্যবীথিকা। তাহারা যে বৈদেশিকভাবে অনুপ্রাণিত, অঙ্গনাগণের গাত্রাবরণ জামা তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। বালিকারা কর্ণপত্রের ছিদ্র চতুরঙ্গুলি পরিমিত করিবার জন্য দুইটি করিয়া সীসক চক্র আলম্বিত করিয়া দিয়াছে।

আমাদের নিদ্রাকালে রাত্রি একটার সময় গাড়ী থামিল। চালক "কোকাল, কোকাল" বলিয়া চীৎকার করিতেছে। ব্যাপারটি কিছুতেই আমাদের বোধগম্য করাইতে না পারিয়া, সে নিকটবর্ত্তী কোন স্থান হইতে কিঞ্চিৎ হিন্দীভাষাভিজ্ঞ এক মুপ্লালা (মুসলমান) বালককে নিদ্রোত্থিত করিয়া সমভিব্যাহারে আনিল। কথাটি এই যে, এ স্থানের নাম কোকাল; এখান হইতে "উড়ী" (উড়ুপ) যোগে কুচ্চি যাইতে হয়।

উষার আলোক প্রকাশিত হইলে, নদীবক্ষে শতাধিক দ্রোণীর ছবি দৃষ্ট হইল। ইহাদ্বারা কুচ্চি হইতে দ্রব্যজাত আনীত ও প্রেরিত হইয়া থাকে। কুচ্চি ও থিরুবাঙ্কোড়ের বৃটিশ রেসিডেণ্ট ত্রিচুরে বাস করেন। তদীয় দুইখানি তরণী সজ্জিত রহিয়াছে। টিপু সুলতান মলয়ার আক্রমণ করিলে, জিমরিণ্ স্বকীয় তাবৎ বলক্ষয় করিয়া, দেশত্যাগ করা শ্রেয়ঃ জ্ঞান করিয়াছিলেন। কিন্তু কুচ্চিরাজ বলবানের বশ্যতা স্বীকার করিয়া-

ছিলেন ; এ জন্য তিনি অদ্যাপি রাজদণ্ড ধারণ করিতেছেন। সকল অবস্থায় স্বাধীনতার জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন করা শ্রেয়ঃ নহে।

এদেশে সরিতের প্রাচুর্য্য হেতু নদীর বিশেষ নাম নাই। তীরবর্ত্তী স্থানের নামানুসারে প্রবাহের সংজ্ঞা হইয়া থাকে। আমরা তণ্ডুল ও চিপিটকাদি সংগ্রহ করিয়া কুচ্চি যাত্রা করিলাম। মিষ্টান্নের মধ্যে নারিকেল-লড্ডুক পাইয়াছিলাম ; কিন্তু তাহা নাজারার নিকট ক্রীত হইয়াছে সন্দেহ হওয়ায়, নিক্ষেপ করিতে হইল। সমুদ্র-বেলার পশ্চাদ্বর্ত্তী প্রণালী-পথে দ্রোণীখানি মৃদু হিল্লোলে যষ্টিভরে সঞ্চালিত হইতে লাগিল। প্রকৃতি শ্যামল ছবিখানির বিস্তার ক্রমশঃ বর্দ্ধিত করিয়া তুলিতেছেন। আমাদের পূর্ব্বদিন আহার না হওয়ায়, সেদিকে লুব্ধদৃষ্টি নিপতিত হইল না। কোথায় উপযুক্ত ভূমি মিলিবে, এই চিন্তা হইতেছে, এমন সময়ে অনুকূল বায়ু প্রবাহিত হওয়ায় নাবিক পাল তুলিয়া দিল। আমরা অপরিচিত স্থানে যে অজ্ঞাত-কুলশীলকে সহায় করিয়া চলিয়াছি, তাহার সহিত ইঙ্গিত ভিন্ন কথোপকথনের উপায় না থাকায়, আমাদিগকে অত্যন্ত অপ্রসন্ন হইতে হইয়াছে। অবশেষে এক "ধানমারিতে" (নিম্নভূমিতে) অবতরণ করিয়া, আম্র পনস নারিকেলের উদ্যানে পাকের আয়োজন করা হইল।

এখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্য বাঙ্গলার মত। প্রাবৃট্ কালে ভূমি জলমগ্ন হয় ; জল অপসৃত হইলে, বিবিধ ধান্য বপন করা হইয়া থাকে ; কোনটি সার্দ্ধদ্বিমাসে, কোনটি বা চারি মাসে পক্ক হয়। যাহা ষণ্মাসে পরিপক্ক হয়, তাহার শস্য-মঞ্জরীতে চৌদ্দটি, আর যাহা সার্দ্ধ দুই মাসে পাকে, তাহাতে সাতটি বীজ ধান্য উৎপন্ন হইয়া থাকে। এক ভূমিতে বৎসরে দুইবার শস্য জন্মে।

আহারান্তে যত অগ্রসর হইতে লাগিলাম, নারিকেল উদ্যানের

শোভা ততই গভীর দৃষ্ট হইতে লাগিল। ক্ষুদ্র তটিনীর উভয় পার্শ্বে অবিরল নারিকেল বৃক্ষরাজী অবিরল ফলগুচ্ছ ধারণ করিয়া, নদীগর্ভে আনত হইয়াছে। পশ্চাতে এক পঙ্‌ক্তি, তদনন্তর অন্যশ্রেণী চলিয়াছে। নারিকেলাভ্যন্তরে গুবাক আপন অঙ্গ মিশাইয়া সুষমা বিস্তার করিতেছে। বৈচিত্র্য-বিহীন হইলে, সৌন্দর্য্য প্রস্ফুটিত হয় না; সেই কারণে কৃশ পূগ তরু মধ্যে মধ্যে ক্ষুদ্র মস্তক উত্তোলন করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে। নিম্নে আর এক স্তর না দিলে নিরবচ্ছিন্ন শ্যামল হয় না, তাই কদলী শাখা বিস্তার করিয়া বসিয়াছে। বাংলা অপেক্ষা কেরল শ্যামরূপে অধিক পরিমাণে সুন্দর। ইহাতে "বন্দে মাতরং" সঙ্গীতটি সহসা হৃদয়-তন্ত্রীতে বাজিয়া উঠিল। সুর দিব্য মিলিতেছে, কাশ্মীরের পর এতাদৃশী তৃপ্তিদায়িনী শোভা আর দৃষ্ট হয় নাই। যাহা বারংবার দর্শন করিতে বাসনা হইতেছে অথচ নিঃশেষিত হইতেছে না, তাহা কি প্রীতিপ্রদ! নদীকূলে শুষ্ক নারিকেলবৃন্ত বা কেতকী জাতীয় লতার বৃতি গৃহস্থের বাটীর সীমা নির্দ্দেশ পূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে আবর্ত্তিত হইয়াছে। এই কেতকী ফলের আকার পক্ব আনারস ফল-স্তবকের ন্যায়। নারিকেলকুঞ্জের মধ্যে ইতস্ততঃ স্থাপিত বলিয়া, গৃহগুলিতে প্রখর সূর্য্যরশ্মি পতিত হইতে পারে না। এই কুঞ্জবনে ইডেন্ উদ্যানস্থা ইভের মত কেরলীগণ বিচরণ করিতেছে।

পত্র-বিতান তমসাবৃত হইলে শয়নের আয়োজন হইল। নাবিকদ্বয় বিশ্রাম করিল না। সূর্য্যোদয় হইলে, দুগ্ধ আহরাণার্থ "পালু" (পয়স্) শব্দ উচ্চারণ করিয়া, ভৃত্যকে গাভীর অন্বেষণ করিতে নিয়োজিত করিলাম। কুত্রচিৎ দুইএকখানি তৈলের পণ্যশালা দৃষ্ট হইল, কোন আপণে কদলীগুচ্ছ কনককান্তি বিস্তার করিতেছে। কোন স্থানে রজ্জুর উপযোগী করিবার জন্য নারিকেল-বল্কলে কাষ্ঠতাড়ন শব্দ শ্রুতিগোচর

হইতেছে। নারিকেল-শস্য পেষণার্থ নব-চালিত পেষণযন্ত্রখানি তদুপরিস্থিত ছদি সমেত ভ্রাম্যমাণ হইতেছে। সিউলী, কটিদেশে ভাণ্ড আবদ্ধ করিয়া, নারিকেলবৃক্ষারোহণ-পর হইল। গৃহস্থ তস্করগণের অবরোধ জন্য বৃক্ষগাত্রে কণ্টকের বেষ্টন দিয়াছে। যে বৃক্ষের ফল আপনি পতিত হইতে পারে, তন্নিম্নে করণ্ড প্রস্থাপিত হইয়াছে। এদেশের শ্রী নারিকেলের উপর নির্ভর করে, এজন্য দেশের নাম কেরল। মলয়পর্ব্বত হইতে মলয়ার নাম ব্যুৎপন্ন হইয়াছে।

বেলানগর যত নিকটবর্ত্তী হইতেছে, তৈল ও রজ্জুসম্ভার-গৃহের সংখ্যা ততই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে। দূরে কতকগুলি খর্পরাচ্ছন্ন বৃহৎ গৃহ. উহাই কুচি বন্দর। পশ্চাৎ সরিৎ হইতে অম্বধি ও দূরবর্ত্তী গুণবৃক্ষসমন্বিত বাষ্পীয় অর্ণবপোতের ক্ষুদ্রাবয়ব দৃষ্ট হইল। প্রণালার আকার এখানে সমুদ্রবৎ।

কোন ভূ তত্ত্ববিৎ আমাদের সমভিব্যাহারে থাকিলে, বালুকার স্তর পড়িতে আরম্ভ হইয়া, এই দ্বীপ উৎপন্ন হইতে কি পরিমিত কাল অতিবাহিত হইয়াছে, তাহা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতাম। শতবর্ষে ভূমি আড়াই ফিট উচ্চ হয়। অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ অনুমান করিতেন. ছয় সহস্র বর্ষ হইল পৃথিবীতে মানব-বসতি হইয়াছে। অধুনা মানবের উৎপত্তি-কালের পরিমাণ তিন লক্ষ বৎসর বিবেচিত হইয়া থাকে। ম্যামথ্ মৃগয়াকারী মনুষ্য এক লক্ষ বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী জীব।

কুচি বন্দর বোম্বাইবাসী গুজরাটীদের দ্বারা চালিত। কচ্ছ-মাণ্ডুই প্রদেশের হিন্দু ভাটিয়া, মুসলমান খোজা, কোকনস্থ ব্রাহ্মণ ও কোচিনী য়িহুদীতে নগর পরিপূর্ণ। ভাটিয়াগণ আফ্রিকা ও খোজাগণ মরিসস্ পর্য্যন্ত বাণিজ্য করিয়া থাকেন। জনৈক ভাটিয়া বণিক কহিলেন, তিনি নৌকাযোগে সপ্তবার আফ্রিকাখণ্ডে বস্ত্রের ব্যবসায় করিতে গিয়াছিলেন

বস্ত্রের বিনিময়ে তথা হইতে গজদন্ত প্রভৃতি গ্রহণ করিতে হইত। বস্ত্র ক্রেতৃগণ কোন প্রকার প্রতারণা করিত না। বোম্বাই হইতে বস্ত্র গৃহীত হইত, তাহার মূল্য ষণ্মাস পরে দেয় ছিল। ইদানীং আফ্রিকায় ইউরোপীয় বাণিজ্যের বৃদ্ধি হওয়ায়, উক্ত ব্যবসায় রহিত হইয়াছে। যবনান্ন গ্রহণ করিতে হয় না বলিয়া, এই গতায়াতে বল্লভাচারী বৈষ্ণবদিগের হিন্দুত্ব অব্যাহত থাকে। বঙ্গদেশে ইউরোপ-যাত্রিগণ যদি অন্নবিচার রক্ষা করিয়া চলিতে পারেন, তাহা হইলে, তাঁহারা জাতিচ্যুত হইবেন না। জাতি রক্ষা করিবার উপায় না করিয়া, শাস্ত্রার্থ বলে সমুদ্রযাত্রার বৈধতা প্রতিপন্ন করিলে, ফল হইবে না।

৯৪ বৎসরের পূর্ব্বে বুচানন্ যখন মালয়রে আগমন করিয়াছিলেন, তখন ১০০০ নারিকেলের মূল্য ১৩।৹ টাকা; ১০০০ সুপারী ৮০ আনা; মরিচ এক খণ্ডি (খারি, ৮/৭) মূল্য ১২৫৲ টাকা; এলাচ এক খারি ১০০৲ টাকায় বিক্রীত হইত।

১২৯৯ সাল।

(৩ অগ্রহায়ণ)

	প্রেরণ ব্যয় সমেত কোচিনে ১/০ মণের মূল্য।	কলিকাতায়।
নারিকেল শস্য	৭৶০	অজ্ঞাত
নারিকেল তৈল	১২/০	১২৲
নারিকেল রজ্জু (স্থূল)	৩৸৶০	৪৲
মরিচ	১৬।৵০	১৫৲
এলাচ	৬৯৸৶০	অজ্ঞাত

কুচ্চি ও কলিকাতার মূল্যের তারতম্য দৃষ্ট হইতেছে না; তবে বাণিজ্যে লভ্য কি? কলিকাতায় কুচ্চি ভিন্ন অন্যস্থান হইতে ঐ সকল দ্রব্য আনীত হয়, এবং কুচ্চি হইতে কলিকাতা ভিন্ন অন্য স্থানে পণ্যসম্ভার গিয়া থাকে; এ কারণ, সময়বিশেষ মূল্যের অনুপাত লাভজনক না হইতে পারে। কুচ্চি হইতে যাঁহারা কলিকাতায় দ্রব্য পাঠান, তাঁহারা টাকা না আনাইয়া তণ্ডুল ও থলে আনাইতে পারেন; ইহাতে কলিকাতায় প্রেরণ ব্যয়ের উপর যে হুণ্ডীর বাঁটা ধরা হইয়াছে, তাহার হ্রাস হইবে। কুচ্চিতে ক্রয়কারী যদি অগ্রিম অর্থ দিয়া পণ্যগ্রহণের নিয়মসূত্রে আবদ্ধ থাকেন, তবে অবশ্যই হট্টমূল্য হইতে দ্রব্যাদি সুলভে গ্রহণ করিবেন।

শিক্ষিত বাঙ্গালী সম্প্রদায়কে উপায়ন্তরাভাবে ব্যবসায়ে লিপ্ত হইতে পরামর্শ দেওয়া হইয়া থাকে; কিন্তু কেবল বিষয়-তৃষ্ণা থাকিলেই বণিক হইতে পারে না; আশার সহিত সাবধানতা মিশ্রিত করিয়া রাখিতে হইবে। পর্য্যবেক্ষণী শক্তি শিক্ষাসাপেক্ষ নহে। সকলে গণনাকুশল হইতে পারেন না। লোকাদরপ্রিয়তা এবং আসঙ্গলিপ্সা প্রবল থাকা চাই। নতুবা সার্থবাহ অকৃতকার্য্য হইবেন। গুর্জ্জরনিবাসী বণিক্‌গণ কেরল হইতে শ্বেত এলাফল বাঙ্গালায় লইয়া যান, এজন্য আমরা তাহাকে গুজরাটী এলাচ্ আখ্যা প্রদান করিয়াছি। মলয়ারে এলাচ্ রাজসম্পত্তি, উহা ব্রিটিশ-রাজের অহিফেনের ন্যায় সার্ব্বজনিক উচ্চ মূল্যে বিক্রীত হইয়া থাকে।

ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া আমরা একটি বিভিন্ন পল্লীতে উপনীত হইলাম। জ্যোৎস্নাময়ী য়িহুদী ললনাকুল গৃহদ্বার ও যবনিকাভ্যন্তরে পরিলক্ষিত হইতেছেন। উজ্জ্বলবর্ণের গুণে শ্বেত পরিচ্ছদ উজ্জ্বলতর দেখাইতেছে। মার্জ্জিত সুবর্ণের বর্ত্তুমালা দিব্য সাজিয়াছে। মধ্যে মধ্যে তেজঃপুঞ্জ দুই একটি পুমান্ দেখা দিতেছেন। চন্দ্রমণ্ডলে কলঙ্কের মত য়িহুদীপল্লীতে

শ্যামাভ দেশীয় য়িহুদীর দল রহিয়াছে। কলিকাতায় ইহাদিগকে কোচিনী কহে। শ্বেত কৃষ্ণ য়িহুদীতে সঙ্কর বিবাহ হয় না। খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে মলয়ারে বাসের জন্য য়িহুদীগণ ব্রাহ্মণ রাজার নিকট একটি স্থানের সনন্দ পাইয়াছিল। মুসলমান ও খৃষ্টধর্ম্ম এতদুভয় য়িহুদীধর্ম্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। যেমন ভাষা মাত্রেই পূর্ব্ব ভাষার সহিত সংস্রব রাখে, তদ্রূপ অবনীতে এমন কোন ধর্ম্ম বিদ্যমান নাই, যাহা পূর্ব্ববর্ত্তী কোন সম্প্রদায়ের বিশ্বাসের ছায়া লইয়া গঠিত হয় নাই। হজরৎ মহম্মদ কহিয়াছেন, আমি নূতন কোন বিষয় প্রবর্ত্তন করিতে ইচ্ছা করি না; ইব্রাহিম যে প্রকার উপদেশ দিয়া গিয়াছেন, তাহাই প্রচার করিতেছি। মহম্মদের য়িহুদী এবং খ্রীষ্টান ভার্য্যা ছিল। মুসলমান ও খৃষ্টধর্ম্মের সার বিষয় এক। ঈশ্বরের অদ্বিতীয়ত্ব, স্বর্গীয় দূতের অস্তিত্ব, ঈশ্বরাদিষ্ট গ্রন্থ, ঈশ্বরের প্রেরিত ব্যক্তি, শেষ বিচারের দিন এবং ঈশ্বরের অনুজ্ঞা এই সকল উভয় ধর্ম্মাবলম্বিগণ আস্থা করিয়া থাকেন। সমুদ্রতটে অবস্থিত বলিয়া অতি প্রাচীনকাল হইতে প্রবাস-সাহসী "অস্তুবর্ণ" (পঞ্চমবর্ণ), জেরুজালেম নিবাসী য়িহুদী, ইউরোপীয় খৃষ্টান্ এবং আরব্য মুসলমানবর্গ কেরলে যাতায়াত করিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

কুচ্চি নগরের পরপারে আর্ণকোলমস্থিত রাজকীয় ধর্ম্মাধিকরণ ও বিদ্যামন্দিরের সৌধশিখর ইতঃপূর্ব্বে দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল, এক্ষণে আমরা সাগরপ্রণালী পার হইয়া নির্দ্দিষ্ট বাসস্থানে চলিলাম। নিস্তব্ধ রথ্যা প্রশস্ত ও বালুকাময়ী; বৃষ্টিপাতে উহা কর্দ্দমাক্ত হয় নাই। রাজকার্য্য উপলক্ষে দ্রাবিড় ও কর্ণাটী ব্রাহ্মণগণ এখানে বসতি স্থাপন করিয়াছেন। বিগত-রজনীতে রাজ-মন্ত্রী গতাসু হইয়াছেন, তজ্জন্য আমাদিগকে কষ্ট পাইতে হইল। জানপদগণ তদীয় অন্ত্যেষ্টি উপলক্ষে ব্যস্ত আছেন। কেরলীরা নিজ বাসভবনে শবদাহ করিয়া থাকেন। 'ইল্লোম' (বাস্ত)-প্রাঙ্গণের

এক অংশ নাগ দেবতা ও অপর অংশ শ্মশানের জন্য রক্ষিত হয়। দ্রাবিড়গণ কহেন,—শঙ্করাচার্য্য দ্রাবিড় উপনিবেশী ছিলেন। তদীয় মাতৃবিয়োগ হইলে, বহনকারীর অভাবে, তাঁহাকে মাতার দেহ খণ্ডীকৃত করিয়া বহির্দ্দেশস্থ শ্মশানে লইয়া যাইতে হইয়াছিল।

এতদ্দেশীয় প্রথা অনুসারে আমাদের বাসগৃহখানি এক নিকুঞ্জের মধ্যে অবস্থিত, উহার ভিত্তি খনিজ ইষ্টক দ্বারা গ্রথিত; ছাদ, পনস কাষ্ঠে নির্ম্মিত; তদুপরি নারিকেলপর্ণ বিনির্ম্মিত ছদিবটক্ অলিন্দস্থ তালস্তম্ভোপরি বিন্যস্ত হইয়াছে। গৃহের উপর পূগ ও নারিকেল বৃক্ষের ছায়া; চতুর্দ্দিকে কদলী, পেঁপে, গোলাপজাম প্রভৃতি বৃক্ষ। গোলমরিচের সতেজ লতা বৃক্ষ বেষ্টন পূর্ব্বক উত্থিত হইয়া মঞ্জরী বিস্তার করিয়াছে। এখানে তাম্বূলবল্লীও ঐ প্রকার বৃক্ষ বেষ্টন করিয়া উত্থিত হয়। এলাগুল্ম পর্ব্বতোপরি স্নিগ্ধ স্থানে উৎপন্ন হইয়া থাকে। আমাদের অঙ্গনে ক্রোটন্, পিন্‌কস্, তুলসী, আনারস ও কচু পত্রিকাদল বিস্তার করিয়াছে। মঞ্চোপরি শিম্বীলতার চন্দ্রাতপ; ইহাতে সূর্য্যকিরণ গৃহাভ্যন্তরে সম্যক্‌রূপে প্রবেশ লাভ করিতে পারে না; তজ্জন্য গৃহগুলি আর্দ্র। বহির্ভাগস্থ পয়ঃপ্রণালীতে জল নিয়ত আবদ্ধ রহিয়াছে, নির্গমনের পথ নাই।

ছায়াবদ্ধ পয়ঃপ্রণালীর জলে অসংখ্য উদ্ভিজ্জাণুজীব জন্মগ্রহণ করিয়া নানা রোগের নিদান হইতেছে। দুই জন শর্ম্মণ্য দেশীয় যুবক নদীজল পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, সূর্য্যাস্তকালে ২০ বিন্দু জলে ১৬০ টি উদ্ভিজ্জাণুজীব পাওয়া যায়। রাত্রিশেষে, আলোকবিরহিত অবস্থায়, জল বহুক্ষণ অবস্থিত হইলে, উক্ত সংখ্যা ত্রিগুণিত হইয়াছিল। সূর্য্যোদয় হইলে উক্ত জীবাণু-সংখ্যার হ্রাস হইতে থাকে। শ্লীপদ রোগকে কোচিনেরা পদ কহে। আমার সহচর এই ব্যাধির বীজ উদ্ভিজ্জাণুজীব সংগ্রহ করিয়া লইলেন। দেহে নিত্য নূতন ঝিল্লী উৎপন্ন হইয়া, পুরাতন

ঝিল্লীকে অপসারিত করিয়া দেয়। শোণিতই ঝিল্লী নির্ম্মাণের প্রধান উপকরণ। যদি শোণিত যথোপযুক্ত প্রাণবায়ু (অম্লজান) গ্রহণে অক্ষম হইয়া থাকে, তদ্দ্বারা অবিশুদ্ধ ঝিল্লী গঠিত হইবে। কয়েক বৎসর পরে এমন একটি রোগ-প্রবণ দেহ নির্ম্মিত হইয়া যায় যে সামান্য উদ্দীপক কারণে তাহাতে বিবিধ ব্যাধি আশ্রয় গ্রহণ করে। আমার সঙ্গী মহাশয় বাঙ্গলার পল্লীগ্রামে জ্বরোৎপাদক বাতাবরণে বাস করিয়া শরীরটি রোগ-প্রবণ করিয়া রাখিয়াছেন। এজন্য তিনি বাত রোগাক্রান্ত হইলেন।

ত্রিপুনিথুরী এখান হইতে ক্রোশ-চতুষ্টয় ব্যবহিত। রাজা তথায় বাস করেন। এক্ষণে সেখানে একপক্ষব্যাপী উৎসব চলিতেছে। আমরা হস্তচালিত ত্রিচক্ররথযোগে রাজপুরীতে উপনীত হইলাম। জনপদ ও প্রাসাদ, দুর্গের মধ্যে অবস্থিত। আমাদিগকে শিখাতিলকবিহীন ও অঙ্গরক্ষায় আবৃত-দেহ দেখিয়া, প্রহরী খ্রীষ্টান বোধে অগ্রসর হইতে নিষেধ করিল। আর্ণাকোলমে একব্যক্তির সহিত আমাদের পরিচয় হইয়াছে, তিনি কাশীতে আমাদের বাটীর পার্শ্বে বাস করিতেন। আমাদের সহিত একত্র বিচরণ করিলে, খ্রীষ্টান-সংস্পর্শের অপবাদ ঘটে দেখিয়া, তিনি নিবৃত্ত হইয়াছেন। আমরা কঞ্চুক উন্মোচন করিলাম, সহচর যজ্ঞোপবীত প্রদর্শন করাইলেন, কিন্তু তথাপি দৌবারিক সন্তুষ্ট হইল না; অবশেষে কোন পৌরজনকে ইংরাজী ভাষায় আমাদের কষ্ট জ্ঞাপন করা হইলে, তিনি প্রহরীর ভ্রম দূর করিয়া দিলেন। পুরমধ্যে আমরা এক অযাচিত বন্ধু প্রাপ্ত হইলাম; তাঁহার ধারণা,—আর্য্যাবর্ত্তের সহিত পরিচিত কোন লোক না পাইলে, আমরা পূর্ণত্রয়ীশের সম্মুখীন হইতে পারিব না। কুচ্চিরাজের প্রধান মন্ত্রী নিকৃষ্টজাতি সম্ভূত; এজন্য তিনি দেবদর্শন পান নাই। আমাদের হিতৈষী বহু আয়াসে সে প্রকার লোক মিলাইতে না পারিয়া, একটি বাটীতে প্রবেশ করিলেন। অল্পকাল পরে জনৈক

দ্রাবিড় ব্রাহ্মণ বহির্গত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেরলভাষায়াং পরিচয়ো নাস্তি ?" সংস্কৃতভাষায় উত্তর ও আলাপ করিতে দেখিয়া, আমাকে তাঁহার বৈশ্য বলিয়া বিশ্বাস হইল ; কিন্তু তথাপি তিনি আমাদের সমভি-ব্যাহারে যাইতে সাহসী হইলেন না। তখন আমি দ্রুতপদে দেবায়তনে প্রবেশ করিলাম। একবার রক্ষীর দিকে নেত্রপাত করিতে হইয়াছিল, কিন্তু সে নিষেধ করিল না।

প্রাচীর-বেষ্টিত প্রশস্ত অঙ্গনের মধ্যস্থলে মলয়ারী প্রণালীর ষট্‌ছদী-খর্পর মন্দির বিরাজমান। ইহার গঠন দ্রাবিড় প্রণালী হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। প্রাকার-তোরণস্থ ক্ষুদ্র গৃহখানি এতদ্দেশের গোপুরম্। মন্দিরের বহির্গাত্রে অবিচ্ছিন্ন দীপাবলির পঙ্‌ক্তি রচিত হইয়াছে। প্রথমতঃ দ্বারের উভয় পার্শ্বে প্রস্তরের তৈলাক্ত দ্বারপাল চতুষ্টয় দৃষ্ট হইল। আমরা সাহসে ভর করিয়া একবারে দীপাবলির মধ্য দিয়া অভ্যন্তর ভাগে জংজীৎ গোপালের সম্মুখে উপনীত হইলাম। এখানে সূর্য্যালোক প্রবেশ করিতে পারে না ; অসংখ্য দীপ পূর্ণব্রহ্মাংশের কনককান্তি উদ্ভাসিত করিয়াছে। তদীয় সর্ব্বাঙ্গ স্বর্ণালঙ্কারে আচ্ছাদিত ; শিরোদেশে হিরণ্ময় শেষ সপ্তফণা বিস্তার করিয়াছে। যাহাতে অবলীলাক্রমে মূর্ত্তি পরিদৃশ্যমান না হইতে পারে, এই জন্যই বা গর্ভ-গৃহের কপাটদ্বয় ঈষৎ নিমীলিত। যাহা হউক অদ্য আমার ক্রিয়া সফলা হইয়াছে।

কুসংস্কারের সহিত বিজ্ঞানের সমন্বয়কারিগণ কহেন, প্রতিমার প্রতি সাধকের চিত্তের একাগ্রতার দ্বারা উহাতে একটি আধ্যাত্মিক শক্তি উৎপাদন করা যায়। অবশেষে তাহার প্রভা বহির্গত হইতে থাকে ; ইহাতে পূর্ব্বে যাহা মৃত্তিকা বা কাষ্ঠমাত্র ছিল, সময়ক্রমে তাহা পরিত্রাতা, গুহ্যশক্তি ও প্রকৃত পূজার যোগ্য হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু, এ প্রকার অনুমানে শাক্তদিগের পূজার সকল অনুষ্ঠান বিজ্ঞানসম্মত করা সুবিধা-

জনক হইবে না। কামরূপের কোচ রাজা নরনারায়ণ কামাখ্যাদেবীর ইষ্টক-মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া ১৪০টি নরবলিদান করিয়া তাম্রকুণ্ডে মুণ্ডস্থাপনপূর্ব্বক দেবীকে উপহার দেন। তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র রঘুদেব ১৫৮৩ খৃঃ অব্দে হয়গ্রীব-মন্দির পুনর্গঠন করাইয়া, ভূসম্পত্তি প্রদানান্তে ৭০০টি নরবলি দিয়াছিলেন। ছিন্নমস্তকগুলি তাম্রপাত্রে রক্ষা করিয়া দেব-সন্নিকটে আনয়ন করিয়াছিলেন। ইহাতে কি আত্মত্যাগের শিক্ষা আছে কহিবেন? বৈষ্ণবগণ বলিপ্রদান-অনুষ্ঠানে অত্যন্ত অশ্রদ্ধা করিয়া থাকেন। কিষণগড়ের রাজা সোমযাগের অনুষ্ঠান করিয়া পশুবধ করায়, পরম ভাগবত বল্লভাচারিগণ জৈন ও আর্য্যসমাজের সহিত মিলিত হইয়া, নরপতিকে উক্ত বেদোচিত কার্য্য হইতে বিরত হইবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন। জংজীং গোপালের মূর্ত্তি বদরিকাশ্রমের নারায়ণের অনুরূপ; বোধ হয়, শঙ্করাচার্য্যের সহিত উভয়স্থানের সংস্রব থাকায়, এই সাদৃশ্য ঘটিয়াছে।

অদ্য পর্ব্বাহের তৃতীয় দিবস। প্রাঙ্গণে দেববাহন পঞ্চদশ হস্তী স্বর্ণললাটিকা ও গ্রৈবেয়ক পরিধান করিয়া দণ্ডায়মান। তদুপরি আস্তরণ বিস্তৃত রহিয়াছে; তাহাতে ছত্র, চামর, ও ধ্বজধারী উপবিষ্ট। আড়ানীবাহী বালক মধ্যে মধ্যে হস্ত প্রসারণ করিয়া, রৌদ্ররোধিনীদ্বয় ধরিতেছে। গজতার মধ্যস্থলে একটি করিশিরে গোপালের প্রতিনিধি ভোগমূর্ত্তি উপবিষ্ট রহিয়াছেন। জনতার মধ্যে অসংখ্য ভেরী, তূরী ও সানাই বাদিত হইতেছে। মন্দিরপ্রাঙ্গণ রাজবাটীর সহিত সংলগ্ন; দ্বিতল প্রকোষ্ঠে পীন উপাধানে আনত হইয়া, কুচ্চিরাজ বীর কেরল বর্ম্মা উপবিষ্ট আছেন। রঙ্গ-বৈচিত্র্যের অভাবে বা বার্দ্ধক্য-নিবন্ধন তাঁহার নিদ্রাকর্ষণ হইতেছে। পরিচ্ছদের মধ্যে কটিদেশে একখণ্ড শুভ্র বস্ত্র, মুণ্ডিত মুখশীর্ষোপরি পুরশ্চূড় উত্থিত। কিয়দন্তরে দৌবারিক স্বর্ণ-

যষ্টিসহ দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। পুরীর অপর দিক্ হইতে, রাজ-পরিবার রঙ্গভূমি নিরীক্ষণ করিতেছেন। মলয়ারিদের বর্ণ ও গঠন বাঙ্গালীর মত। মান্দ্রাজীরা ইহাদিগকে অত্যন্ত সুন্দর কহে। রাজপরিবারের বর্ণ অপেক্ষাকৃত গৌর; পরিধেয় নিরতিশয় ধবল; যোষিদ্‌গণের বস্ত্র এক প্রকার কৃষ্ণবর্ণের পাড় ও উত্তরীয় জরির কুলবিশিষ্ট। এই সাম্যের দেশে কোন কোন সুন্দরীকে পুরুষের ন্যায় উত্তরীয়খানি স্কন্ধে ব্যবহার করিতে দেখিতেছি। ললাটে কৃষ্ণ তিলক, গলে মণিমুক্তা লম্বন, সুকুমার দেহে বৃহৎ কর্ণিকা, সহ্য হইবার নহে; এজন্য দীর্ঘ কর্ণচ্ছিদ্র রিক্ত রহিয়াছে। পূর্ব্বে থিরুবাঙ্কোড়ে হস্তে সুবর্ণ ও রৌপ্যের অলঙ্কার ধারণ করা, শূদ্রের পক্ষে নিষিদ্ধ ছিল। একটি নিরাভরণা গৌরাঙ্গী সন্তান বক্ষে লইয়া, সৌধোপরি হইতে "সজলঘনরুচি কেরলী কেশ পাশ" উন্মুক্ত করিয়া যাত্রা দর্শন করিতেছিলেন। বাঙ্গলার ন্যায় এখানে নারিকেল-তৈল অভ্যঙ্গ করিবার রীতি আছে। কেশ আকৃষ্ট করিয়া কবরী বন্ধনের বিধি না থাকায়, মস্তকে ইন্দ্রলুপ্তের প্রাদুর্ভাব নাই।

রাজ-সংসার ভগিনী ও ভাগিনেয় দ্বারা গঠিত। পুত্র বা তদীয় জননীকে স্পর্শ করিলে, স্নান করিয়া শুদ্ধ হইতে হয়। রাজার ভাগিনেয় যুবরাজ নামে অভিহিত হন। তিনিই সিংহাসনের উত্তরাধিকারী। রাজা বিবাহ করেন না, রাজভগিনীর বিবাহ হয়। কুচ্চিরাজপরিবারে সবর্ণ পাত্রের সহিত এবং থিরুবাঙ্কোড় রাজবংশে ব্রাহ্মণের সহিত কন্যার বিবাহ দিতে হয়। দিনত্রয়ের অধিক দাম্পত্য-বন্ধন রক্ষা করা অনাবশ্যক। এই বিবাহ পদ্ধতি, ভিন্নদেশীয়দিগের অনুকরণে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে মাত্র, তদ্দ্বারা কোন প্রকার স্বত্ব উৎপন্ন হয় না। অনারেবল্ শঙ্কর মেনন্ "মরু মক্ক-তায়ম্" (ভাগিনেয়াধিকার) রহিত করিয়া "মক্কতায়ম্" (পুত্রাধিকার) প্রচলিত করিবার অভিপ্রায়ে ব্রিটীশ মলয়ারে বিবাহকে

বৈধ করিবার জন্য মাদ্রাজ ব্যবস্থাপক সভায় একখানি বিধানের পাণ্ডুলিপি উপস্থিত করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহা সমর্থিত না হওয়ায় প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে। কালিকটের জামরিণ ও নম্বুরীগণ তাহার প্রতিবাদ করেন। বিষ্ণু পরশুরাম অবতার পরিগ্রহ করিয়া, নম্বুরী ব্রাহ্মণদিগকে কেরল দান করিয়াছিলেন; অতএব তাঁহার অনভিপ্রেত বিষয় বিধিবদ্ধ হইতে পারে না। নম্বুরীদের মধ্যে বৈধবিবাহ প্রথা প্রচলিত আছে; সুতরাং তাঁহাদের মধ্যে পুত্রাধিকার পদ্ধতি আছে; কিন্তু জ্যেষ্ঠ ভিন্ন অন্যে বিবাহ করিতে পায় না। এজন্য তদিতরজাতীয় রমণীদিগকে চিরজীবন বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হইতে দিলে অসুবিধা হয়। সর্ব্বত্র দাম্পত্য নিয়ম লঙ্ঘন করাকে ব্যভিচার কহে; কিন্তু কেরলে দাম্পত্য নিয়ম পালন করা ব্যভিচার। নারী অনুলোম জাতির সহিত মিলিত হইলে সমাজে পতিতা হন।

তিরুপাট জাতীয় কুচ্চিরাজ ও থিরুবাঙ্কোড়াধিপ আপনাদের ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন। শেষাদ্রিআইয়ার অনুমোদিত থিরুবাঙ্কোড় পত্রিকাতে তাঁহাদের শূদ্রত্ব উল্লিখিত আছে। কেরল আলপাথি নামে একখানি মলয়ারি পদ্যগ্রন্থ আছে। কথিত আছে, শঙ্করাচার্য্য তাহার রচয়িতা। উহাতে থিরুবাঙ্কোড় পত্রিকার মতের পোষক প্রমাণ বিদ্যমান আছে।

শঙ্করাচার্য্য কেরলের কোল্লম্ অব্দ আরম্ভের পঞ্চাশৎ বৎসর পূর্ব্বে (খৃঃ অঃ ৭৭৫) কালাদি নামক স্থানে নম্বুরী বংশে জন্মগ্রহণ করেন। আলয়াই নদীর উত্তর তটে, আলয়াই নগরের ৪ ক্রোশ ব্যবধানে কালাদি পল্লী অবস্থিত। শঙ্কর ষোড়শ বৎসর বয়ঃক্রম কালে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন; তিনি বদরিকাশ্রমে অবস্থান কালে শারীরক ভাষ্য রচনা করিয়া, একবার গৃহে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন। তিনি ৩২ বৎসর বয়সে ইহলোক হইতে অবসৃত হন। চৈতন্য ৪৮ ও ঈশা ২৯ বৎসর

জীবন ধারণ করিয়াছিলেন। প্রতিভাশালী ব্যক্তির পক্ষে দীর্ঘকাল কার্য্যক্ষেত্রে অবস্থান করা অনাবশ্যক।

শঙ্কর বেদান্তের সাম্প্রদায়িক-শাস্ত্রত্ব প্রতিপাদন করিয়া উহাকে স্থায়ী করিয়া গিয়াছেন। তৎপ্রবর্ত্তিত দণ্ডি সম্প্রদায় আর্য্যাবর্ত্তে বৈদান্তিক মত ও শাস্ত্র জীবন্ত রাখিয়াছেন। বিজ্ঞান ও দর্শন একত্র সম্মিলিত থাকায় সত্যের সহিত কল্পনা মিশ্রিত করিতে হইয়াছে। বৌদ্ধবিপ্লবের পর ব্রাহ্মণ্যের পুনরুত্থান কালে ষড়্দর্শন সংগৃহীত হইয়াছে; ঈশ্বর-নিরূপণ তাহার অন্যতর উদ্দেশ্য।

কার্য্যমাত্রের কারণ আছে। জগৎ-স্থষ্টির কারণ ঈশ্বর হইলে, তাঁহাব স্রষ্টা কে, জিজ্ঞাস্য হইতে পারে। 'তিনি স্বতঃসিদ্ধ' একথা কহিলে আপনি থাকিতে পারে এমন একটি অবস্থা স্বীকার করা হয়। তাহা হইলে, সৃষ্টি স্বতঃসিদ্ধ এমন সিদ্ধান্ত অসঙ্গত নহে। বেদান্তমতে ব্রহ্ম নিগুর্ণ। দণ্ডিসম্প্রদায় বৈদান্তিক হইলেও শঙ্করের ন্যায় সাকারোপাসক। ঈশ্বর সাকার নহেন। আকারের উৎপত্তি ও ধ্বংস আছে। সাধকের হিতের জন্য ব্রহ্মের রূপ কল্পনা করা হয়, এই বলিয়া তাঁহারা অভ্যাস পরিত্যাগের অক্ষমতা সমর্থন করেন। যতিগণ দণ্ড পরিত্যাগ করিয়া পরমহংস-পথ অবলম্বন করেন। তন্মধ্যে যিনি অধিকতর বিরক্ত হইয়াছেন, তাঁহাব লৌকিক ও শাস্ত্রীয় সকল বিষয়ে উদাসীনতা দৃষ্ট হয়।

"নিস্ত্রৈগুণ্যে পথি বিচরতাং
কো বিধিঃ কো নিষেধঃ।"

তিনি সুখ দুঃখে অনাসক্ত, ও ইষ্টানিষ্টে সমজ্ঞান করেন; স্বয়ং চেষ্টা করিয়া বা নিজ হস্তে ভোজন করেন না। যে জাতীয় লোক হউক, মুখে যে খাদ্য তুলিয়া দিবে, তাহাই তাঁহার ভোজনীয়। বস্ত্র পরিধান না করাইয়া দিলে, তিনি নগ্নাবস্থায় বিচরণ করেন। কাহারও সহিত আলাপ

না করিয়া সদা তুষ্ণীম্ভাবে কালযাপন করিয়া থাকেন। চিত্তশুদ্ধিসম্পন্ন সাধারণ পরমহংসের মধ্যে প্রকৃতপক্ষে নিরাকারবাদীর অভাব নাই। ঈশ্বর নিরাকার নহেন। শরীরবিযুক্ত চেতনাদি মানসিক বৃত্তিসকল কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। বিশ্ববীজ বা জগৎ-শক্তিকে ঈশ্বর নামে অভিহিত করা যাইতে পারে। পরন্তু শক্তি কোন বস্তু নহে, তাহা পদার্থের ক্ষমতা অর্থাৎ "কারণনিষ্ঠ কার্য্যোৎপাদন যোগ্য ধর্ম্ম" মাত্র। ঈশ্বর বা ব্রহ্ম শব্দে কেহ সেরূপ বুঝেন না, তাহাতে ব্যক্তিত্বের আরোপ করেন। এই ব্যক্তিত্ব লইয়াই আধুনিক নাস্তিক ও আস্তিকে প্রভেদ।

শঙ্করের মাতৃবংশ পালুর নামক স্থানে অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। আচার্য্যের জন্মভূমি বিধৌতকারিণী আলয়াই নদীর জল স্বাস্থ্যকর বলিয়া, পানার্থ কুচ্চিবেলা নগরে নৌকাযোগে আনীত হইয়া থাকে এবং জানপদগণ অবগাহন করিবার জন্য উক্ত নদীতে গমন করেন।

কর্ণাটের চেরবংশীয় রাজার প্রতিনিধিত্বে চেরুমল পেরুমল কেরল শাসন করিতেন। পশ্চাৎ তিনি স্বাধীন হন। ৩১১ খৃষ্টাব্দে তদীয় পুত্র, (বা ভাগিনেয়?) রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কুচ্চি-রাজ্যের বর্ত্তমান আয় ত্রয়োদশ লক্ষ টাকা। ধনাগার ব্রিটিশ সিপাহি দ্বারা রক্ষিত। রাজ্যে দুই সহস্র যোধ আছে; কিন্তু ইংরাজের অনুমতি না থাকায়, ব্যূহ দলবদ্ধ হইতে পারে না। ভারতেশ্বরীকে বার্ষিক দুই লক্ষ টাকা কর দিতে হয়। শাসন-কার্য্যে রাজা স্বাধীন। ভূমির পরিমাণ ফল ১৩৬১ বর্গমাইল। জনসংখ্যা ৫,৯৮,৩৫৩। বহুকাল হইতে থিরুবাঙ্কোড়পতির সহিত কুচ্চিরাজের প্রতিযোগিতা ছিল। থিরুবাঙ্কোড়ের দেওয়ান রামআইয়া কহিয়াছিলেন, কুচ্চিকে অন্যান্য বৃত্তিভোগী রাজ্যের তালিকাভুক্ত করিতে পারিলাম না বলিয়া দুঃখ রহিল। বটেভিয়া-নিবাসী ডচ্‌দিগের সহিত সন্ধিকালে উভয় রাজ্যে মিত্রতা স্থাপিত হয়। জিমরীণের সহিত যুদ্ধকালে

কুচ্চিপতি শপথ করিয়াছিলেন, "আমি পেরুম্পাদপুরস্বরূপম্ বংশীয় রোহিণী নক্ষত্রে জন্মা এই নামধেয় বীর কেরল বর্ম্মা রাজা স্বয়ং শচীন্দ্রমের স-তনুমুর্ত্তির সম্মুখে স্বীকার করিতেছি যে আমি বা আমার উত্তরাধিকারী ত্রিপাপুরস্বরূপম্ বংশীয় কৃত্তিকা নক্ষত্র জন্ম নামক থিরুবাঙ্কোড়পতি বা তাঁহার উত্তরাধিকারীর সহিত বিরোধ, বা তদীয় শত্রুর সহিত সন্ধি ও পত্র ব্যবহার করিব না।"

দিবাবসানে অর্ণাকোলম্ সাগরতীরে ভ্রমণ করিতে গিয়া একদা দুইটি বাঙ্গালীর সাক্ষাৎলাভ করি। আনন্দের সহিত তৎসমভিব্যাহারে ইউরোপীয় পান্থনিবাসে যাইয়া বিশ্রম্ভালাপে প্রবৃত্ত হইলাম। গতবার ভ্রমণকালে বরোদায় মহাভারতের ইংরাজী অনুবাদককের সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল, এবার রামায়ণের ইংরাজী অনুবাদককে পাইলাম। তাঁহারা রাজপ্রসাদ লাভেচ্ছায় আগমন করিয়া, উভয়স্থানে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। ডাকবাংলার সম্মুখে সুদূরব্যাপী হট্টের পথ; পার্শ্বে বিবিধ পণ্যশালা, ক্বচিৎ মলয়ারি খৃষ্টানদিগের ভোগার্থ বংশনালীয় ছাঁচে ঢালা তণ্ডুলের পিষ্টক বিক্রয়ার্থ রহিয়াছে। এতদ্দেশে রজক ও নরসুন্দরের কার্য্যক্ষেত্র অধিক বিস্তৃত। একখানি বস্ত্র ধৌত করিবার জন্য এক আনা ও ক্ষৌরকার্য্যের জন্য প্রত্যেককে দেড় আনা দিতে হয়। চোলমণ্ডল উপকূলের ন্যায় মলয়ার উপকূল সমশীতোষ্ণ প্রদেশ। ঋতুভেদে পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন করিতে হয় না। রাত্রিযোগে শয়নকালে স্থূল বস্ত্র ব্যবহার করিতে হয় মাত্র।

বাঙ্গলায় বসন্তকালে যে দক্ষিণ বায়ু বহিতে থাকে, বাঙ্গালী কবি তাহাকে মলয়ানিল কহেন। উহাতে কেরলে শীত-গ্রীষ্মের সাম্য ব্যক্ত হয়। মলয়ার স্বায়ত্ত-প্রেমের রাজ্য; সুতরাং বিয়োগবিধুর ব্যক্তি তৎসংস্পর্শে পরিতপ্ত হইবেন, তাহাতে বিচিত্র কি! কথিত আছে—"স্নেহানাহুঃ কিমপি

বিরহে ধ্বংসিনস্তে হ্বভোগাদিষ্টে বস্তুন্যুপচিতরসাঃ প্রেমরাশী ভবন্তি।" কিন্তু আমরা পূর্ব্বরাগবর্জ্জিত, বাল্যবিবাহপরায়ণ, চির-সম্মিলিত দম্পতি কিরূপে সে উগ্রসুখের অধিকারী হইব ?

দেশভেদে রুচি বিভিন্ন; তদনুসারে সৌন্দর্য্য স্থিরীকৃত হইয়া থাকে। একস্থানে যাহা সুন্দর, অন্যত্র তাহা কদর্য্য বলিয়া পরিগণিত। জীবমিথুন পরস্পরকে আকৃষ্ট করিবার জন্য অপেক্ষাকৃত সুন্দর হইতে চেষ্টা করে। সৌন্দর্য্যবিহীন হইলে সহচর দুষ্প্রাপ্য হয়। কেরলিগণ "কল্যাণম্" (বিবাহ) বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া প্রাকৃতিক যৌননির্ব্বাচন বিসর্জ্জন দেন না; বোধ হয় সেইজন্য তাঁহারা দ্রাবিড় প্রতিবাসী অপেক্ষা সুরূপ। রূপজ মোহ প্রেম নামের যোগ্য না হইলেও প্রেমের নিদান বটে; ইহাতেও অন্যের সুখের জন্য আত্মসুখ বিসর্জ্জন করিতে স্বতঃ প্রবৃত্তি জন্মে। গুণ-জনিত প্রণয় ভিন্ন স্থায়ী স্নেহ জন্মে না; এজন্য রূপলালসাকে পাশব-প্রেম বলে। যুবক উচ্চ আদর্শ মত সংসারে গুণের অন্বেষণ করিতে গিয়া অকারণ-দুঃখ রোগে আক্রান্ত হইতে পারেন। রূপ পুরাতন হয়, গুণের নিত্য নব বিকাশ থাকে; কিন্তু সকলেরই এমন সময় উপস্থিত হয়, যখন উপলব্ধি হইতে থাকে,—"জীবন এমন ভ্রম আগে কে জানিত রে।" উপস্থিত অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকা ভিন্ন সুখের অন্য উপায় নাই; কিন্তু সুবিধা বৃদ্ধি করিবার চেষ্টাই পুরুষার্থ, এবং ধরাধামে যোগ্যতর বিষয় বা যোগ্যতর প্রাণী ভিন্ন কেহ রক্ষা পাইতে পারে না। মলয়ারিদিগের পক্ষে রূপ গুণ বিবেচনা করিয়া যৌনসম্বন্ধ স্থির করা সুসাধ্য; প্রণয়াস্পদকে ভর্ত্তা হইতে হয় না,—প্রেয়সী কেবল সঙ্গিনী মাত্র। হৃদয়ে একটি ভাব প্রবল হইলে, তদ্বিপরীত ভাব স্থান পায় না। মানবকে ভক্তি, বাৎসল্য বা বৈরাগ্যের চক্ষে দেখা অভ্যাস করিতে পারেলে, যৌনভাব সমুপস্থিত হইবে না। অভ্যাসের দ্বারা স্বভাব পরিবর্ত্তিত হয়।

মলয়ার প্রেম-সরোবরে এখনকার কালে গুরুজন-জ্বালা যে নাই, এমন নহে। যদৃচ্ছা ভোজন যেমন স্বাস্থ্যকর নহে, তেমনি স্বৈরাচার পরিণাম-শুভকর নহে। উদ্দাম প্রবৃত্তিকে সংযত করিতে শিক্ষা দেওয়া সমাজের উদ্দেশ্য। লোকের কল্যাণের জন্য সমাজ বা শাসন সৃষ্ট হইয়াছে। যুবতী স্বয়ং "গুণদোষকার" (নায়ক) বরণ করিতে অধিকারিণী নহেন; যুবক বা উভয়পক্ষীয় কর্ত্তার দ্বারা উক্ত সম্বন্ধ স্থিরীকৃত হয়। দ্রবিড় সীমান্তস্থ পালঘাট অঞ্চলে নায়ক প্রথম দিন বরযাত্রীর মত আত্মীয় সমভিব্যাহারে "সম্বন্ধকারীর" (নায়িকার) গৃহে "কড়কা কল্যাণম্" (শয্যাবিবাহ) অনুষ্ঠান করিতে গিয়া থাকেন। যুবক বস্ত্র ও তৈল লইয়া উপস্থিত হইলে, গৃহস্বামিনী পাদ্য-অর্ঘ্য প্রদানে তাহাকে সম্মানিত করেন। কর্ত্রীর হস্ত হইতে বরবর্ণিনী ঐ দ্রব্য গ্রহণ করিবামাত্র "পোতমরি" ব্যাপার সম্পন্ন হইল। কেরলের অন্যত্র কে কাহার নায়ক, তাহা সাধারণে পরিজ্ঞাত থাকে না; ব্রাহ্মণ নায়ক মিলিলে কোন অঙ্গনা অপরকে বরণ করেন না। নায়িকা অন্যের অনুবর্ত্তিনী হইলে পূর্ব্ব সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হয়। নায়ক স্বজাতীয় হইলে প্রণয়িণীর গৃহে নিশাকালে অন্ন গ্রহণ করেন, এবং সম্ভব হইলে অলঙ্কারাদি প্রদান করিতে ত্রুটি করেন না। এতদ্দেশে পূর্ব্বে উচ্চ বর্ণের মধ্যে একাধিক নায়ক নিয়োগের নিয়ম ছিল। ব্রাহ্মণ হইলে দণ্ড, নায়ার হইলে অস্ত্র, গৃহদ্বারে রক্ষা করতঃ প্রবেশ করিতেন; তদ্দৃষ্টে অন্যে গৃহাভ্যন্তরে যাইতে বিরত হইত। অধুনা সে উদ্দালকের রাজ্য নাই, সভ্যতার উদ্রেকে দাম্পত্যধর্ম্মানুরাগ বর্দ্ধিত হইতেছে।

দক্ষিণ আমেরিকার কোন কোন বন্য জাতিতে রমণী ব্যক্তিবিশেষের অনুবর্ত্তিনী বলিয়া গণ্য নহে। জন্তু বিশেষ সন্তানোৎপাদন-ঋতুতে বিযুক্ত-মিথুন হয় না; বানরকে বহুকাল যুগ্মতা রক্ষা করিতে দেখা যায়। পূর্ব্ব-কথিত বন্য মানব, সহোদর সহোদরায় মিলিত হইতে কুণ্ঠিত হয় না;

উহাদের সন্তানের পিতা কে, তাহা নির্ণিত হইবার উপায় নাই। অন্য রমণী সন্তান প্রতিপালনের ভার গ্রহণ করিলে, কদাচিৎ মাতার স্থিরতা হয় না; সে কেবল অমুক জাতীয় ব্যক্তি এইমাত্র তাহার পরিচয়ের স্থল। মাতৃবংশ প্রায়শঃ নিশ্চিত থাকে; এজন্য সে তদনুসারে পরিচিত হয়। কোন বনচর জাতিতে বহুপুরুষসহবাসিনী ললনা অতি সম্মানিতা।

আদিম অবস্থায় মনুষ্য সন্তানের ভরণপোষণে অক্ষম ছিল; এজন্য শিশুহত্যা করিতে হইত। পুত্র জীবন যাত্রায় সাহায্য করিতে পারে, পরন্তু কন্যা কেবল ভার মাত্র; ইহাতে শৈশবে বহু বালিকাকে মানবলীলা সম্বরণ করিতে হইত। কথিত আছে, ভ্রূণ অধিকতর পুষ্ট হইলে, কন্যাত্ব লাভ করে। পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের শারীরযন্ত্রের আধিক্য তাহার প্রমাণ স্বরূপ উপস্থিত করা যাইতে পারে। বোধ হয় সেই কারণে স্বচ্ছল অবস্থাপন্ন লোকের গৃহে কন্যার আধিক্য দৃষ্ট হয়। আদিম কালে পুত্র-সন্তানের ভাগ অধিক ছিল; সুতরাং স্ত্রী অপেক্ষা পুরুষের সংখ্যা অধিক হওয়ায় বহুজন এক নারীতে উপগত হইতেন। নীলগিরিনিবাসী তোডা জাতি ও দ্রাবিড়ের নায়ার সম্প্রদায়ে একটী রমণীর বহু স্বামী বরণের প্রথা আছে। তিব্বতীয় লাসা-নিবাসিনী একটি মহিলা ভারতের বহুপত্নী গ্রহণ প্রথা শ্রবণ করিতঃ আশ্চার্য্যান্বিতা হইয়াছিলেন। তাঁহাদের বহুপত্যাত্মক মর্য্যাদা কি সুবিধাজনক? এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি কহেন, ভগিনী গৃহের কর্ত্রী ও ভ্রাতৃধনাধিকারিণী। স্বামিগণ তাঁহাকে অতি স্নেহ করেন। যথায় কনিষ্ঠ ভ্রাতা ধনাধিকারী হইতে পারে না, সেখানে পৃথক স্ত্রী বরণ করা দুষ্কর। ভ্রাতৃসমবায়ের এক স্ত্রী হইলে ব্যয় লাঘব হয়। কুন্তী ভিক্ষা বণ্টন করিয়া লইতে আজ্ঞা দেন। ভূটানে বহুস্বামি-গ্রহণ প্রথা আছে, কয়েক ভ্রাতা মিলিত হইয়া একটি দার পরিগ্রহ করে। নেপাল-উপত্যকা নিবাসিনী নেওয়ার কুমারীকে প্রথমতঃ বিল্ব ও গুবাক ফলের সহিত

বিবাহিত হইতে হয়, তদনন্তর তিনি পর্য্যায়ক্রমে পাঁচটি পর্য্যন্ত পতিবরণ করিতে অধিকারিণী হন। পত্যন্তর গ্রহণের অভিপ্রায় না থাকিলে বিল্বফল বারিমধ্যে নিমজ্জিত করিয়া বৈধব্য গ্রহণ করা বিধেয়। পূর্ব্বে ইহাদিগের এক সময় বহু স্বামী গ্রহণ করিবার নিয়ম ছিল। খাসিয়া ও গারো জাতিতে অদ্যাপি উক্ত ব্যবহার অব্যাহত আছে; তজ্জন্য পঞ্চাশৎ বৎসর পূর্ব্বে কামরূপে পাতিব্রত্যের গৌরব আরম্ভ হয় নাই।

বহু স্বামী গ্রহণের প্রথা যেমন অকারণে প্রাদুর্ভূত হয় নাই, বহু স্ত্রী গ্রহণের প্রথাও তদ্রূপ বিনা প্রয়োজনে উৎপন্ন নহে। স্ত্রী অপেক্ষা পুরুষের ভাগ অল্প হইলে, এক নরে বহু নারী উপগত হইবে, তাহা কেহ নিবারণ করিতে সমর্থ নহেন। তবে পুংজাতির ক্ষমতাধিক্যপ্রযুক্ত বহুপত্নী গ্রহণ প্রথা কুত্রচিৎ প্রচলিত আছে। সিংহলবাসী বাদীয়া জাতীয় প্রধান লোকের একাধিক সীমন্তিনী না থাকিলে, অপমানের বিষয় বলিয়া বিবেচিত হয়। বাঙ্গলায় কুমারীদের জন্য পাত্র নির্ব্বাচন করা দুষ্কর হইয়াছে; সুতরাং সমাজ সংস্কারকগণ বিধবা-বিবাহ কি করিয়া প্রচলন করিবেন?

কেরলে "নায়ক"-বরণের পূর্ব্বে যে নিষ্ফল বিবাহের অনুকরণ করা হয়, তাহাকে তালি-বন্ধন কহে; বোধহয় যজমানের ক্রিয়াবাহুল্য করিবার জন্য পুরোহিতের দ্বারা এই পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকিবে। দ্রাবিড়-সধবা উভয় পদের মধ্যমাঙ্গুলিতে রৌপ্য অঙ্গুরীয়ত্রয় ও গলে মালাদ্বয় ধারণ করেন। ঐ মালাকে তালি কহিয়া থাকে; উদ্বাহকালে উহার একগাছি পিতা, অপরটি স্বামি কর্ত্তৃক প্রদত্ত হয়। বৈষ্ণবের মাল্যে বিষ্ণুমূর্ত্তি ও শৈবের মাল্যে শিব-চিহ্নাঙ্কিত সুবর্ণ আলম্বন প্রদত্ত থাকে। কেরলি বিবাহে তজ্জন্য কন্যার গলে তালিসূত্র আবদ্ধ করিতে হয়। বর দিনত্রয় অবস্থান করতঃ বিবাহ পরিচ্ছদ ছিন্ন করিয়া প্রস্থান করেন; তদবধি পাত্রীর সহিত তাঁহার সম্পর্ক রহিত হয়।

কোন ব্রাহ্মণের সহিত জেমরিন্ রাজবংশীয়া কন্যার তালি-বন্ধন হইলে, পশ্চাৎ সে অন্য নম্বুরীকে বরণ করিয়া থাকে। নায়ার-কুমারী বয়স্থা হইবার পূর্ব্বে তালিবন্ধন করে, তদনন্তর নায়ক স্থিরীকৃত হয়। পুরুষের পক্ষে তালিবন্ধন সংস্কার অনাবশ্যক। কোন নায়ার রমণী তীর্থ ভ্রমণ ব্যতীত, মলয়ার সীমান্তে কোরপুজা নদের পর পারে যাইতে অধিকারিণী নহেন; সেইজন্য তিনি "সম্বন্ধকারণের" সহিত বিদেশ যাত্রা করিতে অক্ষম। দ্রাবিড়ে নাট কোট চেট্টি জাতীয়া রমণী ও কাশ্মীরে স্ত্রীজাতি স্বদেশের সীমা অতিক্রম করেন না। মলয়ারি গ্রাম্য শিক্ষক পড়ুপত্তর-জাতীয়া ননন্দা, বধূর গলে তালিবন্ধন করিয়া দেয়। ভার্য্যা বয়ঃপ্রাপ্তা হইলে, পতিগৃহে বাস করে; পুত্র জন্মিলে বিধবাবস্থায় পত্যন্তর গ্রহণ নিষিদ্ধ। গ্রহাচার্য্য কনিয়ার ও পণিক্কর জাতিতে ভ্রাতৃগণ সমবেত হইয়া এক নারী গ্রহণ করিয়া থাকে; এতদ্ব্যতীত সূত্রধর, কর্ম্মকার, স্বর্ণকার, কাংস্যকার প্রভৃতি জাতিতে বহুস্বামি গ্রহণের প্রথা আছে। নারিকেলাসব ব্যবসায়ী থিয়ার জাতি, এখানকার প্রথম উপনিবেশী। তাহাদের দম্পতিকে জীবনসংগ্রামে একত্র থাকিতে হয় না। আতিপুরের থিয়ার ভ্রাতৃগণ এক স্ত্রী মনোনীত করিয়া পর্য্যায়ক্রমে মিলিত হয়।

মলয়ার স্বাধীন প্রেমের দেশ বলিয়া সন্তান-পোষণের ভার মাতার উপর ন্যস্ত থাকে; তজ্জন্য তথায় ধনের উত্তরাধিকারিতা সম্বন্ধে সাম্যনীতি প্রচলিত আছে। "তারয়াদ" (একান্নবর্ত্তী পরিবার)-মধ্যস্থ কোন উপার্জ্জনশীল ব্যক্তির মৃত্যু হইলে, তদীয় পরিত্যক্ত সম্পত্তি, পারিবারিক সাধারণ ধনের সহিত মিলিত হইবে। সাধারণ সম্পত্তির বণ্টন নাই। স্বোপার্জ্জিত বা পৃথক্কৃত ধনের দানবিক্রয় নিষিদ্ধ নহে। পরিবারস্থ সর্ব্বজ্যেষ্ঠ পুরুষ বা নারী "কর্ণবল্" (কর্ত্তা) হইয়া ক্ষমতা সঞ্চালন করেন। তাঁহার আচরণ গর্হিত হইলে, পরিবারস্থ লোকে অপরকে অভিভাবক

নিযুক্ত করিতে পারে। কর্ত্তা দায়াদগণের সম্মতিক্রমে স্থাবর সম্পত্তি দান বিক্রয় করিতে অধিকারী। তিনি স্বকীয় প্রয়োজনে ঋণ গ্রহণ করিলে, পারিবারিক বিষয় তজ্জন্য দায়ী নহে। মৃত ব্যক্তির ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্য তদীয় ভাগিনেয়ের দ্বারা সম্পাদিত হইয়া থাকে। স্বস্রীয় পরিচয় স্থলে মাতুলের নাম লয়, কাহারও ভগিনীর অভাব হইলে, দত্তক ভগিনী গ্রহণ করিবে। সমৃদ্ধ পরিবারে আবশ্যক হইলে, সম্পত্তি পরিদর্শনের জন্য সেই সঙ্গে একটি বালককেও দত্তকরূপে গ্রহণ করিবার রীতি আছে। পুত্রের ন্যায় কন্যা মাতার এক উদরে জন্মগ্রহণ করেন, তজ্জন্য সে পরিবারের মধ্যে স্থান পাইতে অধিকারিণী হয়। মলয়ারে ভগিনী অতি আদরণীয়া ও তদীয় সন্ততি যত্নের সহিত প্রতিপালনীয়; অতএব স্বস্রীয় উত্তরাধিকারী পদবাচ্য; তজ্জন্য রাজপরিবারে ভাগিনেয় সিংহাসন প্রাপ্ত হয়। রাজভ্রাতা বা পরিবারস্থ অপর কেহ ভাগিনেয় অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ বর্ত্তমান থাকিলে, "তারয়াদ" নিয়মানুসারে তিনি রাজ্য অধিকার করেন।

কেরলের দায়ভাগ সম্বন্ধে সংস্কৃত গ্রন্থ নাই। এই বিষয় কেবল পরম্পরাগত ব্যবহারের উপর নির্ভর করিতেছে। অন্ধ্র, কর্ণাট ও দ্রবিড়ে তিনখানি স্মৃতি প্রচলিত। ১ম, খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে রচিত দেবানন্দ ভট্টের স্মৃতিচন্দ্রিকা; ২য়, চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মাধবাচার্য্যের রচিত পরাশর-মাধব্য নামক পরাশর সংহিতার টীকা; ৩য়, উক্ত শতাব্দীর বরঙ্গলের রাজা প্রতাপ রুদ্র কৃত সরস্বতীবিলাস। ইহাতে কেবল দায়াধিকার নিবদ্ধ হয় নাই। ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে দেশাচার নিয়মিত করা যায় না; দেশাচারকে আদর্শ করিয়া স্মৃতি রচিত হইয়া থাকে। কোন বিষয়ের প্রমাণ না পাইলে, স্মার্ত্তগণ শ্রুতি কল্পনা করেন; তজ্জন্য মিথ্যাবাদ অপকর্ম্ম বলিয়া বিবেচিত হয় না। রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য স্বমত স্থাপনের

জন্য বহু প্রবচন উদ্ধৃত করিয়াছেন, তৎসমুদয় প্রামাণিক কি না, কেহ অনুসন্ধান করেন না। সভাস্থলে বিদ্যার্থিগণ পূর্ব্বপক্ষ ও অধ্যাপকেরা উত্তর পক্ষ গ্রহণ করেন। সত্য নির্ণয়, বিচারের উদ্দেশ্য না হইয়া, পাণ্ডিত্য প্রদর্শনই অভিপ্রেত বিষয় হইয়া থাকে। নবদ্বীপের কুশদহ সমাজান্তর্গত ইচ্ছাপুর নিবাসী কোন স্মার্ত্ত কাশীধামে অধ্যাপনা কালে কহিয়াছিলেন যে, তিনি যৌবনকালে এক শ্রাদ্ধীয় সভায় মত-বিশেষ স্থাপনকালে প্রমাণ প্রয়োগ করিতে অসমর্থ হইয়া, বাসস্থানে প্রত্যাগমন-পূর্ব্বক তদুপযোগী একটি শ্লোক রচনা করেন; এবং নির্দ্দিষ্ট গ্রন্থের একটি পত্র পরিবর্ত্তিত করিয়া উক্ত শ্লোকটি প্রক্ষিপ্ত করেন; সেই পত্রের নবীনত্ব অপনোদনের জন্য গোময়ের মুদ্রা প্রদত্ত হইয়াছিল; পরদিন সভাস্থলে তৎপ্রদর্শনে জয়লাভ করেন। স্বাধীন মত সাধারণে গৃহীত হইবে না বলিয়া শাস্ত্রীয় টীকাকার আপন উদ্দেশ্যের অনুকূল করিয়া মূলগ্রন্থের ব্যাখ্যা করেন; উহা অধিকতর উপযোগী হয়। এই কারণে যাজ্ঞবল্ক্য অপেক্ষা মিতাক্ষরা সমধিক প্রসিদ্ধ হইয়াছে। ব্রাহ্মণ জাতি খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে [ম]লয়ারে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছেন। তাঁহাদের অনভ্যস্ত বলিয়া [কে]রল-গার্হস্থ্য-প্রণালী শাস্ত্রীয়তা প্রাপ্ত হয় নাই। মলয়ারে যখন নব [ব্র]াহ্মণের উৎপত্তি হইয়াছে, কালক্রমে ভাগিনেয়াধিকার সংস্কৃত গ্রন্থে স্থান [প]াইবে। পয়নুর গ্রামনিবাসী ব্রাহ্মণবংশে 'মরুমক্কতায়ম্' (ভাগিনেয়ের [দ]ায়াদত্ব) প্রচলিত আছে।

পূর্ব্বকালে কেরলে ভূস্বত্ব সম্বন্ধে উদার ব্যবস্থা বিদ্যমান ছিল। ভূমি [স]মাজের সম্পত্তিরূপে পরিগণিত হইত। পর্য্যায়ক্রমে শস্যবপন প্রথা ও [স]াময়িক বিভাগের নিয়ম অদ্যাপি লুপ্ত হয় নাই। পশ্বাদি জীবকেও [প]রস্পর সাহায্য করিতে দেখা যায়; মানব-মণ্ডলীতে সহায়তার জন্যই [স]মাজের উৎপত্তি। জন্ম গুণে বা ঘটনা পরম্পরার আনুকূল্যে কেহ বিপুল

ধনাধিকারী, ও অপরে অন্নাভাবে ক্লিষ্ট হইবে, ইহা সমাজনীতি-বিরুদ্ধ হওয়া উচিত। ভরণ-পোষণের অতিরিক্ত সম্পদে সাধারণের স্বত্ব আছে। ইউরোপ সার্ব্বজনিকসমৃদ্ধিপ্রিয়তার জন্য ধন্য। সে কালে ইউরোপ-খণ্ডে সাধারণের জন্য বাণিজ্য হইত। ব্যবসায়ের উপযোগিতা এই যে, প্রকৃতির কল্যাণে স্থানবিশেষে কোন দ্রব্য সুলভে উৎপন্ন হইলে, অন্যত্র অপেক্ষাকৃত মহার্ঘ করিয়া দিলেও তত্রত্য লোকের সুবিধা থাকে; সেই সুবিধার মূল্যকে লভ্য কহা যায়। এই লভ্য ইউরোপে জানপদ-গণকে বণ্টন করিয়া দেওয়া হইত। তদুপলক্ষে গ্রামান্তরবাসী সার্থবাহ আসিলে, তিনি পৌরগণের অতিথিরূপে পরিগণিত হইতেন। এই সূত্র অবলম্বন করিয়া, অধুনাতন ইউরোপীয় শ্রমজীবিদলের আকাঙ্ক্ষা হইয়াছে যে, বণিকসম্প্রদায়ের উচ্ছেদসাধন করিয়া, সাম্রাজ্যকর্তৃক বাণিজ্য পরিচালিত হউক। তাহারা শ্রমসাধ্য কর্ম্মে নিযুক্ত হইলে, সাম্রাজ্যের রাজকোষ তাহাদের ভরণ পোষণ নির্ব্বাহ করিবে। যে আলস্যবশতঃ কার্য্যে নিযুক্ত না হয়, সে চৌরবৎ দণ্ডনীয় হইবে। পাশ্চাত্য সমাজ, সাধারণতাপ্রবণ বলিয়া, ব্যবসায়ক্ষেত্রে সম্ভূয়সমুত্থানের প্রাবল্য দেখা যায়। আমরা পরার্থপরতায় যে স্বকীয় হিত আছে, তাহা না বুঝায়, সমবেত অনুষ্ঠানে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারি নাই।

নব উপার্জ্জিত স্থানে ঔপনিবেশিকগণ আধিপত্য স্থাপন করিতে পারিলে, তাহারা সে অবস্থায় সকলেই সমকক্ষ; ইহাতে যোদ্ধৃতন্ত্র প্রবর্ত্তিত হয়। ব্রাহ্মণগণের প্রবেশ করিবার অগ্রে, মলয়ার প্রদেশে সর্ব্বাঙ্গীণ যোদ্ধশাসন প্রচলিত হইয়াছিল। কয়েকখানি "দেশম্" (গ্রাম) এক "দেশবলী"র অধীন থাকিত। অনেকগুলি গ্রাম লইয়া "নাদ" গঠিত হইত, সেগুলি যাঁহার অধীন, তিনি "নাদবলী" বা স্থানীয় নিয়ন্তা; তিনি "কোবিলগম্"-এর (রাজার) অধীন ছিলেন। উত্তরাধিকারিবিহীন ভূমি, ভোগস্থ ভূমি

দ্রব্যজাত ও বিদেশীয়ের নিকট শুল্ক গ্রহণ প্রভৃতির আয় হইতে "কোবিলগম্" অর্থ সংগ্রহ করিয়া, কর্ণাটের চের-সম্রাটকে প্রদান করিতেন। এই কর-সংগ্রাহক রাজা জনসমাজ কর্তৃক নিয়োজিত ও তদধীন কার্য্যকারক ছিলেন।

তৎকালে শূদ্রদিগের যে পল্লীসমাজ স্থাপিত হয়, তাহা 'তর' নামে অভিহিত। ভূমির সাধারণ অধিকার তদধীন ছিল; বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিগণ উক্ত সংসদের নেতা ছিলেন। তাঁহাদিগকে "কুত্তং" (সভা) আহ্বান করিয়া কর্ত্তব্য আলোচনা করিতে হইত।. কালে রাজা পরাক্রান্ত হইলে, তিনি পল্লীসমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইতেন; ইহাতে সামাজিক বল হীনপ্রভ হইয়া পড়িত। ইদানীং পূর্ব্বতন পল্লীসমাজ একান্নবর্ত্তী পরিবারের পরিজনতন্ত্র-রূপে বিদ্যমান রহিয়াছে। বাঙ্গালায় পূর্ব্বে যে পল্লীসমাজের অস্তিত্ব ছিল, মণ্ডলপতি, কোষ্ঠপাল ও পট্টলেখকের পদ দৃষ্টে তাহা অনুমিত হইবে।

মলয়ারে ভূমির সাধারণ স্বামিত্ব, মহান্ গ্রামস্বত্ব হইতে সঙ্কীর্ণ পারিবারিক স্বত্বে উপনীত হইলে পর, ব্যবহারিক বিষয়গুলি সামন্ত বলের অধীন করিবার উপক্রম হইতে লাগিল। ইহাতে রাজা ও স্থানীয় নিয়ন্তাদিগের সহিত জনসমাজের ভোগস্ব সম্পর্ক উদ্ভূত হয়। প্রাদেশিক নিয়ন্তা পরিজনতন্ত্র সম্পত্তির উপর ব্যক্তিগত স্বত্ব প্রাপ্ত হইলেন, ইহার ফলে, সংগ্রামের সময় সেনাপতিকে যে অর্থ সাহায্য করিতে হইত, ক্রমে তাহা ভূমির কর হইয়া দাঁড়াইল। দেবস্ব-ভূমির কৃষক ও ব্রাহ্মণ সমরক্ষেত্রে উপস্থিত না হইলে ক্ষতি রহিল না। করসংগ্রাহক ও শাসনকর্ত্তা ভূম্যধি-কারিত্ব লাভ করিলেন। নায়ারগণ প্রজারূপে পরিগণিত হইল; তদবধি তাহারা স্থায়ী স্বত্ববান্ হইয়াছে। যতকাল তাহারা ভূমির উৎকর্ষ সাধনে বিরত না হয় ও কর প্রদানে সমর্থ থাকে, ততদিন তাহাদের স্বত্ব অক্ষুণ্ণ থাকে।

বৃটিশ মলয়ারে বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভে বঙ্গদেশের ন্যায় ভূম্যধিকারীর সহিত রাজস্বের চিরস্থায়ী নিয়ম হইয়াছে। সম্প্রতি ইংরাজ ভ্রম বুঝিতে পারিয়া প্রজার অধিকার বৃদ্ধি করিতে উৎসুক হইতেছেন। "বেরুম্ পাট্টম্" স্বত্বের প্রজা, শস্যোৎপাদনের ব্যয় গ্রহণপূর্ব্বক উৎপন্ন সামগ্রী ভূম্যধিকারীকে দিয়া থাকেন। ভূম্যধিকারী প্রায়শঃ উৎপন্ন বস্তুর মূল্য নির্দ্ধারণ করিয়া, কৃষকের নিকট এক তৃতীয়াংশ অর্থ গ্রহণ করেন। "কানম্ পাট্টম্" প্রজা ভূস্বামীর নিকট কিঞ্চিৎ ধন বা ধান্য গচ্ছিত রাখিয়া, অনধিক দ্বাদশ বৎসরের জন্য ভূমি গ্রহণ করে। তাহারা উৎপাদন-ব্যয় ও বীজের মূল্য বিয়োগ করিয়া, উৎপন্ন দ্রব্যের অর্দ্ধাংশ ভূম্যধিকারীকে প্রদান করে, এবং স্বীয় গচ্ছিত অর্থের কুসীদ গ্রহণ করিয়া থাকে। যে ভূমির উপস্বত্ব আধমন রক্ষা করিয়া ঋণ গ্রহণ করা হয়, তাহা "তট্টি" নামে অভিহিত ; এই অর্থ-ব্যবহারে কলাবৃদ্ধি নাই। ভূমি বিক্রীত হইলে, উত্তমর্ণ সর্ব্বাগ্রে ক্রয় করিতে অধিকারী। উপরি উক্ত হস্তান্তরকরণের বিধিত্রয়ের কোনটি অগ্রে অবলম্বিত না হইয়া বৃটিশ-কেরলে ভূমি বিক্রয় হয় না। পুরস্কার বা কোন কার্য্যের বেতন স্বরূপ চিরস্থায়ী স্বত্বে যে ভূমি প্রদত্ত হয়, তাহার উত্তরাধিকারীর অভাব হইলে, দাতা পুনরায় উহা প্রাপ্ত হন। দেবস্ব সম্পত্তি পূর্ব্বে রাজকীয় তত্ত্বাবধানে রক্ষিত ছিল, ইংরাজ রাজশক্তি গ্রহণ করিলে, উহা তদধীন হইয়াছে। কুচ্চি ব্রিটিশ-মলয়ারভুক্ত নহে ; অত্রত্য ভূস্বত্ব সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম দৃষ্ট হইবে।

আমরা সুদূর ভারত-সীমান্তে সাম্যের বিবিধ আকার পরিদর্শনে অতিমাত্র আনন্দ অনুভব করিতেছি। সাম্য প্রাকৃতিক নিয়ম। স্বাভাবিক অবস্থায় মনুষ্য মাত্রে সমান। নৈসর্গিক প্রকৃতি ও সম্পত্তির অধিকারিত্বে লোকমাত্রেই সমভাবাপন্ন। সভ্যতার বৃদ্ধি হইলে, বৈষম্য উৎপন্ন হয় ; তাহাতে অনিষ্ট দেখিলে, বন্যাবস্থা প্রীতিপ্রদ বলিয়া বিবেচিত হইয়া

থাকে। কখনও সাম্য, কদাচিৎ বৈষম্য উন্নতিজনক। সাম্যের অবস্থায় বৈষম্যের জন্য এবং বৈষম্যের অবস্থায় সাম্যের জন্য আন্দোলন হয়।

আমরা দিনত্রয়ের ভোজ্য সংগ্রহ করিয়া, ডোঙ্গাযোগে থিরুবাঙ্কোড় অভিমুখে যাত্রা করিলাম। অম্বুধি হইতে প্রণালীর দূরতা-বৃদ্ধি অনুসারে জলের লবণাক্ততার হ্রাস হইতেছে। যে স্থলে মলয়পর্ব্বত-নিঃসৃতা স্রোতস্বিনীর সঙ্গম হইয়াছে, তত্রত্য জল সুমিষ্ট। আমরা এক বিশাল হ্রদে প্রবিষ্ট হইলে, দিনমণি মেঘান্তরালে লুক্কায়িত হইলেন। জলের সহিত গগন ও দিগ্বলয়ের সহিত নারিকেল-বৃক্ষরাজী মিলিত হইয়া, খ-গোল ও ভূ-গোলের একত্র সমাবেশ অপূর্ব্বদর্শন হইয়াছে। যেন আমরা একটি শ্যামল ব্রহ্মাণ্ডে অণ্ডের মধ্যে ভাসিতেছি, কিংবা গোলোকধাম সদৃশ গোলকে সশরীরে আরোহণ করিয়াছি। নাতিদূরে সমুদ্র; কিন্তু তাহার সহিত আমাদের সাক্ষাৎকার নাই; রজনীতে গর্জ্জন শ্রুত হয়, মধ্যে সঙ্কীর্ণ ভূভাগের ব্যবধানমাত্র। থিরুবাঙ্কোড় রাজ্যের পথ-নির্দ্দেশক আলোকস্তম্ভ জলে প্রোথিত রহিয়াছে। আমাদের সহিত মাদকদ্রব্য আছে কি না শৌল্কিক-কর্ত্তৃক বারদ্বয় পরীক্ষিত হইল। প্রাতঃকালে আমরা নারিকেল-রজ্জু ব্যবসায়ে লব্ধপ্রতিষ্ঠ আলপলি নগরের উপকণ্ঠে উত্তীর্ণ হইলাম। পথিপার্শ্বে কয়েকখানি বদ্ধদ্বার ক্রয়শালা দৃষ্ট হইতেছে। পরদিন কোল্লম্ জনপদে তরণী প্রবিষ্ট হইল। সর্ব্বাগ্রে, রজ্জু বা তৈল প্রস্তুতের জন্য আনীত বাষ্পীয় যন্ত্র অযথা স্থাপিত রহিয়াছে। ধান্যবিক্রেতার গৃহে কৃষ্ণব্রীহিস্তূপ, ও নৌকাপঙ্‌ক্তি প্রস্তুত রহিয়াছে। ক্ষুদ্র নৌকাবাহিগণ যাতায়াতে নিরত আছে। মাতা ও তরুণী কন্যা তরণী বাহিতেছে। উন্নত বক্ষোরুহ বিমুক্ত রাখিয়া, উত্তরীয় বসন শিরোভাগ হইতে পৃষ্ঠে লম্বমান হইয়াছে।

অন্য এক স্থানে অন্নপান সংগ্রহের জন্য নাবিকদ্বয় উড়ুপ রক্ষা করিল। উচ্চ তটে নানাজাতীয় বৃক্ষ আতপতাপ দূর করিবার জন্য দণ্ডায়মান।

তন্নিম্নে শ্বেত, পীত ও লোহিত পুষ্পাচ্ছন্ন গুল্মশয্যা। অবসর পাইয়া, আমরা উপরিভাগে গমনপূর্ব্বক একটি প্রাচীন দেবালয় দর্শন করিয়া আসিলাম। দেবমন্দির গ্রামের শোভা-বৃদ্ধিকারক; এতদ্দেশে নব বসতি স্থাপন করিতে হইলে, তথায় একটি দেবতায়ন নির্ম্মাণ করা প্রয়োজনীয়। স্থানবিশেষে দেবালয় চিকিৎসালয়ের উপযোগিতা ধারণ করিয়া থাকে।

মনের একাগ্রতায় অবশ্য পীড়া নিবারিত হইতে পারে; একাগ্রতা দ্বারা সমগ্র শরীরযন্ত্র উত্তেজিত হয়। মলয়ারে নীচজাতীয় লোক ভেরীধ্বনি করিয়া অপদেবতাকে দূর করিতে চেষ্টা পায়।. তাহাতে ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তি আরোগ্যলাভ করিয়া থাকে। সিংহলের বাদ্দিয়া জাতি ঔষধ ব্যবহার করে না, তাহারা দৈবজ্ঞের সাহায্যে পীড়ার প্রতিকার করে। বিশ্বাসের দ্বারা আরোগ্য-লাভ অসম্ভাবিত নহে; আহ্লাদ বা শোক-সংবাদ মিথ্যা হইলেও তদ্দ্বারা চিত্তবিকার সাধিত হইয়া শরীরে ভাবান্তর উপস্থিত করে। তারকেশ্বরে "ধন্না" দিলে বা তাঁহার জন্য মানসিক ব্রত গ্রহণ করিলে, যাহার শরীরে ভাবান্তর উপস্থিত হয়, সে নিরোগী হইতে পারে। বিশ্বাসে দৈহিক ব্যাধি উপশমিত হয়, কিন্তু যান্ত্রিক পীড়া প্রতিকার লাভ করে না। বাত ও পক্ষাঘাত তদ্দ্বারা অতি চমৎকাররূপে নিবারিত হইতে দেখা গিয়াছে। মানসিক উত্তেজনা দৈহিক শক্তির উপরে বিশেষ ক্রিয়া সম্পন্ন করে। ষণ্ড আক্রমণ করিলে পঙ্গুর পক্ষেও দ্রুতবেগে পলায়ন অসম্ভব হইবে না। অঙ্গারের আভ্যন্তরিক গতি অর্থাৎ আণবিক সঞ্চালন বৃদ্ধি পাইলে যেমন অগ্নি উৎপন্ন হয়, মস্তিষ্কের গতি প্রভাবে তদ্রূপ জ্ঞান উৎপন্ন হইয়া থাকে। রূপ, রস, গন্ধ প্রভৃতি প্রকৃতপক্ষে ইন্দ্রিয়ানুভূতি ভিন্ন কিছুই নহে; সুতরাং চৈতন্য ও জড় এক প্রকার ব্যাপারের বিভিন্ন অবস্থা; কিন্তু সেই গতি-ব্যাপার কিসে উদ্ভূত হয়, তৎসম্বন্ধে আমরা অজ্ঞ।

গোধূলিকালে আমরা একটি তড়াগ প্রাপ্ত হইলাম; সমুদ্র তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইবার জন্য আপনার উত্তাল সফেন তরঙ্গ লইয়া আগমন করিতেছে। কিন্তু তরঙ্গমালার প্রতি নবমটি, উচ্চতা ও প্রসারে দীর্ঘ হওয়ায়, প্রবেশ দ্বার অপেক্ষা তদীয় আয়তন বৃহত্তর বলিয়া, আহত হইয়া যেন প্রতিগমন করিতেছে। সুদূরে অর্ণবযানের দুই চারিটি গুণবৃক্ষ পরিদৃষ্ট হইতেছে। হ্রদবক্ষে একখানি সমুদ্রগামী নৌকা অবস্থিত আছে। এক পল্লী হইতে অন্য পল্লী গমন করিতে হইলে নৌকার সাহায্য গ্রহণীয়। আমরা কি পুনর্ব্বার কাশ্মীরে প্রবিষ্ট হইলাম! 'অঞ্চার'-হ্রদোপম জলোপরি বীরণ-বন, নলিনী-দল ও কহ্লার দলিত করিয়া চলিয়াছি। আমার কাশ্মীর-সহায় এবার সমভিব্যাহারে নাই; এ সাদৃশ্য তাঁহাকে দেখাইতে পারিলাম না, তজ্জন্য দুঃখ রহিল। প্রমোদ তরীবাহী নস্‌রাণী মুপ্পা যুবকগণ সমপ্রকৃতিক ও বিশ্রামদায়ক সুরে গান করিতে করিতে অতি দ্রুত ক্ষেপণী সঞ্চালন করিয়া গ্রাম হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতেছে। রাত্রিতে পাতাল পুরীতে আমাদের নৌকা উত্তীর্ণ হইল। সুপ্তোত্থিত হইয়া দেখি সুড়ঙ্গ মধ্যে দীপালোক প্রজ্বলিত, খিলানের পার্শ্বে অজস্রধারে ঊর্দ্ধ হইতে বিন্দু বিন্দু বারি নির্গত হইতেছে। এ যেন বরুণ লোক। পথের দূরতা হ্রাস করিবার জন্য বহুস্থানে কৃত্রিম প্রণালী প্রস্তুত করিয়া প্রাকৃতিক সমুদ্র প্রণালীর সহিত মিলিত করিতে হইয়াছে। সেই উদ্দেশ্যে এখানে, ইষ্টউইক্ সাহেবের ভ্রমণ-পথ নির্দ্দেশক পুস্তক রচনার পরে, সুড়ঙ্গ নির্ম্মাণ করা হইয়াছিল।

যথারীতি রাত্রি প্রভাত হইলে, পুনরপি নারিকেল-বৃক্ষ পরম্পর দর্শন দিল। কতকগুলির আকার এরূপ হ্রস্ব, যে বৃক্ষমূলে উপবেশন করিয়া ফল স্পর্শ করা যায়। উহাদের ফলও তেমনি ক্ষুদ্রাকার; কোনটি রক্তবর্ণ। যে স্থানে মৃত্তিকা আঠাল, তথায় বৃক্ষমূলে বালুকা

প্রদান করা হইয়াছে। দীর্ঘ বৃক্ষে আরোহণ-সৌকর্য্যের জন্য বৃক্ষ কর্ত্তন করিয়া পাদপীঠ নির্ম্মাণ করিয়াছে।

বৈশাখ মাসে "পরুম" (বৃক্ষবাটিকা) ঘেরিয়া, তন্মধ্যে দশ হস্ত অন্তর, দেড় হস্ত গভীর ও তৎপরিমিত প্রশস্ত গর্ত্ত খননপূর্ব্বক তাহার অভ্যন্তর দেশে একটি ছিদ্র করিয়া, নারিকেলের চারা, লবণ ও ভস্ম সহযোগে রোপিত হয়। মূলে কিঞ্চিৎ মৃত্তিকা প্রদান করিয়া অল্প জল নিষিক্ত করিতে হয়। গর্ত্তের চতুর্দ্দিক কণ্টকাবৃত করা আবশ্যক। ২১ দিন পর্য্যন্ত প্রত্যহ তিনবার বারিসেক বিধেয়; তৎপরে তিন বৎসর কাল দুই দিন অন্তর একবার করিয়া জল দিলেই হইল। প্রতি মাসে একবার মূলে ভস্ম প্রদান কর্ত্তব্য। তৃতীয় বর্ষে আষাঢ় মাসে, মূলের দেড় হস্ত ব্যবধান রাখিয়া এক হস্ত গভীর খাত করিবে। ইহাতে প্রাবৃট্‌কালে তরুণ-তরু-সন্নিকটে বারি সঞ্চিত রহে। বর্ষাপগমে কার্ত্তিক মাসে উদ্যান কর্ষণ করিয়া খাত সমতল করিতে হয়। তদনন্তর প্রতিবর্ষে বর্ষাগমের পূর্ব্বে পুনরায় খাত খনন, অপিচ, বৃক্ষমূলে একঝুড়ি ভস্ম প্রদান কর্ত্তব্য। উদ্যানাধিকারীর গবাদি পশু সম্বৎসর কালের মধ্যে ইতস্ততঃ স্থানান্তরিত করিয়া রক্ষিত করিবার ও বৃক্ষবাটিকায় উদ্ভূত তৃণশষ্প চৈত্রমাসে দগ্ধ করিবার প্রথা থাকায় সার প্রদানের উপকারিতা সুসিদ্ধ হয়।

এবার আমরা যে কুল্যায় প্রবেশ করিয়াছি, তাহার দৃশ্য বিভিন্ন। উভয় পার্শ্বে প্রহরীর ন্যায় দণ্ডায়মান বৃক্ষশ্রেণী ফলভার লইয়া নিবিড় বন রচনা করিয়াছে। মধ্যে মধ্যে কেতকী সদৃশ বৃক্ষে, আনারসের মত ফলস্তবক আলম্বিত আছে। লবণের অভাববশতঃ ভৃত্য তটে অবতরণ করিয়া কিঞ্চিৎ সেই দ্রব্য ও পয়সা দেখাইল। এখানে ভাষা অকর্ম্মণ্য। পণ্য-জীবীর ইঙ্গিতে বুঝিলাম এ পয়সা চলিবে না। বৃটনেশ্বরীর নাম

যাহাতে মুদ্রিত রহিয়াছে তাহা অচল হয়, এই প্রথম দেখিলাম। যতই অগ্রসর হওয়া যায়, অরণ্য ততই গভীর ভাব ধারণ করিতে চলিয়াছে। অগ্রে ক্ষুদ্র, পরে নাতিদীর্ঘ, তৎপশ্চাৎ উচ্চ বনতরু তট সমাচ্ছন্ন করিয়া উত্থিত হইয়াছে। তদনন্তর উচ্চ বালুকাময় প্রান্তরের আরম্ভস্থান গুল্ম ও সৌরভপূর্ণ কুসুমবৃক্ষে পরিপূর্ণ। আমরা মধ্যাহ্নকৃত্যাভিলাষে উত্থিত হইয়া দেখিলাম, অদূরে মলয়গিরি কিংবা গন্ধমাদন মস্তকোত্তোলন করিয়া রহিয়াছে। মরীচিমালা বিশাল সৈকত ভূমিকে উগ্রভাবাপন্ন করিয়া তুলিয়াছে। কদাচিৎ রৌদ্র ভেদ করিয়া, বনচরদিগের কুটীর হইতে ধূম উত্থিত হইয়া, বসতি নির্দ্দেশ করিতেছে। স্রোতোবিহীনা তটিনী এক নিপতিত, প্রশস্ত, সরল ও অতি দীর্ঘ দর্পণের পথবৎ প্রতিভাত হইতেছে। আমরা ভিন্ন সে পথে অন্য পথিক নাই। জল স্থল সমান নিস্তব্ধ। বিহঙ্গমগণ পল্লবের ছায়ায় আসীন হইয়া কূজন করিতেছে। শব্দের মধ্যে অস্মদীয় নৌচালকের দণ্ড-নিক্ষেপ-ধ্বনি, লয়-সংযুক্ত শ্রুত হইতেছে। নাবিক রাত্রিতে নৌচালন হেতু অনিদ্রিত ছিল; অধুনা সে মাধ্যন্দিন আতপকালে পর্য্যুষিত অন্ন ভক্ষণ ও তাম্বূল সেবন করিয়া, ক্ষেপণী-সঞ্চালন স্থানে নারিকেলপত্রের চালখানি টানিয়া দিয়া কোচিনের প্রসিদ্ধ স্থূল পাদ বিস্তৃত করিয়া, নিদ্রাসুখ অনুভব করিতেছে। তদীয় পুত্র মীরণ্ডার হস্তে এখন তরী সঞ্চালনের ভার। ইহারাও এই নৌকায় রন্ধন করে। ইহারা বহির্দ্দেশ হইতে লঙ্কা, হরিদ্রা ও নারিকেল-শাঁস একত্র পেষণ করিয়া আনয়নপূর্ব্বক গল্লাচিংড়ীর ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া, কৃষ্ণস্থালীতে অন্ন ভোজন করে এবং কাঞ্জিক মিশ্রিত ভাত ব্যবহার করিবার সময় দারুহস্তক সহকারে অন্ন উত্তোলন করে; নৌচালনে ক্লান্ত হইলে, এক চুমুক কাঁজি খাইয়া সঞ্জীবিত হয়। অপরাহ্ণে যে স্থানে দৃষ্ট হইল যে খাল শেষ হইয়াছে, সেই স্থানটি অনন্ত-শয়ন বা

থিরুবাঙ্কোড়ের রাজধানী ত্রিবন্দরম্। তৎপরে ঘট্টচত্তরে অবতরণ করা গেল।

অতঃপর আমরা বেঙ্কট্রাওকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া, কোটগুল্মক-বিশিষ্ট রাজপুরীর প্রাচীর সন্নিকটে, দ্রাবিড় ব্রাহ্মণ উপনিবেশিবর্গের পল্লীতে, রাজকীয় পান্থনিবাসে উপনীত হইলাম।

এক্ষণে যাঁহারা মলয়ারি, কাল-বিশেষে তাঁহারাও উপনিবেশী ছিলেন। পোলিয়ার জাতি এতদ্দেশের আদিম নিবাসী; তাহারা ব্যবসায়ে "শূদ্রম্"। ব্রাহ্মণের বাটীতে পুরুষানুক্রমে দাসত্ব করিয়া থাকে। চেরুমার প্রভৃতি আর কয়েকটি আদিম জাতি পশুচারণ করিয়া দিনাতিপাত করে। থিয়ার প্রভৃতি প্রথমে, তদনন্তর নায়ার এবং সর্ব্বশেষে নম্বুরীগণ কেরলে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছেন।

বঙ্গদেশের ন্যায়, এখানে পূর্ব্বে ব্রাহ্মণগণ তদিতর জাতিকে শূদ্র জ্ঞান করিতেন; কিন্তু যাঁহারা বাহুবলের সহিত জ্ঞান ও ধনবল লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে অচিরকালমধ্যে ক্ষত্রিয়শ্রেণীরূপে গ্রহণ করিতে হইয়াছিল।

কেরল নায়ার-প্রধান দেশ। জনসংখ্যা সাত লক্ষ। তাহাদের পক্ষে আমিষভোজন ও বারুণীসেবন নিষিদ্ধ নহে।

দ্রবিড়-ভূমি হইতে নায়েক উপপদধারী, বর্ত্তমান বণিয়ার জাতির পূর্ব্বপুরুষগণ মলয় প্রদেশে আগমন করিয়া নায়ার নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। নায়ার অর্থে নারীপর্য্যায়। তাহারা যোদ্ধৃতন্ত্র শাসন-প্রণালী স্থাপিত করিয়া, সুজলা সুফলা মলয়ার ভোগ করিতে থাকে। এক্ষণে তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ সৈনিকবৃত্তি অবলম্বন করিয়া, জীবিকা-নির্ব্বাহ করেন। তিরু অনন্তপুরের রাজপথে আমরা একদল নায়ার সেনাকে রণবাদ্যোদ্যম সহকারে ধ্বজদণ্ড অগ্রে করিয়া অভিযান করিতে দেখি-

য়াছি। ইঁহাদিগকে দেখিলে মনে হয়, বঙ্গে কোন স্বতন্ত্র প্রাচীন রাজ্য বর্ত্তমান থাকিলে, মৎস্যান্নভোজী বাঙ্গালীও তক্রান্নভুক্ তিলঙ্গা অপেক্ষা রণবিদ্যাভ্যাসে অপটু হইত না।

সমস্ত মলিয়ালি ব্রাহ্মণের আচার একবিধ। ব্রাহ্মণের মধ্যে নম্বুরী-গণ সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ। শূদ্রযাজী ভিন্ন অপর শ্রেণীর ব্রাহ্মণের অন্নগ্রহণ সম্বন্ধে নম্বুরী পুরুষের আপত্তি নাই। রমণীদিগের পক্ষে তাহা নিষিদ্ধ। কিন্তু সূতিকাগারে নায়াররমণী কর্ত্তৃক পাচিত অন্ন গ্রহণ করিলে, ইঁহাদিগের শুদ্ধাচার নষ্ট হয় না। দ্রাবিড়-ব্রাহ্মণ গোল আলু ভক্ষণ করিলেও, ব্রাহ্মণী তদ্‌ভোজনে বিরত থাকেন।

নম্বুরীগণ চতুঃষষ্টিপ্রকার আচারশৃঙ্খলে আবদ্ধ। ব্রাহ্মণ ভিন্ন অপরকে স্পর্শ করিলে, তাঁহারা স্নান করিতে বাধ্য হন। নম্বুরীদিগের পক্ষে অপর শ্রেণীর ব্রাহ্মণকে অভিবাদন করা নিষিদ্ধ। শিব ও বিষ্ণু উভয় দেবতার উপাসনাও এক ব্যক্তির করা অকর্ত্তব্য। পর্য্যুষিত জল ও অন্ন ইঁহাদিগের অব্যবহার্য্য। নক্ষত্র অনুসারে ইঁহারা একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ করিয়া থাকেন।

নম্বুরীগণ প্রত্যূষে গাত্রোত্থান ও সূর্য্যোদয়ের পর স্নান করিয়া দেবা-লয়ে প্রবেশ পূর্ব্বক বেলা এগারটা পর্য্যন্ত তথায় অতিবাহিত করেন এবং সন্ধ্যার পূর্ব্বে পুনর্ব্বার তৈলাভ্যঙ্গসহকারে স্নান করিয়া দেবস্থানে গমন করেন। রাত্রি নয় ঘটিকার পর তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া স্বস্থানে সুখ অনুভব করেন। দেবালয়ে অবস্থানকালে উপাসনা ও অধ্যয়ন প্রভৃতি কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। সাংসারিক কার্য্যের জন্য অপরাহ্ণ নির্দ্দিষ্ট আছে। মধ্যাহ্নে তাঁহারা কিঞ্চিৎ নিদ্রাসুখ উপভোগ করেন।

নম্বুরী পরিবারে বয়ঃস্থা না হইলে কন্যার উদ্বাহ সম্পন্ন হয় না। সকল পুরুষের বিবাহ করিবার অধিকার না থাকায়, বহু মহিলাকে অনূঢ়া বা সপত্নীবেষ্টিত অবস্থায় কালযাপন করিতে হয়। অগ্রজ নিঃসন্তান ন

হইলে, কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিবাহ করিতে পারেন না। পারিবারিক ধন-এ দেশে অবিভাজ্য; সুতরাং সকলের পক্ষে বিবাহ শ্রেয়স্কর নহে। পূর্ব্বে ধর্ম্মাধিকরণে বেদব্যাসস্মৃতি নামে খ্যাত "অশৌচ প্রায়শ্চিত্তম্" অনুসারে বিচার হইত। স্বজাতির মধ্যে ব্যভিচার, অখাদ্যভোজন বা নরহত্যা-জনিত পাপে কেহ রাষ্ট্র হইতে তাড়িত ও সমাজচ্যুত হইলে, তিনি মুসলমান হইয়া পবিত্রতা লাভ করিতেন; এখন সে অবস্থায় খৃষ্টান হইয়া পরিত্রাণ পাইয়া থাকেন। অদ্যাপি শাস্ত্র ও সদাচার লইয়া কালাতিপাত করা তাঁহাদের জীবনের ব্রত। নগরে বাস করিলে, শুদ্ধাচারিতার ব্যাঘাত হইবে বিবেচনা করিয়া, তাঁহারা গ্রামাভ্যন্তরে বসতি শ্রেয়ঃ জ্ঞান করেন। টিপু সুলতান তামুরী রাজ্য গ্রাস করিলে, ইঁহারা কালিকট প্রদেশ হইতে পলায়নপর হইয়াছিলেন। ইংরেজাধিকারে দেশে শান্তি স্থাপিত হইলে, ইঁহারা পুনরায় স্বস্থানে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছেন। এই শুদ্ধাচারিগণ রজকালয়াগত বস্ত্র অধৌত অবস্থায় দেবতাকে পর্য্যন্ত পরিধান করাইয়া থাকেন। ইংরাজী বিদ্যামন্দিরে এক জন নম্বুরী ছাত্র প্রবিষ্ট হইলে, তাহা বিদ্যালয়ের বিশেষ ঘটনা বলিয়া বিবেচিত হয়। এ দেশে ক্রমশঃ ইংরাজী শিক্ষার বিস্তার হেতু রাজকীয় কর্ম্মে দ্রাবিড়দিগকে নিযুক্ত না করিয়া, যাহাতে স্থানীয় শিক্ষিত ব্যক্তিদিগকে নিযুক্ত করা হয়, —এই মর্ম্মে সম্প্রতি রাম রাজার নিকট আবেদন করা হইয়াছে। এ দেশে ব্রাহ্মণ জাতিকে বিশেষ লক্ষণাক্রান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। কেরলে বিবাহবন্ধন অক্ষুণ্ণ রাখিবার উদ্দেশে মহিলাগণকে দক্ষিণাপথের নিয়ম-বিরুদ্ধ অবরোধ পদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছে। মুসলমানগণ কহেন, বিদেশীয় লোকের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিতে হয় বলিয়া, তাঁহাদের মধ্যে অবগুণ্ঠন প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। কুর্দ্দপর্ব্বতবাসিনী মুসলমান রমণী-গণ অদ্যাপি অবগুণ্ঠন ব্যবহার করেন না। অধিকন্তু তাঁহাদের মধ্যে

যোদ্ধনারী দৃষ্ট হয়। আর্য্যাবর্ত্তবাসিনী ললনাদিগকে অনুকরণ লালসা পরিতৃপ্তির জন্য অথবা প্রয়োজনবশে আবরণ ধারণ করিতে হইয়াছে, তাহা নিশ্চয় করা দুঃসাধ্য। কেরলী ব্রাহ্মণী লোকান্তরালে অবস্থিতি করায় তাঁহারা অন্তর্জনা নামে প্রসিদ্ধ।

মলিয়ালিগণের মতে শঙ্করাচার্য্য নম্বুরী ছিলেন। তিনি বদরিকাদ্রিতে কোনও ব্যাসের সহিত বাস করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক, স্বদেশের আচার সংস্কারে প্রবৃত্ত হইয়া, পরশুরাম সংস্থাপিত নিয়মে উপেক্ষা করিলেন। সংস্কারকেরা সকলদেশেই সাধারণের নিগ্রহভাজন হইয়া থাকেন। শঙ্করাচার্য্যের অন্তরঙ্গগণও বিরোধী হইলেন। শঙ্করকে সমাজ-চ্যুত করিয়া, শূদ্রজাতিকে তদীয় সেবা হইতে বিরত করা হইল; কিন্তু পরবর্ত্তিকালে আচার্য্যের ব্যবস্থাই শিরোধার্য্য হইয়াছে। তাঁহার অনু-শাসনবলে এক্ষণে অন্তর্জনাগণ কুচস্থল আবৃত করেন। ভট্টর উপাধিধারী ব্রাহ্মণগণের কামিনীগণ অদ্যাপি তামিল প্রণালীতে বস্ত্র-পরিধান-প্রথা পরিত্যাগ করেন নাই। পরপুরুষের মুখদর্শন নিষিদ্ধ থাকায়, বহির্গমন কালে তালপত্রের ছত্র অন্তর্জনাদিগের সমভিব্যাহারে থাকে। অগ্রবর্ত্তিনী নায়ার দাসী সতর্ক করিয়া দিলে, তাঁহারা আতপত্র দ্বারা মুখাবরণ করেন। এ দেশে দেবতা ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সম্মুখীন হইলে, পুরুষ ও নারী উভয়ের পক্ষেই গাত্র অনাবৃত করা বিধি। পুরুষের পক্ষে গাত্র বস্ত্র কটিদেশে বেষ্টন করা সম্মান প্রদর্শনের চিহ্ন বলিয়া পরিগণিত। এ রীতি কি দেশের শৈত্যহীনতার ফলে উদ্ভূত নহে?

এ দেশে দাম্পত্যনিয়মলঙ্ঘনের দণ্ড অতি কঠিন। দোষ প্রমাণিত হইলে স্ত্রী ও পুরুষ উভয়কে জাতিচ্যুত হইতে হয়। অপরাধের প্রমাণা-ভাব ঘটিলে মীমাংসক সাধ্বীর চরণে প্রণিপাত করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করেন। এই প্রক্রিয়ার নাম—"ক্ষমানমস্কারম্"। তদনন্তর "শুদ্ধি-

ভোজনম্‌” করাইতে হয়। নম্বুরীগণ অন্তর্জনাকে ব্যভিচার স্বীকার করাইবার জন্য অসম্পূর্ণ আহার দিয়া বা ধনের প্রলোভন দেখাইয়া, বৎসর-ব্যাপী বিচার-বিড়ম্বনা, কুটুম্ব, রাজপ্রতিনিধি ও স্মার্ত্তবর্গের ভোজ্যান্নব্যয় প্রভৃতি হইতে রক্ষা পাইবার চেষ্টা করেন। নারী দোষ স্বীকার করিলে, এক জন নায়ার পুরুষ তাহার মুখাবরক ছত্র গ্রহণ ও উপস্থিত জনগণ করতালি প্রদান করে। পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের অপবিত্রতা অধিকতর ঘৃণ্য। তাহার কারণ কেবল পুরুষের প্রাধান্য নহে, নারীকে গর্ভধারণ করিতে হয়, তদুৎপন্ন সন্ততির উপর সমাজের হিতাহিত নির্ভর করে।

সন্তানের জীবনরক্ষার পক্ষে জনকের অপেক্ষা জননীর যত্ন অধিকতর আবশ্যক। তাই উদ্দাম স্ত্রী-স্বাধীনতার লীলাক্ষেত্র ইউরোপেও অনূঢ়া যুবতী একাকিনী ভ্রমণ করিতে অনুজ্ঞাত হন না, এবং পরিচ্ছদ সম্বন্ধেও তাঁহাদিগের স্বানুবর্ত্তিতা চলে না। রমণীর সতীত্ব রক্ষার জন্য কঠোর বিধি না থাকিলে, মলয়ারে ব্রাহ্মণের পক্ষে পুত্রপর্য্যায়ে বংশপ্রণালী কদাচ রক্ষা পাইত না।

এই স্বেচ্ছাচারিতার দেশেও বিবাহকে “কল্যাণম্‌” কহে। বর হস্তে সূত্র বন্ধন করিয়া বংশদণ্ড পরিগ্রহপূর্ব্বক দেহরক্ষক সমভিব্যাহারে পাত্রীর বাটীতে উপস্থিত হন। দ্বারদেশে বৃষলী ব্রাহ্মণীর বেশে বরকে স্বাগত-সম্ভাষণ ও আরতি করিয়া, অষ্টবিধ বশীকরণ ক্রিয়া সম্পাদন করেন। বরকন্যার আহার হইলে, পাত্র বংশদণ্ড পুনর্গ্রহণ করেন, এবং পাত্রী দর্পণ ও তীর হস্তে লন। অতঃপর কন্যার পিতা বরের পাদপ্রক্ষালন করেন। অবরোধ প্রথার কঠোরতা বশতঃ নম্বুরীদিগের মধ্যে কন্যার মাতা বরের সম্মুখীন হইতে পারেন না। কাজেই কোন নায়ার-রমণী কন্যার মাতার প্রতিনিধিরূপে বরকে পুনরায় আরতি করেন। বর সভায় উপনীত হইলে, কন্যা তাঁহার পদে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া

গলদেশে মাল্য সমর্পণ করেন। তার পর শুভদৃষ্টি। মহিলাগণ যবনিকার অন্তরাল হইতে উলুধ্বনি করিতে থাকেন। কন্যার পিতা দুহিতার হস্ত যৌতুক সহ বরের করে সমর্পণ করেন। বরকন্যা সপ্তপদ গমনানন্তর উপবিষ্ট হইলে, হবন করিতে হয়। সেই দিবসেই কন্যাকে শ্বশুরগৃহে যাইতে হয়।

চতুর্থ দিবসে একটি কক্ষে পীতবস্ত্রোপরি ধান্যের স্তূপ করিয়া পান সুপারী রাখা হয়। অপর পার্শ্বে মছলন্দ মাদুরের ন্যায় শয্যা বিস্তৃত থাকে। তাহার চতুষ্পার্শ্বে ধান্যের আলি দেওয়া হয়। নব দম্পতি সেই শয্যা গ্রহণ করিলে পুরোহিত বহির্দ্দেশে গর্ভাধানের মন্ত্র পাঠ করিতে থাকেন। পঞ্চম দিনে বর বাহুস্থিত মঙ্গলসূত্র ও বংশদণ্ড পরিত্যাগ করিলে, অনুষ্ঠান পরিসমাপ্ত হয়। পয়মুর-গ্রামবাসী নম্বুরীদিগের কুলে ভাগিনেয়-গত উত্তরাধিকারপ্রথা বর্ত্তমান আছে বলিয়া, নম্বুরী সম্প্রদায় ঐ বংশীয়া কন্যার পাণিগ্রহণ করিলে পতিত হইয়া থাকেন।

ঋগ্বেদীয় ব্রাহ্মণের উদ্বাহসংস্কারকালে স্ত্রী-আচারের সময় জায়াপতির কোন সরোবরে গমন করিয়া বস্ত্রাঞ্চলে মৎস্য ধৃত করিবার প্রথা আছে। তদ্দর্শনে পাশ্চাত্যগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, পরশুরাম ধীবরের হস্তস্থিত জাল গ্রহণ করিয়া সূত্রনিষ্কাশনান্তে তদীয় স্কন্ধে আরোপ করিয়া, উপনিবেশী ব্রাহ্মণের সংখ্যা বর্দ্ধিত করিয়া গিয়াছেন। কথিত আছে, নাগ দেবতার উপদ্রবে উপনিবেশী দ্রাবিড় ব্রাহ্মণগণ একবার প্রত্যাবৃত্ত হইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। আমি শ্রীরঙ্গমে অগ্রশিখাধারী ব্রাহ্মণ দর্শন করিয়াছি; বোধ করি, তাঁহারা প্রত্যাবৃত্তদিগের বংশধর হইবেন। অনেক সদাচারী হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণের নিকট শুনিয়াছি যে, এক রাজা প্রতিযোগিতাপরবশ হইয়া লক্ষ ব্রাহ্মণ আমন্ত্রণ করিতে বাধ্য হন। সন্নিকটে তৎপরিমিত ব্যক্তি দুষ্প্রাপ্য হওয়ায় অন্বেষণকারিগণ ক্ষেত্র

মঞ্চোপরি সমাসীন অপর বহু ব্যক্তিকে আহ্বান করিয়া লইয়া যান। নরপতি তাহাদিগকে ব্রাহ্মণবৎ সমাদর করিলেন। ইহাতেই তরুয়ী পাঁড়ে ও মচিয়া পাঁড়ে প্রভৃতি ব্রাহ্মণের উৎপত্তি হয়। তৎ-শ্রবণে তীর্থজীবী সাদৃশ্য দিলেন, উৎকলবাসী হলচালন-নিরত পনিয়ার ব্রাহ্মণ তদ্বৎ। ব্রহ্মস্থাপন হেতু অদ্যাপি পূর্ব্ববাঙ্গলায় নৌকাযোগে আগমন করায় "ভরার মেয়ে" নামে খ্যাত কন্যার পাণিগ্রহণের রীতি আছে। "ভাদ্র মাসে যে চর্ম্ম শুষ্ক হইতে চারি দিন অতিবাহিত হয়, শ্রাবণে তাহা তিন দিনে শুকায়,"—এই উক্তি শ্রবণ করিয়া ননন্দার সন্দেহ হয়, তবে কি বধূ চর্ম্মকারদুহিতা? ভট্টনারায়ণের পুত্রের নাম বারেন্দ্র মতে আদিগাই ওঝা। ওঝা উপাধি দৃষ্টে অনুমিত হইবে, তদীয় পিতা কান্যকুব্জ হইতে না আসিয়া মিথিলা হইতে আগমন করিয়া থাকিবেন। আদিশূর কর্ত্তৃক আহূত পঞ্চ ব্রাহ্মণকে বঙ্গীয় ব্রাহ্মণদিগের আদিপুরুষ স্বীকার করিলে, তদ্দ্বারা ৮২১ বৎসরে ব্রাহ্মণের বর্ত্তমান জনসংখ্যা পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা ছিল না। ধর্ম্মপাল কর্ত্তৃক নারায়ণভট্টকে প্রদত্ত দানপত্রে লিপিব্যবসায়ী জ্যেষ্ঠ কায়স্থের পদ উল্লিখিত হইয়াছে। অতএব, কনৌজ হইতে গৌড়ে পঞ্চ ব্রাহ্মণ ও সমভিব্যাহারী কায়স্থ ভৃত্যপঞ্চকের আগমন সম্বন্ধে কিম্বদন্তি ভ্রান্তিবিজৃম্ভিত, অথবা তদতিরিক্ত আদিপুরুষ স্বীকার্য্য।

কন্যাকুমারী হইতে গোনর্দ্দ (গোয়া) পর্য্যন্ত কেরল। তদনন্তর কঙ্কণ বেলাভূমির প্রারম্ভ। কেরলের ন্যায় কঙ্কণস্থ ব্রাহ্মণমণ্ডলী পরশুরাম কর্ত্তৃক স্থাপিত। উক্তবংশে পেশোয়া জন্ম গ্রহণ করায় চিতপাবনগণ মহারাষ্ট্রীয় সমাজে ধন্য হইয়াছেন। ত্রিপুণীথুরীতে আমরা যে অযাচিত বন্ধু প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, তিনি কহেন, আমি তোমাদিগকে পূর্ণত্রয়ীশের সম্মুখীন করিতে অক্ষম। আমি কঙ্কণস্থ ব্রাহ্মণ; সুতরাং এতদ্দেশে ব্রাহ্মণ-রূপে গণ্য হইতে পারি না।

পূর্ব্বকালে এখানকার পোলিয়ার এবং চেরুমার জাতি ক্রীতদাসরূপে ব্যবহৃত হইত। পুরুষের মূল্য ১৪৲ টাকা ও স্ত্রীর মূল্য ৭৲ টাকা ছিল। ক্রীতদাসের সন্ততি প্রভুর সম্পত্তি মধ্যে গণ্য হইত। অন্যের দাস দাসী আবশ্যক হইলে, প্রভুরা তাহাদিগকে ভাড়া দিতেন। কিন্তু ইউরোপীয় ধর্ম্মপ্রচারকগণের প্রসাদে দাস মতান্তরে দীক্ষিত হইলে, স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইয়া, বেতন পাইবার অধিকারী হইত। অদ্যাপি ব্রাহ্মণ মানবলীলা সংবরণ করিলে, নিকটস্থ শূদ্রদিগকে সংবাদ দেওয়া হয়। তাঁহারা উপস্থিত হইয়া উদ্যানস্থ আম্রবৃক্ষ ছেদন করিয়া বাটীর দক্ষিণভাগে চিতা সজ্জিত করিয়া আপনাদের আদরশীলতা রক্ষা করেন।

থিয়ার জাতি সাগু, নারিকেল ও তাল বৃক্ষের রস সংগ্রহ ও তাহা হইতে খণ্ড-শর্করা প্রস্তুত করিয়া জীবিকার্জ্জন করিয়া থাকে। অধুনা তাহারা দেশস্থিতি-রীতি প্রকরণে অভিজ্ঞ হইয়া উঠিতেছে। পাঁচ লক্ষ থিয়ারের মধ্যে দশজন মাত্র ইংরাজী ভাষায় শিক্ষালাভ করিয়াছে। সে কয়জনের অদ্যাপি রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইবার সময় উপস্থিত হয় নাই। কোন ভদ্রলোক তাহাদিগের সংস্পর্শে থাকিতে ইচ্ছা করেন না। কিন্তু থিয়ার পণ্ডিত যদি খৃষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া, খৃষ্টানোচিত নামে অভিহিত হয়, তবে তাহার রাজকর্ম্ম পাইবার বাধা হয় না। ইতর জাতীয় ব্যক্তি মুসলমান কিংবা খৃষ্টান হইলে, তাহার নিকৃষ্ট ভাব অপনোদিত হয়। যে অন্ত্যজের ছায়ার দশ হস্ত ব্যবধানের মধ্যে পদক্ষেপ করিলে, ব্রাহ্মণাদি উচ্চ বর্ণ অশুচি হন, তখন তিনি সেই অন্ত্যজকে অভিবাদন করিতেও কুণ্ঠিত হন না। বোধ হয়, এই কারণে দক্ষিণভারতে অষ্টত্রিংশবৎসর-ব্যাপী কালে নয় লক্ষ লোক খৃষ্টান হইয়াছে।

থিয়ারগণ সিংহল বা ভারত-মহাসাগরস্থ অপর কোন দ্বীপ হইতে এখানে আগমন করিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে। কথিত আছে,

উহারাই প্রথমে এ দেশে নারিকেল তরু আনয়ন করে। সুতরাং তাহাদের দ্বারা, সাগরের বিপরীত স্রোতোবাহিনী তরণীতে মালয় (Malay) দ্বীপের আচরণ, এই মলয় প্রদেশে আনয়ন করা অসম্ভব নহে।

সুমাত্রা দ্বীপে 'স-মন্দেই' অর্থে মাতৃত্ব, ও কেরলে "সম্বন্ধকারী" শব্দে পত্নীত্ব বুঝায়। উভয় শব্দের মধ্যে সাদৃশ্য কল্পনা করিলে, বোধ হয় ক্ষতি নাই। সুমাত্রায় (মালয়ে) গৃহস্থালীতে কেবল স-মন্দেইগণ বসতি করেন। সে দেশেও পুত্র, কন্যা ও কন্যার সন্ততি লইয়া পরিবার গঠিত হয়। পতি আপনার স্বতন্ত্র ভবনে বাস করেন। তিনি মধ্যে মধ্যে সন্তানগণকে দেখিতে আসেন ও পত্নীর কৃষিক্ষেত্রে কার্য্য করিয়া থাকেন। তাঁহার ভ্রাতা, ভগিনী বা ভগিনীর সন্তানেরাই উত্তরাধিকারী হইয়া থাকে, আপন সন্তানেরা কিছু পায় না। ভার্য্যার সহোদর ভাগিনেয়ের ভরণপোষণের ভার লয়, মাতামহী সর্ব্বোপরি কর্ত্তৃত্ব করেন। এই পদ্ধতি কেরলের 'তারয়াদের' "মরুমকতায়ম্" প্রণালীর অনুরূপ সন্দেহ নাই। বোধ হয়, আদিমকালে অনেক স্থলে বিবাহের প্রয়োজনীয়তা বিদ্যমান না থাকায়, প্রথমতঃ নারীপর্য্যায় বংশ-প্রণালী প্রচলিত হইয়াছিল। কালক্রমে বিবাহপদ্ধতি স্থাপিত হইলে, পুরুষপর্য্যায় আবদ্ধ হইয়াছে। সুমাত্রা দ্বীপের অধিবাসীরা ইদানীং নারীপর্য্যায় রহিত করিবার সঙ্কল্পে কন্যা ক্রয় করিয়া বিবাহ করে; তাহাতে পতিগৃহ-বাসিনীর পুত্রসন্তানপরম্পরায় উত্তরাধিকারিত্ব বর্ত্তে। আমেরিকার ক্যালিফর্ণিয়া সীমান্তে অদ্যাপি আদিম অধিবাসীদিগের জাতিবিশেষে স্বামী ভার্য্যার পিত্রালয়ে যাইয়া বাস করে; নিতান্ত যোত্রহীন না হইলে, প্রণয়িনী নায়ককে প্রত্যাখাত করেন না। এরূপ অবস্থায় উত্তরাধিকার নারী পরম্পরাগত থাকিবে, ইহা বলা বাহুল্য। অষ্ট্রেলিয়ার অন্তর্গত কুইন্সল্যাণ্ড-বাসী কোন কোনও বন্যজাতি, যে রমণীর সহিত বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়,

তাহারই স্বজাতি হইয়া পড়ে। এইরূপে পুত্র বিজাতীয়ত্ব লাভ করিলে, উভয় জাতিতে যদি সংগ্রাম উপস্থিত হয়, তখন পিতা পুত্রের নিধন সাধন করিতেও পরাঙ্মুখ হয় না।

আর্য্যধর্ম্মের প্রাদুর্ভাবকালে যেমন অনার্য্য বংশ আর্য্যত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল, তেমনই মুসলমানদিগের অভ্যুদয় সময়ে, এক মৎস্যজীবী জাতির সমগ্র লোক ইস্লামধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিল। বহুপত্যাত্মক বিবাহপ্রথার ফলে এ দেশে বৈদেশিক খৃষ্টান ও মুসলমান পুরুষের সংস্রবে দেশীয় নীচ-কুলোদ্ভূতা নারীর গর্ভে নাজারা ও মুপ্পালা জাতির উৎপত্তি হইয়াছে। এতদ্দেশীয় মুসলমানগণ জোনমুপ্পা ও খৃষ্টানেরা নসরাণীমুপ্পা নামে বিখ্যাত। পোর্ত্তুগীজদিগের আগমনের পূর্ব্বে সিরীয় খৃষ্টানেরা হিন্দু আচার পালন করিত। তাহারা গোমাংসভক্ষণেও বিরত ছিল; এজন্য এ দেশে উহারা পঞ্চম বর্ণ বলিয়া পরিগণিত হইত। এক্ষণে বৈদেশিক আচারের প্রতি অধিক অনুরক্ত হওয়ায় তাহাদিগের সে সুযোগ অন্তর্হিত হইয়াছে।

এ দেশে খৃষ্টানেরা পণ্যজীবী। ত্রিচুরে কেহ রবিবাসরে গতাসু হইলে, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য সে দিন বস্ত্র ক্রয় করা অসম্ভব হয়। খৃষ্টান ও মুসলমান উভয় শ্রেণীর মোপ্‌লাই কৃষিকার্য্যনিরত। ইহাদিগের মধ্যে ভাগিনেয় দায়াদমধ্যে গণ্য। উত্তর-মলয়ার নিবাসী মোপ্‌লারা মুসলমান প্রথানুযায়ী উত্তরাধিকারিত্ব প্রাপ্ত হয়। মুসলমানের অত্যাচারে কোন কোন স্থানের বসতি উৎসাদিত হইয়া বনে পরিণত হইয়াছে। মুপ্‌লাগণ অতীব হঠকারী। যেমন পঞ্জাবে মুসলমান ধর্ম্ম হইতে শিখমতের উৎপত্তি হইয়াছে, বঙ্গে খৃষ্টধর্ম্ম হইতে যে প্রকারে ব্রাহ্মমতের প্রাদুর্ভাব হইতেছে, তদনুসারে বৈদেশিক ধর্ম্ম দক্ষিণাপথে সাধারণ দেশীয় ব্যবহারের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। দেশ বিজাতীয়ের সম্পূর্ণ আয়ত্ত না হইলে, পরের হৃদয়কে আপন হৃদয় করিতে পারা যায় না।

গান্ধার এক্ষণে আর আর্য্যদেশ নহে; সেইরূপ কেরলও আর অনার্য্যভূমি নহে। হিন্দুস্থানের পরিসর আর্য্যাবর্ত্তে হ্রস্ব হইয়া দাক্ষিণাত্যে বর্দ্ধিত হইয়াছে। সেইরূপ, হিন্দুধর্ম্ম অনৈসর্গিকতা পরিহার করিয়া যাহাতে নৈসর্গিকতার দিকে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে পারে, তৎপক্ষে সহৃদয়গণের চেষ্টা সর্ব্বথা বাঞ্ছনীয়। যজ্ঞাদির প্রাবল্য ও সামাজিক বৈষম্যের বৃদ্ধিবশতঃ বৌদ্ধমতে আকৃষ্ট জন-সাধারণের বংশধরের পক্ষে উহার মূল তত্ত্ব দুর্ব্বোধ্য হইলে, ক্রমে তাঁহারা বিষম কদাচারী হইয়া উঠিলেন। তখন অধিকারিভেদে উপাসনার তারতম্য করিয়া ধর্ম্মকে নৈসর্গিকতার দিকে লইয়া যাওয়ার প্রয়োজন হয়। যাঁহারা সেই কার্য্য সাধন করিতে আসিয়াছিলেন, তন্মধ্যে শঙ্কর এখন বিশেষ পরিচিত।

কালাদিপল্লি।

শারীরক মীমাংসা।

ভারতের ঐতিহাসিক স্থানের মধ্যে, শঙ্করাচার্য্যের জন্মভূমি বলিয়া কেরলের কালাদিপল্লি বিশিষ্টস্থান অধিকার করিয়াছে। বেদান্ত দর্শনের ভাষ্য, এ স্থলে বিরচিত না হইলেও, যে শরীর শারীরক প্রকাশ দ্বারা দিগ্দেশ উজ্জ্বল করিয়াছে, এখানকার বাতাবরণে তাহার বীজ অঙ্কুরিত হইয়াছিল। ভ্রমণ-কাহিনীতে, শান্তিপথের আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। জগতে, কোন সময়, প্রবৃত্তিমার্গের পথিককেও নিবৃত্তিমার্গ অবলম্বন করিতে হয়। শঙ্কর, উক্ত উভয় শ্রেণীর লোকের জন্যই শ্রম স্বীকার করিয়াছেন।

যিনি নিবৃত্তিপথে প্রবেশ করিবার জন্য উৎসুক, তাঁহার নিত্যানিত্য বস্তু বোধ, ইহকাল ও পরকালে সুখ-দুঃখরূপ ফলভোগে বিরাগ, শমদমাদি-সম্পন্ন হওয়া ও মুমুক্ষুত্ব থাকা আবশ্যক (১)। যাঁহার এই সকল গুণ নাই, তিনি আত্মস্বরূপ ব্রহ্মসম্বন্ধে জিজ্ঞাসু হইবার অধিকারী নহেন। অদ্বয় ভাব তাঁহার আসিবে না।

আমি যে অনুভব করি, ইহাই চৈতন্য (২)। ব্রহ্মের চৈতন্য ও আমার চৈতন্যে ভেদ থাকিলেও, অহিকুণ্ডলবৎ মূলে এক। একতা বোধ যতক্ষণ না জন্মে, ততক্ষণ আমি পৃথক্। বস্তুগত্যা, জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্ম

---

(১) নিত্যানিত্যবস্তুবিবেকঃ, ইহামুত্র ফলভোগবিরাগঃ শমদমাদিসাধন-সম্পদ-মুমুক্ষুত্বঞ্চ। ব্রহ্মসূত্র শারীরকভাষ্য। ১ম অধ্যায়, ১ম পাদ, ১ম সূত্র।

(২) অস্মৎপ্রত্যয়-গোচরবিষয়িণি চিদাত্মকে। ভাষ্যভূমিকা।

এবং আমি অভিন্ন। চৈতন্তের অর্থ, জ্ঞান। উভয়ত্র, চিদেক-রস বিদ্যমান। সর্প হইতে কুণ্ডলী পৃথক্ নহে। তাহা উভয়ই বটে। চৈতন্য, ব্রহ্মভাবে ব্রহ্ম। উহাই আবার জীবভাবে জীব। অগ্নি ও অগ্নিকণার মত, পরমাত্মা হইতে আত্মার ভেদ নাই।

জগৎকে জড় বোধ হইতেছে,—আমারও ক্ষমতা যৎসামান্য। ব্রহ্ম ও জীব,—অপিচ, জগৎপর্য্যন্ত, আমি কেমন করিয়া এক চৈতন্য স্বরূপ ভাবিতে পারি। এ বিষয়ে শঙ্কর বলেন, যখন দ্বৈত থাকে, তখনই দ্রষ্টা ও দৃশ্য থাকে অর্থাৎ একে অপরকে দেখে; যৎকালে এ সকল আত্মভূত হয়,—আত্মা বলিয়া বোধ হয়,—তখন কে কাহাকে কি দিয়া দেখিবে (১)? তৎকালে, জড়ের জড়ত্ব ও জীবের ক্ষমতার স্বল্পতা জ্ঞান হইবে না। এবম্প্রকারের অবস্থা লাভ করা, নিত্যানিত্য বস্তু-বোধ-সাপেক্ষ। জড়ের দ্বারা সৃষ্টি হইবার নহে। তাহা, আলোচনাপূর্ব্বকই অভিহিত হইতে পারে। অচেতন, জগৎ-কারণ হইতে পারে না (২)।

ব্যবহারিক অস্তিত্ব থাকিলেও, জাগতিক সত্তার পারমার্থিক অস্তিত্ব থাকিতে পারে না। দুগ্ধ বা জল হইতে, দধি বা হিমানী পৃথক্ নহে। ব্রহ্ম, আমি কিংবা চৈতন্য (পাশ্চাত্য মতে, অবস্থা-ভেদে আমার ভিন্ন ভিন্ন বোধ) রূপান্তরিত হইয়া, জগৎ হইয়াছে। এ স্থলে, পরবর্ত্তী বৈদান্তিকেরা বলেন,—জগৎকে যে ভিন্ন বোধ হয়, তাহা মায়া,—ভ্রান্তির কার্য্য। আমাকে যে আবার আমা হইতে পৃথক্ দেখিয়া থাকি, তাহা অবিদ্যা,

(১) যত্র দ্বৈতমেব ভবতি, তদিতর ইতরং পশ্যতি।
যত্র ত্বস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ, তৎ কেন কং পশ্যতি।
ভাষ্য, ১ম অঃ, ১ম পা, ১ম সূ।

(২) ঈক্ষতের্নাশব্দম্। ১ম অঃ, ১ম পা, ৫ম সূ।
নাচেতনং জগৎ কারণত্বমীক্ষতীত্যশ্রবণাদিতি। ভাষ্য।

—অজ্ঞান। শারীরকে মায়াবাদ নাই। ব্রহ্ম হইতে বিশ্ব উৎপন্ন হইয়াছে। জ্ঞানে ভাসে, অথচ নাই, এমন হইতে পারে না; জগৎ ভ্রান্তি নহে। অনিত্য, বলিতে পার।

পাশ্চাত্য চৈতন্যবাদে,—আমি স্বতঃসিদ্ধ। জগৎ আমা সাপেক্ষ। আমি কতকগুলি সঙ্কেত,—রূপ, রস, গন্ধ স্পর্শাদি দ্বারা তাহা অনুভব করি। অনুভূতি, আমার অংশ,—স্বপ্নের মত। বাহ্য জগৎ কাল্পনিক। প্রকৃত অস্তিত্বের অভাবেও, স্বপ্নাবস্থায় কখন কখন অনুভূতি হয়। বিশ্ব, কতকগুলি অনুভূতির সমষ্টি। যাহাকে আত্মা কহে, উহাই অন্তর্জ্জগৎ; তাহাও ঐ প্রকার কতকগুলি অনুভূতির একীকরণ। বৌদ্ধের বিজ্ঞান-বাদ, প্রায় এই প্রকারের। বিজ্ঞানের অর্থ, চৈতন্য। আমার বাহিরে, দেশ ও কাল, আমারই কল্পনা। আমি তন্মধ্যে জগৎকে প্রক্ষিপ্ত করিয়া থাকি। প্রকৃতপক্ষে উহা কিছুই নহে।

সমাধি, ইত্যাদি সাধনা, দ্বৈতভাবেই অনুষ্ঠেয়। আত্মার পৃথক্ ভাব না থাকিলে, কে সমাধি করিবে? জ্ঞানের বিকাশ হইলে, দ্বৈত যাইবে। তখন, সাধনা করিতে হইবে না। ব্রহ্ম ও আমি যখন অভিন্ন, তখন কাহার উপাসনা করিব? কেহ তীব্রভাবে চিন্তা করিবার সময় তন্ময় হইয়া যান, ইহা সকলেই জানেন। তৎকালে, সে ব্যক্তি অভীষ্ট বিষয়ে এমনি নিমগ্ন হইয়া যায়, যেন তাহা উহার সম্মুখে উপস্থিত। এইরূপে, অনেকে দেবদর্শন পাইয়া থাকেন। উক্ত প্রকারে যাঁহার বেদান্ত প্রতি-পাদ্য ব্রহ্মজ্ঞান হইয়াছে, তিনিই ব্রহ্মস্বরূপ হন। তিনি ব্রহ্মে তন্ময় হওয়ায়, জগৎ দেখিতে পান না। তখন নিজের সত্তাও উপলব্ধ হইতে পারে না।

আত্মা ইন্দ্রিয়দিগকে গ্রহণ করিয়া, সুখ দুঃখ অনুভব করে। নির্ব্যাপার হইলে, সুখদুঃখাদির অনুভূতি থাকে না। তক্ষা, কার্য্য করিয়া ক্লান্ত হয়; পরন্তু কার্য্য না করিলে, সুখ-দুঃখ কিছুই উৎপন্ন হইত না।

আপনাকে নিজের চৈতন্য মাত্রে পর্য্যবসিত করিয়া, স্বীয়রূপে, নিধর্ম্ম অবস্থায়, উপস্থিত করিতে হইবে। শ্রুতিতে আছে, (১) মুক্তি প্রাপ্ত আত্মা, স্বীয়রূপে অভিনিষ্পন্ন হন। তজ্জন্য, মহর্ষি ব্যাস কহিতেছেন, (২) আত্মা তখন সর্ব্বপ্রকার বিশেষ-সংসার-বন্ধন-বিহীন, অদ্বয়রূপে অভিনিষ্পন্ন হয়। শঙ্কর লিখিয়াছেন, যাহা আপনার, কেবল বিশুদ্ধ অনারোপিত রূপ, তৎকালে তাহারই আবির্ভাব হয়; অন্য কিছু আইসে না (৩)। ইহাই মোক্ষ। মুক্তিপ্রাপ্ত জীব, শুদ্ধ চৈতন্যমাত্র। তাহাতে কোন প্রকারের ইন্দ্রিয়-বিকার,—সুখ, দুঃখ, আকাঙ্ক্ষা ইত্যাদি, থাকে না। মুক্তাবস্থা হইলে অদ্বৈতভাব স্বতঃ উপস্থিত হইবে। মুক্ত হইলে, আত্মা ও পরমাত্মা একীভূত হয়। জগৎ যখন ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন, তখন উহাও পরমাত্মা হইতে পৃথক্ নহে। এ অবস্থায়, আমি বলিতে পারি—"সোঽহম্"।

এতাবতা, অদ্বৈত ত্রিবিধভাবে দর্শন করা হইল। প্রথম,—জগৎ, জীব ও ব্রহ্মে, অভেদে একই চৈতন্য বিদ্যমান রহিয়াছেন। দ্বিতীয়,—ব্রহ্মে তন্ময় হইয়া যাওয়া। তৃতীয়,—আপনাকে নিধর্ম্ম অবস্থায় উপস্থিত করা। দ্বৈতভাবই আমাদের স্বাভাবিক। সাধনাদ্বারা জ্ঞান লাভ করিতে হয়। চৈতন্যবাদ, সম্পূর্ণ বোধগম্য নহে। মুক্তিবাদ, স্পষ্ট। কার্য্যমাত্রেরই কারণ অবশ্যই আছে। দর্শন-শাস্ত্রকারের এই সংস্কার এবং নির্ভরের কোন সামগ্রী দেখাইয়া দেওয়া আবশ্যক বোধে, ব্রহ্ম-মীমাংসা আবশ্যক হইল। বেদান্তের ব্রহ্ম কিরূপ, সে কথা পরে বলিব। সৃষ্টিকে অনাদি বলা

(১) স্বেন রূপেণ অভিনিষ্পদ্যতে।

(২) সম্পদ্যাবির্ভাবঃ স্বেন শব্দাৎ। ৪র্থ অঃ ৪র্থ পাঃ ১ম সূ।

(৩) কেবলেনৈবাত্মরূপে, নাভিনিষ্পদ্যতে, নাগন্তুকে, নাপররূপে নাপীতি।

ভাষ্য, ৪র্থ অঃ ৪র্থ পাঃ ১ম সূ

হয়, তথাপি, উক্ত কার্য্যের কারণ নির্দ্দেশ আবশ্যক হইয়াছে। পাশ্চাত্য মতে, জগৎ ব্যতীত ঈশ্বর-কল্পনা অনাবশ্যক,—জগৎ জ্ঞানের মূর্ত্তিভেদ।

জাগতিক ব্যাপার অনিত্য; নিত্যানিত্য-বস্তুবিবেকে ইহা বোধ হইলে, বাসনা যাইবে; তখন আর হর্ষ, বিষাদ উপস্থিত হইবে না—মুক্তির পথ পরিষ্কৃত দেখিবে। শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন, একবার করিলে,—যদি তত্ত্বজ্ঞান না হয়, তবে পুনঃপুনঃ ঐগুলি অনুষ্ঠেয়। আসন করিয়া, ধ্যান কালে, অচল হইবার জন্য যাহাতে একাগ্রতা জন্মে, এই ভাবে উপবেশন করিতে হয়। সময় বা দিগ্‌বিশেষের প্রতি লক্ষ্য করা অনাবশ্যক।

ধ্যানের বিষয়,—মনের স্থৈর্য্য, ঔদাসীন্য, অনাসক্তি বা বৈরাগ্য। ধ্যানে সিদ্ধিলাভ করিলে কেবল সত্তা-চেতনা, আনন্দমাত্র অনুভূত হইতে থাকিবে। উহাই ব্রহ্মানুভব। তজ্জন্য ব্রহ্মকে সচ্চিদানন্দ বলে। আমি আছি, অতএব আমি সৎ; ইহা বোধ করিতে পারিতেছি, একারণ চিৎ; আপনাকে কে না প্রীতি করে, আমাতে অবশ্যই আনন্দ আছে; অতএব আমিও সচ্চিদানন্দ। এই ধ্যানে যিনি অসমর্থ, তাঁহার মনের একাগ্রতা সম্পাদনার্থ, সগুণ চিন্তা বিধেয়। কিঞ্চিৎ সামর্থ্য জন্মিলে তিনি বলিয়া উঠিবেন, ভগবন্! আমি যে অপরাধ করিলাম (১)।

বৌদ্ধের ধ্যান, শূন্যতা মাত্র। উহার অর্থ,—অবলম্বন শূন্যতা, অনাসক্তি। সনাতন মতেও ঐ প্রকার ধ্যান দৃষ্ট হইয়া থাকে (২)।

---

(১) রূপং রূপবিবর্জ্জিতস্য ভবতো ধ্যানেন যদ্‌বর্ণিতং,
স্তুত্যাऽনির্ব্বচনীয়তাऽখিলগুরোর্দূরীকৃতা যন্ময়া।
ব্যাপিত্বঞ্চ বিনাশিতং ভগবতো যত্তীর্থযাত্রাদিনা,
ক্ষন্তব্যং জগদীশ তদ্‌বিকলতা দোষত্রয়ং মৎকৃতম্।

(২) খ-মধ্যে কুরু চাত্মানং আত্মমধ্যে চ খং কুরু।
আত্মানং খময়ং কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ। শ্রীভাগবত।

জ্ঞানীর কোন সৎকর্ম্ম করিবার প্রয়োজন নাই। কর্ম্মের বিনা সহায়তায়, পুরুষার্থ—মোক্ষ সিদ্ধ হয়। স্বীয়রূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়া যখন বাঞ্ছনীয়, তখন কর্ম্ম করিতে গিয়া আত্মার বিকার উৎপাদন করা অবৈধ। তত্ত্বজ্ঞানীর, যে পর্য্যন্ত অবশ্য কর্ত্তব্য কার্য্যের অধিকার সমাপ্ত না হয়, ততদিন তিনি জীবন্মুক্ত ভাবে, অনাসক্ত হইয়া সে কার্য্য সম্পাদন করিবার জন্য অবস্থান করিবেন। প্রবৃত্তি পথে, এই অবস্থা জীবন্মৃতের সদৃশ বোধ হইবে, সন্দেহ নাই। মানুষের এমন সময় আসে, যৎকালে ইহা পরম উপকারী হইয়া থাকে। আত্ম-জ্ঞান হইলে, সর্ব্বপাপ নষ্ট হয়, এবং পরে যে পাপ হইবে, তাহাতেও তাঁহাকে লিপ্ত হইতে হয় না। জ্ঞানী, কখন পাপাচরণ করিতে পারেন না। ভবিষ্যৎ পাপের অর্থ,—অজ্ঞতা-জনিত আচরণ বুঝিতে হইবে। তাঁহাকে শম, দম, উপরতি ও তিতিক্ষা অভ্যাস দ্বারা সমাধান করিতে হয়। সমাধান ও সমাধি একার্থক। অগ্রে সবীজ (সবিকল্প) তদনন্তর নির্বীজ (নির্ব্বিকল্প) সমাধি হইয়া থাকে। বৌদ্ধমতে, মনের মধ্যে মনকে স্থাপন করাই সমাধি। উহা সোপানত্রয় অবলম্বনে অনুষ্ঠেয়। অগ্রে আপনাকে শূন্যভাবাপন্ন করিতে হয়। তাহা হইলে, স্বয়ং কোন বিষয়ের আর কারণ হইতে হইবে না; তখন সে সম্পূর্ণ উদ্দেশ্য বিহীন হইয়া যাইবে। দুর্ব্বল অধিকারী প্রথমে প্রণব অবলম্বন করিয়া উপাসনা করিবেন।

পাতঞ্জল ও বেদান্তের মুক্তাবস্থা, একই প্রকারের। বেদান্ত যেখানে "স্বেন রূপেণ অভিনিষ্পদ্যতে" বলিয়াছেন, পতঞ্জলি তথায় 'স্বরূপে প্রতিষ্ঠা বা চিতিশক্তিরিতি" কহেন। চিত্তশক্তি, আপন স্বরূপে স্থায়ী ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইলেই, কৈবল্য হয়। মনকে অবলম্বন শূন্য করিতে পারিলে, নির্ব্বিষয় চৈতন্যমাত্র অবশিষ্ট থাকে। ইহাই মনের স্বরূপ,—স্বাভাবিক আকার।

পাতঞ্জলে, যম নিয়মাদি যোগের অষ্টবিধ অঙ্গ উল্লিখিত হইয়াছে। বেদান্তে,—জ্ঞান সাধনের অঙ্গ, নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক প্রভৃতি চতুর্ব্বিধ। আসন ও ধ্যান, ইহাতেও আবশ্যক। তদ্ভিন্ন শ্রবণ মননাদি করিতে হয়। প্রাণায়াম করিবার প্রয়োজন নাই। উভয় দর্শনের সাধনা, অন্তঃপ্রকৃতি লইয়া। কুসংস্কার বা সুসংস্কার জ্ঞানের অবস্থা-সাপেক্ষ। ইহার কোনটি প্রকৃত নহে। অনাসক্তের পাপ পুণ্য নাই,—যোগশাস্ত্রেরও ঐ মত। দার্শনিক বিষয়ে, পাতঞ্জল অপেক্ষা বেদান্ত জটিল। ইহাতে বৈরাগ্য আনয়ন করে।

ব্রহ্মসূত্রে জড়বাদ খণ্ডিত হইয়াছে। পরমাণুর রূপাদি স্বীকার করাতে, তাহার নিত্যত্ব বিদূরিত হয়। রূপাদিবিশিষ্টের স্থূলতা ও অনিত্যতা দৃষ্ট হইয়া থাকে। বেদান্তে ব্রহ্মকে আকাশের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। মুণ্ডক উপনিষদে আছে,—যাহা অদৃশ্য, তাহা অগ্রাহ্য। সূত্রকার বলেন,—ব্রহ্ম অদৃশ্যত্বাদিগুণযুক্ত,—তিনি অব্যক্ত, ইন্দ্রিয়ের অগম্য। যৎস্বরূপে, অন্য দর্শন নাই,—শ্রবণ নাই,—বিজ্ঞান নাই,—কোন প্রকারের ভেদ ব্যবহারের উপযোগিতা নাই, সেই স্বরূপই ভূমা,—ব্রহ্ম (১)। ব্যাস বা শঙ্কর কেমন করিয়া সুগতের বাহ্যার্থবাদ এবং বিজ্ঞানবাদ খণ্ডন করিয়াছেন, বুঝিতে পারিলাম না। শূন্যবাদ কিছুই নহে বলিয়া, ইহাকে ত্যাগ করা হইয়াছে, অথচ, দেখা যাইতেছে, অদ্বৈত-বাদ প্রকারান্তরে তাহা খণ্ডন না করিয়া মণ্ডন করিয়াছে। বৌদ্ধের বিজ্ঞান ক্ষণিক। বৈদান্তিকেরা চৈতন্য বা জ্ঞানকে স্থায়ী কহেন। ইহা, অবান্তর ভেদ মাত্র। শঙ্করের প্রতিভা বৌদ্ধের মতকে ভিন্ন পথে চালিত করিয়াছে। তর্ককালে,—এস্থলে, শঙ্কর ব্যবহারিক ভাবে দ্বৈতবাদী হইয়া-

(১) যত্র নান্যৎ পশ্যতি, নান্যচ্ছৃণোতি, নান্যৎ বিজানাতি, স ভূমা।

১ম অঃ ১ম পা ১১শ সূ, ভাষ্য।

ছেন। যিনি বৌদ্ধ প্রভাবকালে জ্ঞানোপার্জ্জন করিয়াছেন, সেই ভাব যে তাঁহাকে অজ্ঞাতসারে আচ্ছন্ন করিবে, ইহা অসম্ভব নহে।

জড়বাদেও একপ্রকার অদ্বৈত আছে। জড় ও চেতন বিভিন্ন দেখায়; কিন্তু মূল অনুসন্ধান করিলে, একটি ব্যতীত অন্যটির অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ হইবে না,—বিশিষ্টাদ্বৈত বোধ জন্মিবে। সদ্‌বস্তু সম্বন্ধে সাঙ্খ্যের মতে, প্রকৃতির স্বভাব অব্যক্ত—অজ্ঞেয়। ইহার অধিক বলায়, কেবল আপন বিশ্বাসের পরিচয় দেওয়া হয় মাত্র। মুমুক্ষু বলিবেন, যাহা থাকে থাকুক, আমার সে চিন্তা অনাবশ্যক। আমার কেবল নিধর্ম্ম অবস্থার প্রতি দৃষ্টি থাকিবে। সাধনার উচ্চাবস্থা আসিলে, সংজ্ঞাবেদিত নিরোধ হইয়া থাকে। উহাই উপাধিশেষ, জীবন্মুক্তি।

যিনি মুক্তি ইচ্ছা করেন, তাঁহার পক্ষে সন্ন্যাস গ্রহণ সঙ্গত। গৃহে থাকিয়া যদি কেহ আসক্তিবিহীন হইতে পারেন, উত্তম। পুরাণে সন্ন্যাসের নিষেধ থাকিলেও, আচার্য্য তাহা গ্রাহ্য করেন নাই। সংসার-যন্ত্রণা ভুলিবার জন্য, নিবৃত্তি ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। অনেকে বলেন,—অগ্রে কর্ম্ম কর; চিত্তশুদ্ধি জন্মিলে ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী হইবে। উহা অস্বীকৃত হইয়াছে। ধর্ম্মজনক অনুষ্ঠানের পর ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা করিবেক, এরূপ বলা যাইতে পারে না। ধর্ম্মবোধের পূর্ব্বেও, বেদান্ত মত জ্ঞাত হইয়া অনেক লোককে ব্রহ্মজিজ্ঞাসু হইতে দেখা গিয়াছে। বৈরাগ্য উপস্থিত হইলেই ব্রহ্মজ্ঞান হইতে পারে। কর্ম্ম করিবার প্রয়োজন নাই (১)। কিন্তু ভাষ্যকার, স্থানান্তরে কর্ম্মের সমর্থন করিয়াছেন। অভক্ষ্য ভোজন, নিষিদ্ধ বলা হইয়াছে। অবশ্য, অধিকারিভেদে বিপরীত ব্যবস্থা হইতে

(১) নত্বিহ কর্ম্মাববোধানন্তর্য্যং বিশেষঃ ন ধর্ম্মজিজ্ঞাসায়াং প্রাগপ্যধীতবেদান্তস্য ব্রহ্মজিজ্ঞাসোপপত্তেঃ * * * নিঃশ্রেয়সফলন্তু ব্রহ্মজ্ঞানং ন চানুষ্ঠানান্তরাপেক্ষম্।

১ম অঃ ১ম পাঃ ১ম সূঃ, ভাষ্য।

পারে। ব্রহ্মচারীর ব্রতভঙ্গে প্রায়শ্চিত্ত বিধেয়। মৌন, জ্ঞানের সাহায্য করে; বিদ্বান্ সন্ন্যাসীর ইহা অবলম্বনীয়। রাগদ্বেষের ন্যায়, সকল বিষয়ে অভিনিবেশ ত্যাজ্য। বালকবৎ, ভাবশুদ্ধি রাখিবে, পরন্তু তাহার যথেচ্ছাচারিতা গ্রহণীয় নহে। দেহান্তে পুত্রগণ দায়, আত্মীয়েরা পুণ্য ও শত্রুগণ পাপ গ্রহণ করিয়া থাকে।

শঙ্কর, দার্শনিক ও পৌরাণিক উভয়বিধ সংস্কারাপন্ন ব্যক্তি ছিলেন। তিনি সনাতন মতের, প্রায় তাবৎ সংস্কারে বিশ্বাস করিতেন। আদিকর্ম্ম কোথা হইতে আসে, সে প্রশ্ন না করিয়া, তিনি কর্ম্মবাদ স্বীকার করিয়াছেন। জীবনের সীমা, সমাপ্ত করিতে কাহারও ইচ্ছা হয় না। জন্মান্তর পর্য্যন্ত থাকিতে, সকলেই উৎসুক। জ্ঞানী ইহা অনাবশ্যক বিবেচনা করেন, তজ্জন্য মুক্ত পুরুষের পুনর্জ্জন্ম নাই। তিনি জীবনের সীমাবৃদ্ধি করিতে অনিচ্ছুক। বেদান্তমতে, সগুণ উপাসকগণ ব্রহ্মলোকে যাইবেন। নির্গুণ উপাসকেরা মুক্তি পাইবেন। যিনি ব্রহ্মলোকে যান, তিনি প্রত্যাবৃত্ত হইয়া মোক্ষলাভ করিবেন। উপাসনায় ভিন্নতা আছে বলিয়া উহা বিভিন্ন বলিতে পারি না। ইহার প্রকার ভেদ থাকিতে পারে।

ব্যাস ও শঙ্করের মতে প্রভেদ কি, তাহা বুঝিলাম না; বৃত্তি নহিলে অধিকাংশ সূত্রের অর্থ হয় না। যোগসূত্র তেমন নহে। অক্ষরার্থ বহিষ্কৃত করিতে পারা যায়। ব্যাস লিখিলেন,—"কম্পনাৎ", প্রকরণগত কোন অর্থ না পাইয়া ভাষ্য করা হইল, এ অধিকরণের শ্রুতি এইরূপ আছে, অতএব অর্থ হইল। অন্বিক্ষিকীয় ন্যায়াবয়বের অনুকরণে, বেদান্তে অধিকরণ সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। নৈয়ায়িকেরা ইহাতে রহস্য বোধ করেন। সূত্র ও ভাষ্যের বিচার প্রণালী, অনেক স্থলে নিবন্ধ-স্মৃতির ন্যায়, শ্রুতি দেখাইয়া ক্ষান্ত। প্রয়োজনমতে উহা নির্ব্বাচন করা হইয়াছে। স্মৃতিও পুরাণকে আশ্রয় করিতে ত্রুটি হয় নাই। নহিলে লোকে মানিত না।

পরবর্ত্তী বৈদান্তিকগণ, চৈতন্যবাদ বিশদ ও বিস্তৃত করিয়াছেন সংসার-দাবানলে ক্লিষ্ট জীবের, মহোপকার সাধিত হইল। জগৎ—মিথ্যা কি লইয়া সাধারণে সন্তুষ্ট থাকিবে? উত্তর,—ব্রহ্ম। স্বরূপের ব্যব হারিক অর্থ,—পরব্রহ্মের রূপ; তাহাতেই অবস্থান কর। এই সৌন্দর্য্যে জন্য, বেদান্তদর্শন জনপ্রিয় হইয়াছে। অশিক্ষিত লোককেও মায়াবাদঘটিত ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা, জীবমাত্রেই ব্রহ্ম, বলিতে শুনা যায়। শঙ্করে অসাধারণ পাণ্ডিত্যই ইহার মূল।

সর্ব্বদা যে কার্য্য করা যায়, তাহাই অভ্যস্ত হইয়া উঠে। বাসন পরিত্যাগ করিবার অভ্যাস করিলে, অন্য কিছু ভাল লাগিবে না অধিকক্ষণ ধ্যানস্থ থাকিতে পারা যাইবে। দেখিবার, করিবার, ভাবিবার শুনিবার বিষয় না থাকিলে, শীঘ্র ধ্যান ভঙ্গ হইবে কেন? কিয়ৎকাল ধ্যান করিয়া, অবশিষ্ট সময় অন্য কর্ম্মে ব্যাপৃত থাকিলে, সমাধি অভ্যা হইবে না। যাহা করা যায়, তাহাই করিতে প্রবৃত্তি জন্মে।

কেরল। *

(অন্ত্য)

দক্ষিণ ভারতে প্রাচীন সাম্রাজ্যের মধ্যে একমাত্র চের অবশিষ্ট আছে। গোমন্ত হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত কেরল তাহার পশ্চিম বিভাগ। থিরু-বাঙ্কোড়ের অপভ্রংশ হইতে বাঙ্গলায় ত্রিবাঙ্কুর শব্দ উৎপন্ন। দ্রাবিড়-সভ্যতার ধারাবাহিকতা এখানে রক্ষা পাইয়াছে।

আমরা 'তিরু অনন্তপুরম্' ধর্ম্মশালা হইতে বহির্গত হইয়া, সর্ব্বাগ্রে জাতীয় বিশ্বাস, আচার ও অনুষ্ঠানের প্রত্যক্ষ প্রমাণস্বরূপ দেবস্থান সন্দর্শ-নের অভিলাষে দুর্গমধ্যে প্রবিষ্ট হইলাম। ইহা পরিখাবিহীন। চতুরস্রে পাদক্রোশ,—মৃৎপ্রাচীর-বেষ্টিত। তন্মধ্যে উত্তর ও পশ্চিম ভাগ প্রস্তর-গ্রথিত। এখানে রাজপ্রাসাদ-সম্পৃক্ত পঞ্চসহস্রাধিক ব্যক্তি বাস করেন। পদ্মতীর্থের কূলে, সান্ধ্যস্নানার্থিনী মহিলা পদ্ম-কোরক উন্মুক্ত করিয়া সোপানের বিপরীত দিকে দণ্ডায়মান। কর্ণাট্ট অতিক্রান্ত হইলে, আমরা মন্দিরবহিঃস্থ প্রকাণ্ড প্রাঙ্গণে সমুপস্থিত হইলাম। এস্থলে ব্রাহ্মণ মধ্যাহ্ন ও সায়ং সময়ে ভোজনার্থ চিরনিমন্ত্রিত হইয়া আছেন। থিরুবাঙ্কোড় রাজ্যের ভূস্বামী পদ্মনাভের স্বকীয় প্রকোষ্ঠ নাতিদীর্ঘ। গর্ভগৃহে নারায়ণের মহী-য়সী কৃষ্ণপাষাণমূর্ত্তি শয়ান রহিয়াছে। পঞ্চ-স্বর্ণঘণ্টা-বিলম্বিত দ্বারত্রয় হইতে বিশাল দেহের ত্রিভাগ দৃষ্ট হইল। অভ্যন্তরভাগ তমসাচ্ছন্ন। শ্বেতাম্বর অগ্রশিখ গৌর ও বর্ষীয়ান্ নম্বুত্তিরী মহাশয় স্মিতমুখে মদীয় প্রতি-

---

* ১। History of Travancore —P. Shungoony Menon প্রণীত।

২। Calcutta Review.

নিধিত্বে দেবার্চ্চনা করিয়া কর্পূরালোক দ্বারা দেবমূর্ত্তি দেখাইলেন। নাভিমূল হইতে নাল সহ পদ্ম উত্থিত হইয়াছে, তদুপরি ব্রহ্মা উপবিষ্ট আছেন। নাটমন্দিরের একপার্শ্বে উচ্চ দানাধার; বৃহৎ পিত্তল-কলসের মুখাবরণ কিঞ্চিৎ কর্ত্তিত রহিয়াছে। পর্ব্বোপলক্ষে নৃপতি তন্মধ্যে প্রচুর মুদ্রা নিক্ষেপ করিয়া থাকেন।

এই স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া অমাত্য-পরিবৃত মার্ত্তণ্ড বর্ম্মা তরবারি পরিত্যাগ করতঃ, উত্তরাধিকারীর সম্মুখে যোগাচারে সমগ্র দেশ, 'কৃষ্ণার্পণ-মস্তু' বলিয়া অর্পণ করিয়াছিলেন। তদবধি থিরুবাঙ্কোড় ভূপতির 'ধর্ম্মোঽস্মৎকুলদেবতং' এতদুক্তি ও বিষ্ণুর শঙ্খ ও শ্রীবস্ত্র রাজচিহ্নরূপে ব্যবহৃত হইতেছে। ধর্ম্ম অর্থে দান। কনক-বেষ্টিত বিশাল ধ্বজদণ্ড বিশিষ্ট গুণসম্পন্ন। শাকবৃক্ষ ছেদন করতঃ, ভূমিস্পৃষ্ট না হয় এমন ভাবে আনয়ন করিয়া, দেবালয়ে প্রোথিত হইয়াছে। সন্ধ্যা উপস্থিত হইলে, দীপসাহস্রিক ও ধাতুময়ী নারীর করতলস্থ দীপাধার আলোক বিকিরণ করিতে লাগিল। কণ্ঠসঙ্গীত সহকারে মঙ্গলবাদ্য বাদিত হইল। প্রাচীন পূজক নাটগৃহে দণ্ডায়মান হইয়া ভগবানের পাদ হইতে মস্তক পর্য্যন্ত মণ্ডলাকারে হস্তোত্তোলন করিয়া আরতি করিতে লাগিলেন। অবশেষে চত্বরনিম্নে দণ্ডায়মানা অনাবৃতা নবীনা পরিচারিকার হস্তে পঞ্চমুখী নামাইয়া দিলেন। তাপ-প্রসাদ গ্রহণ করিবার জন্য এখানে কেহই ছিল না। পদ্মনাভের ভোগমূর্ত্তি হিরণ্ময়ী। শ্রীদেবী দেশাচারের গুণে নগ্নদেহা। প্রস্তর ও পিত্তলের দীপবাহিনী মূর্ত্তিতেও অনাবৃত ভাব। আমি অন্ধকার মত বহির্গত হইলাম। মন্দিরের বহিঃস্তম্ভশ্রেণীতে পর্য্যন্ত দীপের আবেষ্টন।

এক দিনে দেবস্থানের সমস্ত বিষয় দেখা সম্ভব নহে। যতবার ভিন্ন ভিন্ন দ্বারপথে প্রবেশ করিয়াছি, ততবারই আমরা কোন্ জাতীয় ব্যক্তি তাহা না জানায়, প্রহরী আপত্তি করিয়াছে। গ্রামের ন্যায় বৃহৎ প্রাঙ্গণে
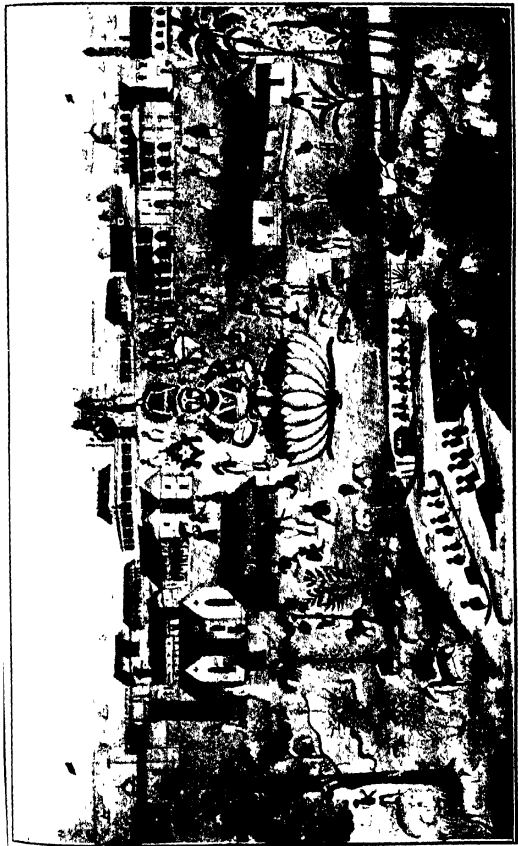
থিরুবাঙ্কোড়ের সমগ্র দৃশ্য (লক্ষ্মী মূর্তি সহ)

(ভারত প্রদক্ষিণ)

কয়েকটি প্রকোষ্ঠ। প্রথমটিতে শত হস্ত দীর্ঘ ও তেত্রিশ হস্ত প্রস্থ পাষাণ বিনির্ম্মিত ত্রিভুবনমণ্ডপ। ইহা নম্বুরীদিগের আহারের জন্য ব্যবহৃত হয়। মণ্ডপ বিচিত্র স্তম্ভের শ্রেণীপরম্পরায় রচিত। এক এক বৃহৎ স্তম্ভের অভ্যন্তরে অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ চতুঃস্তম্ভ সমন্বিত বেদীর উপর গণপতি। বটতরুমূলে অষ্টভুজ নারায়ণ, দানব-দমনকারী বিষ্ণু প্রভৃতির মূর্ত্তি, সহচর-সহচরী সহ ক্ষোদিত হইয়াছে। স্তম্ভশিরে ভাবুকতার পরিচায়ক সূক্ষ্মশিল্পে সজ্জিত যোজক। তদুপরি ছাদ,—পুষ্পাঙ্কিত। তাহাতে রামায়ণ প্রভৃতির কাব্যকলার ক্ষোদিত চিত্রাবলী। মণ্ডপোপরিস্থ নিম্নগা-নিষ্কাশিনী অতি বিচিত্র। ভোজনগৃহ সুপ্রেক্ষিত বা শিল্প সুরক্ষিত করিবার জন্য প্রবেশ-পথ কাষ্ঠিকাযুক্ত হইয়াছে। আবুজী ভিন্ন নিপুণতার এমন নিদর্শন অন্যত্র দেখি নাই। সহস্রস্তম্ভ মণ্ডপ গতানুগতিকভাবে অবশ্য এখানেও আছে। মন্দিরগাত্রে প্রস্তরোপরি নানাবর্ণের চিত্র। হস্তী প্রভৃতির অবয়বে আদি-রসের ব্যঞ্জনা দেখিলাম। মৎস্য-তীর্থ ও বরাহ-তীর্থ এক ক্রোশ দূরে অবস্থিত হইলেও, এই স্থলে তাহাদের বিষয় বলিয়া শেষ করিব। তড়াগের উপরিস্থ গৃহাভ্যন্তরে বরাহ অবতার সর্ব্বাঙ্গে চন্দনের স্থূল প্রলেপ মাখিয়া শূকরের মুখটি বাহির করিয়া লক্ষ্মীকে ক্রোড়ে স্থান দিয়াছেন। এমন অন্নক্ষেত্র অপর স্থানে হইবার নহে। রন্ধনশালায়, দুই দ্রোণ (মণ) তণ্ডুল পাক হইতে পারে এত বৃহৎ, কতকগুলি পিত্তলের স্থালী রহিয়াছে। ব্রাহ্মণমণ্ডলীকে নিজ বাসে আহার করিতে হয় না। সংখ্যায় যত হউন, দুই সন্ধ্যা আহার ও মাসিক দক্ষিণা মিলে। বৈদেশিক হইলে, আমার পাইয়া থাকেন। অহোরাত্র সদাব্রত উন্মুক্ত। 'নহী' শব্দ উচ্চারিত হইবে না। দেবস্বের ইহাই প্রকৃত ব্যবহার। রাজ্যের অপর স্থানে দুই শত সত্র ও ষাটটি দেবালয় আছে। একদিন একজন বঙ্গীয় বৈষ্ণব যাত্রীর সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। কেবল আমরাই এত দূর আসি নাই!

দুর্গের মধ্যে রাজা ও তদীয় উত্তরাধিকারী ভাগিনেয়গণের বাস। দক্ষিণাবর্ত্তের অন্য প্রদেশের গৃহের ন্যায় এ রাজভবন ইষ্টক-প্রাচীরের উপর সুন্দর ও দৃঢ় খর্পরে আচ্ছাদিত। যে কোন রাজসম্বন্ধীয় গৃহ হউক, তাহাতে শঙ্খচক্র চিহ্ন ও দ্বারে বন্দুকধারী পদাতিক দৃষ্ট হইবে। দ্রাবিড় ও কর্ণাটী ব্রাহ্মণ-কর্ম্মচারিবর্গ প্রাসাদের নিকট বসতি করিতেছেন। সাম্রাজ্যে কেরলী অতি অল্পই নিযুক্ত হইয়া থাকেন। তজ্জন্য পথে বিদেশীয়দিগকেই গতায়াত করিতে দেখি।

একদিন কোনও স্থানে যাইতেছি, এমন সময়ে হুলুধ্বনি শ্রবণ করিয়া, বাড়ীর মধ্যে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলাম, অঙ্গনাগণ শঙ্খধ্বনি করিয়া নারিকেল বৃক্ষের শীষ রোপণ করতঃ, তাহাতে জলাঞ্জলি দান করিতেছেন। দ্রাবিড় ও মলয়ার ভিন্ন বাঙ্গলার মত হুলু দিতে আর কোথায় শুনি নাই। চের ছাত্রী অঙ্গরক্ষা পরিধান করিয়া পত্রবিনির্ম্মিত ছত্রহস্তে বিদ্যালয় হইতে গৃহে ফিরিতেছে। রাজা দুর্লভ-বস্তুসংগ্রহাগারের অভিমুখে বায়ুসেবনের জন্য 'ফিটনে' গমন করিতেছেন; তাঁহার বেশ মুসলমান সম্রাটের ন্যায়। রাজমৌলী শ্বেত পক্ষিপুচ্ছে শোভিত। কর্ণপত্রে হীরক কমল জ্যোতিরিঙ্গণবৎ উদ্ভাসিত। নায়ার সেনাদল বাদিত্র-নির্ঘোষে অভিযান খ্যাপন করিয়া রাজার অনুসরণ করিতেছে। হট্টে আমরা কেরলী নারীর একখানি তৈল-চিত্র ক্রয় করিলাম। অষ্টাবিংশতি বিষ্ণুচক্রাঙ্কিত রজতবর্ণক অতি ক্ষুদ্র তাম্রখণ্ডে ব্রিটিশ ভারতীয় এক টঙ্ক গৃহীত হইয়া থাকে। এখানকার সিকি আধুলিতে পদ্মনাভের শঙ্খ অঙ্কিত হয়। কলা-বিদ্যালয়ে গজ-দন্তের শিল্পশিক্ষা দেওয়া হয়।

রবিবর্ম্মা কেরলের অধিবাসী। তাঁহার শিক্ষা ইয়ুরোপীয়। পাত্রের মরাঠী পরিচ্ছদ না দিলে, সে গুলি গুরুকুলের মত হইয়া যাইত। আমাদের অবনীন্দ্রনাথের চিত্র সেইহেতু জাপানী হইতেছে। কল্পনার রাজ্যে

অভ্যাস স্বপ্নাবস্থার মত অজ্ঞাতসারে আবির্ভূত হয়। কাব্য বা অভিনয়, চিত্র বা ক্ষোদিত বিষয়, এসকলে স্বাভাবিকতার সহিত কিঞ্চিৎ কাল্পনিকতা মিশ্রিত থাকা আবশ্যক হইয়া উঠে। যাহা প্রকৃত, তাহাই যে কুৎসিত, কিংবা কেবল কল্পিত বিষয় মাত্রই সুন্দর হইবে, এমন সংস্কার দোষাবহ। কোনও বিষয়ে কল্পনার সৌষ্ঠব বিধানের জন্য পুরাবৃত্তকে মিথ্যাবাদী করিতে নাই।

এখানে এক বেধালয় আছে। ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে ক্যালুডিক্ট ইহার প্রতিষ্ঠা করেন। পঞ্জিকাকারগণ ইহার সাহায্য গ্রহণ করিলে উপকৃত হইবেন। দৃষ্টফলের সহিত গণনা মিলিত না করায়, বিশেষ অনিষ্ট হই-তেছে। সাবন দিনের পরিমাণ সমান থাকে না। প্রত্যহ উহার পরি-বর্ত্তন হয়। সূর্য্যের বলয়রেখা প্রদক্ষিণ করিতে, পৃথিবীর ৩৬৫ দিনের অধিক সময় লাগে। এই অতিরিক্ত কয়েক হোরা গণকগণ সংশোধন করিয়া লইবার যে উপায় করিয়াছেন, তাহাতে কিঞ্চিৎ ত্রুটি আছে; সেই ত্রুটি প্রযুক্ত মহাবিষুব সংক্রান্তি চৈত্র-সংক্রান্তিতে ধরা হইতেছে; প্রকৃতপক্ষে ১০ই চৈত্র বিষুব-সংক্রান্তি ধরা উচিত। কারণ, ঐ দিন দিবা ও রাত্রি সমান থাকে। এই ত্রুটি সংশোধিত না হইলে কালক্রমে বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে শীত ঋতুর আবির্ভাব হইবে। মাসের পরিমাণ দ্বিবিধ,— সৌর ও চান্দ্র। বাঙ্গলায় সৌরমান প্রচলিত; কিন্তু অসঙ্গতভাবে চান্দ্র নাম ব্যবহৃত হয়। বিশাখা-নক্ষত্রযুক্তা পৌর্ণমাসীতে বৈশাখ হইবে। অথচ, আমরা তাহার অগ্রপশ্চাৎ সূর্য্যের এক রাশি হইতে অন্য রাশিতে সংক্রমণের কালে মাস-পরিমাণ শেষ করি। এ দেশে রবি যে রাশিতে থাকেন, তদনুসারে মাসের নামকরণ হইয়াছে। চান্দ্র মান দুই প্রকার। গৌণচান্দ্র পূর্ণিমায় শেষ হয়; সুতরাং ইহাকে গৌণ বলা অনুচিত। মুখ্যচান্দ্র কেবল পিতৃকার্য্যের তিথি-গণনায় আর্য্যাবর্ত্তে

ব্যবহৃত হয়। দ্রাবিড়ে অমাবস্যায় পর্য্যবসিত এই মাস-মান প্রচলিত আছে। পিতৃগণের তৃপ্তি উপলক্ষে এখানে শেষ দিনে উপবাস করিতে হয়। গ্রীন্‌উইচ্ মানমন্দিরে নভোমণ্ডল পর্য্যবেক্ষণের জন্য সর্ব্বপ্রকারের আয়োজন করা হইয়াছে। বিষুব-দূরবীক্ষণের মূল্য আড়াই কোটী টাকা। ক্যালিফর্ণিয়ার ইকুইটোরিয়্যাল দূরবীক্ষণ সাত কোটী টাকা ব্যয়ে প্রস্তুত হইয়াছে। ইংলণ্ডে বিষুব-দূরবীক্ষণ যন্ত্র যে গৃহে স্থাপিত, তাহার নির্ম্মাণ ব্যয় সাত লক্ষ মুদ্রা। যন্ত্রটি ঘটিকা সহযোগে ঘূর্ণিত হয়, সেই সঙ্গে পর্য্যবেক্ষণকারীর উপবেশনস্থানটিও আবর্ত্তিত হইতে থাকে। আকাশ উন্মুক্ত রাখিবার জন্য গৃহছাদ ভ্রাম্যমাণ হয়। এক্ষণে তথায় সামান্য-প্রতিফলিত দূরবীক্ষণেব ব্যবহার পরিত্যক্ত হইয়াছে। ইয়ুরোপীয়দিগের অসাধারণ অধ্যবসায়ের ফল গ্রহণ করিয়া, আমরা অনায়াসে পঞ্জিকা সংশোধন করিতে পারি। আশ্চর্য্যের বিষয়, রক্ষণশীলতা এখানে এমনই বিড়ম্বনার বিষয় হইয়াছে যে, কোনও কোনও জ্যোতির্ব্বিৎ ইহার প্রতিবাদ করিতেও লজ্জিত নহেন।

এখানে ইংরাজী সভ্যতার অঙ্গস্বরূপ চিকিৎসালয়, চিত্রশালা, পূর্ত্ত জলসেচন ও বনবিভাগ, মুদ্রাযন্ত্র প্রভৃতি আদর্শ রাজ্যের উপযুক্ত লোক-হিতকর সমুদয় অনুষ্ঠান বিদ্যমান আছে। উক্ত শিক্ষার জন্য প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ের দ্বারদেশ ইষ্টকনির্ম্মিত পুস্তক-অলঙ্কার দ্বারা চিহ্নিত। রাজ-ভাগিনেয় বি, এ, উপাধিধারী। তাঁহার সাধারণ নাম, রামবর্ম্মা। অত্রত্য রাজন্যমাত্রই উক্ত উপাধিধারী। সেই জন্য হিন্দুস্থানীরা এই প্রদেশকে 'রাম রাজার দেশ' কহে।

আদি রাজা, যিনি ৪র্থ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন, তাঁহার নাম পেরু মল। তিনি কর্ণাটের চের সম্রাটকে অস্বীকার করিয়াছিলেন। এ রাজকুল এক্ষণে তিরুপাট নামে পরিচিত। সিংহাসনে অভিষিক্ত হইবা

চের রাজ্যাভিষেক

কালে, রাজাকে তুলাপুরুষ ও হিরণ্যগর্ভ দান করিতে হয়। যজমান দণ্ডায়মান হইলে, তাঁহার মস্তক পর্য্যন্ত উত্থিত হইবে, এমন দীর্ঘ স্বর্ণনির্ম্মিত কোষকে হিরণ্যগর্ভ কহে।

উদয়মার্ত্তণ্ড বর্ম্মা ১লা সিংহ হইতে বৎসর গণনা আরম্ভ করিয়াছিলেন। ইহা অদ্যাপি 'কোলম অব্দ' নামে কেরল ও মদুরায় প্রচলিত।

১৭২৯ খৃষ্টাব্দে শ্রীপদ্মনাভ দাস বনজিপাল মার্ত্তণ্ড বর্ম্মা কুলশেখর সিংহাসন প্রাপ্ত হন। তিনি যুদ্ধবিশারদ ও রাজ্যের ধনবৃদ্ধিকারী ছিলেন। রণক্ষেত্রে ধনুর্ব্বাণ, লৌহ-গোলক ও ঔর্ব্বাস্ত্র ব্যবহৃত হইত। তিনি ফরাসী ও ডচ্‌দিগের সহিত সখিত্ব রাখিতেন। পূর্ব্বোক্ত কোয়ার অব্দের ৯২৫ সম্বৎসরে ৫ই মকর (৭ই জানুয়ারী ১৭৫০ খৃঃ), মার্ত্তণ্ড দেবোদ্দেশে রাজ্য সমর্পণ করায়, প্রজাগণ তাঁহাকে ভক্তি করিত। রাজার বিপক্ষে কিছু করিলে "স্বামি-দ্রোহী অনাৎ" পদ্মনাভের প্রতিকূল হইতে হয়। এই আশঙ্কায় কেহ বিরুদ্ধাচারী হইত না। ইহাতে কুলশেখরের বুদ্ধিমত্তা প্রকাশ পাইয়াছে। অধিকন্তু রাম আইয়ার মত প্রতিনিধি পাইয়া তিনি বিশেষ উপকৃত হইয়াছিলেন। মন্ত্রী এমন নিষ্ঠাবান্ ছিলেন যে, এত উচ্চপদ প্রাপ্ত হইয়াও তিনি মৃত্যুকালে কোনও সম্পত্তি রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। রাজা ৫৩ বৎসর বয়সে নিজ জন্মতিথিতে চক্ষু ও মস্তকে দেবচন্দন লেপন করিয়া, নিদ্রাভিভূত হইবার মত অক্লেশে মুক্তিলাভ করেন। মৃত্যুকালে তিনি যুবরাজকে আহ্বান করিয়া কহিয়াছিলেন,—১ম, পদ্মনাভের সম্পত্তি বিভক্ত হইবে না। ২য়, রাজ্যের জন্য কেহ পারিবারিক বিবাদ করিতে পারিবেন না। ৩য়, আয় অপেক্ষা ব্যয় অধিক করিবে না। ৪র্থ, বাণিজ্য হইতে উপার্জ্জিত অর্থে রাজসংসারের ব্যয় নির্ব্বাহিত হইবে। ৫ম, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সহিত সর্ব্বপ্রকারে বন্ধুতা রক্ষা করিবে।

পরবর্ত্তী কালে একবার মুসলমানের হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য থিরুবাঙ্কোড়াধিপ পঞ্চদশ লক্ষ মুদ্রা ও ত্রিংশৎ হস্তী প্রদানের অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। চৌর্য্যের প্রতীকার সম্বন্ধে রাজনিয়ম হয়,—যে গ্রামে পথিকের দ্রব্য অপহৃত হইবে, তত্রত্য অধিবাসী ও শান্তিরক্ষক সে ক্ষতির পূরণ করিবে। হায়দর আলি কাহারও ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিতেন না। কিন্তু টিপ্ সুলতান মুসলমান করিবে, এই ভয়ে, অনেক ব্রাহ্মণ কর্ণাট হইতে আসিয়া এখানে আশ্রয় লইতে লাগিলেন। পুনর্ব্বার যবন-আক্রমণের আশঙ্কায় ভূপালকে বৃটিশ-বল আনয়ন করিতে হইল। পান্থশালা তৃণাচ্ছাদিত থাকিবে, পথিকদিগকে তক্র প্রদান করিতে হইবে, কোনও বিচারক স্বগৃহে বিচার করিবেন না, ভূমি-স্বত্বের বিচার অগ্রে পল্লী-সমাজ কর্ত্তৃক নিষ্পন্ন করা প্রয়োজনীয়, ইত্যাদি কতকগুলি বিধি ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে প্রচারিত হয়।

রাজ-ক্ষমতার অযোগ্য বালরাম বর্ম্মা ১৬ বৎসর বয়সে শাসন-ভার গ্রহণ করেন। ইহাতে দেশ অশান্তির আকর হইয়া উঠে। পরে বলুথম্পি দেলয়া সর্ব্বাধিকারীর পদ পাইলে, রাজ্যে ন্যায়-ধর্ম্ম পুনঃস্থাপিত হয়। তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠুর ছিলেন। রাজ্যের অভ্যন্তরভাগ পরিদর্শনে যাইয়া, তিনি বৃক্ষতলে উপবিষ্ট হইয়া বিচারে প্রবৃত্ত হইতেন। শাস্ত্রী ও মুফ্‌তি তথায় উপস্থিত থাকিতেন। কাহারও নরহত্যাপরাধ সপ্রমাণ হইলে, তাহাকে সেই বৃক্ষের শাখায় উদ্বন্ধনে নিহত করিতেন। দুই জন ইংরাজ-ভক্ত কর্ম্মচারীর হত্যা হইলে, কর্ণেল মেকলের সহিত রাজার মনান্তর হইল। অতঃপর নায়ার যোদ্ধদল উঠাইয়া দিবার প্রস্তাব হইলে, তাহারা বিদ্রোহী হয়। তখন রাজাকে অন্তঃ-শত্রু হইতে রক্ষা করিবার প্রস্তাব করিয়া, ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে এক সন্ধিপত্র লিখিত হইল। ব্রিটিশ-সৈন্য-প্রতিপালনমূলক সন্ধিতে কর নির্দ্ধারণ দৃঢ় হইয়া গেল। পূর্ব্বাপেক্ষা

দ্বিগুণ,—চারি লক্ষ টাকা কর নির্দ্ধারিত হইল। রাজাকে প্রয়োজনাধিক সেনার ব্যয় বহন করিতে হইল। রাজ্যের সকলেই অসন্তুষ্ট হইলেন। ক্রমে দেলয়ার সহিত মেকলের মনোবাদ বাড়িতে লাগিল। মেকলে রাজাকে পদচ্যুত করাইবার জন্য প্রয়াস পাইয়াছিলেন। ইহাতে দেওয়ান রেসিডেণ্টকে হত্যা করিবার মানসে সেনা নিয়োগ করেন। কর্ণেল পলায়ন করিয়া রক্ষা পান। এ বিষয়ের বৈধতা প্রতিপন্ন করিবার জন্য সর্ব্বাধিকারী ঘোষণা করিলেন,—"ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর ব্যবহার সকলেই জ্ঞাত আছেন; কর্ণাটের নবাব তাঁহাদিগকে আশ্রয় দিলে, যাহাতে নবাবের ক্ষমতার হ্রাস হয়, বিধিমতে সে চেষ্টা হইয়াছিল; পরে তাঁহারা নবাব-বংশ লোপ করিয়া সমগ্র সাম্রাজ্য আত্মসাৎ করিয়া ক্ষান্ত হইয়াছেন। সেই কোম্পানী বন্ধুভাবে এখানে প্রবেশ করিয়া রাজকীয় সমস্ত ক্ষমতা স্বয়ং গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। অতএব অধুনা তাহার প্রতীকার আবশ্যক।" বলা বাহুল্য, এই ব্যাপার লইয়া যুদ্ধ উপস্থিত হয়। বলুথম্বি ধৃত হইবার পূর্ব্বে, আপন ভ্রাতাকে তাঁহার শরীরে অস্ত্রাঘাত করিতে অনুরোধ করিলেন। ভ্রাতা স্বীকৃত না হওয়ায়, তিনি স্বয়ং আপনার বক্ষে অসি প্রবেশ করাইয়া দিলেন। কিন্তু ইহাতেও তাঁহার প্রাণবায়ু বহির্গত হইল না। তখন তিনি চীৎকার করিয়া কহিলেন, আমার কণ্ঠ ছেদন কর। এবার ভ্রাতাকে সে অনুরোধ রক্ষা করিতে হইল। প্রতিনিধি স্বদেশ-বৎসল ও রাজভক্ত প্রজা ছিলেন। পরন্তু তাঁহার অনুরাগ অসংযত হইয়াছিল—হিতাহিত-জ্ঞান লুপ্ত হইয়াছিল। ইংরাজ সেনাপতি জয়লব্ধ ষোলটি হস্তী, কয়েক শত বন্দুক ও একটি বৃহৎ কামান লুণ্ঠিত দ্রব্য স্বরূপ গ্রহণ করিয়া, বিক্রয় করেন, এবং আপন যোধদিগকে সেই অর্থ বণ্টন করিয়া দেন। রাজা এই বিগ্রহে লিপ্ত ছিলেন না। তিনি শীঘ্রই পঞ্চত্ব লাভ করেন।

ধর্ম্মবাদ্ধিনা রাজরাজেশ্বরী গৌরী লক্ষ্মীবাঈ রাজ্যভার গ্রহণ করিয়া, ব্রিটীশ রাজপ্রতিনিধিকে শাসনক্ষমতা প্রদান করিয়াছিলেন। স্ত্রীলোকের মস্তিষ্কের পরিমাণ পুরুষের দশমাংশ মাত্র। দীর্ঘকায় পুরুষ অপেক্ষা হ্রস্ব পুরুষের মস্তিষ্কের পরিমাণ ন্যূন হইলেও, বুদ্ধিমত্তায় তাহাকে হীন দৃষ্ট হয় না। অনুশীলনের অভাববশতঃ নারীজাতির ক্ষমতা বিকাশ প্রাপ্ত হয় নাই। সুকুমার ভাবে বর্দ্ধিত হন বলিয়া, আচার ও অনাচারের ভাব যেমন স্ত্রীজাতির মধ্যে বদ্ধমূল, পুরুষের মধ্যে তেমন নহে। পুরুষ কর্ম্মী; তাহার সৎকর্ম্ম যদি অভ্যস্ত হইয়া যায়, তবে সমাজ গৌরবান্বিত হয়। রাণী রাজকীয় তিক্ত কর্ম্ম হইতে বিরত থাকিলেন। ইহাতে দেশের কল্যাণ হইল। মনু প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্র ও স্থানীয় ব্যবহারসম্মত ইংরেজী দণ্ডবিধির মিলনে রচিত 'সত্তাওয়ারিয়ালা' নামক বিধান প্রচারিত হইল। ক্রীতদাস রাখিবার প্রথার উচ্ছেদ হইয়া গেল। ব্রাহ্মণ ভিন্ন আর সকলেই এখানে ক্রয় বিক্রয়ের সামগ্রী বলিয়া গণ্য হইত। পূর্ব্বে রাজা প্রায় সকল প্রকার দ্রব্যজাত লইয়া একচেটে ব্যবসায় করিতেন।

১৮১৫ খৃষ্টাব্দে পার্ব্বতী বাঈ তের বৎসর বয়সে প্রতিনিধিত্ব পাইয়াছিলেন। উত্তরাধিকারীর অভাব হইলে দত্তক ভগিনী গ্রহণ করিতে হয়। তাঁহার পুত্র সংস্কৃত ও ফারসী অধ্যয়ন করিতেন। কন্যা সংস্কৃত শ্লোক রচনা করিতেন এবং বীণা ও সারঙ্গ বাজাইতে পারিতেন। এই সময়, ধর্ম্মাধিকরণে ষ্ট্যাম্প-শুল্ক প্রবর্ত্তিত হয়। কার্য্যক্ষেত্রের বহির্ভাগে অর্থী প্রত্যর্থীর সহিত বিচারকগণের আলাপ নিষিদ্ধ হইল। অপরাধিনী স্ত্রীলোকের মস্তক মুণ্ডন, দেশ হইতে নির্ব্বাসন, এবং শচীন্দ্রের মন্দিরে উত্তপ্ত ঘৃতে নম্বুরিদের দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলি প্রদান করিয়া ব্যভিচারে নির্লিপ্ততা প্রদর্শন করিবার প্রথা নিষিদ্ধ হইয়া গেল।

স্যর্ ত্র্যম্বক মাধব রাও রাজকুমারদিগের শিক্ষার জন্য আহূত হইয়া,

রাজনীতিজ্ঞান প্রভাবে মন্ত্রিত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই সময় গোলমরিচের ব্যবসায়ের জন্য ঋণ গ্রহণ করা আবশ্যক হয়। ধারে ক্রয় করিয়া নগদ বিক্রয় করিতে পারিলে, অর্থের প্রয়োজন হইবে না, সুস্থির হইল। ইতঃপূর্ব্বে রাজাজ্ঞা না পাইলে, কেহ গৃহ খর্পরাচ্ছাদিত করিতে পারিত না। মাধব রাও আসিবার পূর্ব্বে এই নিয়ম রহিত হইয়াছিল। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে রাজ্যের জনসংখ্যা ১২,৬২,৬৪৬ নির্দ্ধারিত হয়। হিরণ্যগর্ভদান, তুলাপুরুষ, মুরজপ (মৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র) প্রভৃতির ব্যয় এবং আয় অপেক্ষা ব্যয়-বাহুল্য ইত্যাদি কারণ-পরম্পরা প্রদর্শন করিয়া, লর্ড ডেলহাউসী, থিরুবাঙ্কোড় ইংরাজ-সাম্রাজ্যভুক্ত করিবার অভিলাষ করিয়াছিলেন। প্রতিনিধির বুদ্ধিপ্রভাবে সে আশঙ্কা দূর হয়। পদ্মনাভের দেবস্ব হইতে শতকরা বার্ষিক পাঁচ টাকা কুসীদ স্বীকারে পাঁচ লক্ষ টাকা ঋণ লইয়া রাজ্যের দেয় ঋণ পরিশোধিত হইল।

দ্রবিড়ে সনার নামে একটি জাতি আছে। আর্য্যগণের আগমনের পূর্ব্বে তাহারা দেশের স্থানবিশেষের রাজা ছিল; এ জন্য ক্ষত্রিয় বলিয়া স্বীকৃত হয়। পলিগারদিগের আধিপত্যকালে তিন শত বৎসর তাহাদের সামাজিক অবনতির একশেষ হইয়াছিল। এখানে সনার-জাতীয়া খৃষ্টান-রমণীগণ উচ্চ শ্রেণীর হিন্দু নারীদের ন্যায় বেশভূষা করিতে আরম্ভ করিলে, নৃপতি তাহা রহিত করিয়া দিলেন। কিন্তু আদেশ হইল,—সনার-নারীরা ইচ্ছা করিলে বক্ষঃ আচ্ছাদিত করিতে পারে। ইহাতে প্রোটেস্‌ট্যাণ্ট খৃষ্টীয় প্রচারকগণ উপদ্রবের সূত্রপাত করেন। সহস্র বৎসর হইতে সিরীয় খৃষ্টান ও আরব্য মুসলমান হিন্দুর সহিত একত্রবাস নিবন্ধন মিশ্রধর্ম্মী হইয়াছেন। দক্ষিণ-ভারতে রোমান-ক্যাথলিক্‌গণ জাতিকুল রক্ষা করিয়া হিন্দুর মধ্যে খৃষ্টীয় মত প্রচারিত করেন। দ্রাবিড়-ভারতে ব্রাহ্মণ শতকরা তিন জন মাত্র। আত্মীয়তা দেখাইলে অনায়াসে জানপদগণকে হস্তগত করিতে

পারা যায়; এই জন্য ক্যাথলিক্‌গণ উক্ত প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন। রেসিডেণ্ট কর্ত্তৃক রক্ষিত প্রোটেস্‌ট্যাণ্টগণ সেরূপ নহেন। সেই জন্য তাঁহাদের নিকট সনার-জাতি সম্বন্ধায় পরিচ্ছদের নিয়ম গর্হিত বলিয়া বিবেচিত হইল।

এক্ষণে যিনি থিরুবাঙ্কোড় সিংহাসন অলঙ্কৃত করিতেছেন, তাঁহার পুরাবৃত্তঘটিত নাম—শ্রীপদ্মনাভ দাস বঞ্জিপাল রামবর্ম্মা কুলশেখর কিরীটপতি মণি সুলতান মহারাজ রামরাজা বাহাদুর সম্‌শের জঙ্গ কে, জি, সি, এস্‌, আই। প্রজাবর্গ তাঁহাকে দেবতার মত সম্মান করে। রাজ্যের পরিমাণফল,—৬,১০০ বর্গমাইল। বার্ষিক ৭৮ লক্ষ টাকা রাজস্ব সংগৃহীত হয়। তন্মধ্যে ইংরেজ-গবর্ণমেণ্টকে আট লক্ষ টাকা দিতে হয়।

কেরলের ইতিবৃত্ত আংশিক পঞ্চদশ শত বৎসরের কাহিনী বহন করিতেছে। এই রাজ্য ইংরাজের আশ্রিত না হইলে, মুসলমানের অধিকৃত হইয়া, পরে ইংরাজ-সাম্রাজ্যভুক্ত হইত। ইহাতে অবশ্য রাজ-বংশের ক্ষতি নিবারিত হইয়াছে। প্রজাসাধারণের কি উপকার হইল, দেখা যাউক। স্বদেশী রাজা হইলেই দেশকে স্বাধীন বলা যায় না। প্রজাশক্তি যদি দেশের উপর কার্য্যকরী হয়, তবেই স্বাধীনতা ভোগ সম্ভব। পার্শ্ববর্ত্তী বলবান্ মহাদেশের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য আপনার দেশের ক্ষমতা সঞ্চিত করিতে হইলে, তাহার এক কেন্দ্র নির্দ্ধারিত করিতে হয়; উহাই রাজশক্তি। তদ্ব্যতিরেকে মঙ্গল নাই। এই কারণে, বাণিজ্য পর্য্যন্ত কেন্দ্রীভূত করিবার প্রস্তাব হইয়া থাকে। কেরলে জনসাধারণকর্ত্তৃক কর-সংগ্রাহক নিযুক্ত হইতেন। কালক্রমে তিনি পরাক্রান্ত হইয়া স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিলেন। তখন তাঁহার নাম হইল, রাজা। ইহা অতি গর্হিত হইয়াছে। যে প্রদেশে ভূমি সমাজের সম্পত্তি ছিল. তথাকার প্রজা এমন হইতে দিলেন কেন? মূঢ়তাই কি ইহার

প্রধান কারণ নহে ? তাহার ফলে দাসত্ব-প্রথা, রাজার একচ্ছত্র বাণিজ্য, প্রজাগণের অলঙ্কার-ধারণের অযোগ্যতা, এবং গৃহ খর্পরাচ্ছন্ন করিবার সুযোগেরও অভাব প্রভৃতি কত কষ্টের সৃষ্টি হইয়াছে। ইংরেজ এক্ষণে মধ্যস্থ। তাঁহার সহিত সাক্ষাৎসম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত থাকিলে, প্রজার অভাব জ্ঞাপন করিবার দ্বিতীয় স্থান থাকিত না। ব্রাহ্মণ পরকাল লইয়া ব্যস্ত থাকিবেন ; সে জন্য রাজার অন্নক্ষেত্র উন্মুক্ত। শূদ্রের জন্য রাজপণ্য-উৎপাদনার্থ কৃষিক্ষেত্র উন্মুক্ত রাখিয়া, ক্ষত্র ও বিশের অধিকার একমাত্র ব্যক্তিকে প্রদান করিয়া উদাসীন থাকিলে, কাহারও স্বকীয় বা জাতীয় হিত কদাচ হইবার নহে। সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তি, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য হইবার চেষ্টা করিবেন। যে অসমর্থ, সে শূদ্র থাকিবে। ইহা আমাদের প্রাচীন সমাজ-নীতি। এক্ষণে কাহাকেও ক্ষত্রিয় আচার গ্রহণ করিতে দেখিলে, ব্রাহ্মণ কুপিত হন। ক্ষত্রিয় না থাকিলে, তাঁহাদের সম্মান কে রক্ষা করিবে, ইহা তাঁহারা বিবেচনা করেন না। ব্রাহ্মণ শূদ্রযাজী হইবেন, সেও স্বীকার, কিন্তু কেহ যেন বৈশ্যত্ব গ্রহণ না করে। ইহাতে দেশ অসাড় হইয়া পড়িতেছে।

অনন্তশয়ন হইতে দক্ষিণার্ণব-দর্শনে যাইবার জন্য আমাদিগকে সৈকত-শৈল অতিক্রম করিতে হইয়াছিল। সূক্ষ্মপত্রক ঝাউজাতীয় বৃক্ষের ছায়াতলে শ্রমাপনোদন করিয়া নাগরিকগণকে সমুদ্রকূলে আসিতে হয়। তাঁহারা অপক্ক আম্র ও বদরী ফল দীর্ঘকাল রক্ষার্থ লবণাম্বু আহরণ করিয়া লইয়া যান। আমরা জীমূতমন্দ্রবৎ-ধ্বনি-সমাকুল অনন্ত তরঙ্গরাজির ক্রোড়ে একটি তৃণের মত দণ্ডায়মান হইলাম। সম্মুখে সুদূরে জলরাশি-পারে আফ্রিকা, এবং আরব ; পশ্চাতদিকে অতিসন্নিহিত কুমারিকা অন্তরীপ হইতে, ভারত-মহাসাগর কুমেরু পর্য্যন্ত আপন অধিকার বিস্তৃত করিয়াছে। অম্বুধির অন্তঃপ্রবাহিত তপ্তস্রোত আরব, পারস্য হইতে সিন্ধু-সঙ্গমে

প্রবাহিত হইয়া, নোলকদ্বীপ উল্লঙ্ঘন ও দক্ষিণাপথের উভয় দিক প্লাবিত করিয়া, বঙ্গ-ব্রহ্ম বিধৌত করিয়া, অষ্ট্রেলিয়া বর্জ্জনপূর্ব্বক মালয়-ভ্রমণোত্তর চীন-প্রান্তে জাপান পর্য্যন্ত যাইয়া শীতল হইয়াছে। এসিয়াখণ্ডে একি স্রোত বহমান! অহো, কি মহা ঐক্য! এমন সময় উৎক্ষিপ্ত তরঙ্গে আলোকপাত বশতঃ বামধনুর বিচিত্র বর্ণ প্রকটিত হইল। আর কি,— নিবৃত্ত হওয়া যাউক, প্রকৃতি অনেক দেখাইলেন।

প্রত্যাবর্ত্তনের পথে ভদ্রকালী দর্শন করিলাম। ইহা মকুয়া জাতি কর্ত্তৃক উপাসিত একখানি বৃক্ষকাণ্ড। আম্রবৃক্ষে তাম্বূলবল্লী উত্থিত হইয়াছে। মলয় ভারতের সিংহল। এখানে চা উৎপাদন বেশ চলিতেছে। কফি রীতিমত উৎপন্ন হইয়া থাকে। এখন খনিজ পদা-র্থের আকর আবিষ্ক্রিয়ার জন্য যত্ন হইতেছে। ভূগর্ভ, সিংহলের প্রকৃতি-বিশিষ্ট। লঙ্কায় যাহা মিলে, এখানে তাহা কেন না পাওয়া যাইবে! ওয়ার্ণদে স্বর্ণের খনি ছিল। দক্ষিণে রৌপ্য অপেক্ষা স্বর্ণ সুপ্রাপ্য।

আমাদের যান্ত্রিক-শকট তূরীধ্বনি করিয়া তিন্নাভেলি অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল। অনন্তপুরে অনন্তশয়ন দেখিয়া আসিয়াছি। এক্ষণে বৃক্ষমূলে অনন্ত সর্পমূর্ত্তি দর্শন করিতেছি। যামিনী প্রভাতা হইলে দৃষ্ট হইল, আমরা সুন্দর সেতুযুক্ত আলোক-স্তম্ভ সমন্বিত এক স্রোতস্বতীতটে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। নারিকেলের পরিবর্ত্তে এক্ষণে তালবৃক্ষশ্রেণী দেখা দিয়াছে। ভগিনী নামক কৃশ তালবৃক্ষ প্রান্তরের অবলম্বনস্বরূপ হইয়া মস্তক উন্নত করতঃ শ্রেণীবদ্ধভাবে সারি সারি দণ্ডায়মান; এইরূপ সমস্ত পথ চলিয়াছে। এ দেশে এই তরু-রস হইতে শর্করা উৎপন্ন হইয়া থাকে। ক্রমে কেরল শেষ হইয়া আসিল। বসুন্ধরা কঠিন ও রক্তিম আকার ধারণ করিলেন। স্থানে স্থানে মৃত্তিকা প্রস্তরীভূত হইয়াছে। কোনও স্থানে কৃষ্ণ বল্মীক রক্তমৃদ্ উত্তোলন করিয়া স্তূপাকার করিয়াছে।

ক্ষেত্রের আলবাল রক্তবর্ণ। গগনে রবি রক্তবর্ণ ধারণ করিয়া শনৈঃ শনৈঃ অস্তাচলে যাইতেছেন। তদনন্তর দ্রাবিড়-ললনাদের রক্তবসন দেখা দিল। কিছু দূর পর্য্যন্ত দুইখানি, তাহার পর স্ত্রী জাতির বস্ত্র একখণ্ডে পরিণত হইল। কর্ণ-পত্রের ছিদ্র তেমনই দীর্ঘ, কিন্তু অলঙ্কারের পার্থক্য দৃষ্ট হইল। কফোণিতে অলঙ্কার পরিধানের পদ্ধতি ক্রমশঃ বদ্ধমূল হইয়া আসিতেছে। ইহাদের বর্ণ ঘোর কৃষ্ণ। ঘরগুলি ছয় চালের পরিবর্ত্তে চারি চাল বিশিষ্ট ও নারিকেলের পরিবর্ত্তে তাল-পত্র দ্বারা আবৃত। গ্রাম্যদেবতার মৃণ্ময় আসুরিক মূর্ত্তি ক্ষুদ্রচাল গৃহে দৃষ্ট হইতেছে। কদাচিৎ ঈশার ক্রুশ-শোভিত মৃন্ময় দেহ ইষ্টকমঞ্চে উভয় হস্ত প্রসারণ করিয়া দণ্ডায়মান। সম্মুখে তৈলাক্ত দীপাধার ও ধুনাচি রহিয়াছে। থিরুবাঙ্কোড় রাজ্যের সীমার সহিত পথিকের অবিপন্নতা শেষ হইল। সীমান্ত কর্ম্মচারি-গণ নিশীথে কয়েক জন একত্র না হইলে, ব্রিটিশ-রাজ্যে প্রবেশের জন্য অনুমতি দিলেন না। সীমান্ত-প্রদেশ দস্যু-পীড়িত। অধিকন্তু দ্রবিড়ে দুর্ভিক্ষের ভয়ানক প্রকোপ হইয়াছে। কেরল ভূভাগের মত দ্রাবিড় ভূমি সুজলা নহে। প্রদোষকালে পান্থশালায় উপস্থিত হইলাম। অগ্রহায়ণ হইলেও আপণে পক্ক আম্র মিলিল। ইহা বোধ হয়, সিংহল হইতে আসিয়াছে। সোরনুর হইতে সার্দ্ধশত ক্রোশ লৌহপথ ছাড়িয়া, এক্ষণে তিন্নাভেলীতে রেল প্রাপ্ত হওয়ায়, সবিশেষ আরাম বোধ হইতে লাগিল। তুত্তীকুড়ী (Tuticorin) অনতিদূরে। লঙ্কায় যাইতে হইলে, এই স্থানে সমুদ্র লঙ্ঘন করিতে হয়।

দ্রবিড়। *

এক পথে নিত্য ভ্রমণ মনোরম নহে। অপরিচিত স্থানে গমন করিয়া, তেমন কোনও বিশেষত্ব না থাকিলেও, বিচিত্র বোধ হয়। বাহিরে না মিলিলে অন্তরে প্রবেশ করিয়া আকাঙ্ক্ষা-নিবৃত্তির উপায় অনুসন্ধান করিতে হয়।

কৃষ্ণ শব্দের এতদ্দেশীয় উচ্চারণ, 'কিরুট্টিনন্'। ক বর্ণ হইতে আমাদের খ, গ, ঘ, পর্য্যন্ত ব্যঞ্জন উচ্চার্য্য। প্রত্যেক বর্গে এইরূপ। প্রথম একটি দ্বারা অস্মদীয় তাবৎগুলির কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হয়, কিন্তু স্বরবর্ণে এ এবং ও হ্রস্ব দীর্ঘ প্রয়োজনীয়।

দেশের প্রকৃতিগুণে উচ্চারণ-ভেদ জন্মে। আর্য্যাবর্ত্তের রাগিণী বিশুদ্ধ দ্রাবিড় স্বরে দ্রুত কম্পন উৎপাদন করে। অগস্ত্য ঋষি সঙ্কর বর্ণ বলিয়া নবীনকে প্রাচীন করিয়া লইলেন। দ্রাবিড়ী আপন কায়ার গ্রহাংশ ত্যাগ করিল না। পৈশাচী ভাষা বিন্ধ্যাগিরির মস্তক নত করিয়া রাখিল। অগস্ত্য আর্য্যাবর্ত্তে প্রত্যাগমন করিলেন না। তামিল ভারতী দেবাসুরবৎ সম্পূর্ণ বিসদৃশ, তজ্জন্য চিত্তাকর্ষক। ইহাই বিশেষত্ব।

মদুরা দ্রবিড় মহাদেশের প্রাচীন রাজধানী। নরসিংহ আইয়ঙ্গর মহাশয় আমাদের জন্য বেগবতী-তীরে বেঙ্কট স্বামী নায়ডুর ছত্রে, দ্বিতল গৃহে, বাসস্থান নির্দ্ধারিত করিয়া দিলেন। আমাদের ব্যবহারের জন্য তাঁহার অশ্বযান নিয়োজিত হইল। বিদেশে আসিয়া নানা স্থানে অনেকের আশীর্ব্বাদ পাইয়াছি। আমাদের সুবিধার জন্য তাঁহারা যে প্রকার যত্ন

---

* History of Civilization in Ancient India.—রমেশচন্দ্র দত্ত প্রণীত।

করিয়াছেন, তাহার প্রতিদান করিবার অবসর কখনও উপস্থিত হইবে না। কেহ আমাদের সাহায্য প্রার্থনা করিলে যদি এইরূপ ব্যবহার করি, তবে ঋণশোধ হইতে পারে।

তিরুমলের বাসভবন ইংরাজের বিচারগৃহে পরিণত হইয়াছে। নির্ম্মাণ-প্রণালী সারাসেনিক। অট্টস্তম্ভের উপর দেবদেবীর মূর্ত্তি আছে।

মধুরাস্থল পুরাণে, এখানকার নাম হালাস্য ক্ষেত্র। পাণ্ড্যরাজ মলয়-ধ্বজের দুহিতা মীনাক্ষী ও সুন্দর পাণ্ড্য, পার্ব্বতী ও শিবের অবতাররূপে বর্ণিত হইয়াছেন। মলয়ধ্বজ পুত্রেষ্টি-যজ্ঞ করিয়াছিলেন; পূর্ণাহুতিকালে ত্রিবর্ষ বয়স্কা, স্তনত্রয়যুক্তা এক কন্যা অগ্নিকুণ্ড হইতে উত্থিতা হইয়া কহিলেন,—হে রাজন্! বর প্রার্থনা কর। ইহাতে তাঁহাকে পুত্রীরূপে অবস্থিতি করিতে হইল। নাম থাকিল, মীনাক্ষী। রাজা কন্যাকে ত্রিস্তনী দেখিয়া দুঃখিত ছিলেন। কৈলাসে যুদ্ধ করিতে গিয়া মহাদেবকে দেখিয়া, এক স্তন লোপ পাইল। মহাদেব পাণিগ্রহণের প্রস্তাব করিলে, ভাবী শ্বশ্রূ কহিলেন,—তোমাকে তাহা হইলে মধুরাপুরীতে যাইয়া বাস করিতে হইবে। ইহাতে তিনি স্বীকৃত হইয়া সুন্দর পাণ্ড্য নামধারণ করিয়া বিরাজমান হইলেন।

"নিরন্তরনিবাসেন শিবসাযুজ্যতাং পরম্!
কাশ্যাদিপুণ্যক্ষেত্রেষু দেহান্তে মুক্তিরুচ্যতে।
শ্রীহালাস্যে শিবক্ষেত্রে জীবন্মুক্তিঃ সদা নৃণাম্।
তস্মাদ্ধালাস্যসদৃশং নাস্তি ক্ষেত্রং জগত্রয়ে॥"

এই দেশ শিবপূজার আদিস্থান। শিব এখান হইতে আর্য্যাবর্ত্তে নীত হন। বাঙ্গালায় ব্রাহ্মণ শিবপূজার ব্যবসায় গ্রহণ করিলে নিন্দিত হইয়া থাকেন। শিবের প্রসাদ অগ্রাহ্য। এখানে বেল্লালদিগের শিবালয়ে শূদ্র-বর্ণের পিণ্ডারং পূজকগণ কার্য্য করিয়া থাকে। তাহারা শিষ্যানুক্রমে

কৌলিক সন্নাসী ও গৈরিকধারী। অন্যের পীড়া উপশমের জন্য তাহারা শক্তির নিকট কৃচ্ছ্র সাধন কার্য্যে ব্রতী হয়। সফলকাম হইলে দেবীকে মৃন্ময় শিশু ও ঘোটক উপহার দেয়। জঙ্গম প্রভৃতি পাশুপতের ন্যায় পিণ্ডারং সম্প্রদায় ব্রাহ্মণের মুখাপেক্ষী নহে। সুন্দর পাণ্ড্যের দেবস্থান পিণ্ডারংদিগের কর্ত্তৃত্বাধীন। স্মার্ত্ত মতের পোষক শঙ্করাচার্য্য ইহাদিগকে আর্য্যত্বে আশ্রয় দিয়াছিলেন। বারাণসী ও বদরিকাশ্রমের কেদারনাথের পূজক, পিণ্ডারং। যোষিদ্‌গণ 'শুব্রমণ্য' (কুমার স্বামী)-সম্মুখে, নাট-মন্দিরে শয়ন করিয়া, উদরোপরি পিষ্ট তণ্ডুলে নির্ম্মিত দীপ প্রজ্বলিত করিলে, ইহারা মন্ত্র পাঠ করে, এবং পিত্তলদণ্ডোপরি নির্ম্মিত ধুনচি ধারণ করিয়া থাকে। সেতুবন্ধের মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ উপাধ্যায়গণ পিণ্ডারংদিগের বিরোধী। তাঁহারা একবার তত্রত্য মঠাধ্যক্ষের জটা বৃক্ষে বন্ধন করিয়া দিয়াছিলেন, এবং চেষ্টা করিয়া মীনাক্ষী তথা রামেশ্বরের দেবস্ব ইংরাজের তত্ত্বাবধানে দিয়াছেন।

বৌদ্ধ ও জৈন সম্প্রদায় কর্ত্তৃক শিবারাধনাকারী দক্ষিণ-ভারত প্রথমতঃ আর্য্যত্বে দীক্ষিত হইয়াছিল। কুমারিল ভট্ট অষ্টম শতাব্দীতে রাজবলে বৌদ্ধ ও জৈন হনন করিয়া, স্বকীয় অসাধারণ পাণ্ডিত্যের প্রভাবে ব্রাহ্মণ্য মত অবিসম্বাদী করিয়া যান। দার্শনিক সাহিত্যে তাঁহার তর্কসংগ্রাম সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে। তদীয় প্রতিভার নিকট হিন্দুধর্ম্ম বিশেষ ঋণী। কুমারিল প্রথমে বৌদ্ধমতাবলম্বী ব্রাহ্মণ ছিলেন। হত্যাজনিত মহাপাতকের অপনোদনার্থ তুষানলে প্রাণত্যাগ করিবার কালে শঙ্করাচার্য্য তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। শঙ্করের নিকটেও সনাতন ধর্ম্ম অশেষ সাহায্য পাইয়াছে। বৌদ্ধ এ দেশে নির্ম্মূল হইয়াছে। বৌদ্ধসমাজ কেমন ছিল, জৈনদিগকে দেখিয়া বুঝিয়া লইতে হয়। মুসলমানেরা আধি-পত্য পাইয়া হিন্দুর উপরে যেরূপ অত্যাচার করিয়াছিল, তাহার

পূর্ব্বে হিন্দুগণ অন্যমতাবলম্বীদের সহিত অবিকল সেইরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন।

খ্রীষ্টপূর্ব্ব পঞ্চম শতাব্দী হইতে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত সুদীর্ঘ কাল পাণ্ড্যবংশ শাসনক্ষমতা পরিচালন করিয়া, দ্রবিড় রঙ্গমঞ্চ পরিত্যাগ করিয়া যান। ইন্দ্রপ্রস্থের রাজসূয়ে পাণ্ড্যরাজ অনার্য্যত্ব হেতু দ্বারদেশ হইতে প্রত্যাখ্যাত হইয়াছিলেন। রোম সাম্রাজ্যে তাঁহার রাজদূত গিয়াছিল। সেই দূত বলিয়াছিল, আমার প্রভু ষট্‌সহস্র রাজার উপর কর্ত্তৃত্ব করেন। মুসলমান-বিজয়ের পরেও একবার সেই বংশ নির্ব্বাপিত হইবার পূর্ব্বে জ্বলিয়া ক্ষান্ত হয়। ওড়েয়ার, পাণ্ড্য-প্রবাহের মধ্যে কিঞ্চিৎ কালের জন্য উদিত হইয়া, অস্তমিত হইল। মধুরাপুরীতে বিজয়নগরের আধিপত্যের পূর্ব্বে ও পরে নায়কগণ ত্রিশত বর্ষ লীলা করিয়াছিলেন। তাহার পর নাট্যশালায় যবনিকার অন্তরাল হইতে যবন ও মারাঠা বারংবার প্রবেশ করিয়া বিংশতি সংবৎসর অভিনয় করিল।

১৭৬২ খ্রীষ্টাব্দে বৃটন-রাজলক্ষ্মী কর্ণাটের মুসলমান ভূপতির প্রতিনিধি-রূপে দেখা দিলেন। তাঁহার জ্যোতিঃকণা ইদানীং মঞ্চ উজ্জ্বল করিয়া নগরকে শোভাময় ও সুখ সম্পদের আকর করিয়া রাখিয়াছে। প্রভুত্বের জন্য যদি কোনও জাতি মাৎসর্য্যপরায়ণ হন, পুরাবৃত্ত উক্ত রঙ্গ স্মরণ করাইয়া বিদ্রূপ করিতে পারিবে।

জগতে মদুরার দেবস্থানের মত বৃহৎ ভজনালয় কুত্রাপি নাই। কাশী-ধামের বিশ্বেশ্বরের মন্দিরের ন্যায় ইহা সদা জনপূর্ণ। পাণ্ড্য-নরেশ সুন্দর অবশ্য আপন নামানুসারে শিবস্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার তামিল নাম তটাতকা। এই বংশে যিনি শেষ, তিনিও সুন্দর, তবে কুব্জ, এইমাত্র প্রভেদ। যিনি আদি, তাঁহার নাম অবশ্য কুলশেখর হইবারই কথা।

আলাউদ্দীনের সেনানী মালিক কাফুর আসিয়াই সুন্দরেশের

দেবায়তন ভগ্ন করিল। ভাবিয়াছিল, সে লোকশিক্ষা দিতেছে। গর্ভগৃহ তদীয় আক্রমণ হইতে কোনও ক্রমে রক্ষা পাইয়াছিল। নায়কগণ পরে প্রাকারাদি নির্ম্মাণ করিয়া দেন। অদ্যাপি মণ্ডপনির্ম্মাণ সমাপ্ত হয় নাই। আমার সহচর মন্দিরের চতুর্দ্দিক ভ্রমণান্তে অনুমান করেন, উহার পরিমাণ এক ক্রোশ হইবে। কিন্তু উহার প্রকৃত পরিমাণ ৩২২২ পাদ, বা ক্রোশ-তৃতীয়াংশ। ইহা একখানি গ্রামবিশেষ। তন্মধ্যে উদ্যান, সরোবর, পণ্যবীথি, যান-বাহন, দেবস্ব, লেখশালা, রত্নভাণ্ডার ইত্যাদি স্থানলাভ করিয়াছে। বিস্তীর্ণ অঙ্গনে সহস্রস্তম্ভ শালাদ্বয় ব্যতীত অষ্টাধিক প্রকাণ্ড প্রস্তরমণ্ডপ ও কয়েকটি বিমান, স্বর্ণধ্বজযষ্টি ও বিস্তর দীপস্তম্ভসহ প্রাকারত্রয়মধ্যে একাধিক দশ তোরণ সংযুক্ত হইয়া রহিয়াছে।

রাজপথের পশ্চিমে পাণ্ড্যতনয়া মীনাক্ষীর মন্দির। আমরা লৌহ-শলাকা-পরিবেষ্টিত নারিকেল বৃক্ষ কয়েকটি পার হইয়া, কর্ণাট্টদ্বারে উপনীত হইলাম। নানা দেবদেবীর রঞ্জিত লীলা-খচিত স্তর ঊর্দ্ধদিকে সঙ্কীর্ণ হইয়া চতুষ্পার্শ্বে তির্য্যক-ভাবে উত্থিত হইয়াছে। সমতল শিখরে দুই পার্শ্বে দন্তী সিংহমুখ, মধ্যে কলসশ্রেণী। অভ্যন্তরভাগে আরোহণের জন্য শতহস্ত উচ্চ সোপানাবলী গ্রথিত হইয়াছে। প্রাঙ্গণে যে রথ রহিয়াছে, তাহারও আকার এই প্রকার। গোপুরে ক্ষোদিত বিগ্রহের শিরস্ত্রাণ তদ্বৎ। সকলই যেন পর্ব্বতের আদর্শে সূক্ষ্মাগ্র। গিরীশ ও পার্ব্বতীর জন্য ব্যবহৃত বিষয়ে ইহাই স্বাভাবিক। সাঁওতাল-দ্রাবিড় কর্ত্তৃক "মেরং বুরু" নামে গিরি পূজিত হইয়া থাকে।

পণ্যবীথিতে মৃগমদ-পঙ্ককর্পূরপূর্ণ চন্দন, সুবাসিত 'পিচ্চি' (নবমল্লিকা), 'তেঙ্গায়' (নারিকেল), 'বাড়পড়ং' (কদলী) ও অন্যান্য দ্রব্য বিক্রীত হইতেছে।

মাদুরা—মীনাক্ষীমণ্ডপ মধ্য

(ভারত প্রদক্ষিণ)

অদূরে অষ্টলক্ষ্মীমণ্ডপ। তাহাতে শ্রীযন্ত্র ও লক্ষ্মীমূর্ত্তি। পশ্চিম প্রান্তে বেঙ্কটাচল। শ্রেষ্ঠী ষষ্টিসহস্র মুদ্রা ব্যয়ে আপন কামনা-সিদ্ধির জন্য সহস্রোপরি পঞ্চশত স্থাণু যোজনা করিয়া মণ্ডপ নির্ম্মাণ করাইতেছেন।

দ্বিতীয় প্রকোষ্ঠে, প্রাকারের মধ্যে প্রবেশ করিতে হইলে, বিক্রয়ের জন্য প্রস্তুত অন্নপিণ্ড দেখিয়া, দীপাবলী-আবেষ্টিত পুরদ্বার অতিক্রম করিয়া, নৃত্যকারী বিগ্রহগুলির সান্নিধ্যে যাইতে হয়। এক্ষণে আমরা শিবতীর্থে অবতীর্ণ হইলাম। বসন্তে এখানে দেবতার জলবিহার সুন্দররূপে সম্পন্ন হইবে না বিবেচনা করিয়া, বহির্দ্দেশে ক্রোশান্তরে দ্বীপসমন্বিত "টেপ্পম্" খাত হইয়াছে। যাত্রিগণ স্নানান্তে ঘণ্টাবাদন করিল। পিঞ্জরাবদ্ধ শুক-পক্ষীর নিকট 'সুব্রমন্ন' (কার্ত্তিক) ও গণপতি-চত্বরে বেদপাঠ হইতেছে। তালপত্রে লিখিত পুঁথি ধরিয়া এক জন মহাভারত পাঠ করিতেছেন, অপরে মূলব্যাখ্যা শুনাইতেছেন।

জনাশ্রয়ের লীলাচিত্রে ঐতিহাসিক, লৌকিক ও পৌরাণিক কাহিনী বিবৃত হইয়াছে। ক্ষপণকদিগকে তৈলযন্ত্রে পেষণ করা হইতেছে। দ্রাবিড়-প্রথানুসারে, বিবাহকালে, সুন্দরেশ মীনাক্ষীর পাদধৌতকারী হইয়াছেন। তাঁহাদের পুত্র ত্রিজ্ঞানসম্বন্ধ বা উগ্রপাণ্ড্যকে সর্পদংশন এবং নটরাজ কর্ত্তৃক গুণ্ডোদর দানব-দলন দৃষ্ট হইল। আদিম সাহস্রক বিশ্রামাগারে, নির্ম্মাতা আর্য্যনায়কম্ পিল্লের অবয়ব, অঘোর বীরভদ্র ও নর্ত্তনশীল বৃহৎ মূর্ত্তিনিচয় বিদ্যমান রহিয়াছে।

আমরা কার্ত্তিকী পূর্ণিমায় লক্ষদীপদান-উৎসবকালে উপস্থিত হইয়াছিলাম। হস্তিশিরে দেবতার স্নানের জন্য বারি আনীত হইল। প্রদোষে নিরতিশয় জনতা হইল। তাহাতে ইংরাজ ও মুসলমান পর্য্যন্ত উপস্থিত ছিলেন। শেষোক্তগণের এ দেশ মাতৃভূমি হইয়াছে; সেই মমতায় প্রবেশ-নিষেধের ভয়ে তাহারা উপানৎ হস্তে লইতে কুণ্ঠিত হয় নাই। কলানাথের

কিরণাভাবে, অঙ্গন অপেক্ষা সুদীর্ঘ অভ্যন্তরভাগে, অগণ্য দীপের বিচ্ছিন্ন শিখা সমধিক জ্যোতি বিস্তার করিয়াছে। তাহাতে প্রত্যেক দীপকে সৌন্দর্য্যের আকর বোধ হইল।

তৃতীয় প্রাকার দুই ভাগে বিভক্ত। একটীর মধ্যে সুন্দরেশ ও অপরটিতে মীনাক্ষীর দেবালয় স্থাপিত আছে, দেখিলাম। প্রথম প্রকোষ্ঠের অঙ্গনে ধ্বজ-স্তম্ভ ও পার্শ্বস্থ গৃহে স্বর্ণবাহন, রৌপ্যপাত্র, ছত্রদণ্ড প্রভৃতি উপকরণ রক্ষিত আছে। কাশীর বিশ্বেশ্বর এখানেও স্থান পাইয়াছেন। প্রধান মন্দিরের গাত্রে তিরুমল ও তদীয় তাঞ্জোর-মহিষীর প্রতিকৃতি উপযুক্ত ক্ষেত্রে প্রদত্ত হইয়াছে। প্রস্তরোপরি স্থূল চূর্ণ সংযত করিয়া, ঈশানের চতুঃষষ্টি লীলাময় অবয়ব গঠিত হইয়াছে। বিমান অষ্ট গজ-মূর্ত্তির উপর উত্থিত। তাহার উপরিভাগ কর্ণাট্টবিহীন। শিরোভূষণ স্বর্ণবর্ণক-পত্র-মণ্ডিত। প্রবেশপথে দ্বারপাল। অভ্যন্তরে এক দিকে চিদম্বরের নটেশ, অপর পার্শ্বে তাঁহার পুত্রদ্বয়,—'শুব্রমন্ন' ও গণপতি। যাহার জন্য এত সমৃদ্ধি, সেই সুন্দরেশ শিব, তমসাচ্ছন্ন গর্ভস্থানে, পুংচিহ্নরূপে অনার্য্যভাবে গৌরীপট্টে উপবিষ্ট। দ্বিতীয় প্রকোষ্ঠে মীনাক্ষীর মন্দিরদ্বারে ধান্যমঞ্জরীগুচ্ছ আলম্বিত আছে। একটি মণ্ডপে সিংহ ও হস্তীকে মনুষ্যের অর্দ্ধাঙ্গ করিয়া প্রদর্শিত হইয়াছে। দশভুজ মহাদেব বামপদ উত্তোলন করিয়া ভদ্রকালীর সহিত নৃত্য করিতেছেন। মহেশ উলঙ্গ হইয়া পড়িতেছেন দেখিয়া দেবী লজ্জায় ক্ষান্ত হইলেন। শফরীনয়না এক হস্তে অভয় ও অন্য হস্তে বর দিতেছেন।

আরতির বাদ্য বাজিয়া উঠিল। দেবস্থানের অধ্যক্ষ পিণ্ডার স্বামিরাজ দেববন্দনা করিতে আসিতেছেন। তাঁহার কটি পর্য্যন্ত কাষায় বহির্ব্বাস; কক্ষ ও প্রকোষ্ঠ ভস্মলিপ্ত। তিনি শ্মশ্রুহীন ও কুন্তল-বিহীন। জটামণ্ডিত-মস্তকে পঞ্চমুখী-রুদ্রাক্ষমালা গোলাকার ধারণ

করিয়াছে। অগ্রে মশালধারী ও পশ্চাতে রক্ষিগণ। শিব যেন কৈলাসে আসিতেছেন।

মহারাজ-মান্য রাজশ্রীতিরুমল শেবরি নায়নি আই আলুগারু ১৬২৩ খৃষ্টাব্দে দেবস্থান-নির্ম্মাণান্তে, উহার সম্মুখে ও পথের পূর্ব্ব দিকে, এক বিশাল অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তাহা পশ্চাৎ-নির্ম্মিত, অতএব "পুদু" অর্থাৎ নব মণ্ডপ আখ্যা পাইল। এখানে নাগরিকগণের প্রয়োজনীয় দ্রব্যসম্ভার বিক্রীত হয়। সভামণ্ডপে দশজন নায়কের পূর্ণপরিমিত মূর্ত্তি; তন্মধ্যে দুই জন মৃগয়া-নিরত। শাবকক্রোড়ে বরাহ অবতার বিরাজ করিতেছেন। বিষ্ণু কর্ত্তৃক শিবকে গৌরী-সম্প্রদান প্রভৃতি বৃহৎ বৃহৎ পুত্তলীও ক্ষোদিত আছে। এক এক খানি বৃহৎ প্রস্তরে তিনটি করিয়া স্তম্ভ নির্ম্মিত হইয়াছে। কোন স্থানে রাবণ কৈলাস উত্তোলন করিতেছেন। কোথাও শিব হস্তীকে গুড় তৃণ ভোজন করাইতেছেন; পার্শ্বে উমা উপবিষ্টা; তাঁহার বস্ত্রে শিল্পচাতুরীপ্রদর্শক লতিকা-পত্র অঙ্কিত হইয়াছে। কোথাও বা মহিষাসুরমর্দ্দিনী এক হস্তে সিংহ ও অন্য হস্তে বরাহ ধারণ করিয়াছেন। ব্রহ্মাকেও কিঞ্চিৎ স্থান দিতে ক্রটী হয় নাই।

কয়েকটি প্রকারভেদ ব্যতীত অস্মদ্দেশীয় স্থাপত্য কোনও নির্দ্দিষ্ট প্রণালীর অধীন নহে। ইহার প্রধান উপকরণ,—স্তম্ভের নির্ম্মাণপ্রণালী, কালভেদে বিভিন্ন। তদ্দ্বারা সময় নির্ণীত হইতে পারে। অগস্ত্যসংহিতার এক ভাগ—'সকলাধিকার' পুত্তলিকাদি নির্ম্মাণ সম্বন্ধীয় উপদেশে পূর্ণ। হালাস্যমাহাত্ম্য উহার অংশ। অগস্ত্য-গীতা নামে গ্রন্থেরও উল্লেখ দেখা যায়। উক্ত ঋষিকে এখানকার প্রথম ব্রাহ্মণ্যমতপ্রবক্তা বলিয়া বোধ হয়।

সুন্দর পাণ্ড্যের শিবালয় সম্পূর্ণ রক্ষিত হয় নাই। এই হেতু সপ্তম

শতাব্দীতে নির্ম্মিত রথাকৃতি মহাবলিপুরের বিমান ও নবম শতাব্দীতে নির্ম্মিত দেবগিরিস্থ পর্ব্বতাভ্যন্তর-ক্ষোদিত কৈলাস নামক অদ্ভুত বিমান দ্রাবিড় স্থাপত্যের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন।

তৈলঙ্গের বিজয়নগর-রাজকুমারী কাশীতে কেদারনাথের শাস্তিক বিমানের মধ্যে, মদুরার অনুকরণে, স্তম্ভ হইতে ছাদের দিকে বোধিকার উপর বহির্বর্ত্তন দিয়া, সম্প্রতি একটি মণ্ডপ নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছেন। এই স্থান পরিষ্কৃত করিবার জন্য কুমারস্বামী মঠের অধ্যক্ষ একটি পুরাতন শিবমন্দির ভগ্ন ও বহু শিব উত্তোলন করিয়া গঙ্গাগর্ভে নিক্ষেপ করেন। স্তম্ভবপু একাধিক ষোড়শ-পলযুক্ত হওয়ায়, শিবকাণ্ড নহে। কাশী-স্থাপত্যের প্রণালী অনুসারে ইহার অধিস্থান ও বোধিকা পট্টিকাবৎ অলঙ্কারবিহীন। পুষ্পবোধিকা বা তরঙ্গবোধিকা অঙ্কন করিবার ব্যয়ভার, রেওয়ার রাণী গ্রহণ করেন নাই। অধিস্থানকে শ্রীবন্ধ বা মঞ্চবন্ধ করিয়া উৎকৃষ্ট ও দর্শনসুখপ্রদ করা হয় নাই। অন্যত্র এই সকল স্থানে, বিশেষতঃ ইহা যখন পুত্তলিকাদির আসনরূপে অবস্থান করিয়াছে, তাহার গঠন, পরিমাণ, পারিপাট্য ও শোভনীয় অলঙ্কারপ্রাচুর্য্য, সকলগুলি একত্র মনকে আনন্দরসে বিমুগ্ধ করিয়াছিল।

বঙ্গে পূর্ব্বতন স্থাপত্য সম্বন্ধে গৌরবজনক কিছু নাই বলিয়া কেহ যেন আক্ষেপ না করেন। বঙ্গভাষা যেমন অনাদি নহে, বাঙ্গালী জাতিও তদ্রূপ অনাদি হইতে পারে না। পূর্ব্বে মগধ ও বাঙ্গালা এখনকার মত বিভিন্ন ছিল না। রবিবাবু যদি লৌকিক বাঙ্গালার ব্যাকরণ গ্রহণ করাইতে সমর্থ হন, তবে অখণ্ড বঙ্গ পূর্ব্ব-পশ্চিমে দ্বিধা বিচ্ছিন্ন হইবে। পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গ, মিথিলা ও উৎকলে যে ভাষা প্রচলিত ছিল, তাহার ধাতু-প্রকৃতি, গ্রাম্য ও রূঢ় শব্দের অনেকটা মিল দৃষ্ট হয়। লিখিত হইবার প্রথা দ্বারা, ভাষা বিভিন্ন রূপ ধারণ

করে। আদি বৈদিকভাষা পরিবর্ত্তিত হইয়া যখন আরও বিভিন্ন আকার ধারণ করিতে চলিল, তৎকালে ব্যাকরণ প্রস্তুত হইয়া তাহাকে বন্ধনের মধ্যে নিক্ষেপ করিল। তৎকালের প্রকৃতিসিদ্ধ বাণী কালক্রমে ভিন্ন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিলে প্রাকৃত ব্যাকরণ রচিত হইল। গিরিব্রজে রাজগৃহস্থ গুহাশিল্প, তথা বোধিগয়ার মন্দির আমাদের মনঃপ্রসাদের কারণ হইতে পারে। আর্য্যত্বের তালিকায় সকলই এক।

মীনাক্ষী দেবস্থানের নিয়মিত বার্ষিক আয় ষাটহাজার টাকা। মত্থুরাবাসী দণ্ডশক্তির ইঙ্গিত মত পাঁচ জন বিশ্বস্ত ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিয়াছে। তাঁহারা পিণ্ডারং অধ্যক্ষ দ্বারা বিষয় ও সেবাকার্য্য নির্ব্বাহ করাইয়া থাকেন। দেবতার অলঙ্কারের মূল্য পঞ্চাশহাজার টাকা; উহা মন্দিরেই থাকে।

আমরা একদিন 'পীপল্‌স্‌ পার্ক'এ গিয়াছিলাম। সেতুর উপর দণ্ডায়মান হইয়া দৃশ্যটি কাব্য-বর্ণিত চিত্রের মত হইতেছে কি না, একবার অনুধাবন করিতে ইচ্ছা হইল।

প্রত্যাবর্ত্তনকালে শূদ্রপল্লীতে কুক্কুটের প্রাদুর্ভাব অবলোকন করিলাম। উপবীতধারী তক্ষা ও ভাস্করকে তাম্রচূড় বহন করিতে দেখিলাম। এই জন্যই এ দেশে ব্রাহ্মণেরা অপর জাতির জল গ্রহণ করেন না। পল্লীদেবী পালম্মা কেবল ইহাদের নিকট পূজা পাইতে পারেন। ব্রাহ্মণপল্লীতে শূদ্র বাস করিতে পায় না। পান্থশালায় তাহাদের জন্য পৃথক্ কোষ্ঠ নির্দ্দিষ্ট আছে। যদি এক স্থানে থাকিতে হয়, তাহা হইলে ব্রাহ্মণ পটাবরণ দিবেন। আমাদের বাসস্থানের নিম্নে সোমবতী অমাবস্যায় অশ্বত্থপূজা হইতেছিল; সেখানে শূদ্রের গমন নিষিদ্ধ। তাহাদের জন্য পৃথক্ তরু নির্দ্দিষ্ট আছে।

অনেক কারণে সহানুভূতির ব্যতিক্রম হইতে পারে। আচারভেদ,

জেতৃজিত সম্বন্ধ ও শ্বেত-কৃষ্ণ বর্ণ প্রভৃতি তাহার নিয়ামক। স্বাধীন আমেরিকায় শিক্ষিত ও সমৃদ্ধ নিগ্রোজাতীয় ব্যক্তির সহিত শ্বেতপুরুষ একত্র আহার বিহার করিতে সম্মত হন না। উপনিবেশেও সেই ভাব দৃষ্ট হয়। ভারতে তাহার ব্যতিক্রম কেমন করিয়া সংঘটিত হইবে? যে কৃপাপাত্র, সে কি সমকক্ষ হইতে পারে?

রাত্রিকালে দেখিলাম, একটি পুরুষ—তাহার মস্তকের সম্মুখভাগ মুণ্ডিত, পশ্চাদ্‌ভাগে কেশগুচ্ছ লম্বমান, মস্তকের উপর রজতকলস পুষ্পভারে অলঙ্কৃত,—রোশনচৌকী বাদ্য সহ ছন্দোবন্ধে নর্ত্তনকলা প্রকাশ করিতেছেন।

এতদ্দেশীয় লোকের প্রধান খাদ্য তণ্ডুল। 'রাগী,' 'কম্বু' ও তৈল প্রস্তুত করিবার জন্য হট্টে 'চোলম্' রাশীকৃত রহিয়াছে; এ সময় এখানে এক টাকার তণ্ডুল আশী সিক্কার ওজনের পরিমাণে ।৪ কুড়ব (সের); চোলম্ ৮• কুড়ব, রাগী ৮• কুড়ব ও কম্বু ॥৮ কুড়ব পাওয়া যায়। রাগী ও কম্বু-চূর্ণ দ্বারা রুটী ও পিষ্টক প্রস্তুত হয়। চোলম্ সরিষার মত; উহার তৈলে রাগীর বড়া প্রস্তুত করে। রাগী দরিদ্রের খাদ্য; ইহা তণ্ডুল অপেক্ষা গুরুপাক। ক্ষুদ্র বাজরামঞ্জরীর শস্যকেই কম্বু কহে।

দক্ষিণাপথে তাবৎ পুরুষের বেশ একই প্রকারের। কিন্তু ললনাকুলে তাহার বৈপরীত্য দৃষ্ট হয়। ইহাতে প্রাদেশিকতা ও বর্ণভেদতত্ত্ব নিহিত আছে। মরাঠা ও কণাড় নারীর পরিচ্ছদ একরূপ; উভয়েই কচ্ছসংযুক্ত বস্ত্র পরিধান করে। নথের ব্যবহার নাই; তাহার পরিবর্ত্তে নাসালম্বনরূপে একটি মুক্তা ব্যবহৃত হয়। সচরাচর মরকত-বিজড়িত কর্ণিকা বা উজ্জ্বল হীরক-অলঙ্কার কর্ণশোভা বিধান করে। সুবর্ণ গ্রৈবেয়ক ও কাঞ্চি উল্লেখ-যোগ্য। তাঞ্জোরে উৎকৃষ্ট মেখলা প্রস্তুত হয়। তৈলঙ্গের পাদকটকের সহিত বঙ্গীয় বাঁকমলের সাদৃশ্য আছে। পাদাভরণ কিঙ্কিণী সমস্ত্রে

আবদ্ধ। তৈলঙ্গ-স্ত্রী কচ্ছ বিস্তৃত করিয়া দেন : দ্রাবিড় ব্রাহ্মণী সম্মুখের লম্ব-মান কুঞ্চিত বস্ত্রদাম বামভাগে আলম্বিতপূর্ব্বক অদৃশ্য করিয়া বেষ্টন দেন। বস্ত্রাঞ্চল কঞ্চুকপটের উপর ঝুলিতে থাকে। কেশ পৃষ্ঠোপরি বেণীর আকারে বা বিজড়িত অবস্থায় নিম্নমুখে অবস্থিত থাকে। দ্রাবিড়-শূদ্রার কেশবন্ধন প্রণালী সাঁওতাল-অঙ্গনার মত, পশ্চাৎ দিকে এক গুচ্ছ অপরটির বিপরীত দিকে লইয়া গিয়া মধ্যে গ্রন্থি দ্বারা নিষ্কাশিত করিয়া দিতে হয়। কর্ণভূষা কদর্য্য, ছিদ্রবৃদ্ধি করাই যেন তাহার উদ্দেশ্য। সধবারা হস্ত নিরাভরণ করা অন্যায় বিবেচনা করেন না। সম্মুখের কুঞ্চিত বস্ত্র দক্ষিণে নিক্ষেপ করিয়া, কিয়দ্ভাগ কটিপার্শ্বে বহির্গত করিয়া রাখিতে হয়। তাহাদের কচ্ছদান নিষিদ্ধ। ত্রিকচ্ছ হইতে পারে না। খৃষ্টান মহিলাগণ এই নিয়মের ব্যতিক্রম করায় অন্তর্বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছিল। এই কারণে তিন্নাভেলিতে গৃহদাহ, দেবধ্বংস প্রভৃতি বহু অনর্থপাত হইয়া গিয়াছে। মস্তক পর্য্যন্ত গাত্রে শ্বেতবর্ণ দ্বিতীয় বেষ্টনবস্ত্র-প্রদান মুসলমানীদের প্রথা। দক্ষিণি হিন্দুমহিলা আমাদের নারীদের মত শিরোবস্ত্র আকর্ষণ করিয়া পুরুষকে সম্মান জ্ঞাপন করেন না।

মধুরা, ও মদুরা, ইহার কোন্‌টি প্রকৃত বা সংস্কৃত, আমি তাহা বুঝিতে অক্ষম। এই প্রকারে রামনাথকে রামনাদ বলা হয়। তামিল বর্ণমালায় অক্ষরের সংখ্যা ২৭ ; তন্মধ্যে স্বর ১২, ব্যঞ্জন ১৫ ; স্বরবর্ণ ব্যঞ্জনের সহিত যুক্ত হয় না। ব্যঞ্জন ব্যঞ্জনের সহিত যুক্ত হইয়া থাকে। অনেকগুলি অক্ষরকে মাত্রাহীন করিলে, ব্রাহ্মী বর্ণের সাদৃশ্য মিলে। ইহাতে জ্ঞান হয়, তামিল ভাষার ন্যায়, তাহার স্বতন্ত্র অক্ষর ছিল না। দ্রাবিড় বর্ণে কতকগুলি সমান্তরাল কোণ দেখিয়া চেনা যায়। মলিয়ালী বর্ণ তদ্রূপ, দেখিয়াছি। মৌর্য্য বর্ণলিপি হইতে ভারতের তাবৎ অক্ষর এক ব্রাহ্মী শ্রেণীভুক্ত। কেবল অশোকের গান্ধার অক্ষর খরোষ্ঠী। তাহা দক্ষিণ

হইতে বামগামী। সেমেটিক আরব্য বিপর্য্যস্ত লিপি সহ উহা তুলনীয় নহে। আর্য্যবংশীয় পহ্লবী নামক প্রাচীন পারস্ত অক্ষরের সহিত তাহার সাদৃশ্য আছে।

সংস্কৃত ভাষা লিখিবার জন্য গ্রন্থ-অক্ষরের সৃষ্টি হইয়াছে। শাস্ত্রীদের উচ্চারণ এমনই বিশদ যে, হ্রস্ব, দীর্ঘ, স-কার ও ব-কারের প্রভেদ শ্রবণমাত্রই হৃদয়ঙ্গম হয়। লিখিবার কালে আমাদের মত বর্ণাশুদ্ধি ঘটিতে পারে না। আবৃত্তিকালে যেখানে অক্ষর-অনুমান বা পদাংশ-যোজনা করিতে বিলম্ব হয়, সেখানে একপ্রকার কম্পিত স্বর ব্যবহার করিয়া সময় পূর্ত্তি করিয়া লন। দেশজ ভাষার সহিত কোনও সংস্রব না থাকায় গ্রন্থ-অক্ষরের উচ্চারণ বিকারগ্রস্ত নহে।

ব্রাহ্মণগণ তামিল ভাষায় সংস্কৃত শব্দ মিলাইয়া থাকেন। ইহাতে প্রাচীন ভাষা রূপান্তরিত হইয়া যাইতেছে। আদি দ্রাবিড়-সাহিত্য, জৈনগ্রন্থপ্রধান। পরিয়া-জাতীয় ভাই ভগিনীর রচিত কবিতা সমাজে বিশেষ আদর পাইয়াছে।

বিশুদ্ধ তামিল শব্দ দেখিয়া ভাষাতত্ত্ববিদ্‌গণ স্থির করিয়াছেন, আর্য্য উপনিবেশের পূর্ব্বে দ্রাবিড় জাতি অসভ্য ছিল না। তাহাদের রাজা ও গায়ক ছিল। তাহারা দুর্ভেদ্য গৃহে বাস করিত। নৌকা, ঔষধ, অঙ্ক ও ধাতু দ্রব্যের ব্যবহার হইত। তাহারা কিঞ্চিৎ জ্যোতিষ, কৃষি, বস্ত্রবয়ন, রঞ্জন ও মৃৎপাত্র প্রস্তুত করিবার জ্ঞান রাখিত। যুদ্ধে ধনুর্ব্বাণ, অসি ও পরশু ব্যবহৃত হইত। তাহাদের গ্রাম, উদ্যান ও নগর থাকার প্রমাণ আছে। দেবতা "কো"-পদবাচ্য। তাঁহার সম্মানার্থ "ইল" অর্থাৎ মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল, তজ্জন্য কর্ণাট্টকে "কোইল" কহে। "আমি প্রয়াগে যাইতেছি" এই বাক্য, দ্রাবিড় ভাষায় "নান প্রয়াগকু পোগিরেন", কর্ণাটীতে "নানু প্রয়াগিকে হোগাতেনে", এবং তৈলঙ্গী কথায়, "নেনু

প্রয়াগুকু পোণ্টামু" এই পৈশাচিক প্রকৃতি প্রাপ্ত হয়। প্রয়াগ শব্দে যে 'কু' বিভক্তি দৃষ্ট হইতেছে, তাহা হিন্দী 'কো' ভিন্ন আর কিছু নহে। আর্য্য উপনিবেশীদের প্রাকৃত ও আধুনিক হিন্দীর মূল এক; তজ্জন্য এমন হইয়াছে। স্থানাদির নাম সংস্কৃত হইলে ঔপনিবেশিক "ম" বিভক্তি ব্যবহৃত হয়। "ইগে" বিভক্তিটি কর্ণাটী। বিশুদ্ধ দ্রাবিড়ীতে বিভক্তি নাই,—উহা যেন শিশুর ভাষা। তৈলঙ্গী ব্রাহ্মণ, "পোণ্টামু" স্থলে "পোতান্নু", এবং বক্তা দ্রাবিড় ব্রাহ্মণ হইলে "পোগিরেন" না বলিয়া "পোরে" উক্তি করিবেন। ইহার কারণ আমি নির্ণয় করিতে পারি নাই, এই জন্য অদ্ভুত জ্ঞান করি। "আমি" শব্দ তিন ভাষাতেই প্রায় একবিধ, —"নান", "নান্নু", কিংবা "নেন্নু"। ক্রিয়াপদ "পোগিরেন," কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত আকারে "পোণ্টামু" হইয়াছে। "হোগাতনে" রূপের ধাতু স্বতন্ত্র।

পরিয়া (পরইআন) জাতি সামাজিক সম্মানে নিকৃষ্ট; কিন্তু ইংরাজ আধিপত্যের উৎপত্তিকালে তাহারা, যাহাকে সমাজের দক্ষিণহস্ত বলে, সেই সৌভাগ্য লাভ করিয়াছে। মুসলমান ও ব্রাহ্মণ ইহাতে নিরপেক্ষ ছিলেন। পরইআনগণ কহে,—তাহারা ব্রাহ্মণের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, সংখ্যাতেও অধিক। চর্ম্মকার প্রভৃতি পঞ্চ শিল্পী ও অন্ত্যজগণ সমাজের বামহস্ত বলিয়া কথিত হয়। স্বদেশীয় কর্ত্তৃক শাসিত জনপদে,—ত্রিবাঙ্কোড় ও মহীশূরে, পথে নায়ার ও ব্রাহ্মণ বহির্গত হইলে, পরিয়া ভ্রমণ করিতে সক্ষম নহে। যদি ঘটনাক্রমে সাক্ষাৎ হইয়া পড়ে, বা স্পর্শ হয়, রীতিমত নিগ্রহ পায়; যেন আফ্রিকায় ভারতবাসী! আমরা অন্ত্যজ স্পর্শ করিলে অপবিত্র হই, এখানে দর্শনমাত্র অশৌচ ঘটে। পরই আর অর্থে পার্ব্বত্য। উহারা অষ্টাদশ ভাগে বিভক্ত। উহাদের এক শ্রেণী অপর শ্রেণীকে আপনার মধ্যে প্রবেশ করিতে দেয় না এবং উচ্চশ্রেণীতে প্রবিষ্ট হইতেও

ইচ্ছুক নহে। বস্ত্রবয়ন, এবং শূদ্র, কৃষক ও ইউরোপীয় জনের দাস্যবৃত্তি ভিন্ন তাহার জীবিকার উপায়ান্তর নাই। পরশুরামের মাতৃমুণ্ড ও চণ্ডিকা ইহাদের উপাস্য দেবতা। ইহারা পার্ব্বতীকে স্বজাতীয়া মনে করে। দেবীর উৎসবকালে জনৈক পরিয়া পুরুষের সহিত তাঁহার বৈবাহিক তালিসূত্র বন্ধন হয়। এই জাতিতে বিস্তর শৈব বৈষ্ণব কবি ও সাধু জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। ইহাদের স্বজাতি দ্বারা দেশীয় ভাষায় যাজনক্রিয়া হইয়া থাকে। পুরোহিত জাতীয় বিবাদের মীমাংসক। তিনি অর্থদণ্ড করিতে পারেন ; কিন্তু জাতিচ্যুত করেন না।

অন্যান্য দ্রাবিড় জাতির ন্যায়, পরিয়াগণের মস্তক ঈষৎ চেপ্টা, নাসিকা অনুচ্চ ও প্রশস্ত, মুখকোণ অপেক্ষাকৃত হ্রস্ব, ওষ্ঠাধর স্থূল, মুখমণ্ডল প্রশস্ত ও মাংসল এবং মুখশ্রী কদর্য্য। অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দৃঢ়, শরীর স্থূল, বর্ণ শ্যামল হইতে ঘোরকৃষ্ণ হইয়া থাকে। সর্ব্বপ্রকার আমিষ তাহাদের ভক্ষ্য, তথাপি ইহারা সমাজের দক্ষিণহস্তমধ্যে গণ্য। বৈশ্য বর্ণের কমাটি ও লদাকু মুসলমান এই দক্ষিণ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত আছেন। সম্মান করিবার ব্যক্তি না থাকিলে স্বয়ং শ্রেষ্ঠ হইতে পারা যায় না। সমাজের বামহস্ত বিভাগে চর্ম্মকারের কর্ত্তৃত্ব প্রবল। এই সকল প্রাচীনত্বের নিদর্শন। কোন কোন পণ্ডিত সমাজের দক্ষিণ ও বামভেদে দুই ভাগ হইবার কারণ, অন্যবিধ কহিয়াছেন। তামিল ভূমিতে পূর্ব্বকালে জাতিভেদ ছিল না। আর্য্যগণ তাহা লইয়া যান। ব্রাহ্মণ-প্রভাবে আকৃষ্ট পরৈয়া পর্য্যন্ত দক্ষিণ বাহু, তদিতর বনিয়ান (তৈলী), কামাল (কর্ম্মকার), দ্রাবিড় চেটি ও তৈলঙ্গি কোমটি বাম বাহু সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হইয়াছে। ইহাদের মত পরিবর্ত্তন হইলে, উপবীত গ্রহণ করিলেও, পরৈয়া পর্য্যন্ত তাহাদের জলগ্রহণ করিত না। ইহারা রজক ও নরসুন্দর পায় নাই। বাম শ্রেণীর জাতি, দক্ষিণবিভাগের বৈবাহিক শোভাযাত্রায় যোগ দিতে নিষিদ্ধ হইয়াছিল।

আদিম নিবাসী হওয়া হেয় নহে। মনস্বী কোচবিহারের রাজা আদমসুমারীর সময় স্বহস্তে আপনাকে অনার্য্য লিখিয়া দেন। ব্রাহ্মণ-শাসনে এই প্রাচীনত্ব অমর্য্যাদার কারণ হইয়াছে। আর্য্যসমাজে বংশবৃদ্ধির প্রয়োজন রহিত হইলে, আদিম নিবাসীদের কন্যাগ্রহণ নিষিদ্ধ হইল। সমবেদনাহীন হইয়া গেল। তদবধি উহাদের শুভাশংসা লুপ্ত হইয়াছে। বৈদেশিক প্রভাবে ইহার প্রতিকার হইতে পারে।

বদরিকাশ্রম, দ্বারকা, পুরুষোত্তম হইয়া অবশেষে চারি ধাম সম্পূর্ণ করিবার জন্য রামেশ্বরে আসিতে হয়। আমরা "টপাল" অর্থাৎ ত্বরিত অশ্বযানে আরোহণ করিয়া রামনাদ অভিমুখে যাত্রা করিয়াছি। পথে, কাশীর দেবদর্শনার্থ যাত্রাগতপ্রাণ বঙ্গীয় বিধবাগণ পদব্রজে চলিয়াছেন, দেখিতে পাইলাম। মধ্যে এক পান্থনিবাসে থাকিতে হয়। তথায় এক ভৈরবীর সহিত আমাদের আলাপ হইল। রুদ্রাক্ষবিক্রেতাও আসিয়াছে। এই স্থান সেতুপতির অধিকারভুক্ত। তাঁহার সিংহাসন তথাকথিত বানরগণ কর্ত্তৃক আনীত একখানি কৃষ্ণপ্রস্তরের উপর স্থাপিত। রাজা সেই বানর-বংশে জন্মগ্রহণ করিযাছেন বলিয়া পরিচয় দেন। পূর্ব্বে শিব-গঙ্গায় ও রামনাথে সেতুপতির বৃষভ-লাঞ্ছিত মুদ্রা প্রচলিত ছিল। সৈকত প্রান্তর হইতে সুদূরে এক বৃহৎ মণ্ডপে রাক্ষসবৎ প্রকাণ্ড শ্যামল মূর্ত্তি রক্ষিত হইয়াছে কেন, তাহা উপলব্ধি করিতে পারিলাম না। মধুর রামকথা স্মরণে আসিতে লাগিল।

রামেশ্বর দ্বীপ।—আমাদিগকে পম্বন প্রণালী নৌকায় পার হইতে হইবে। বাল্মীকি এ স্থলে কহিয়াছেন ;—

আকাশমিব দুষ্পারং সাগরং প্রেক্ষ্য বানরাঃ।
নিষেদুঃ সহিতাঃ সর্ব্বে কথং কার্য্যমিতি ব্রুবন্॥

এই বিবরণে ঐতিহাসিকতা থাকিলে, রামচন্দ্রের অনুচরগণ বানরবৎ

দ্রাবিড়দিগকে আর্য্যীকৃত করিয়া মনুষ্যত্ব প্রদান করিয়াছিলেন, বুঝিতে হয়। আমরা সমুদ্রে ভাসিলাম। সেতু কল্পনার সামগ্রী নহে। রসাতল হইতে উত্থিত জলমগ্ন শৈলশ্রেণী দৃষ্ট হইল। চত্বারিংশৎ বৎসর পূর্ব্বে পরপারস্থ মণ্ডপে রামেশ্বরের সচল মূর্ত্তি পম্বন দ্বীপ হইতে সেতুর উপর দিয়া স্থলপথে উৎসব উপলক্ষে যাতায়াত করিতেন। বাষ্পীয় পোতের গতি বিধির জন্য, ইংরাজ স্থপতি সেই পথ বিদীর্ণ করিয়াছেন। সময়ে বালুকা নিষ্কাষিত করিবার প্রয়োজন হয়। প্রতি বৎসর মৌশুমী বায়ুর সাহায্যে মুসলমান নাবিক এতদ্দেশীয় দ্রব্যসম্ভারপূর্ণ তরণী কলিকাতায় লইয়া গিয়া থাকে এবং জগন্নাথের ঘাটে অবস্থিতি করে। আমরা কূলে অবতীর্ণ হইয়া পার হওয়া সহজ মনে করিলাম। এখন "সংসারমিব নির্ম্মমঃ" কহিতে পারি। করপত্রবৎ নাগদ্বীপের ভিন্ন দিকে সমুদ্রের ভিন্ন ভাব; দক্ষিণে অতি প্রশান্ত মূর্ত্তি। তরঙ্গমালা ধীরে ধীরে যাইয়া কূলসংলগ্ন হইতেছে। শঙ্খ-শম্বুকাদি বিচিত্রবর্ণ প্রাণী তীর বহিয়া উঠিতেছে; বেলাভূমিতে বিস্তৃত হইয়া পড়িতেছে। পশ্চিমে সে ভাব নহে। ভয়ানক কাণ্ড! সমুদ্রোর্ম্মি উন্মত্তের ন্যায় লম্ফ প্রদান করিতেছে। নানা প্রকারের মৎস্য মকরাদি ক্রীড়া করিয়া বিচরণ করিতেছে। উড্ডীয়মান মৎস্য পক্ষবিস্তারপূর্ব্বক লম্ফ দিয়া উঠিয়া পুনরপি জলে মগ্ন হইতেছে। দ্বীপমধ্যে নারিকেলকুঞ্জে মৎস্যজীবিগণের বাস। তাহার পর আদম সেতু, মান্নার পর্য্যন্ত গিয়াছে। সেখানে লঙ্কার পরিখাস্বরূপ মহার্ণব বিক্ষিপ্ত। এই দিক্ যেমন বৃক্ষলতাদিপরিপূর্ণ তেমন আর কোনও ভাগ নহে। পক্ষীর কলরবে তাহা মুখরিত হইতেছে। তুত্তিকুড়ির সম্মুখে, খ্রীষ্টান্ জালজীবিগণ মুক্তা আহরণের জন্য শুক্তি সংগ্রহ করে। "ঐ যে শৈলখণ্ডটি সমুদ্রজলে ধৌত হইতেছে, উহার গাত্রে, নারিকেল-শস্যের ন্যায় একপ্রকার শুভ্র পদার্থ লক্ষিত হইতেছে। এগুলিও প্রাণী। ইহারা গতিশক্তিবিহীন।"

যেমন অম্বুরাশি উহার উপর দিয়া গেল, অমনি উহারা মুখব্যাদন করিয়া কীট-উদ্ভিজ্জাদি ভক্ষণ করিয়া ফেলিল। পৃথিবীর যাবতীয় জীব ইহার পরিণতি হইতে সমুৎপন্ন।" জাল ফেলিলে তাহাতে আটার মত এই জীব, কপর্দ্দক, কর্কটী ও নানাপ্রকারের স্বচ্ছ জীব তুলিতে পারা যায়। আমরা ভ্রমণ করিতে করিতে মহোদধিতীরে স্পঞ্জ-জাতীয় বিবিধ জীবের কোষ আহরণ করিয়া মহা আমোদ বোধ করিলাম। শ্বেত প্রবালকীট কি সুন্দর! গৃহশোভার জন্য ইহা ব্যবহৃত হইবার যোগ্য। স্বভাবের স্বহস্তনির্ম্মিত প্রস্তরক্ষোদিতবৎ কারুকার্য্য, এমন অন্য কুত্রাপি দৃষ্ট হইবার নহে। ছত্রাকার পুষ্পের মধ্যে পত্রবিতানতলে শিরাসহযোগে স্তরক্রমে কত অংশপরম্পরা রচিত হইয়াছে। প্রবাল বালুকাযুক্ত হইয়া প্রস্তর নির্ম্মিত করে। বেলাভূমিতে আলোকস্তম্ভের দিকে অগ্রসর হইয়া, বহুদূরব্যাপী স্থানে তাহার ভগ্ন অংশ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত দেখিলাম। বাষ্পীয় পোতের গতিবিধি নির্ণয় করিয়া দিবার জন্য এখানে এক জন দ্রাবিড়-জাতীয় তরিক বাস করেন। তাঁহার নাম নাগলিঙ্গম্। তিনি আপনাকে রাবণবংশীয় বলিয়া পরিচয় দেন। আমাদের হস্তে লঙ্কাপতি হেয়ভাবে চিত্রিত হওয়াতে তিনি দুঃখিত। বানর ও রাক্ষস, উভয়েই আদিম ভারতবাসী। লঙ্কাবতার সূত্রে রাবণ প্রতাপশালী বৌদ্ধ নরপতি বলিয়া বর্ণিত।

রত্নাকরের তরণস্থান হইতে যোজনান্তে দেবালয়। কয়েক ধনু অগ্রসর হইলে, উপাধ্যায় আমাকে চন্দনচর্চ্চিত করিয়া পুষ্পমালা পরাইয়া দিলেন। রামেশ্বরের দ্বারের দুই পার্শ্বে সিংহলের রাণী কর্ত্তৃক প্রদত্ত দ্বিরদ-দন্ত উত্তানভাবে রক্ষিত। কদলী, নারিকেল ও দাড়িম্বে গ্রথিত চন্দ্রমল্লিকা প্রভৃতি পুষ্পে গৃহ সজ্জিত। ফুলের বেশে হিরণ্যগর্ভ মহাদেব আচ্ছন্ন আছেন। মৌলিতে হিরণ্য শেষ কয়েকটি ফণা বিস্তার করিতেছে। তিন

হস্ত দেবমূর্ত্তির এক সচল বিগ্রহ নিশীথে পার্ব্বতীর গৃহে গমন করেন। মন্দিরগাত্রে ধনুর্দ্ধারী রাম, সীতা, সত্য ও কলিযুগের মূর্ত্তি। কলি স্ত্রীকে স্বীয় স্কন্ধে উত্তোলন করিয়া মাতাকে তাড়না করিতেছে।

শ্রীরঙ্গম্।—ত্রিশিরাপল্লীতে (Trichinapolly) রেল হইতে অবতরণ করিরা আমরা এই ব-দ্বীপে উপনীত হই। আদৌ যাহা বক্তব্য, শ্রীরঙ্গমাহাত্ম্যের ভাষায় তাহা কীর্ত্তন করিব,—

সপ্তপ্রাকারমধ্যে সরসিজমুকুলোদ্ভাসমানে বিমানে
কাবেরীমধ্যদেশে মৃদুতলফণিরাট্‌শেষপর্য্যঙ্কভাগে।
নিদ্রামুদ্রাভিরামং কটিনিকটশিরঃ পার্শ্ববিন্যস্তহস্তং,
পদ্মাধাত্রীকরভ্যাং পরিচিতচরণৌ রঙ্গনাথং ভজামি।"

কথিত আছে,—সপ্তম শতাব্দীতে, চোলরাজ কর্ত্তৃক দেবায়তন নির্ম্মিত হয়। বিজয় রঙ্গনায়ক তাহা বর্দ্ধিত করিয়া দেন। ফরাসীগণ বৃটিশ-বাহিনীর ভয়ে এক সময় দুর্গরূপে ব্যবহার করিবার জন্য আরও প্রাকার বাড়াইয়া যান। তিন প্রাকারের মধ্যে গ্রাম। চতুর্থে দেবস্থান।

বৈকুণ্ঠ উৎসব উপস্থিত দেখিয়া, আমি চিত্রিত-ললাট, কোলাহলমগ্ন, আচার্য্যমণ্ডলী ভেদ করিয়া উচ্চমণ্ডপতলে গমন করিলাম। বিচরণশীল মূর্ত্তির আরতি হইতেছে। রৌপ্য-ঘটের উপর বৃহৎ বর্ত্তিকা প্রজ্বলিত। দেব-অঙ্গে মুক্তাবলীর মধ্যে হীরক-দোলক, যেন কৌস্তুভের মত ভাস্বর। ইহা অনেক দিন মনে থাকিবে। অদ্যতন রাত্রের কার্য্য শেষ হইলে এক জন দীর্ঘশিরস্ত্রাণধারী ও অঙ্গরক্ষাবৃত প্রতিহারী জনতা ভঙ্গ করিয়া দিল। নারায়ণ শয়নকক্ষে গমন করিলেন। আমরা প্রতিবেশীর মত নির্দ্দিষ্ট স্থানে যাইয়া উপস্থিত হইলাম। ঘৃতপক্ক কলায়ের ডাইলের লবণাক্ত লুচির মত আকৃতির বড়া ও মালপুয়া সেবা দিয়া নিশা পোহাইলাম। আচারিগণের মৃদঙ্গ করতালিসংযুক্ত গীতধ্বনিতে নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছিল।

দ্রাবিড়—শ্রীরঙ্গম

(ভারত প্রদক্ষিণ)
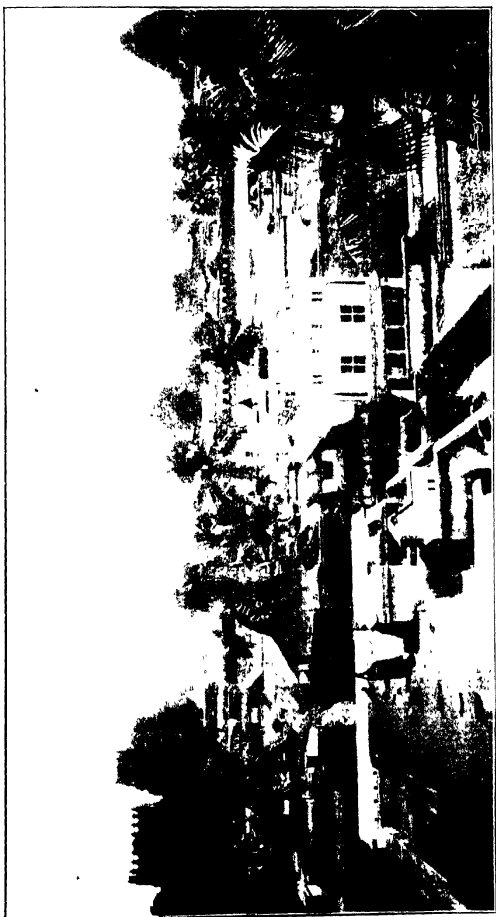
ইংলণ্ডীয় যুবরাজের প্রদত্ত অর্থে নির্ম্মিত গোপুরের পুত্তলিকাগুলির মুখে ভাব আছে, যেন শোণিত শিরার কিঞ্চিৎ আভাস মিলে। স্থানবিশেষে উজ্জ্বলবর্ণসংযোগে আরও শ্রীসম্পন্ন হইয়াছে। মারুতিকে পুষ্পসজ্জা দিয়া, সম্মুখে ফুলের চন্দ্রাতপ করিয়া, আরও সুন্দর করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইল। মিষ্ট ভাত, খেচরান্ন ও মোহনভোগের গোলক বিক্রীত হইতেছে। তাহার এক পার্শ্বে ঘোল খাইবার সামগ্রী আছে।

অর্জ্জুনমণ্ডপ কদলীবৃক্ষ ও সহকার-পল্লবে শোভিত হইয়াছে। রামানুজ ও পরবর্ত্তী গুরুগণের ধাতুময় সালঙ্কৃত বিগ্রহ সিংহাসনে বসাইয়া, আচারিগণ স্কন্ধে বহন করিয়া শ্রেণীবদ্ধভাবে রাখিয়া দিলেন। উৎসব দ্বাবিংশতি দিন স্থায়ী হইবে। যাত্রীদের জন্য সোলার সাজ দিয়া অষ্টচ্ছদি-আবাস নির্ম্মিত হইতেছে। জনপদের অন্য ভাগে জম্বুকেশ্বর শিব দর্শন করিয়া আসিলাম। ইহা পঞ্চমূর্ত্তির অন্যতর অপ্-মূর্ত্তি। মন্দিরের মধ্যে অন্য কোনও আকার নাই। একটি উৎস হইতে জল নির্গত হইতেছে।

বৈচিত্র্যে কে না আকৃষ্ট হয়? পাণ্ডিত্যের সহিত যে কোনও মত প্রচার করিতে পারিলে, তাহার অনুবর্ত্তী সংগ্রহ করা দুরূহ হয় না। প্রতিবাদ দ্বারা, উহাতে যে সার আছে, এইরূপ প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। রামানুজ আচার্য্য, মহম্মদের মক্কা হইতে পলায়নের মত, কৃমীকান্ত চোলের ভয়ে এ স্থান ত্যাগ করিয়াছিলেন। তিনি অখিল ভারতে শ্রীসম্প্রদায় স্থাপনপূর্ব্বক প্রত্যাবৃত্ত হন। ১০১৭ খ্রীষ্টাব্দে চিঙ্গলপট প্রদেশে পরম্বদূর গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। বিদ্বান্ কেশব ত্রিপাঠীর পুত্র প্রতিভাবান্ রামানুজ বাল্যজীবন এই শ্রীরঙ্গে অতিবাহিত করিয়াছিলেন। যখন তখনই তিনি বিষ্ণুপ্রেমে আত্মহারা হইতেন। বিবিধ রঙ্গাবতারক নারায়ণ দক্ষিণে রঙ্গনাথ হইয়াছেন। আচার্য্য সেই রঙ্গে বৌদ্ধ জৈন অনেককে মুগ্ধ করিলেন। কত তীর্থঙ্কর ধূলিসাৎ হইয়া গেল। মানুষের স্বাভাবিক

আয়ুষ্কাল পূর্ণ হইলে, যতিরাজ এখানেই দেহরক্ষা করিলেন। তাঁহার ৭০ জন গৃহস্থ শিষ্য পীঠাধিপতি হইয়াছিলেন। তাঁহারা বড়গল ও পিঙ্গল শাখায় বিভক্ত হইয়া উপদেশ বিতরণ করিতেছেন। দুই দলের বৈরিতার জন্য একটি বিগ্রহ অপহৃত হয়! তজ্জন্য দণ্ডশক্তির আশ্রয় লইতে হইয়াছিল।

পিঙ্গল সম্প্রদায়ের গুরুপাট কেরল ও দ্রাবিড়ের মধ্যসীমায় তোতাদ্রি নামক স্থানে অবস্থিত। ইহার প্রধান আচার্য্য এক জন যতি। তিনি শ্বেত-বহির্ব্বাস-পরিহিত দণ্ডী। ইঁহাদের দুই বা তিন দণ্ড একত্র বদ্ধ করিয়া ব্যবহার করিবার নিয়ম আছে। দেবতার কফি ফলের ক্ষেত্র লাভজনক। ভক্তগণ মনস্কামনা পূর্ণ হইলে, নারায়ণকে দ্রোণপরিমিত তৈল দ্বারা স্নান করাইয়া থাকে। চর্ম্মরোগ-প্রশমনের জন্য ইহা ব্যবহৃত হয়। হিন্দুস্থানী রামাৎ এই মঠের শিষ্য। চৈতন্য মাধ্ব-সম্প্রদায়ের শিষ্য হইলেও, বাঙ্গালী বৈষ্ণবকে এখানকার শ্রীসম্প্রদায়ের মত শৈবের সহিত সম্বন্ধ রাখিতে দেখা যায় না। প্রেম ভক্তি বিভাগ করিলে, উহা গাঢ় থাকে না।

এই বংশজাত নড়াদু রঙ্গাচার্য্যের সহিত আমি সাক্ষাৎ করি। তিনি শতাবধানী। এককালে অনেক কার্য্যে মন দিতে পারেন; অথচ তিনি কবি। ক্রীড়া, গণনা ও গল্প এক সঙ্গে হইতেছে; এমন সময় কেহ কহিল,—গৃহে অগ্নিদাহ উপস্থিত; তথাপি অবধানী উদ্‌ভ্রান্ত হইলেন না। আমি একত্র বিভিন্ন শ্লোকের পাঁচটি অংশ দিলাম, তিনি তৎক্ষণাৎ প্রত্যেক ভাগে এক এক বিচ্ছিন্ন চরণ বলিয়া যাইতে লাগিলেন। যোগ করিয়া দেখিলাম, চমৎকার সদর্থপূর্ণ চ্যুতসংস্কৃতিবিহীন কবিতাপঞ্চক প্রস্তুত হইয়াছে।

দেবস্থান। *

দাক্ষিণাত্যে দেবালয়ের সংখ্যা অধিক। তাঞ্জোর ও চিদম্বরের প্রসিদ্ধি শুনিয়াছি। শেষোক্ত স্থলে শিবের ব্যোমমূর্ত্তি। গর্ভস্থানে শূন্য, কিছুই নাই। তথাকার মণ্ডপস্থ স্তম্ভশিরে প্রস্তরের অদ্ভুত শৃঙ্খল একের পর আর একটিতে দোদুল্যমান হইয়া রহিয়াছে। মহাবলীপুরের মত পর্ব্বতের অভ্যন্তর ও বহির্ভাগ খুদিয়া, আগার প্রস্তুত হইয়াছে। হিন্দু-দেবতা নিরাকার হইতে পারেন, ইহা জানিয়া, টিপু সুলতান আনন্দ-সহকারে লক্ষ টাকা মূল্যের স্বর্ণ মাল্য উপহার দেন।

কুম্ভকোনম্ আসিয়া বেলাঙ্গিমন গ্রামে গোবিন্দ চেট্টি মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইল। 'তত্ত্ববিশ্বাসী' পত্রে এই পিশাচসিদ্ধ ব্যক্তির অতুল ক্ষমতার বিষয় পাঠ করিয়াছি। আমরা দ্বিভাষী সংগ্রহ করিয়া, গন্তব্য স্থানে উত্তীর্ণ হইলাম। দৈবজ্ঞ উত্তর লিখিয়া দিয়া, পরে সার্থকতা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলেন। সচরাচর লোকে যাহা চায়, আমার প্রশ্ন তদ্রূপ ছিল না। আমার নাম কি, তিনি বলিবেন, এই প্রশ্ন ছিল, কিন্তু তিনি পারিলেন না।

অন্যত্র, এক দেবীসিদ্ধ খ্যাতনামা বহু সম্ভ্রান্ত শিষ্যের গুরুর নিকট গিয়াছিলাম। তিনি কহিলেন, "একার্য্যে অনেক অপ্রিয় সত্য ভাষণ করিতে হয়; যাহা হউক, তুমি আমার স্বদেশী, তোমার জন্য গণনা না করিলে চলিবে না। কল্য আসিও।" অথচ, আমি সেজন্য যাই নাই।

অন্যের অনুভব জানিবার ক্ষমতা আমি কলিকাতায় প্রত্যক্ষ করিয়াছি।

---

* পুষ্পাঞ্জলি—ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রণীত।

যতদিন দেখি নাই, তাহা সত্য বা মিথ্যা, সে বিষয়ে কোন চিন্তা করিতাম না। অধ্যাপক গসী নাট্যক্ষেত্রে শ্রীমতী রোকে দণ্ডায়মান করাইয়া দিলেন। একবার তাঁহার মুখের দিকে হস্তচালনা করায়, বিবির অক্ষি গোলক বিদ্যুদ্‌বেগে কম্পিত হইল। অধ্যাপক তখন করবস্ত্র দ্বারা তাঁহার নেত্র বন্ধন করিয়া দিলেন। মহিলাকে কয়েকটি সোপান অবতরণ করিয়া পশ্চাৎ-মুখী হইতে দেখিলাম। শ্রীমতীর দ্বারা যে অনুভব প্রকাশ করিতে হইবে, তাহা লিখিত ছিল; সম্মোহনকারী মহাশয়, দর্শক-সমাজে প্রবিষ্ট হইয়া, তাহা দেখিয়া লইলেন। পরে তিনি প্রত্যাগত হইবামাত্র, বিবি সম্মুখীন হইয়া, অগ্রসর হইলেন। সেই শ্মশ্রুল নরপুঙ্গব, পশ্চাতে আছেন। তাহার পর উদ্দিষ্ট ব্যক্তির সন্নিধানে যাইয়া অভিপ্রেত কার্য্য করিয়া দিলেন। প্রত্যেকবার তাড়িত চালনা করিতে হইয়াছিল। একজন, সাহেবকে দেখাইয়া, জনাস্তিকে কহিয়াছিল, "আমার অঙ্গরক্ষার মধ্যে এই চর্ম্মকোষ আছে, তন্মধ্যস্থ মুদ্রা কিয়দ্দূরে উপবিষ্ট অমুককে দিয়া, তাহার গণ্ডে চপেটাঘাত করিতে হইবে।" বিবি ঠিক তাহাই করিয়াছিলেন! সাধক, উপস্থিত এক দর্শকের মধ্যে আপন শক্তি চালিত করিয়া কহিয়াছিলেন, "তুমি যৎকালে সঙ্গে যাইবে, কি করাইতে হইবে সেই বিষয় একাগ্র হইয়া চিন্তা করিও।" ফল কিন্তু সন্তোষজনক হইল না। অপরের দ্বারা পরে সেই কার্য্য হইয়াছিল। শুনিয়াছি, ক্যালি-ফর্ণিয়ার বাতাবরণের গুণে, এ প্রকার সিদ্ধির জন্য তথায় অধিক তপস্যা করিতে হয় না। বহিঃস্থ কোন শক্তি, পিশাচ বা দেবতার প্রয়োজন নাই। জীবের মধ্যেই, উক্ত ক্ষমতা বর্ত্তমান আছে; অনুশীলন দ্বারা তাহার বৃদ্ধি করিতে হয় মাত্র।

কুম্ভেশ্বরের প্রস্তর-মন্দির রথের মত। শঙ্খ-চক্রাঙ্কিত পাষাণ চক্র তাহার নীচে যোজিত আছে। সারঙ্গপাণীতে, আদিরসঘটিত মূর্ত্তি

প্রচুর সমাবেশ দৃষ্ট হইল। আমরা যে আশ্রমে ছিলাম তথায় একখানি মাত্র খর্পর-ছাদ পৌরগণের পল্লী ব্যাপ্ত করিয়াছে। আমাদের কোন দ্রব্যের প্রয়োজন হইলে, মন্দিরের মধ্যে তাহা ক্রয় করিতে যাইতাম। কোথাও নূতন বসতি করিয়া দিতে হইলে, অথবা একটি দেবালয় নির্ম্মাণ করিয়া দেওয়া অবশ্যপ্রয়োজনীয় হইলে, কিছুকাল পরে, তাহার প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে একখানি মাহাত্ম্য লিখিয়া দিতে হয়। এই প্রকারে দেশে পুরাণ-সৃষ্টি চলিতেছে।

আমাদিগকে মহাবলীপুর যাইতে হইবে। চিঙ্গলপট্টের মরুভূমিতে পথের উভয় পার্শ্বে, নারিকেল বৃক্ষশ্রেণী ছায়া ও শোভাপ্রদ হইয়াছে। তিন চারি হস্ত পরিমিত তরুকে ফলপ্রসূ দেখিয়া বড় আনন্দ হইল। ভগ্ন দুর্গে, বন্দি বালকদিগের সংশোধন-কারা প্রতিষ্ঠিত আছে। দণ্ডের উদ্দেশ্য শাস্তি নহে; তাহা এখানে প্রতিপন্ন হইল। যাহাতে ব্যক্তি-বিশেষের হানি হয়, তাহা অপরাধ; যাহা সমাজের অহিতকর, তাহা নীতিবিরুদ্ধ দোষমাত্র। পূর্ব্বে যাহা রাজদণ্ডের যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে অনেকগুলি এখন কেবল নীতিবিরুদ্ধ দুষ্কর্ম্ম বলিয়া গণ্য হইতেছে। অপরাধী বাসন-নির্ম্মাণ, বস্ত্রবয়ন ও তক্ষার কার্য্য শিক্ষা করিয়া সংসারে ফিরিবে।

গয়ার বিচ্ছিন্ন গণ্ডশৈলের মত, ত্রিগুণ্ডবেদাচলোপরি "পক্ষিতীর্থ" প্রতিষ্ঠিত আছে। মধ্যাহ্নে, শ্যেনমিথুন আহূত হইয়া অন্নগ্রহণ করিলে, তবে যাত্রীরা প্রসাদ পায়। আমরা অপরাহ্নে শৈলে উঠিয়াছিলাম, তখন সে ব্যাপার অতীত হইয়া গিয়াছে। সংসারে পক্ষীর বিশেষ উপযোগিতা আছে। উহারা কেবল মনুষ্যের ক্রীড়ার সামগ্রী নহে। পরন্তু উহারা ক্ষেত্রের বীজ-সংহারকারী কীটগণকে বিনষ্ট করে এবং বৃক্ষনাশকারী কীটগণকে ভক্ষণ করে। উহাদের ন্যায় ভ্রমণকারী আর নাই। শীত-

কালে উহারা ইয়ুরোপ হইতে গঙ্গাতীরে আইসে। চারি-অঙ্গুলী-পরিমিত জীব, আপন দৈহিক তাপ রক্ষার উদ্দেশ্যে, বৎসরে দুইবার দেড় হাজার ক্রোশ ভ্রমণ করে! পক্ষীর ক্ষুদ্র শরীর দ্বারা মনুষ্যের কতই উপকার হইতেছে! অতি ক্ষুদ্র উদ্ভিজ্জজীবাণু, নানা পীড়ার নিদান বলিয়া আমাদের বিশেষ বৈরী হইলেও, তদ্দ্বারা উপকার আছে। প্রাণীর মৃতদেহ তৎপ্রাসাদে রূপান্তরিত হইয়া ভূভার হরণ করে। বিবেচনা করিতে গেলে, ইহারাই শণ, পাট প্রভৃতির পুষ্টিবর্দ্ধনের অন্যতম সাধন; ছানা দধি প্রভৃতি গব্যদ্রব্য জীবাণুর প্রসাদেই প্রস্তুত হইয়া থাকে।

প্রাতরাশ গ্রহণ করিয়া, আমরা সালাব নদীতে পটমণ্ডিত নৌকায় আরোহণ করিলাম এবং পূর্ব্ব উপকূলে কুল্যাদ্বারা অম্বুধির পার্শ্বে উপনীত হইলাম। বলি রাজা ত্রিভুবনের অধীশ্বর ছিলেন, তাই বামনকে ত্রিপাদ বিস্তার করিতে হইয়াছিল। আমি যথায় অবতরণ করিলাম, উহা একটি পর্ব্বতখোদিত দেব-নগরী; উহার কিয়দংশ, ভূমিকম্পে সমুদ্র-গর্ভে প্রবিষ্ট হইয়াছে। এই বনপূর্ণ স্থানে, বোধ হয় শ্বাপদের অভাব নাই। নাবিকেরা সমুদ্র হইতে যে সূর্য্যাদির সপ্ত মন্দির দেখিতে পায়, তাহা চুলুক-শৈলে অভিষিক্ত নৃপতিকর্ত্তৃক ইষ্টকাদি উপকরণে গঠিত। ইহার বাহ্যাভ্যন্তর ভাগ শৈল কর্ত্তনে নির্ম্মিত; এতাদৃশ স্থপতি-কার্য্যের উৎকর্ষ অন্যত্র দৃষ্ট হয় না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। খোদিত স্থাপত্যে বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ-শিল্পের বিশেষ লক্ষণ সকল এখানে সুপ্রাপ্য। যাঁহারা, অভ্র ও মণির আকর, 'গ্র্যানাইট্' পাষাণ-স্তরে, এই দ্রবিড়ের অতি প্রাচীন কীর্ত্তি, অজস্র অর্থ ও সময় ব্যয় করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, সেই সকল ব্যক্তি অবশ্য মহাশক্তিশালী। নয় খানি রথ ও ত্রয়োদশটি গুহা—দূরে দূরে। একটি বিমানের নিম্নভাগে, দশভুজার মহিষাসুরসহ যুদ্ধ, কৃষ্ণের গোষ্ঠলীলা প্রভৃতি অঙ্কিত আছে। রৌদ্রের প্রকোপে, বলির স্বর্গ,

মহাবলীপুরম্—পর্ব্বতখোদিত প্রাচীর

(ভারত প্রদক্ষিণ)
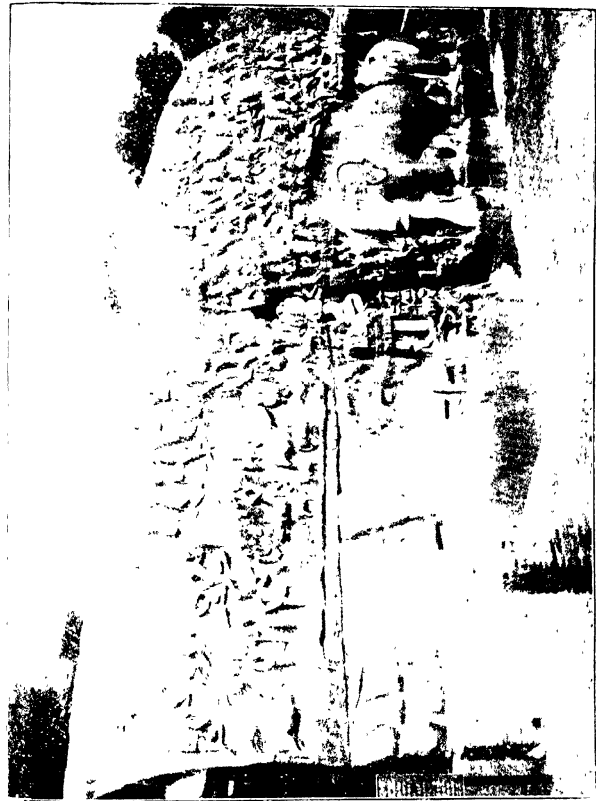
পর্ব্বতোপরিস্থিত গুহক-আয়তন এবং পাতালের তোয়নিধি-প্রবিষ্ট দেবস্থান দর্শন করা ঘটিল না। "কোইল" বা কর্ণাট্ট, তোরণ ভিন্ন বিমানরূপে প্রায় ব্যবহৃত হয় না। সারঙ্গপাণীতে ও এখানে, শেষোক্ত উদ্দেশ্য রক্ষিত হইয়াছে। এই রথ পল্লবদিগের দ্বারা সপ্তম শতাব্দীতে গঠিত হইয়াছে, কিন্তু যেন আজি কালি প্রস্তুত বলিয়া ভ্রম হয়! ভাস্কর কিছু কিছু করিয়া পাষাণ বিদীর্ণ করিতেছিল, যেন অকস্মাৎ টঙ্ক ত্যাগ করিয়াছে;—সে শিল্পী আর প্রত্যাগমন করিবে না; তাহার প্রভুও কত শত বৎসর হইল লোকান্তরিত হইয়াছেন। কোন বিমানের বাহির খোদা হইয়াছে, অভ্যন্তর অবশিষ্ট আছে। স্থানটি এমনই সমতল, যেন অন্যত্র হইতে এক এক খণ্ড সুবৃহৎ প্রস্তর আনয়ন করিয়া কক্ষ খোদিত হইয়াছে এবং বৃষ, হস্তী ও সিংহের বিশাল মূর্ত্তি নির্ম্মিত হইয়াছে। তন্মধ্যে আমরা কিছুকাল বিশ্রাম করিলাম। যে দেশে এবংবিধ বিমান বিরচিত হইতে পারে, তথাকার লোকের মনে চিরকাল আত্মাদর থাকিবে। তাহারা আবার কীর্ত্তিস্তম্ভনির্ম্মাতা হইতে পারিবে। মানবের উচ্চাভিলাষ কদাচ বিলুপ্ত হইবে না; নিন্দিত অধঃপতিত হইলেও সে আপনাকে প্রধান বলিয়া জানিবে। এক জন্মে না হয়, দশ জন্মে পুরুষানুক্রমে সঞ্চিত মহোন্নতির মহৎ আকাঙ্ক্ষার অবশ্যই সিদ্ধি আছে।

কাঞ্চী।—আরকোনম্ হইতে দক্ষিণ-ভারতীয় লৌহপথ আমাকে এখন পৃথক্ দৃশ্যের মধ্যে উপস্থিত করিয়াছে। ধান্যক্ষেত্র বর্ষায় প্লাবিত হইয়াছে; তন্মধ্যে তাল ও খর্জ্জুর বৃক্ষ। রঞ্জিত গোপুরগুলি শকটের উপর হইতে দৃষ্ট হইয়া উদ্দিষ্ট স্থানের পরিচয় দিল।

কাঞ্চী, শিব ও বিষ্ণুর নামে দ্বিধা বিভক্ত। যে কেশরি বংশ দ্বারা ওড্রমণ্ডলের একাম্রকাননে ভুবনেশ্বর স্থাপিত, সেই কুলের এখানেও

আধিপত্য ছিল। শিব-কাঞ্চীর সেবিত দেবতা একাম্রনাথের ক্ষিতিমূর্ত্তি, —জলাভিষেক করা হয় না। 'কামাখ্যা'র হস্তে কুক্কুট! প্রাঙ্গণে তিন শত বৎসরের এক আম্রবৃক্ষ আছে। তন্মূলে, পার্ব্বতী হস্ত দ্বারা শিব-চিহ্ন ধারণ করিয়া আছেন। চতুর্দ্দিকে শিবালয়; শঙ্করাচার্য্যের সমাধির উপর তাঁহার প্রতিমা বিরাজিত। তামিল শ্রেষ্ঠিগণ দ্বিলক্ষ মুদ্রা ব্যয়ে মন্দিরের সংস্কার করিয়া দিতে মনস্থ করিয়াছেন।

বিষ্ণু-কাঞ্চীর পথে নারিকেল তরুশ্রেণী। গৃহ ও স্তম্ভগুলি সমাকার। ছাদ ইষ্টকের। আমরা যাঁহার আলয়ে উপস্থিত হইয়াছিলাম, তিনি সংস্কৃত ভাষায় কথা কহিতে লাগিলেন। দক্ষিণে এই পুরী, শাস্ত্রচর্চ্চার জন্য প্রসিদ্ধ। দেহাবসানে, কাশীর মত এখানেও মুক্তির জন্য অনেকে বাস করিতেছেন।

তৃতীয় প্রকোষ্ঠে, দ্বিতলোপরি, বরদারাজের অচল ও সচল মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। আমরা অর্গল হইতে তালক উন্মোচন করাইয়া, কর্পূর-আলোকে দেব দর্শন পাইলাম।

একাদশ শতাব্দীতে, নারায়ণের অনুকম্পায় গঙ্গা গোপাল রাও পুত্রবান্ হইয়াছিলেন। শিবমন্দির ভগ্ন করিয়া, সেই উপকরণে ঐ বিষ্ণু স্থাপনালয় গঠিত হইয়াছে; সুতরাং বিগ্রহের নিরুক্তি বরদ হইতে পারে। বিজয়নগরাধীশ কৃষ্ণ রায়কে, স্বর্ণ মণ্ডপ নির্ম্মাণ ও বরদ স্বামীর সেবার্থ, তিনি সহস্র টাকা আয়ের কয়েকখানি গ্রাম দান করিয়া যান। মান্দ্রাজ-গবর্ণমেণ্ট হইতেও বার্ষিক নয় সহস্র টাকা মিলে। দেবমূর্ত্তির কান্তিবর্দ্ধক মণি-মুক্তার মূল্য লক্ষাধিক মুদ্রা। তন্মধ্যে, ক্লাইবপ্রদত্ত একখানি কণ্ঠাভরণ আছে। অত্রত্য মণ্ডপ, সহস্রের পরিবর্ত্তে, ষট্ নবতি স্তম্ভযুক্ত। ইহা এক খণ্ড পাষাণ ভেদ করিয়া নির্ম্মিত। তাহাতে প্রস্তর-কর্ত্তিত শৃঙ্খল দোদুল্যমান। অন্য স্থান হইতে প্রস্তর

সংগ্রহ করিয়া, শিল্পী, জনাশ্রয়ে যতদূর নৈপুণ্য প্রকাশ করিতে পারিতেন, ইহাতে তাহার অভাব ঘটে নাই। ছাত্রগণ এক্ষণে তন্মধ্যে অধ্যয়ন করিতেছে। পাষাণভূমির অদূরে সরোবরের মধ্যস্থলে, গৃহনির্ম্মাণ হইতেছে, দেখিলাম।

কাঞ্চী সামান্য পুরী নহে। এখানে, পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক বহু সন্দর্ভ, একত্র অবস্থান করিতেছে। কাশীরাজ্যের বৌদ্ধগণ, কোন সময় জৈন দ্বারা এখানে তাড়িত হন; শৈবও বৈষ্ণব কর্ত্তৃক লাঞ্ছিত হয়। পাণ্ড্য, চোল, পল্লব, চালুক্য, বেল্লাল, সকলেই ইঁহাকে একবার রাজপাট করিয়া গিয়াছেন। আফ্‌গান ও মরাঠাকর্ত্তৃক তামিল-বিক্রম-সংহার-কাহিনী এস্থলে স্মরণীয়। পঞ্চদশ শতাব্দীতে 'ব্রাহ্মণী' মুসলমান এখানে বিজাতীয় স্রোত প্রবাহিত করিয়া দিল; ক্লাইবও এই স্থানে ডুপ্লের চাতুরী ব্যর্থ করিয়া দিয়াছিলেন। অষ্টাদশ বর্ষ পরে, এই রাজন্য-চিতা-ভূমিতে, হয়দার কর্ত্তৃক বেলী সদলে নিহত হইয়াছিলেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে, রাজেন্দ্র চোলের রাঢ় আক্রমণ কালে, দক্ষিণাপথের বহু সামন্ত নৃপতি তাঁহার বলবৃদ্ধিকারী ছিলেন। ইহাদের অন্যতম কুলজ হেমন্ত সেন সমতটে শূররাজ-বংশীয়া একটি কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। হেমন্তের পুত্র বিজয় হইতে বল্লাল সেন উৎপন্ন হন। তিনি ১১১৯ খৃষ্টাব্দে, বিক্রমপুরে, পিতৃসিংহাসনে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। বল্লাল সেনের পিতৃকুল কাঞ্চীরাজ-বংশের কনিষ্ঠ শাখাসম্ভূত। দ্রাবিড় কান্যকুব্জ ও মাগধবল-দৃপ্ত ভারতাঙ্গ বঙ্গ, জ্ঞানানুশীলনের গুণে, একটি পরাক্রান্ত আর্য্যশাখার বাসস্থান বলিয়া গণ্য হইয়াছিল। দ্বাদশ ভৌমিক, প্রতাপাদিত্য, কংশ নারায়ণ ও সীতারাম তাহার প্রমাণ।

চেন্নপট্টন। *

(আদ্য)

জীবমাত্রেই আয়াস লঘু করিতে ব্যস্ত। সুবিধা তাবৎ বিষয়ের নিয়ামক। ধন্য ওয়াট সাহেব। ১৭৬৪ খ্রীষ্টাব্দে, তিনি অগ্রবর্ত্তী মনীষিগণের চেষ্টার ফলে বাষ্পীয় যন্ত্র নির্ম্মাণে কৃতকার্য্য হইলেন। পঞ্চাধিক ষষ্টিসংবৎসর পরে, তদ্দ্বারা কামগ-যান চালিত হইল! ১৮৫৪ অব্দে, ভারতে ইংরাজ বণিক সমিতি দ্বারা, হাওড়া হইতে প্রদ্যুম্ন নগর পর্য্যন্ত বাষ্পীয় শকট চালিত হইয়াছিল। অধুনা লৌহপথ সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়াছে। নতুবা আমাদের পক্ষে, এতদূর পর্য্যটন অসম্ভব হইত।

আমি দ্রবিড়ে, নবামদ্রাস নগরের এগমোর নামক অন্যতর অধিষ্ঠান ক্ষেত্রে অবরোহণ করিতে অভিলাষী। তদ্ধেতুক, দিগ্‌দেশগামী শকট-শ্রেণীর সমাশ্রয় সমান্তরাল দীর্ঘ চত্বরাবলী-যুক্ত কেন্দ্র ভবনে উপস্থিত হইলাম না। অধুনা অস্মদীয় ভ্রমণসন্দর্ভ, দক্ষিণাখণ্ডের পশ্চিম ভাগ ত্যাগ করিয়া পূর্ব্ব উপকূলে সন্নিবদ্ধ হইল। এই ধূমযানে সেতুপতি

---

* ১। Hand Book of the Madras Presidency—Edward. B. Eastwick প্রণীত।

২। Agriculture in Madras—W. R. Robertson প্রণীত।

৩। Notes on the Criminal Classes of the Madras Presidency—Frederick. S. Mullaly প্রণীত।

৪। Lecture on Famine—রমেশচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক প্রদত্ত।

৫। গীতসূত্রসার—কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত।

৬। দৈনিক সংবাদ পত্র।

আসিয়াছেন। তাঁহার সংবর্দ্ধনার্থ নানা পরিচ্ছদধারী অভিজাতবর্গ উপস্থিত হইয়াছেন; যথা, রামনাদের রাজকর্ম্মচারী বেঙ্কট স্বামী নায়ড়ু, রাজা স্যর্ রামস্বামী মুদেলি, দেওয়ান বাহাদুর রঘুনাথ রাও, জে, এডাম, বিজয় রঙ্গ মুদেলি, ইথেরাজুলু চেট্টি, বরট্টওর, বলবন্ত সহস্র বুধে, শিবগঙ্গা মুদেলি, আইয়াস্বামী মুদেলি, রায় বাহাদুর পঃ রঙ্গনাথং মুদেলি, আপ্পাস্বামী চেট্টি, রামস্বামী নায়ড়ু, পঃ রঙ্গীয়া নায়ড়ু, মঃ বীর রাঘব চারিয়ার (আচার্য্য), সুব্রহ্মণ্য আইয়া, রামকৃষ্ণ আইয়া, কল্যাণ সুন্দরং চেট্টি, দামোদরং পিল্লৈ, শিবশঙ্করং পণ্ডিয়াজি, সুব্রহ্মণ্য চেট্টি, গোপীনাথ টাকর, আইয়া স্বামী পিল্লে প্রভৃতি। ইঁহাদিগকে দর্শন করিতে পারিলে, লোকালয়ে যাইবার উদ্দেশ্য এখানেই কিয়ৎ পরিমাণে সিদ্ধ হইত। যাঁহার সম্বর্দ্ধনার জন্য এই সমারোহ তিনি জাতিতে "মরভর"। দক্ষিণা-পথের দুষ্কর্ম্মান্বিত জাতির অন্যতর শাখা বলিয়া এই শ্রেণীর প্রতি লোকে অপ্রসন্ন। পূর্ব্বে তাঁহারা সামাজিক সম্মান ও ক্ষমতায় সমকক্ষ না হইলেও শৌর্য্যে রাজপুতদের ন্যায় বীরত্বশালী ছিলেন।

নগরে পদার্পণ করিয়া, সর্ব্বাগ্রে খ্রীষ্টীয় ভজনালয় আমার নয়ন-পথে নিপতিত হইল। বাঙ্গলাবিজয়ের সাত বৎসর পূর্ব্বে এই প্রদেশ ইংরাজাধিকৃত হইয়াছিল। ভারতে প্রথমতঃ এখানে গীর্জ্জা নির্ম্মিত হয়। পূর্ব্ববারে যৎকালে রঙ্গনাথ ঠাকুরের সাউকার-পেটস্থিত গৃহে উপস্থিত হই, তখন কাঠিয়াওয়াড়নিবাসী লাড শ্রেণীর গুর্জ্জর-বণিকগণের দীপা-ন্বিতা উৎসব পরিসমাপ্ত হয় নাই। অধুনা, বড়দিনের সময় বলিয়া বাটীর বেতন অধিক দিতে হইবে।

ব্রাহ্মী বর্ণ-মালার প্রত্যেক বর্গের প্রথম চারিটি অক্ষরের কার্য্য, দ্রাবিড় উচ্চারণে কেবল প্রথমটি দ্বারা হইতে পারে। মণিকার রঙ্গনাথ গুজরাতি হইলেও তাঁহার ঠাকুর উপাধি টাকর হইয়া গিয়াছে। তাঁহাদের মাতৃ-

ভাষা এক্ষণে তামিল। গোপীনাথের সহধর্ম্মিণী পদ্মাবতী ; তদীয় কঞ্চুকও এতদ্দেশীয় মহিলার মত অষ্টাদশ-হস্তপরিমিত কৃষ্ণকার্পাস ও পীতকৌষেয় সূত্র নির্ম্মিত বস্ত্র, ব্রাহ্মণ্য-পরিচায়ক ত্রিকচ্ছ-সজ্জায় পরিহিত। নব বিজয়-নগর-রাজের বাঙ্গালীসাহচর্য্য-হেতুক, অথবা ইংরাজী প্রথার প্রভাবে অমাত্য গোপীনাথ টাকর, বপনকার্য্যে বীতশ্রদ্ধ। তথাপি তাঁহার শিখা বিদ্যমান। প্রভাতে,—অনেকে যাহা চাহেন, তাঁহার অনুরোধে আমাকে সেই উষ্ণ চা পান করিতে হইল। এই পল্লার মহাজনগণের উষ্ণীষে চেন্নপট্টন একটি বিশেষত্ব দিয়াছেন। তাহা গুজরাতি ও দ্রবিড় হইতে ভিন্ন।

সমস্ত প্রধান জনপদেই ইউরোপীয় পল্লী স্বাস্থ্যকর ও শোভান্বিত এবং নগরোপকণ্ঠে পৃথক্ ভাবে স্থাপিত। স্থান-পরিচায়ক কোন বিশেষ অভিধান, প্রভেদ সূচনা করে। এখানে সেটি একেবারে মর্ম্মস্পর্শী হইয়াছে। দণ্ডবিধিতে আছে, অন্ধকে উক্ত অপ্রীতিকর 'অন্ধ' নামে আহ্বান করা নিষিদ্ধ। যে ভাগে দেশীয়গণের বসতি, উহা 'ব্ল্যাক টাউন' ; উহাতে গ্যাস-আলোকের অভাব। 'ড্রেনেজ' হয় নাই, তথাপি মুম্বই অপেক্ষা ইহা ইষ্টকালয় সম্বন্ধে সমৃদ্ধ। নায়ক-প্রধান চেন্ন আপ্পার নামানুসারে মান্দ্রাসকে প্রাচীনেরা চেন্নপট্টন কহেন। চেন্ন মহাশয়ের যত্নে, তদীয় প্রভু তদানীন্তন ভূস্বামী চন্দ্রগিরি রাজার নিকট হইতে, ইংলণ্ডীয়-বণিক-সমিতি বন্দর নির্ম্মাণার্থ আজ্ঞাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মোগল ও মহারাষ্ট্রীয়-সেনানীকর্ত্তৃক আক্রমণাশঙ্কায়, ব্ল্যাক-টাউনের বহির্ভাগ প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত করিতে হয়। অদ্যাপি তাহার ধ্বংসাবশেষ দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। সমুদ্রোপকূলে, ৪ লক্ষ মানব-অধিষ্ঠিত, ১৩ বর্গক্রোশ ব্যাপিয়া এই নগর অবস্থিত। চত্বারিংশৎ বৎসর পূর্ব্বে, আকাশবৃত্তি অবলম্বন করতঃ, বঙ্গদেশ হইতে কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী পদব্রজে এখানে আগমন করিয়াছিলেন। তিনি স্ববৃত্তে লিখিয়াছেন,—"সাউকার পেট প্রভৃতি

মদ্রাস—সমুদ্রতট

(ভারত প্রদক্ষিণ)

যেস্থানে অবস্থিত, উহাই চীনাপাটন সেণ্টজর্জ্জ দুর্গসন্নিহিত ভূভাগ, মদ্রাস। এখানে ৮।১০টি সত্র আছে। তথায় চাউল ও আটা দেয়। কূপের জল, খারা এবং মিষ্ট। খাপরেল ও পাকা বাটী।"

কলিকাতার দুর্গ-সন্নিহিত, সুন্দর তৃণক্ষেত্রের মত বৃহৎ প্রান্তর, প্রয়াগ বা অন্যত্র না থাকিলেও, আমরা অত্রত্য দুর্গের আবেষ্টক দূর্ব্বাদলশ্যাম প্রান্তরগুলির মধ্য দিয়া রত্নাকরতীরে প্রশস্ত পথে ভ্রমণ করিয়া অধিকতর রমণীয়তা ও শ্রেষ্ঠত্ব বোধ করিতে লাগিলাম। সৈনিক-সম্প্রদায়ের যান্ত্রিক বাদ্যনিঃস্বন, কর্ণপটহে অধিক আঘাত করিতেছে না। দূরশ্রুত সঙ্গীতের মাধুর্য্য কি সুন্দর! এপথে, উল্লসিত পৌরগণ, এমন কি, শাসনকর্ত্তা পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিতে আসেন। শরীর ও মনের স্বাস্থ্যপ্রদ সামুদ্রিক সান্ধ্য-সমীরণ সেবন করিবার কালে ব্যস্ত হইবার কারণ নাই। এখানে জনতার অভাব।

প্রাতে তোয়নিধির ক্রোড়ে 'মসুলাহ' মৎস্যজীবিগণের জল-ক্রীড়া অতি বিচিত্র। নৌকা তরঙ্গে নৃত্য করিতেছে; কর্ণ ও ক্ষেপণীসঞ্চা-লনে তাল দেওয়ার ভাব মনে হয়। মোহময়ী পোতাশ্রয়ের নাবিক-বৎ, বিপরীত বলের সাহায্যে, পাইল উড়াইয়া মধ্যবর্ত্তী ভাবে, বায়ুর প্রতিকূলে "লুন্নু" কাষ্ঠ-তরণী যাইতে সমর্থ নহে। পুরীতে যেরূপ দেখিয়াছি,—তরণী তিনখানি নিরেট কাষ্ঠ সংযোগে প্রস্তুত, রজ্জুদ্বারা আবদ্ধ, লৌহকীলক নাই। প্রয়োজন না থাকিলে, উহা বেলাভূমির উপর ন্যস্ত থাকে। যৎকালে স্রোত তটের দিকে আসিতেছে, ধীবর জালখানি প্রস্থভাবে তৎসংলগ্ন দণ্ডদ্বারা সিকতায় যেন আবদ্ধ করিয়া দিতেছে। স্রোতের আবর্ত্ত নিম্নগামী হইলে, পূর্ব্বাগত মীনরাশি জালে আবদ্ধ হইয়া যাইতেছে। কৈবর্ত্ত জননী, সহকারী বালকের জন্য চুবড়ি, আলুসিদ্ধ ও আস্কে পিষ্টক দিয়া গেল।

বালুকারাশির উপর আরণ্য স্থূল-পত্রক-পুষ্প-সজ্জান্বিত আসন দর্শনান্তে আমরা ঝাবুক বৃক্ষের বেষ্টন অতিক্রমণ করিয়া, তটসমীপবর্ত্তী উদ্যানমার্গে বিহার করিতে লাগিলাম। গবর্ণমেণ্ট-প্রাসাদের অদূরে, "চিপক" বৃক্ষবাটিকা। কর্ণাটের নবাব ইহাতে বাস করিতেন। ইহা স্যারাসেনিক প্রণালীতে রচিত, দেবমূর্ত্তি দ্বারা অলঙ্কৃত হর্ম্ম্য। মহম্মদীয় শাস্ত্রে, জীবন্ত প্রাণীর অবয়ব শিল্পে অঙ্কন নিষিদ্ধ, উদ্ভিদের চিত্র, কর্ত্তব্য। যাঁহার আজ্ঞায় এই পূর্ত্ত বিনির্ম্মিত, তিনি উক্ত 'সরা' জ্ঞাত ছিলেন না। শিখর দেশের স্বর্ণ-কলসোপরি বিরাজিত সেই চন্দ্র, আর সেই সূর্য্যতেজে উদ্ভাসিত নহে। এখানে বৃটিশ রাজস্ব-কার্য্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। রাজ-পুরুষের অপরিশোধ্য ঋণে আবদ্ধ হইয়া এবং ইংরাজবৈরী সহ মৈত্রী করিয়া কর্ণাট-পতির নবাবী গিয়াছে। সেই বংশ এক্ষণে টিপলীকন্ পল্লীতে, অবদান বৃত্তির উপর নির্ভর করিয়া অবস্থিত।

বিশ্ববিদ্যালয়-সংশ্লিষ্ট ব্যবহার-বিদ্যা-পাঠাগারের দ্বারদেশ, দশাব-তারের মূর্ত্তি-ভূষিত। বিজিগাপট্টন-রাজ প্রদত্ত, ভারত-সম্রাজ্ঞীর ধাতব-প্রতিমা দর্শন করিবার যোগ্য। এক মালাকর মহারাণীকে পুষ্প মাল্য দ্বারা, অন্য এক ব্যক্তি তাঁহাকে চন্দন-চর্চ্চিত করিয়া, অর্চ্চনা করে। মত্তরাস্থ পুতুমণ্ডপেও ভারতেশ্বরীর ঐ প্রকারে সেবা হইয়া থাকে।

নবনির্ম্মিত প্রধান-বিচারালয়, এক সুদৃশ্য অট্টালিকা। তাহার শিখর ও সোপানাধার এখনও আমার মনে জাগ্রত হইতেছে। ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া, আমি এক কক্ষে উপনীত হইলাম। আপাদলম্বিত কঞ্চুক পরিহিত রজতদণ্ডধারী প্রতিহারী, প্রবীণ বিচারককে সমাসীন করিয়া গেল। স্তর মথুস্বামী আইয়া স্বাধীনচেতা, বিদ্বান ও সর্ব্বপ্রকারে ভদ্রপদবাচ্য। পুনর্ব্বিচারে তাঁহার নিষ্পত্তি অকাট্য। তিনি ধুতির উপর কৃষ্ণবর্ণের গাউন পরিয়া উপবিষ্ট। পাদুকা গ্রহণ করেন নাই। শ্বেত উষ্ণীষের

স্বর্ণকূল, উভয় দিক দিয়া বক্রভাবে আসিয়া সম্মুখে মিলিয়াছে। তদীয় ললাটে শ্বেত বৃত্তার্দ্ধের মধ্যে কৃষ্ণ বিন্দুবৎ তিলক। এতদ্দেশের ব্রাহ্মণ শূদ্র, তিনবার ভাত খাইয়া থাকেন। প্রথমবারে পর্য্যুষিত অন্ন, ঘোল বা চাটনি'সহ আহার করিতে হয়। তদনন্তর, এক চমস কাফি সেব্য। প্রাতে বিভূতি ধারণ করিয়া আহারান্তে টীপ পরিতে হয়। সায়ংকালে, ইহা প্রক্ষালন করিয়া পুনরপি ত্রিপুণ্ড্র ধারণ করা বিধেয়। কৃষ্ণ তিলক দৃষ্টে, স্মার্ত্তদিগের মধ্যাহ্ন ভোজন হইয়াছে কি না, বুঝা যায়। প্রাড্‌বিবাক স্মার্ত্ত, ওয়ারমা ব্রাহ্মণ। তাঁহার গুম্ফহীন শ্যাম মুখ-চ্ছবি, দ্রাবিড়কে উজ্জ্বল করিয়াছে। বিচার আরম্ভ হইল। ব্যবহারাজীব মুদ্রিত আবেদন পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন। অর্থী, অলিখিত লেখ্যপত্র স্বাক্ষর করিয়াছিলেন বলিয়া আপত্তি উপস্থাপিত করেন। ধর্ম্মাধিকরণ হাস্যে মুখরিত হইয়া উঠিল। অভিযোগ প্রত্যাখ্যাত হইল। উকীলেরা উঠিলেন। তাহার মধ্যে যিনি পেণ্টলুন পরিয়াছিলেন, তাহার পক্ষে ইংরাজী উপানৎ ব্যবহারে আপত্তি নাই।

ওয়েনলক মহোদয়ের রাজকীয় উদ্যান অবারিত-দ্বার নহে। এ দেশের উদ্ভিদ্-জগতে প্রবেশ করিবার জন্য, সিংহ-শার্দ্দূল-অধিষ্ঠিত পশুপালিকা সংযুক্ত, 'পিপিল্‌স্ পার্ক' উন্মুক্ত। তথায় কি দেখিয়াছি, আমার স্মারক লিপিতে তাহার কোন চিহ্ন নাই।

কোয়েম নদীর পূর্ব্বভাগে, দেশী অংশে সমুদ্র ঘেরিয়া পোতাশ্রয়। বৃহৎ কৃত্রিম প্রস্তর খণ্ড দ্বারা প্রাচীর নির্ম্মিত। তন্মধ্যে জলরাশি হ্রদের আকার ধারণ করিয়াছে। চতুর্দ্দিকে অর্ণবপ্রোত চত্বরোপরি দ্রব্যসম্ভার অবতারিত করিতেছে। ইউরোপীয় পোত বণিকগণের বিপুল ভাণ্ডার, ন্যাসগৃহ ও স্থাপ্য ধনাগার ইহার সমীপস্থ। ডিগ্‌বি সাহেব এখান হইতে তাড়িত-বল চালিত রথ লইয়া যাইবার জন্য, সভ্য সমুত্থান করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

কলিকাতা ও মুম্বই অপেক্ষা, মান্দ্রাজে পৌরগণের বর্ণমালিন্য অধিক। অন্ধ্র, দ্রবিড় ও কর্ণাটী পুরুষের বেশ দৃষ্টে, কে কোন্ দেশের অধিবাসী, নির্ণয় করা দুরূহ। পরন্তু নারী জাতির বস্ত্র-পরিধান প্রণালীতে সে পরিচয় মিলে। তাঁহারা অনবগুণ্ঠিতা, সুতরাং কটাক্ষের চাঞ্চল্য, আর হৃদয়ের চপলতা কেহ এখানে উপলব্ধি করিবার সুযোগ পাইবেন না। ইহাতে সংসারের কোমলতা বৃদ্ধি করিতেছে। অপরিচিত পুরুষের সহিত তাঁহাদের আলাপ অবৈধ। কেরলের নায়ার ছাত্রগণের ব্রহ্মচারিবৎ বহির্বাস দেখিলেই, বাসস্থানের জ্ঞান জন্মে। উহারা পুরশ্চূড় নহে। আমাদের মত কর্ত্তিত-কেশ, শিখাহীন।

শ্রীরামপুরে নিম্মিত, কৌষেয় বস্ত্রবিক্রেতা বা মৃদঙ্গার ব্যবসায়ী রামচন্দ্র বাবুর ভ্রাতা, কে স্মরণ নাই, তিনি কহিয়াছিলেন, দেখ, এখানে স্ত্রীলোকের মস্তক উন্মুক্ত, কিন্তু পুরুষের আচ্ছাদিত। অনেক সময়, তাঁহাদিগকে সুদীর্ঘ কুঞ্চিত বস্ত্র শিরে ধারণ করিতে হয়। বিধবা মস্তক আবৃত করে। যথন তাহার এই দশা উপস্থিত হয়, পদ-যুগলের অঙ্গুলিত্র কাটিয়া ও গলদেশস্থ "তালি" সূত্র উন্মোচন করতঃ, দুগ্ধ বা জলে নিক্ষেপ করিবার কালে, শূদ্রা না হইলে মস্তক মুণ্ডন করিতে অবশিষ্ট রহেনা। কুস্কুমের পরিবর্ত্তে বিভূতি, চিতা-ভস্ম বলিলেও হয়, তখন ভ্রক্ষণ কর্ত্তব্য। প্রতি বৃহস্পতিবারে, তৈল হরিদ্রা আর ব্যবহার্য্য নহে। কি নিষ্ঠা! আমরা তাঁহাদের নিকট সংযম শিক্ষা করিব। ত্যাগে বাসনার তৃপ্তি হয়। ভোগে নহে।

কোতওয়াল-চেড়ী হট্টে প্রবেশ করিয়া দেবালয় দৃষ্ট হইল। বিল্বপত্র, চন্দ্রমল্লিকা, শ্বেত ও পীতকরবীর, পাটলাদি সুগন্ধি পুষ্প ও তুলসীদল বিক্রীত হইতেছে। বিবিধ প্রকারের কমলা জাতীয় জম্বির, দ্রাক্ষা, দাড়িম্ব, হরিত ও লোহিত পক্ক কদলী, অঞ্জীর, আম্র, পনস, কপিত্থ

কদলীপত্র, বার্ত্তাকু, চিচিণ্ড, ঝিঙ্গা, বিবিধ শাক, আলু, ওল, কচু, অলাবু, কুষ্মাণ্ড, পলাণ্ডু ও করবেল্ল উপস্থিত। এদেশে যাহা জন্মে, তাহা বারমাস পাইতে পারা যায়, ঋতুভেদ নাই। একস্থানে, কৃষ্ণজিরা ও জম্বিরখণ্ড-নিহিত তক্র রহিয়াছে। শ্রান্ত বিক্রয়ী, তাহা এক চুমুক পান করিয়া যাইতেছে। অপূপ ও তৎকঠিনীকৃত মৎস্য, স্থূল সরুচাকলী (যাহা কটু অম্ল লেহ্য সহযোগে ভক্ষণীয়), আরও কত কি,—যাহা কেমন করিয়া উদরস্থ করিতে হইবে, কিংবা কি প্রকারে প্রস্তুত, জ্ঞাত নহি,—বিক্রয়ার্থ সজ্জিত আছে। লঘুপাক পাঁপর প্রভৃতি খাদ্যের নিকটে, দক্ষিণাবর্ত্তের প্রাণদায়িকা, তাবৎ ব্যঞ্জনে ব্যবহৃতা, যমদূতিকার পাটালী ও তৎসংযোগে প্রস্তুত লঙ্কার লড্ডুক ক্রেতার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছে। পলাশ-পত্রের ঠোঙ্গা ও সীবন দ্বারা বর্দ্ধিত ভোজনপত্রের বৃহৎ বিপণি দর্শন করিতে করিতে আমরা অঙ্গনে অবতরণ করিলাম। তথায় নানাবর্ণের চূর্ণক, হরিদ্রা, ধূপ, তিলক-মৃত্তিকা প্রভৃতির ক্ষুদ্র বীথি দৃষ্টিগোচর হইল। বহির্ভাগে গুড়, তেঁতুল, চিকী সুপারী, লঙ্কা, বাদাম, খর্জ্জুর ইত্যাদি গৃহস্থের প্রয়োজনীয় সামগ্রীর পণ্যশালা ক্রেতৃগণকে আহ্বান করিতেছে। তাম্বূল বিক্রয়ের জন্য এক পৃথক্ বিভাগ নির্দ্দিষ্ট আছে। রাজধানীতে কিসের অভাব? খ্রীষ্ট জন্মোৎসব উপলক্ষে, শর্করা-নির্ম্মিত গণপতি, নটরাজ প্রভৃতি বিক্রীত হইতেছে। হিন্দুর জন্য হইলে, দেবমূর্ত্তি ভক্ষণার্থ গঠিত হইত না। কপিশাক ক্রয়ের জন্য, আমাকে আমিষহট্টে যাইতে হইয়াছিল। কোতোয়াল-চেড়ীতে তাহা মিলে না। অপেক্ষাকৃত শীতল বেঙ্গলুর হইতে এখানে কপি আনীত হইয়া থাকে। ইহা সনাতন মতাবলম্বিগণের অগ্রাহ্য। দ্বিজাঙ্গনা গোলআলু বর্জ্জন করেন; কিন্তু এখানকার অধিকাংশ ফল ফুল ও তরকারী যে বিদেশীয়, তাঁহারা ইহা জ্ঞাত নহেন। মুসলমান ও খৃষ্টানের দ্বারা

যেমন নব ভাব আসিয়াছে, তেমনই অন্যদেশীয় সুখাদ্যও আনীত হওয়া সঙ্গত।

একদিন কোন সুহৃদ্ আমাদিগকে নিমন্ত্রণ করিলেন। তদীয় পিতা ভীম শঙ্কর শাস্ত্রীর সহিত আমার কলিকাতায় পরিচয় ছিল। বাঙ্গালী প্রণালীতে নৈশ ভোজ্য প্রস্তুত হইয়াছিল, তৈলঙ্গী প্রথা অনুযায়ী নহে, অতএব বক্তব্য কিছুই নাই। অন্নাজী, প্রসঙ্গক্রমে কহিলেন, আমি বহুকাল বঙ্গে বাস করিয়াছি, কিন্তু এখনও সংবাদ লয়, এমন ঘনিষ্ঠতা কাহারও সহিত দেখি না। মন্দ্রাসিগণের জীবন, প্রফুল্ল, কর্ম্মঠ, সরল ও বর্ত্তমান অবস্থায় সন্তুষ্ট; সেই জন্য আমাদের দৃষ্টিতে তাহারা সুদরিদ্র।

কফি ও শ্বেত এলা এখান হইতে বিভিন্ন দেশে প্রেরিত হয়; তণ্ডুল মৃগনাভি, চামর ও থলে এখানে আমদানীর বস্তু। শাস্ত্রীজী মসলীপট্টন হইতে কলিকাতায় ঘৃত বিক্রয়ার্থ লইয়া যাইতেন। মুম্বই নগরের মুসলমান ব্যবসায়ীগণ ঘৃতের সহিত বসা মিশ্রিত করিবার প্রথা আবিষ্কৃত করিয়াছেন। এখানকার গম্বরে, নারিকেল ও চিনেরবাদামের তৈল মিশ্রিত ঘৃত প্রচুর পরিমাণে, বৈদেশিক বাণিজ্যের জন্য মিলে। ইহাতে দেশকালভেদে যে দ্রব্যের তারতম্য ঘটে, ক্রেতৃগণ তাহা বিবেচনা কবিবার অবসর পান না। সকলই কৃত্রিম বোধ হয়। নেলুকুপ্পম নামক স্থানে পেরী কোম্পানি "পামায়র" রস জাত যে শর্করা প্রস্তুত করিয়া থাকেন, কলিকাতায় তাহা মান্দ্রাজী নামে প্রসিদ্ধ।

এখানে ব্রাহ্মণের অবস্থা সুখদ। তাঁহারা রাজ-দত্ত ভূমির কর গ্রহণ এবং অপরের সাহায্যে কৃষি বা বিদ্যাবত্তা দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করেন। তাঁহাদের ব্রহ্মস্বকে 'শ্রোত্রিয়ন্দার' বলে। এবংবিধ উপায় না থাকিলে, তীর্থযাত্রা করিতে হয়। নাটকোট-নিবাসী চেট্টি সমাজ, দূরগামী পথে

ত্রি বা পঞ্চক্রোশ অন্তর ধর্ম্মশালা করিয়া দিয়াছেন। তথায় রাত্রিত্রয়ের জন্য বাস ও ভোজন প্রাপ্য। এইরূপে ব্রাহ্মণ ষণ্মাসে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া, পুনরপি পথান্তরে নিষ্ক্রমণ করিয়া, দেবদর্শন ছলে, বৎসরের পর বৎসর অতিবাহিত করিতে পারেন। ভারতের তমসাচ্ছন্ন বিভাগের, এই আর একটি বিশেষত্ব।

ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম, এক্ষণে কোন জাতিতেই নাই। তাঁহাদের আচার ব্যবহার থাকিতে পারে। বিজয়নগর-সম্রাটের আধিপত্য স্বীকারপূর্ব্বক, অন্ধ্র, দ্রাবিড় ও কর্ণাটে, কোন যোদ্ধা ও মেধাবী ব্যক্তি, বিভিন্ন প্রদেশে সংস্থানিক হইতেন। সে বিষয়ে বর্ণভেদ গ্রাহ্য হইত না। তিনি কর সংগ্রহ করিয়া, কিয়দংশ স্বয়ং এবং কিয়দংশ সেনাপালন-ব্যয়রূপে গ্রহণ করিতেন। লোকযাত্রা-বিধান, তাঁহারই হস্তে থাকিত। ইহারাই পলিগার নামে প্রথিত। ক্রমে এই ক্ষমতা উত্তরাধিকারীর হস্তগত হইতে আরম্ভ হইলে, তাহারাই ভূম্যধিকারী হইল। দেশরক্ষার্থ পলিগারগণ সশস্ত্র সেনা রাখিলেও, প্রজাকে আত্মরক্ষার জন্য অস্ত্র ব্যবহার করিতে হইত। কর গ্রহণে নির্দ্দিষ্ট নিয়ম ছিল না। মহীসুর-রাজ যৎকালে ৩২ খানি গ্রামের অধিপতি ছিলেন তখন তিনি পলিগার মাত্র। ইহারা লৌহময় কবচ ধারণ করিয়া, এক পঙ্‌ক্তিতে, কেহ অসি চর্ম্ম, কেহ বা বন্দুক, ধনুর্ব্বাণ, শেল বা কুঠার লইয়া যুদ্ধ করিত। পরন্তু খড়্গ পরিত্যাগ করা নিষিদ্ধ। দ্বিধার ঋজু তরবার তাহাদের প্রিয়বস্তু। ভাটকবি চন্দ বরদায়ী রাজপুত যোদ্ধৃগণের যে সজ্জা বর্ণনা করিয়াছেন, ইহা তদনুরূপ। বোধ হয়, উক্ত লৌহশৃঙ্খল-নির্ম্মিত কবচ হইতে ক্ষত্রিয়ের বর্ম্মা উপাধির ব্যুৎপত্তি হইয়া থাকিবে। শিখেরাও বর্ম্ম ধারণ করিয়াছেন। তাঁহারা কহেন, খড়্গ যোদ্ধার প্রধান অস্ত্র। গুলিদ্বারা প্রহার, উপাংশু বধের মত। উহাতে বীরত্বের লেশ নাই। বীরগণ যেমন দুর্দ্ধর্ষ, তেমনি

সরল। এখন সে কাল গিয়াছে। নোবেল সাহেব, 'নাইট্রোগ্লিসারীন' সহ শোষক পদার্থ যোগ করিয়া, 'ডিনামাইট' উদ্ভাবন করিয়াছেন। তিনি রণবিদ্যায় প্রযোজ্য, ধূমরহিত ঔর্ব্বাস্ত্র প্রভৃতি ১২৫ প্রকারের অস্ত্র, কেবল ইংলণ্ডে প্রদান করিয়া গিয়াছেন। তদ্দ্বারা উপার্জ্জিত অর্থের কিয়দংশ শান্তি-সংস্থাপনকল্পে দান করেন। অসাধারণ ব্যক্তিগণের চরিত্র দুর্ব্বোধ্য। হায়দার আলি-তাড়িত পলিগারদিগকে কর্ণওয়ালিস মহোদয় তাহাদের দুর্গ প্রভৃতিতে পুনঃস্থাপন করিয়াছিলেন; কিন্তু পরে উহারা ইংরেজদিগের সহিত হৃদ্যতা ত্যাগ করিয়া টীপুর সহিত মিলিত হইয়াছিল; তজ্জন্য স্বাধীনতা হারায়।

হিন্দীতে যে অর্থে শেট শব্দ ব্যবহৃত হয়, চেট্টি শব্দ সেই পর্য্যায়ভুক্ত। শ্রেষ্ঠী ইহার সংস্কৃত রূপ; ইহা বৈশ্য-শূদ্র-নির্ব্বিশেষে ব্যবহৃত হয়। কোম্‌টিগণ বৈশ্য। তাঁহারা কামাক্ষীর উপাসক। কোম্‌টিগণ ভিন্ন-দেশীয় স্বজাতীয়ের সহিত, আহার বা বিবাহ দিতে অপরাঙ্মুখ। তাঁহাদের মধ্যে কতকগুলি গুপ্ত প্রথা আছে, সেই ভেদ জ্ঞাত হইয়া, তাঁহারা কার্য্য করেন। তাঁহাদের মধ্যে কৃষি বা শিল্প নিষিদ্ধ; বণিক পথ অবলম্বনীয়। চেট্টি, আর্য্যশব্দ নহে। সংস্কৃত চেট অর্থে দাস। দ্রাবিড়ে 'সট্টি' বলিতে অন্নপাত্র বুঝায়। উহাই রূঢ়ি করিয়া, চেট্টি শব্দ দ্রব্য মাত্রের ব্যবসায়ী-বাচক হইয়াছে। এতন্নগরের ধনীদিগের অধিকাংশ, এই শ্রেণীভুক্ত। রাজপথে 'অফাস'-যানারূঢ়, বিশেষপ্রকারের উচ্চ শ্বেত-উষ্ণীষধারী, কৃষ্ণকান্ত মুখ অনেক বার দেখিয়াছি। শূদ্র চেট্টিরা সংখ্যায় তিন লক্ষ। সেতুবন্ধের নিকটবর্ত্তী নাটকোটবাসী শ্রেষ্ঠীদিগের শিখা ও কেশ মুণ্ডিত। তাঁহারা পাদুকা ও অঙ্গরক্ষা-বর্জ্জিত। ভস্মলিপ্ত কালশ্রীতে, তাঁহাদের অনার্য্যভাব দূর হয় নাই। যেখানে ব্যবসায়, সেই খানেই এই শিব-ভক্ত তামিল জাতি; ইহারা কোন বাধায় ভ্রূক্ষেপ করে না।

কলিকাতায় মাড়োয়ারিদের নিকট কেবল ঋণগ্রহণার্থ, ইহারা অবস্থান করে। শেঠীরা কদাপি যোত্রহীন হয় নাই; এই অবস্থার জন্য, ইহাদের মধ্যে কোটি মুদ্রার হুণ্ডির ক্রয় বিক্রয় চলে। তদর্থ (স্বর্ণ-ভৌমিক) রেঙ্গুনে প্রেরিত হয়। দ্রাবিড়-রজত-নির্ম্মিত "কোইল" তামিল প্রণালীতে শোভা যাত্রা করিয়া, এক্ষণে প্রতি বৎসর পার্শ্বনাথের অভিযানের ন্যায় আড়ম্বর সহ কলিকাতায় বহির্গত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। সেই সমতল ছত্র, সেই আড়ানি, সেই গাম্য আনদ্ধ যন্ত্র মাদলের সহিত কাহাল জাতীয় বহির্দ্বারিক তীব্র রোশনচৌকী, ৪।৫ স্বর উৰ্দ্ধে, নিনাদিত হইয়া থাকে। বোধ হয় যেন, চীনা পাটনে উৎসব দেখিতেছি।

অত্রত্য কৃষক, দৈব ও রাজকীয় আধি দ্বারা সদা পীড়িত। এক প্রকার পার্ব্বত্য ভূমি, সদা শস্য উৎপাদনের অনুপযোগী। ক্ষেত্রে সেচনের জন্য নদীর জল প্রাপ্তি, বৃষ্টির উপর নির্ভর করে। পশ্চিম-ঘাট গিরিশ্রেণী বারিদের আগমনের পক্ষে প্রতিকূলাচরণ করিয়া থাকে। মন্দ্রাস, কলিকাতা ও মুম্বই অপেক্ষা, বিষুবরেখার নিকটবর্ত্তী। এখানে গ্রীষ্ম অধিক হইবার কথা। কিন্তু, মহাসত্ত্ব অম্বুধি উত্তপ্ত হইতে না পারায়, তৎসংশ্লিষ্ট বায়ু দিবাভাগে নিয়ত ভূমির দিকে প্রবাহিত হইয়া তাপ হরণ করে। কলিকাতায় তাপমান ঊর্দ্ধসংখ্যায় ৮৫, মুম্বইতে ৮০ অংশ, মন্দ্রাসে ৭৯, কিন্তু কখন কখন ৯০ পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। এখানে উষ্ণতার পরিমাণ, বর্ষে বর্ষে, অধিক কি, প্রতিমাসে পরিবর্ত্তিত হয়,—ঠিক করা যায় না। কোন সময়, পৌষে এমন দাঁড়ায় যে, তাপাধিক্যবশতঃ অপরাহ্লকৃত্য পূর্ব্বাহ্লে অনুষ্ঠেয় হয়। ঘোড়দৌড় বৈকালে হইতে পারে না। রাত্রিকালে বহির্দ্দেশে শৈত্য দ্বারা আক্রান্ত হইবার ভয় থাকে না। আমরা এ প্রকার স্থানকে, চিরবসন্তের আকর বলি। ইউরোপীয়দের পক্ষে, ইহা অবচ্ছেদা-

বচ্ছেদে গ্রীষ্ম। মুম্বইবৎ চেন্নপট্টনে, ষাণ্মাসিক নৈঋ‌র্ত ও ঈশান কোণ হইতে প্রবাহিত পবন যথাক্রমে ক্রিয়াশীল।

কৃষি ক্ষেত্রের অর্দ্ধাংশের অধিক রায়তআরি; পাদাংশ জমিদারী ও কিঞ্চিৎ ইনামভূমি। ইনামভূমির কর অতিমাত্র অল্প। জমিদারী বিভাগে, গবর্ণমেণ্ট প্রজার সহিত কর নির্দ্ধারণ না করিয়া, ভূম্যধিকারীর সহিত ৩০ বৎসর অন্তর ধার্য্য করেন। জমিদারী প্রজার, বিশেষ কোন স্বত্ব নাই। ভারতেশ্বরীর রায়ত-আরি প্রজার পক্ষেও ৩০ বৎসর অন্তর কর ধার্য্য হয়। অনাবৃষ্টি ও অতিবৃষ্টির জন্য, পাদ অংশ ত্যাগ করিয়া, কর্ষণ ব্যয় ব্যবকলন পূর্ব্বক যে প্রকার শস্যের মূল্য স্থির হয়, রাজস্বরূপে তদর্দ্ধ গৃহীত হইয়া থাকে। ভূমির মূল্য জল-সিক্ত হইলে প্রতি বিঘা ৫০৲ টাকা, তদন্যথায় ১০৲ টাকা। নির্দ্ধারণ কালে ভূমির যে প্রকার অবস্থা থাকে, তদনুসারে ত্রিংশৎ বৎসর কর-ভার বহনীয়। কৃষক যদি তৎকালে, আপন ক্ষমতায় উর্ব্বরতা বৃদ্ধি করিয়া থাকে, উহাকে উচ্চহারের শ্রেণীতে নিবদ্ধ করিয়া দণ্ডিত করা হয়। এ অবস্থায় দুর্ভিক্ষ অনিবার্য্য। গত ৬০ বৎসরের মধ্যে ছয় বার অল্লান্ন-কাল গিয়াছে।

বাঙ্গালা অপেক্ষা, এখানে কর অধিক। মধ্যপ্রদেশে তদপেক্ষা গুরুতর। তথায় যত দুর্ভিক্ষ হইয়া থাকে, ভারতের অন্যত্র তদ্রূপ হয় না। বঙ্গের কোথাও খাজনা উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্যের ষষ্ঠাংশের অধিক নহে। পূর্ব্বাঞ্চলে তদপেক্ষা ন্যূন। মধ্যভারতে, অবান্তর শুল্কসহ প্রতিশতে ৭২৲ টাকা রাজস্ব সংগৃহীত হয়। প্রজার ঋণই দুরবস্থার প্রকৃত কারণ; রাজস্ব দিয়া, সুভিক্ষের কালেও, কৃষিজীবিগণ সঞ্চয় করিতে অক্ষম। আমাদের শাস্ত্রে ষষ্ঠাংশ কর গ্রহণের বিধান আছে। বৃটীশরাজ বঙ্গে যাহা করিয়াছেন, যদি সমগ্র দেশে তাহা প্রবর্ত্তিত করেন, মদ্রাস ও অপর স্থান মহোপকৃত হইবে। বঙ্গেও পূর্ব্বে দুর্ভিক্ষ হইত; স্থায়ী কর নির্দ্ধারণান্তে,

উহা ভীষণ ভাব ধারণ করিতে পারে নাই। এখানে আর কর বৃদ্ধি হইবে না বলিয়া, গবর্ণমেণ্ট একবার প্রতিশ্রুত হন, কিন্তু দুঃখের বিষয়, তদ্রূপ কার্য্য হয় নাই।

ডাক্তার বুচানন লিখিয়াছেন, প্রজাকুল কহিয়া থাকে, বিজয়নগরাধীশ কৃষ্ণরায়ের সময়, তাহারা অতি সুখে অতিবাহিত করিত। টিপুসুলতান পর্য্যন্ত সে নিয়ম লঙ্ঘন করেন নাই। পল্লিসমাজ, লোকযাত্রা নির্দ্ধারণ করিতেন। তালুকগুলি বহু 'হাবেলি'তে বিভক্ত ছিল। এক সহস্র বরাহ মুদ্রা (কিঞ্চিদধিক ৩৲ টাকায় এক বরাহ) কর সংগৃহীত হয়, এমন ভূভাগ লইয়া, প্রত্যেক তহসিলদারের অধীন, এক এক তালুক গঠিত হইয়াছিল। তহসিলদার ব্রাহ্মণ হইতেন। প্রতি হাবেলিতে একজন শাস্তা নিযুক্ত হইত। তিনি রাজকর্ম্মচারী, আমীলদার নামে খ্যাত। সিকদার, অধিকাংশ স্থলে ব্রাহ্মণ। তিনি গ্রামের ৪ জন বর্ষীয়ানের পরামর্শ গ্রহণ করিয়া, ক্ষেত্র ও সরোবর সম্বন্ধে, নিম্ন-কর্ম্মচারীর অমীমাংসিত বিষয়ের নিষ্পত্তি করিতেন। আমীলদারের সম্মতি ভিন্ন, দণ্ডবিধান হইত না। শাস্তিও লঘু ছিল। প্রধান প্রজা ও কৃষিজীবী ব্যক্তি পটেল হইতেন। তিনি শূদ্র। তিনিই মুখ্য। করসংগ্রহ এবং জাতীয় দলপতির ন্যায় তাবৎ বিবাদভঞ্জন তাঁহার কর্ত্তব্য। এ বিষয়ে, তিনি ৪ জন গ্রাম্য-বৃদ্ধের দ্বারা চালিত হইতেন। তদ্দ্বারা নিষ্পত্তি না হইলে, ব্রাহ্মণ সেরেস্তাদার কর্ত্তৃক বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়া, আমীলদারের গোচরার্থ প্রেরিত হইত। অর্থাভাব থাকিলে, পটেল প্রজাকে ঋণ দিবে। তজ্জন্য উৎপন্ন শস্যের একাংশ, বৃদ্ধিরূপে তাঁহার প্রাপ্য। এইরূপ আনুগত্য-পরম্পরায় কেহ আপন ক্ষমতার অসদ্ব্যবহার করিতে পারে নাই। পটেল, সেরেস্তাদার ও চৌকিদারের পদ পুরুষানুক্রমিক। কেহ অধিক কর সংগ্রহ করিয়া দিতে পারিলে, আমীলদার কর্ত্তৃক পটেল-পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী ছিল। কৃষ্ণ

রায়ালুর রাজত্বে, সেচনবিহীন ভূমির যে কর নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল, মুসলমান অধিকারে তাহার বৃদ্ধি হইতে পারে নাই। প্রজা পাট্টা পাইত না বটে, কিন্তু যতদিন নির্দ্দিষ্ট কর প্রদান করিত, কেহ তাহাকে উচ্ছেদ করিতে সমর্থ হইত না। কৃষক অক্ষম হইলে, আমীলদার 'তকাবি' দিতেন, বা কৃষিকার্য্য হইতে নিষ্কৃতি দিতে পারিতেন। গ্রাম্য-ভৃত্য, চতুর্ব্বিধ। প্রথম, শস্যপ্রহরী, পত্র বা সংবাদবাহক, পথপ্রদর্শক ও ক্ষেত্রের সীমা পর্য্যবেক্ষণ-কারক। দ্বিতীয় ব্যক্তি, খাল ও সঞ্চিত বৃষ্টিজলপূর্ণ সরোবর-বারিপ্রদানকারী। তৃতীয়, কৃষক যাহাতে অপরবৃত্তি অবলম্বন করিতে না পারে, তজ্জন্য সতর্ক থাকিত। চতুর্থ, পরিমিতিকারক। হাবেলির বেতনভুক কর্ম্মচারিগণ, প্রতি মাসে প্রাপ্য পাইতেন।

ইংরাজ যদি পল্লি-সমাজের অনুকরণে "মিউনিসিপালিটি" করিতেন, অতি সুখের হইত। গ্রাম্য-সমিতি, পূর্ব্বকালে, সর্ব্বসাধারণের নিকট হইতে শস্য আহরণ করিয়া ধর্ম্মগোলা করিয়া রাখিত। দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে, বিতরণ করিবার নিয়ম ছিল। পাশ্চাত্য অর্থ-নীতি, সমৃদ্ধ দেশে ব্যবহৃত হইবার যোগ্য। পরন্তু, শিল্পকলা-হীন নির্ধন স্থানে, স্বাধীন বাণিজ্য উপযুক্ত নহে। লৌহপথ বিস্তৃত থাকায়, অধিক মূল্যে শস্য বিক্রয় করিয়া, কৃষিজীবী লব্ধ অর্থ বিলাসিতায় ব্যয় করিয়া ফেলে। প্রয়োজনের মুহূর্ত্তে টাকা, শস্য অথবা কোন প্রকার ধন অবশিষ্ট রহে না। কিঞ্চিৎ অর্থ থাকিলেও, যে মূল্যে শস্য বিক্রয় করিয়াছে, অধুনা ক্রয়মূল্য তাহার তুলনায় অত্যধিক।

গত দুর্ভিক্ষে, তণ্ডুল টাকায় ⁄২॥ সের হইয়াছিল। প্রত্যহ ।০ আনার ন্যূন ব্যয়ে, কেহ উদরপূর্ত্তি করিতে পারে নাই। বৃটীশ-রাজ, উপশমন-শিবিরে যাইতে সমর্থদিগকে, দেড় আনা মাত্র দিতে সমর্থ হন। পাঁচ কোটীর মধ্যে, সার্দ্ধ দ্বাদশ লক্ষ লোক, দুর্ভিক্ষের সাক্ষাৎ বা পরম্পরা

কারণে গতাসু হইল। বাঙ্গালীগণের অনেকেই তৎকালে উপন্যাসের মত নির্লিপ্ত ভাবে, সংবাদ পত্রে এই শোচনীয় ঘটনা পাঠ করা ভিন্ন, ভিক্ষা দিয়া সাহায্য করিতে পারেন নাই। অর্থ-দুর্ভিক্ষের জন্যই শস্য-দুর্ভিক্ষ হইতেছে। বৃটন-রাজলক্ষ্মী, প্রসন্ন মূর্ত্তিতে ভারতীয় প্রজার হৃদয়-শতদলে দাঁড়াইয়া আনন্দ-সুধা বর্ষণ করুন। গবর্ণমেণ্ট কর-ভার হ্রাস করিয়া দিন।

শ্রীরঙ্গের বৈকুণ্ঠ-উৎসব-সন্দর্শন, এখানে সমাপন করিব। চেন্ন-পট্টনের দেবালয়স্থ সকল বিগ্রহগুলি, আর্দ্রার দিন পূর্ব্বাহ্ণে, নগর পরি-ক্রমণার্থ বহির্গত হইয়াছে। অভিযানের অগ্রে পথ-রোধক পট চলিয়াছে। মাদলের অনুবর্ত্তী হইয়া সানাই বাজিতেছে। এক নির্দ্দিষ্ট স্থানে, চন্দ্রমল্লিকা-দামে সমাচ্ছন্ন বিমানগুলি বাহকস্কন্ধে সুস্থির হইল। পুষ্পা-ভরণের মধ্যে, মণি-মুক্তা-খচিত দেব-অঙ্গের কিঞ্চিৎ ভাগ, ও বক্ষোবিলম্বিত হারের কেবল বৃহৎ দোলকখানি প্রতিভাত হইতেছে। শাড়ীর নিম্নে পীত বর্ণের পায়জামা-পরিহিতা, "কঞ্চনী"রা হস্তভঙ্গি-সহকারে নৃত্য গীত আরম্ভ করিল। শ্রুতিমধুর, অচল, বিশ্রান্ত, নিদ্রাকর্ষক বা বৈতালিকবৎ মৃদুভাবে উদ্‌বোধনে সক্ষম ষড়্জের সহিত, ক্ষণে ক্ষণে ধৈবত আসিয়া মিলিতেছে। উহা ক্রন্দন ও শোক-সূচক বটে; কিন্তু আমাদের কীর্ত্তন-অঙ্গের মত নহে। বাঙ্গলা সুরে, মধ্যম নিরাশা বা ভয়-ব্যঞ্জক কার্য্য করে। 'কঞ্চনী'র ধীর শান্তিপ্রদ পাদবিক্ষেপকালে গান্ধার উঠিতেছিল। আশ্বাস-উৎসাহপ্রদ, ঋষভ আলাপ করা এক্ষেত্রে অসম্ভব। সুতরাং তীব্র নিষাদ বা পরিষ্কার পঞ্চম প্রকাশ করিবার অবসরাভাব। এই দেব-বেশ্যাগণ যাহাতে সামাজিক ও পারমার্থিক উৎসবে উপস্থিত হইতে না পারে, তজ্জন্য সমাজ-সংস্কারকেরা সচেষ্ট হইয়াছেন। মহারাষ্ট্রের মত দ্রাবিড় তন্তুবায়, দেবসেবার কথা সমর্থন করে। ইউরোপেও পূর্ব্বে এই প্রথা ছিল।

বাবু কেশবচন্দ্র সেন-সংস্থাপিত, দক্ষিণ-ভারতীয় ব্রাহ্মসমাজের

সংকীর্ত্তক-মণ্ডলী, তামিল অক্ষর-যুক্ত পতাকা ও গীতি-পুস্তিকা হস্তে, ইংরাজী বহির্দ্বারিক বাদক-সম্প্রদায়কে সম্মুখীন করিয়া, পুর-পর্য্যটক প্রতিমাগুলির পশ্চাদ্‌বর্ত্তী হইলেন। বালক ও পূর্ণবয়স্কেরা তানপূরা সহযোগে গাহিতেছেন। অনতিদূরে উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত-স্বরে স্বাধ্যায় হইতেছে; মানব স্তন্যপায়ী; কিন্তু এই দলের কেহ কেহ, গোদুগ্ধ পানে ক্ষান্ত। তাঁহারা নারিকেল-নিষ্পীড়িত দুগ্ধ সেবন করেন। আমরা দুগ্ধকে নিরামিষ জ্ঞান করি। ইউরোপে, ডিম্ব আমিষ মধ্যে গণ্য নহে। এদেশে, সনাতনী নামে চৈতন্য সম্প্রদায় আছেন। তাঁহারা ভজন কালে, মাঙ্গল্য খোল করতাল ব্যবহার করেন কি না, জ্ঞাত নহি। অধুনা নূতন কেহ ব্রাহ্ম হইতেছেন না। তত্ত্বসভা, আর্য্যসমাজ, রামকৃষ্ণ সম্প্রদায় ও রাধা-স্বামীর দল, এখন লোকের আধ্যাত্মিক ক্ষুধা শান্ত করিতেছেন। হিন্দুত্ব অতি কঠিন, চাপিলে তাহার আয়তন-হ্রাস হয়, মোচড়াইলে আকৃতি বদলায়। কিন্তু উভয়ই, আয়াস-সাধ্য। এই স্থিতি-স্থাপকতার গুণে, তাহা প্রশস্ত হইতেছে। যাহাতে বস্তু অধিক, অধিক প্রয়াস না করিলে, তাহা বিচলিত হয় না।

পাচৈ অপ্পা নামক চেট্টি ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা কল্পে স্বকীয় ধনরাশি দান করিয়া গিয়াছেন। বিদ্যামন্দির-সংলগ্ন বিস্তীর্ণ গৃহ, সার্ব্বজনিক সভা-মণ্ডপরূপে ব্যবহৃত হয়। ভিত্তিসংলগ্ন দুই খানি তৈল-বর্ণক চিত্র দেখিলাম;—অপ্পা কোন ছাত্রকে মস্তকে হস্তার্পণ পূর্ব্বক অভয় দিতেছেন; তাহার শিক্ষার ব্যয়ের জন্য তিনি দায়ী রহিলেন; সে স্মিতমুখে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছে। উভয়ের পশ্চাতে 'কোইল' দৃশ্যমান। তাহার অর্থ, কাঞ্চী ও চিদম্বরে দেবসেবার্থ তাঁহার দান স্মরণীয়। হিন্দু নামক প্রাত্যহিক ইংরাজী পত্র পাঠে জ্ঞাত হইয়া, তত্ত্বসভার সপ্তদশ বার্ষিক অধিবেশন দর্শন মানসে, আমরা এস্থলে পুনরাগমন করি।

আদের। *

তত্ত্ব-সভা।

বৌদ্ধ, জৈন, শিখ, ব্রাহ্ম, আর্য্য, দেব, রাধাস্বামী, রামকৃষ্ণ ও তান্ত্রিক মত হিন্দুধর্ম্মের অন্তর্ভুক্ত। ইদানীং তত্ত্বসভার আরও সপ্তদশ বর্ষগ্রন্থি বর্দ্ধিত হইয়াছে। তত্ত্ববিদ্যা সার্থক। ইহার সাহায্যে, লোকে আপন মত পরিস্ফুট ভাবে বোধগম্য করিতেছে।

ইতিহাসের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে হইলে, সমাজ বা ব্যক্তিবিশেষের দোষোদ্ঘাটন অনিবার্য্য। এই অপ্রীতিকর বিষয়ের জন্য, সমালোচক ক্ষুব্ধ থাকেন। নিন্দাবাদ, তাহার উদ্দেশ্য নহে। সকলেই ভাবেন, আমার বিশ্বাস ঠিক। কেহ দোষোদ্ঘাটন করিলে, তাহা অটল থাকে; অথচ বিমর্ষ থাকিতে হয়। এমন সময় কোন পোষকতাকারীকে পাইলে, আনন্দের সীমা থাকে না। তত্ত্ববিদ্যা, জগতে সেই আনন্দ-বর্দ্ধক কার্য্যে ব্রতী।

মনুষ্যমাত্রই এক প্রকার দার্শনিক, অদ্বৈতবাদী। আমরা আপন বুদ্ধিমত ব্যাপ্তিমূলক ও নিগমনমূলক,—এই উভয় প্রকারের ন্যায়াবয়বের হেতু গ্রহণ করিয়া থাকি। হেত্বাভাস বা ভ্রান্তি-সংশ্লিষ্ট হেতুর বিচার, তদনুমানোপরি সংশয় করিতে অপারগ। অতএব প্রচলিত ব্যবহার রক্ষা করিতে হইবে। তখন সর্ব্বপ্রকার সংস্কারকার্য্যকে ভয়ানক বোধ হয়। আমিত্ব সমগ্র জগদ্ব্যাপী। বিশেষতঃ আমরা ভাবপ্রবণ, সিদ্ধান্ত করিয়া পরে কার্য্য করি, কার্য্য দেখিয়া সিদ্ধান্তে উপনীত হই না।

---

* (১) Theosophy & New Psychology ও (২) Ancient Wisdom—Annie Beasant প্রণীত।

ম্যাডাম ব্লাভস্কি অলৌকিক ব্যাপার প্রদর্শনে অকুতোভয়, মনোনুভব ক্ষমতায় অদ্বিতীয়। শ্রীমতী কোলম্ব, মায়াবিনীর কুথ্‌হুমি-রহস্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। তখন বলবদাক্ষির রুধিরে মারাত্মক বিষ প্রবেশ লাভ করিল। রাজদ্বারে অভিযোগ করিতে হইবে। কিন্তু তিনি ভারতে প্রত্যাগতা হইলেন না। বিশ্বাসীদের পক্ষে যাহা সম্ভব, তখন তদনুরূপ সিদ্ধান্ত হইল। কোলম্ব মিথ্যাবাদিনী। ভক্তির প্রামাণিকতা অধিক গ্রাহ্য। বিলাতের 'সাইকিকল' সভা, অনুসন্ধান করিয়া কুথ্‌হুমিকে পান নাই।

দয়ানন্দ সরস্বতী, প্রতিমা পূজার খণ্ডন এবং বৈদিক দেবতার ভৌতিক চলিত অর্থ পরিত্যাগ করিয়া, আধ্যাত্মিক অর্থ করিলে, পাশ্চাত্য বিদ্যায় শিক্ষিত সুধীসমাজ ইপ্সিত নেতা প্রাপ্ত হইলেন। গতানুগতিক নিয়মে, আর্য্যসমাজ প্রথমতঃ বর্ণাশ্রম বন্ধন ত্যাগ করিতে পারিলেন না। তজ্জন্য কর্ণেল অল্‌কট ও তদীয় বান্ধবীকে বৌদ্ধ হইতে হইল। শিষ্য হইবেন না ; অতএব গুহ্য বৌদ্ধ হইলেন। শাক্যমুনি গুপ্তমতকে ঘৃণা করিতেন। ত্রিপিটকের বিরুদ্ধ কাহিনী প্রচার করিলে, আর প্রতিবাদের আশঙ্কা নাই। মর্ত্ত্যে যে স্থান সর্ব্বাপেক্ষা দুর্গম, সেই ভোট প্রদেশে, মহাত্মা-দিগকে স্থাপন করা হইল। মহর্ষি ঈশা তিব্বতীয় কোন বিহারে বাস করিয়া আপন মতের পরিপুষ্টি করিয়াছিলেন। বলবদাক্ষির কর্ম্ম, অনুর্ব্বর (নিষ্কাম) নহে। তাহা উর্ব্বর, বা সকাম। যেমন মোহরের কর্ম্মফলে, মোহরের ছাপ্‌। মনুষ্য কয়েকটি স্কন্ধ বা ধর্ম্মের সমষ্টি। কোন স্কন্ধের স্থায়িত্ব বা সত্তা নাই। সকলেই ক্ষণবিধ্বংসী ; সুতরাং তাহার পুনর্জ্জন্ম হইবার সম্ভাবনা না থাকিলেও, কেন জানি না, লোভ, ঘৃণা ও মোহজনিত কর্ম্ম, জন্মান্তরের জনয়িতা হয়। জীবের চরিত্রের পুনর্জ্জন্ম হয়। কর্ম্মের জন্মান্তর লাভ হয়। বিবি বিলাতে দেহত্যাগ করিয়া, তত্ত্ববিশ্বাসীদের মতে ব্রাহ্মণের গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।

অল্‌কট্‌ মহোদয় পরিষদের কার্য্য আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে কহিলেন, "এখানকার অধিবাসিবৃন্দের অমনোযোগিতায়, এই সামাজিক ব্যাপারে, এত অল্পসংখ্যক ব্যক্তিকে উপস্থিত দেখিতেছি। লণ্ডন হইতে আগত যুবা ওলড, সিংহলী বৌদ্ধ বুলট জেম্‌স্‌, আমেরিক ইলিস্‌ ও পুনার থণ্ডেয়ালা অনুষ্ঠিত কার্য্যের ব্যাখ্যান দিলেন। তদনন্তর, সংস্থাপকের অভিভাষণ আরম্ভ হইল। যথা,—লোকে নিন্দা করুক, ক্ষতি নাই। আমরা প্রতি বৎসর দেখাইব, পৃথিবীর বিভিন্ন প্রদেশের প্রতিনিধিগণ,—একে একে কি বলিতেছেন। পার্শি বিচারক কহিয়াছেন, "তত্ত্ববিদ্যার সাহায্যে, আমাদের মত অধিক বুঝিতেছি।" আমি ভারতে আসিয়াই আর্য্য-সমাজের সভাপতির সহিত পত্র ব্যবহার করি। তাঁহার মূলসূত্র, আমাদের মত নহে। তিনি চাহেন, আমরা শিষ্য হইব, এবং পার্শী ও বৌদ্ধের দোষ উদ্ঘাটন করিব। আমরা অসাম্প্রদায়িক। বৌদ্ধগণ ইউরোপে প্রচারক প্রেরণ করুন। হিন্দুরা পারিবেন না। কারণ, হিন্দুত্ব জাতিগত। কিন্তু উভয় মতই একসূত্রে আবদ্ধ। একের প্রচার হইলে অপরটির প্রচার হইবে। খ্রীষ্টীয় প্রচারকগণের হস্ত হইতে ত্রাণ পাইবার উপায় করা উচিত। ত্রিপতি ও গয়ার বুদ্ধ মন্দির ৭৫০ বৎসর অবধি হিন্দুর কর্ত্তৃত্বাধীন রহিয়াছে। তাহার উদ্ধারের উপায় কি? ইত্যাদি।

কর্ণেল যখন জানেন, হিন্দু ও বৌদ্ধমত একসূত্রে আবদ্ধ, বিচারকের প্রচলিত অধিকার লোপ করিবার ক্ষমতা নাই, তখন ধর্ম্মপালকে গয়ার মোহন্তের বিরুদ্ধে উত্তেজিত কেন করেন? বৌদ্ধ-জগতে প্রতিষ্ঠালাভেচ্ছাই, তাহার হেতু। হিন্দু বোধি-গয়ায় পিণ্ডদানান্তে মূর্ত্তিবিশেষের মুখে নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিতে যেন না পারে, এহেন ব্যবস্থা অবশ্য কর্ত্তব্য।

তত্ত্বসভা, ধর্ম্মসম্বন্ধে অসাম্প্রদায়িক। বহিরঙ্গভাবে, ইহা সত্য। বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব, প্রাচীন-সাহিত্যের উদ্ধার, গুপ্ত বিদ্যার অনুশীলন,

সকলেরই বাঞ্ছনীয়। কুৎহুমি লাল সিং প্রভৃতি মহাত্মা, বা তাঁহার অনুচরবর্গের বাক্যে আস্থাই যখন অন্তরঙ্গভাব, তখন, উহা সম্প্রদায় হইতে অবশিষ্ট রহে নাই।

মুম্বই নগরের 'রেকড়া' এখানে 'ঝট্‌কা' নামে প্রথিত। তদারোহণে, আমি "অল্‌কট বাঙ্গলা" অভিমুখে যাত্রা করিলাম। যানে আর একটি ভদ্রলোক উঠিলেন। তিনি সে পর্য্যন্ত যাইবেন না। তিনি আমার উদ্দেশ্য শুনিয়া কহিলেন, এখন মহাত্মাদের প্রতিপত্তি গিয়াছে। বাবু শরচ্চন্দ্র দাস বলেন, ভোটে মহাত্মা নাই,—পলাইয়াছেন। ক্রমে সর্পাকার 'কোয়েম' নদীর ফণার উপর দিয়া, যথায় 'আদের'-তটিনী সমুদ্রে সঙ্গতা, হইয়াছে, আমরা সেই দ্বীপে উপনীত হইলাম। স্থান-নির্ব্বাচন সুন্দর হইয়াছে। ফেনিলবারি, সমুদ্র হইতে নদীমুখে প্রবিষ্ট হইতেছে। উপবনে, বৃক্ষের আশ্রয় হইতে অন্ধকার সরিয়া যায় না। অন্ধকারের আশ্রয় ব্যতীত, গুপ্তবিদ্যার প্রচারবৃদ্ধি অসম্ভব। মুম্বই অপেক্ষা, সে বিষয়ে মান্দ্রাজ অধিক উপযোগী। "নাস্তি সত্যাৎ পরো বলঃ"-শীর্ষক মণ্ডপাভ্যন্তরে যাইয়া, আমি দণ্ডায়মান হইলাম। আমেরিকার অন্তর্যুদ্ধের কর্ণেল, এক্ষণে অখিল ভূমণ্ডল জয় করিয়াছেন। চতুর্দ্দিকে তত্ত্বসভার শাখাগুলির নাম ও সংস্থাপন-কাল-নির্দ্দেশক পতাকানিচয় আলম্বিত রহিয়াছে। ভিত্তির অলঙ্কারস্বরূপ সৌরচিত্রে পূর্ব্ববর্ত্তী কয়েক সম্মিলনের বিবিধ জাতীয় সাধক নয়ন-পথগামী হইলেন। পুস্তকালয়ে সিংহলিয় ও ভারতীয় হস্তলিখিত গ্রন্থ সংগৃহীত হইতেছে। বিক্রেয় পুস্তকের তালিকা দেখিলাম।

গুপ্তবিদ্যার পুস্তক—যাহা পাঠ করিলেও গুহ্য থাকে—হইতে আরম্ভ করিয়া বৌদ্ধ, হিন্দু, জোরোঅষ্ট্রীয়, কব্বাল, খ্রীষ্টীয়, এবং ইন্দ্রজাল, মইস্মর ও প্রেততত্ত্ব, চরিত্রানুমান, সামুদ্রিক ফলিত প্রভৃতি প্রকৃত ও ভাক্ত,

তাবৎ বেদিতব্য গ্রন্থের নাম ইহাতে পুঞ্জীকৃত হইয়াছে। যাহার যেমন প্রয়োজন, তিনি তাহা নির্ব্বাচন করিতে পারেন।

অন্তরঙ্গ সভার সদস্য ব্যতীত, গুপ্তগৃহে কেহ প্রবেশ করিতে পারে না। তথায় দুই জন মহাত্মার চিত্র আছে। এই স্থানে ভোট হইতে মহাত্মার পত্র একটি কপালে আসিয়া পড়িত। প্যারিসের ভোজনালয়ে অবস্থান কালে বলবদাস্কী যে গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তাহার কয়েক অধ্যায় উক্ত মহাত্মা কর্ত্তৃক রচিত। ইহাতে শ্রীমতীর ভারতীয় প্রাচীন বা নব্য কোন ভাষা জানিবার প্রয়োজন ছিল না। গুরুদেবের চিন্তা মনঃ প্রেরণাদ্বারা শিষ্যার মস্তিষ্কে প্রক্ষিপ্ত হইত। কায়া না থাকিলে, ছায়া হইতে পারে, এ অধ্যাস অনেকের আছে। ভক্ত আপন হৃদয়ে দেবতার প্রত্যাদেশ অনুভব করে। অথচ প্রত্যক্ষ ভাবে শুনিয়াছে বলিয়া জ্ঞান হয়। ভাব সঞ্চার প্রভৃতি অতিপ্রাকৃত কার্য্যে চাতুরী ও সত্যের মধ্যে প্রভেদ নির্ণয় করা নিতান্ত দুরূহ। তদ্ভিন্ন ভ্রান্ত জ্ঞান, প্রবঞ্চক হইয়া পড়ে। বিশ্বাসের চক্ষে উহা উন্নত অবস্থা।

শ্রীমতী বেসেণ্ট কর্ত্তৃক শান্তিকুঞ্জে, উপেন্দ্র বাবু দ্বারা শিবপ্রতিষ্ঠান্তে কাশীস্থ ব্রাহ্মণমণ্ডলীকে ভূরি দক্ষিণা প্রদত্ত হয়। কথিত আছে, তিনি মিত্র গোষ্ঠীর গৃহে দুর্গোৎসব কালে, মণ্ডপের একপার্শ্বে কুশাসনোপরি ক্ষৌম বস্ত্র পরিধান করিয়া উপবেশনান্তে ত্র্যক্ষরী মন্ত্র জপ করিয়াছেন। কর্ণেল শেষাবস্থায় যজ্ঞোপবীত ধারণ করেন। বেসেণ্ট প্রথমে কোন্ দিকে ভর দিবেন, স্থির করিতে না পারায়, লঙ্কায় বৌদ্ধ ভারতে তাঁহার দ্বারা হিন্দুমত ব্যাখ্যাত হইতে লাগিল।

বাসন্তী কেন ব্রহ্মবাদিনী হইলেন, তদ্বিষয়ে বলিয়াছিলেন। বিজ্ঞান যে স্থলে নিরুত্তর, তিনি তত্ত্ববিদ্যায় তাহার সদুত্তর পাইয়াছেন। সূক্ষ্ম (Astral) শরীর, কারণ (Mental) শরীর, প্রেতলোক, দেবলোক,

নির্ব্বাণ, কর্ম্ম, পুনর্জন্ম ইত্যাদি সার্ব্বভৌমিক তত্ত্বগুলি ইহাতে ব্যাখ্যাত হইয়া থাকে। অনেকে জানেন, বিশ্বাসকে সহচর না করিলে, তত্ত্ববিদ্যা বুঝা অসম্ভব। সূক্ষ্ম শরীরকে (Spirit-matter) চৈতন্য পরমাণু বলা হয়। লোকে ভাবিল, বুঝিলাম। চৈতন্যের আবার পরমাণু কেমন, কেহ জিজ্ঞাসা করিবেন না। বেদান্তের ঈশ্বর জ্ঞানস্বরূপ। তাহা জ্ঞেয় হইতে পারে না; তবে কথা ফুরাইল। বিজ্ঞান চিরদিন অসম্পূর্ণ থাকিবে। বিশ্বাসই কেবল সকল কথার উত্তর দিতে পারে। দ্রোণাশ্রমে অদৃশ্য কিরণ প্রভাবে অদৃশ্য বস্তুর ছায়াপাত দ্বারা চিত্র অঙ্কন হইতেছে। বৈদ্যুতিক প্রক্রিয়ায় রঞ্জন আলোক মাংস ভেদ করিয়া বহির্গত হইতে পারে। কিন্তু অস্থিতে আবদ্ধ হয়। চিকিৎসক তৎসাহায্যে নিদান স্থির করিতে পারিতেছেন। তাই বলিয়া বিজ্ঞান তাবৎ অদৃশ্য বিষয় গ্রহণ করিবে না। যেখানে কথা ফুরায়, সিদ্ধান্ত তাহার সীমার বহির্ভূত।

ম্যাডাম ও কর্ণেল ভাবিয়াছিলেন, নিরীশ্বরভাব পরিত্যাগ করিলে, সুধীসমাজে হেয় হইতে হইবে। নাস্তিকতার প্রকারভেদ বিস্তর। ক্ষপণকগণ কি না বিশ্বাস করেন। কিন্তু জগৎ-সৃষ্টির কারণ ঈশ্বর নহেন। এনি ও চারলস্ যৎকালে অভিন্ন-মত ছিলেন, তখন ব্রাড্‌ল লিখিয়াছেন, আমি নিরীশ্বরভাবে একটি সত্তা স্বীকার করি। এই সত্তা অর্থে, জাগতিক ব্যাপার বুঝিতে হইবে। ইহা, কেবল তাহার গুণের দ্বারা জ্ঞাতব্য। যতদূর বোধগম্য হইবে, সেই পর্য্যন্ত বিশ্বাস্য। ঈশ্বরের যে প্রকার লক্ষণ দেওয়া হয়, আমি তাহা স্বীকার করি না; এইজন্যই তিনি নাস্তিক। যাহা পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণদ্বারা প্রত্যক্ষ হয়, তাহাই প্রাকৃতিক নিয়ম। প্রাকৃতিক নিয়মের অস্তিত্ব দেখিয়া, তিনি আত্মহারা নন। বিশ্ববিধাতার মাহাত্ম্য গান করিয়া তিনি আত্মপ্রসাদ অনুভব করিতে পারেন না। নিয়মের ব্যতিক্রম হইবার সম্ভাবনা নাই। নিয়ম অবশ্যই আছে, কিন্তু

কিরূপে হইল, তাহা কেহ জানেন না। তাহার কারণ নিষ্কাষণ করা নিষ্ফল। ব্রাড্‌ল প্রাকৃতিক নিয়ম স্বীকার করিয়াছেন। উহাতে তিনি নির্ভরশীল। সেশ্বরবাদ ভগবানে নির্ভর করে। আস্তিক ও নাস্তিকে প্রভেদ আর রহিল না, তিনি নির্ভরাস্পদ। পার্থিব ধর্ম্মবীজে ব্রাড্‌লর মতভেদ নাই। জগৎ-প্রণালী জড়পদার্থ, পশু ও মানব-সমাজে এক অনির্দ্দেশ্য লক্ষ্য করিয়া কার্য্য করিতেছে। উহাই নিয়ম বা নিয়তি। ধর্ম্ম তাহার একাংশ। নিয়তির প্রভাব কেহ অতিক্রম করিতে পারে না। একস্থলে যাহা ধর্ম্ম, স্থানান্তরে তাহাই অধর্ম্ম। ইহা সাপেক্ষ বিষয়। আমি সামাজিক জীব—সর্ব্বভূতে ব্যাপিয়া আছি। আমি ভূতের উপকার করিলে, আমারই উপকার সাধিত হইবে—পীড়া দিলে, আমাকেই ক্লেশ দিব। ধর্ম্মের মূল, সাধারণতঃ উক্ত ভাবের উপর নিহিত আছে। পাপে বিরতি বা পুণ্যে অনুরাগ-বৃদ্ধ্যর্থ, অভ্যাসশীল করাইবার জন্য, সামান্য লোককেও অলৌকিক এবং অতিপ্রাকৃতে বিশ্বাসী করাইবার চেষ্টা করিতে নাই। কুসংস্কার দ্বারা বিড়ম্বিত হইলে, মনুষ্যত্বের স্ফূর্ত্তি হইবে না। ধর্ম্মে প্রীতি উৎপাদন করাইলে, উপকার আছে। যে ধর্ম্ম থাকাতে মানুষের বিশেষত্ব, ব্রাড্‌ল তাহার অধিকারী ছিলেন। সত্যনিষ্ঠার জন্য তিনি প্রসিদ্ধ। তিনি স্বদেশ ও ভারতের হিতকল্পে আপনার জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। ভারতের ন্যায় পরাধীন যে সকল দেশ আছে, তিনি তৎসমুদয় রক্ষা করিতে একান্ত উৎসুক ছিলেন।

এখন, স্বাধীনমতের বক্তা ও শ্রোতা অতীব দুর্লভ। মান্দ্রাজে, মুরুগেস মুদেলি "দার্শনিক জিজ্ঞাসু" নামক ইংরাজি সাপ্তাহিকে ব্রাড্‌ল প্রভৃতির মত প্রচার করিতেন। বঙ্গে কেদারনাথ বসু এই বিষয়ে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। নূতন পৃথিবীতে, কেহ কেহ খৃষ্টধর্ম্মের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করায়, ঈশ্বরনিন্দার অপরাধ হইয়াছিল। তজ্জন্য কয়েকজন প্রচারক কারাগারে

নিক্ষিপ্ত হইয়া অমর হইয়াছিলেন। জড় ও অদ্বৈতবাদ কেবল ঔপপত্তিক; সুতরাং লোকের অপ্রিয় নয়। স্বাধীনচিন্তাকারী সমাজ, তাঁহাদের মত ক্রিয়াসিদ্ধ করিতে প্রয়াসী হওয়ায়, তজ্জন্য, নিন্দাভাজন হইয়া থাকেন।

জগতে অধিকাংশ লোকে যাহা চায়, বেসেণ্ট সেই পথের অনুসরণ করিয়াছেন। ইহাতে অসাম্প্রদায়িকতার উপর আস্তিক্যের অলঙ্কার সর্ব্বগ্রাসী হইল। ব্রাড্‌ল পরলোকে কি অবস্থায় আছেন, তিনি তাহা লেখা অন্যায় বোধ করেন নাই। মহাত্মারা পার্থিব বিষয়ে মতামত দিতে প্রস্তুত নহেন। অল্‌কট্‌ দেহত্যাগ করিলে, বাসন্তী তাঁহাদের আদেশক্রমে, পৃথিবীব্যাপী সংসদের সভাপতি হইলেন। 'প্রবন্ধ'কারিগণের অমতে তিনি সুহৃদ্‌কে পরিষদে স্থান দিলেন। তিনি বিদুষী, মানসিক ভূগোলবিৎ। কোন্ স্থান হইতে কি ভাব আইসে, তাহা তিনি বিলক্ষণ বুঝেন। আপনাকে ছাড়িলে, কিছু থাকে না। স্বতন্ত্র, নিরপেক্ষ পদার্থের বিদ্যমানতার প্রমাণ নাই। যেমন করিয়া হউক, আপনার প্রাধান্য স্থাপন করা উচিত। ব্রহ্মাণ্ড, শব্দ স্পর্শ গন্ধাদির সমবায় ও পরম্পরা মাত্র। সেই অস্তিত্ব—এবং দুঃখ সুখ সমস্তই নিজের মধ্যে, ঐগুলি বহিঃস্থ নহে। আমি,—এই জগতে সমগ্রব্যাপী। ইহাতে কুমারী এড্‌গার-প্রমুখ তাত্ত্বিকগণ যাহা গ্রহণ করিয়াছেন, ত্যাগ করিবার নয় ভাবিয়া, তাঁহারা স্বাধীন তাত্ত্বিক-সমিতির সৃষ্টি করিলেন। রায় ঈশ্বরীপ্রসাদ, তজ্জন্য প্রধান কার্য্যালয়ের সন্নিকটে, কাশীতে সহযোগী সভার জন্য নিজ গৃহে স্থান দিয়াছেন। বাসন্তীকে, অধুনা সকল দিক রক্ষা করিতে হইবে। হিন্দুত্বে অধিক ভর দিলে চলিবে না। কৃষ্ণমূর্ত্তি-নামা বালকে, ঈশার আবির্ভাব করান আবশ্যক হইয়াছে। অশরীরী মহাত্মারা, আদেরে (Adyar) আগমনপূর্ব্বক গাত্রাবরণ ও চা-পান পাত্রকে ভার বোধ করিয়া পরিত্যাগ করিয়া যাইতে বাধ্য হইতেছেন।

তত্ত্বসভা আমাদের বংশধরগণের জাতীয়তার মমতা বৃদ্ধি করিয়া দিতেছে। বাসন্তী দেবী, সুলভে শিক্ষার জন্য বিদ্যামন্দির স্থাপন করিয়া প্রভৃত উপকার করিতেছেন। এই সকল কারণে, তাঁহারা কৃতজ্ঞতার পাত্র—আমাদের নমস্য। ধর্ম্মনীতি অনেক স্থানে সকলেরই এক। বিরোধে কেবল অনিষ্টই হইয়া থাকে। "থিওসফি", সকল সম্প্রদায়কে সমর্থন করিয়া, এপক্ষে উপকার করিতেছে।

ব্রহ্মবাদিনীর মতে, ছাত্রজীবনে রাজনৈতিক চর্চ্চা অবিধেয়। পাঠ্যাবস্থায় বিচারকের পদ গ্রহণ করা অসঙ্গত। ধর্ম্মনীতির ন্যায় রাজনীতিও শিক্ষাসাপেক্ষ। গুরুজনের পদানুসরণ করিতে বাধা নাই। উচ্ছৃঙ্খলতা মন্দ। মুসলমান বা হিন্দু, যে যেমন স্থানে পালিত হয়, তাহার সেইরূপ বিশ্বাস হইয়া থাকে। এদেশে কাব্যকে ইতিহাস বোধ করে। বাল্যকালে ক্রিয়াসিদ্ধ ধর্ম্মনীতি-শিক্ষা অবশ্য প্রয়োজনীয়।

তত্ত্ববিদ্যা কাহারও শত্রু নহে, সকলের মিত্র। তবে, নেতৃগণ খৃষ্টীয় ধর্ম্ম ত্যাগ করিলেন কেন? ইহা না হইলে, বোধ হয়. তাঁহারা লোকের সহানুভূতি পাইতেন না। বেসেণ্ট, মাসিক দুই হাজার টাকার পুস্তক বিক্রয় করিতে পারিতেন না। মানুষের চিত্ত-দৌর্ব্বল্য আসিতেই পারে। লোকৈষণা দুস্ত্যাজ্য।

তত্ত্ববিদ্যার আলোক দ্বারা বিষয়-বিশেষ সুন্দর বুঝা যায়, ইহা নিশ্চিত। 'ইথর' বা আকাশ সর্ব্বব্যাপী। দূরস্থ মনুষ্য, তাহার অন্তর্গত হওয়ায় একত্ব লাভ করিয়াছে। কম্পন উৎপন্ন হইলে, এক মস্তিষ্ক হইতে অন্য মস্তিষ্কে চিন্তা পরিচালিত হইতে পারে। অন্যের অনুভব জানিবার ক্ষমতা কিরূপে সম্ভব?—ইহাতে আমি তাহার ব্যাখ্যা পাইয়াছি। বাসন্তী বুঝাইয়াছেন, ইহা তন্তু-বিহীন তাড়িতবার্ত্তা-পরিচালন সদৃশ।

আর্য্য সমাজের দ্বারা, তত্ত্ব-সভা অপেক্ষা অধিকতর উপকার হইবে।

তাঁহারা সংস্কারের প্রতি লক্ষ্য রাখেন। মুসলমান ও খৃষ্টানকে শুদ্ধ করিতেছেন। দয়ানন্দ কহিতেন, হিংসা অর্থে, অসূয়া,—পশুবধ নহে। আমিষভোজী 'মাসিগণ' সেই অর্থ গ্রহণ করিয়াছে। নিরামিষাশীর দল 'ঘাসী' থাকিলেন। গুরুকুলে প্রবেশ কালে, বটু যে জাতিরই হউক না কেন, উপনীত হইবে। কায়স্থ ব্রাহ্মণ হইয়াছে। স্বরস্বতী মহাশয়কে, একব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, আপনারা কাহার স্বামী? তিনি কহিলেন—ইন্দ্রিয়ের। আমি ভাবিলাম, মাৎসর্য্যের কথা হইল। বস্তুগত্যা, তাহা নহে। অন্য সময়, স্বামীজির মুখে শুনিয়াছি, আমাদের চিত্তবিকার অবশ্য হয়, কিন্তু আমরা তাহার সংযম করি।

সংস্কার বশতঃ হিন্দুধর্ম্মের বিশ্বাস যায় না; অথচ, বিজাতীয় সংস্রবে নিষিদ্ধ আহারে অপ্রবৃত্তি তিরোহিত হয়। এ অবস্থায় রামকৃষ্ণ সম্প্রদায় মনোযোগ আকর্ষণ করেন। পরমহংসদেব নিরক্ষর ছিলেন; অথচ তাঁহার শ্রীমুখ হইতে, পারমার্থিক বিষয়ে চারু চটুল বাণী বহির্গত হইত। ভক্তি-যোগের সহিত গ্রহাময় সম্মিলিত থাকায়, সাধারণে উহাকে সমাধির অবস্থা জ্ঞান করিয়াছে। 'ক্যাটালেপ্‌সি' নামক মস্তিষ্ক-পীড়ার লক্ষণ এই;—রোগাক্রমণ কালে, দেহের সংস্থান পূর্ব্বে যে অবস্থায় ছিল, ঠিক সেই মত রহে। আত্মবোধের অভাব ঘটে। নাড়ীর গতি, এবং শ্বাস ক্রিয়ার পরিবর্ত্তন হয় না। নিমেষ বা চতুর্দ্দিন পর্য্যন্ত, আক্রান্ত ব্যক্তিকে উক্ত অবস্থায় থাকিতে দৃষ্ট হইয়াছে। এ ব্যাধি সচরাচর হানিজনক নহে; তবে আত্যন্তিক উদ্বেগ, উদ্দীপক বলিয়া গণ্য। ভক্তির উদ্বেগ হইলেই, রামকৃষ্ণ উক্ত দশা প্রাপ্ত হইতেন। দণ্ডায়মান অবস্থায়, ঊর্দ্ধবাহু হইয়া সঙ্কীর্ত্তন করিতেছেন, সেইভাবে রহিয়া গেলেন। সংজ্ঞা-লোপ হইল; অথচ পতিত হইলেন না। দর্শকবৃন্দ চমৎকৃত হইয়া রহিল। তাঁহার জীবনে এই বৈচিত্র্য মহত্ত্বের কারণ হইয়াছে।

বিবেকানন্দ আমেরিকায় কহিয়াছিলেন,—মনুষ্য ঈশ্বরের অবতার। নবভূমণ্ডল চমকিয়া উঠিল। যত অবতার পশ্চিমে আবির্ভূত হইয়াছেন। চৈতন্যভিন্ন আমরা আর একজনকে পাইলেও গৌরবের বিষয় হইত। রামকৃষ্ণ অর্চ্চিত হইলে উপকার আছে। এই মঠের সন্ন্যাসিগণ স্বামীজির দ্বারা কর্ম্মী হইয়াছেন। ইঁহারা তত্ত্বসভার পক্ষপাতী নহেন। পাপীকে উপেক্ষা না করিয়া, তৎপ্রতি প্রীতি প্রকাশ করা উচিত। তবেই, সে সংশোধিত হইতে পারে। সকলই ব্রহ্ম, কেহ পর নহে; অতএব অন্যের কষ্ট নিবারণ করিলে, ব্রহ্মেরই সেবা করা হয়। এইস্থলে আত্মতত্ত্বের সম্যক্ মীমাংসা হইল। জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তিকে একযোগে লইয়া যাইবার চেষ্টা প্রশংসনীয়। পরের জন্য কার্য্য করিতে অভ্যাস করা, নিবৃত্তিমার্গের সোপান, ইহাতে সন্দেহ নাই।

রাধাস্বামী, শালগ্রাম সিংহ বাহাদুরের গুরু। "সৎ সঙ্গ"র মতে বেদ না মানিলে ক্ষতি নাই। গুরুবাদ শিরোধার্য্য। বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের ত্যাগ বা রক্ষা, উভয়ই দুরূহ; ইহা তাঁহারা প্রদর্শন করিতেছেন। ইহাতে হিন্দুধর্ম্মের উপকার ভিন্ন ক্ষতি হইবে না। নির্ম্মল বাবুর পৌত্রীর সহিত ব্রহ্মাশঙ্করের পুত্রের বিবাহ হইয়াছিল। একজন বাঙ্গালী, অন্য হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণ। পণ্ডিতজীর পরে, সর্ব্ববাদিসম্মত না হওয়ায়, আর কেহ গুরু হইতে পারিতেছেন না।

এই সম্প্রদায় নাদোপাসক। মুক্তাসনে অবস্থিত হইয়া শাম্ভবী মুদ্রা গ্রহণপূর্ব্বক অন্তঃস্থ নাদ দক্ষিণ কর্ণে শ্রোতব্য। শ্রবণপুট, নয়নযুগল, ঘ্রাণ ও মুখের নিরোধ করিতে হয়। কর্ণে হস্তার্পণ করিলে, যে শব্দ শ্রুত হয় কল্পনার সাহায্যে তাহা সমুদ্রগর্জ্জন, মেঘধ্বনি, শঙ্খ, ঘণ্টা, বংশী বা স্ফুটাত্মক রাধাস্বামী—কোন একটির মত হইয়া দাঁড়ায়। সেই নাদ লক্ষ্য করিয়া তাহাতেই চিত্ত স্থির করিবে। চিত্ত নাদাসক্ত হইলেই, আর বিষয়মদে

মুগ্ধ হইবে না। নাদে চিত্ত প্রবর্ত্তিত হয়; পরে নাদেই লীন হয়। তখন আর কোন শব্দ শুনা যায় না। সেই নিঃশব্দ ভাবই পরব্রহ্ম। ক্রমে, উক্ত হঠযোগীর দেহ মৃতবৎ অবস্থান করিতে থাকে। এই অবস্থা হইলে, সাধক মুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইতে পারেন। যোগপ্রবণতার দিনে এবংবিধ প্রলোভন ত্যাগ না করিয়া, অব্রাহ্মণ গুরুর উচ্ছিষ্ট ভোজন করায়, "থুকপন্থি" বলিয়া আখ্যাত হইতে অনেকে প্রস্তুত আছেন। ইঁহারা যোগী, অতএব নিরামিষাশী। চরম অবস্থায় কেহ উত্তীর্ণ হইতে পারিয়াছেন কি না, জ্ঞাত নহি।

তত্ত্ববিদ্যা হঠযোগ অভ্যাস করিতে বলে না। ত্রাটক (দৃষ্টিসাধন) প্রভৃতি শারীরিক প্রক্রিয়া দ্বারা নানা অনিষ্টপাতের আশঙ্কা আছে। রাজ-যোগে চিত্তসংযম করিতে হয়। ইহাতে হঠের ন্যায় প্রাণায়াম প্রয়োজনীয় নহে। কেহ বলেন, হঠ ব্যতীত, রাজযোগে ফল নাই। যোগ দুই ভাগে বিভক্ত; অভাব যোগ ও মহাযোগ। আপনাকে শূন্য ও সর্ব্বপ্রকার গুণ-রহিত রূপে চিন্তা করাকে অভাব যোগ বলে। যদ্দ্বারা আত্মাকে ব্রহ্মের সহিত অভেদ জ্ঞান করা যায়, তাহা মহাযোগ। ইহাতে শারীরিক প্রক্রিয়ার প্রয়োজনাভাব। পরন্তু, সে সকল থাকিলে শ্রেয়স্কর।

'থিয়োসফি'র মতে, ইহ শরীরে, যোগারূঢ় ব্যক্তি সূক্ষ্ম-শরীর, কারণ-শরীর ও 'বুদ্ধিক'-শরীর লাভ করিয়া, যে লোকে বিচরণ করিতে পারা যায়, তথাকার বিষয় জ্ঞাত হইতে পারেন। সূক্ষ্ম ও কারণ শরীরের অবস্থা স্বপ্ন ও সুষুপ্তি কালের ন্যায়। তৎকালে, আত্মা প্রাণময় ও মনোময়-কোষে অবস্থিতি করে। তুরীয় অবস্থা, 'বুদ্ধিক' লোকের সদৃশ। ইহাতে, মস্তিষ্কের সম্বন্ধ এত দূরবর্ত্তী হয় যে, যোগী বাহ্য কোন কার্য্যে আকৃষ্ট হইতে পারে না। সুষুপ্তিতে মস্তিষ্ক কোন জ্ঞান উৎপাদন করিতে অক্ষম। তখনি, মন আপনার কারণ-শরীরের মধ্যে কার্য্য করিতে

থাকে। যোগের স্বপ্নাবস্থা তান্ত্বিকের নিকট জাগ্রৎ অপেক্ষা অধিক সত্য। তৎকালে জ্ঞান সূক্ষ্মশরীরে কার্য্য করে। জাগ্রদবস্থা, স্থূলশরীর বা অন্নময়-কোষের কার্য্য। অন্তরঙ্গ বিভাগের শেষ শ্রেণীর সদস্যগণ অবশ্য উপরি-উক্ত তত্ত্ব বুঝিতে পারেন। উক্ত বিভাগের জনৈক বিশিষ্ট ব্যক্তি আমাকে কহিয়াছেন, সেই লোকে গমন না করিলে, বুঝিবার উপায় নাই। মধ্যশ্রেণীর সদস্যকে, দেবী বাসন্তী পত্র দ্বারা উপদেশ দেন। কেহ জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, আমি ধ্যানে বসিলে, হিংস্র জন্তু দেখি, প্রতিকারের উপায় কি? আদ্য শ্রেণীতে কেবল তত্ত্ব-সাহিত্যের অধ্যাপনা হয়।

ব্রাহ্মমতকে, আমরা ঘূর্ণিবায়ুর ন্যায় জ্ঞান করি। পরস্পর বিপরীত-গামী ঝটিকা-প্রবাহ মিশ্রিত হইলে, ঘূর্ণিবায়ু উৎপন্ন হয়। উহা জলে পতিত হইলে, জলস্তম্ভ হইবে। ব্রাহ্মসমাজ আর্য্যের সহিত 'সেমেটিক' ভাব মিশ্রিত করিয়া, আমাদের মধ্যে জলস্তম্ভ উৎপাদন করিয়াছেন। তাঁহারা অল্পসংখ্যাগত হইয়া রহিলেন। প্রবলবাত্যাদ্বারা দেশের দূষিত বাতাবরণ বিশুদ্ধি প্রাপ্ত হয়। তজ্জন্য তাঁহাদের নিকট হিন্দুগণ ঋণী। ইঁহারা সত্যনিষ্ঠা ও সৎসাহসের জন্য প্রসিদ্ধ। স্বর্গ যদি চূর্ণ হইয়া যায়, তথাপি ইঁহারা ন্যায়কে রাজ্য করিতে দিবেন। সনাতনমতাবলম্বিগণ যেন ব্রাহ্মগণের নিকট এই বিষয় শিক্ষা করেন। স্থলভেদে সনাতন মতের পুনরুত্থানবশতঃ ব্রাহ্মসমাজ ভগ্ন করিয়া তত্ত্বসভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়ের নূতন সংস্করণ,—তান্ত্বিক, আর্য্যসমাজি, রামকৃষ্ণ, রাধাস্বামী,—সমস্তই সময়োপযোগী হইয়াছে। এই গুলি নব্য-ভারতের উপকারার্থ, বৈদিকধর্ম্মের ধারাবাহিকতা রক্ষা করিবে। যে মত যখন মনুষ্যের হিতকর, তৎকালে তাহাই প্রকৃত ধর্ম্ম। ইহাই হিন্দুত্বের নির্দ্দিষ্ট সীমা।

চেন্নপট্টন। *

(অন্ত্য)

দুই রাত্রির কয়েক যাম, নটকীর্ত্তি দর্শন করিয়া, অতিবাহিত করিয়াছি। মহীশূর হইতে আগত তামিল নাট্যসমাজস্থ যবনিকা উত্তোলিত হইল। সম্মুখপট ও নান্দী প্রভৃতি, পুণ্যপত্তনে দৃষ্ট রঙ্গমঞ্চের অনুরূপ। মোহময়ী নগরীয় পারসী ইন্দ্রসভার সুরে চণ্ডকৌশিক গীতাভিনয় হইল। তাহাতে মূর্চ্ছনা নাই। সুব্বারাও আচারির (আচার্য্যের) অভিনয়-শালায়, চর্ম্ম-নির্ম্মিত বায়ুকোষবাদ্যে ফুৎকার দ্বারা আলাপন করিতে শুনিয়াছিলাম। ইহা অহিতুণ্ডিকের দ্বিনলযুক্ত তিত্তিরির মত। যন্ত্রস্থ একটি নল কেবল স্বরযোগের জন্য ব্যবহৃত হয়। বঙ্গে, ইয়ুরোপীয় প্রণালীতে গঠিত রঙ্গালয়ের তুলনায়, এগুলি নিকৃষ্ট। সৌন্দর্য্যানুরাগ বর্দ্ধিত করে, এমন কোন বস্তু ইহাতে নাই। সুতরাং চক্ষুর শিক্ষা হইল না। আমরা ভাষা বুঝি না; কর্ণের শিক্ষা কতদূর হইতেছে, বুঝিবার উপায় নাই। অধিকাংশ স্থলে, ব্যবসায়ের জন্য অভিনয়-ক্ষেত্র উদ্ঘাটিত হয়। কলাবিদ্যার সাধে নহে। অপর কলা, একটি ভাবের উপর কার্য্যকরী হয়। কিন্তু, রঙ্গমঞ্চ আংশিকভাবে, তাবৎ অনুভূতির উপর আধিপত্য করিতে সমর্থ। বুদ্ধিবৃত্তির উপর, তাহার প্রভাব নাই। দর্শক আপনাকে বিস্মৃত হইয়া, অভিনেতার সহিত একপ্রাণ হইয়া যান। ইংলণ্ডে,

---

* ১। Marriage & Funeral of the Hindus—J. F. Kearns প্রণীত।

২। Hindu Castes and Sects—শ্রীযোগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য প্রণীত।

৩। আমাদের জ্যোতিষ ও জ্যোতিষী—শ্রীযোগেন্দ্র চন্দ্র রায় প্রণীত।

একজন নাবিক অভিনেত্রীর অপমানকারীকে প্রহার করিতে উদ্যত হইয়াছিল। নটবিদ্যাকে, ধর্ম্ম ও নীতিশিক্ষার সহজ উপায় করা যাইতে পারে। এক লণ্ডনে, রঙ্গালয়ের সংখ্যা তিনশত। সামান্য নগরে, দুই বা তিন। দুঃস্থ বালক, মিষ্টান্ন ক্রয় না করিয়া, সেই 'পেনি' দ্বারা অভিনয় দর্শন করে।

এখনও রজনী আছে। আমরা শয্যা ত্যাগ করি নাই। পথে অস্ফুট ধ্বনি হইতেছে। উহা, চীৎকার নহে। নারীকণ্ঠ-নিঃসৃত স্বর, তাহাতে পৈশাচী, সুতরাং বোধগম্য হইবার নহে। কেবল, শ্রুতির হিল্লোল পাইতেছি মাত্র। এখানে সংক্রান্তি প্রভৃতি পর্ব্বাহে, প্রত্যূষে মহিলাগণ বহির্দ্বারে আলিম্পন প্রদানপূর্ব্বক গোময়ের বর্ত্তুল স্থাপন করিয়া, তদুপরি কুষ্মাণ্ডের পুষ্প প্রোথিত করেন। তজ্জন্য, বিক্রেত্রী পণ্যখ্যাপন করিয়া যাইতেছে।

এখানে অমান্ত মাস ধরা হইয়া থাকে; সংক্রান্তি অনাবশ্যক নহে। চতুর্ব্বিধকাল মানে, কর্ম্ম সম্পাদিত হয়। চৈত্রে, বৎসর আরম্ভ হয়। সায়ন গণনায় ষষ্টি সংবৎসরে একচক্র পূর্ণ হয়। প্রত্যেক বৎসরের নাম স্বতন্ত্র। অধুনা, নন্দন নামে সম্বৎসর চলিতেছে।

মদ্রাসে, একটি রাজকীয় বেধশালা আছে। ভারতের জ্যোতিষিগণ সমবেত হইয়া তথায় আগমনপূর্ব্বক, দৃক্‌সিদ্ধভাবে গণনা দ্বারা পঞ্জিকা-সংস্কার করিতে পারেন। গ্রহণ নির্ণয় বিশুদ্ধ করিবার জন্য, প্রচ্ছন্নভাবে নাবিক-পঞ্জিকার আশ্রয় লইতে হইবে না। আর্য্যসন্তানগণ অকালে, কেন ক্রিয়া করাইতেছেন? চন্দ্রশেখর সিংহের দৃক্‌গণনায়, উৎকলে পঞ্চাঙ্গ শোধিত হইয়াছে।

স্বাস্থ্যরক্ষা, সময়োপযোগিতা, পৌরাণিক ব্যক্তির জন্মোৎসব, জ্যোতিষিক কাল-নির্ণয় প্রভৃতি কারণে আমাদের ব্রত ও পূজাদি অনুষ্ঠিত হইয়া

থাকে। আরাধ্য দেবগণ, সাক্ষাৎ বা পরম্পরায়, সকলেই জ্যোতিষ্ক। বৈদিক মন্ত্রের জ্যোতিব-রূপক, বৈদিক ব্রাহ্মণে পল্লবিত হইয়া, পুরাণে মানব-চরিত্র প্রাপ্ত হইয়াছে। তদনুসারে, দেবতার রূপ কল্পিত হইয়াছে। তাঁহাদের সন্তানাদি না হইল কেন? ধ্রুবতারা, রাজার পুত্র। আকাশের ছায়াপথ মর্ত্ত্যে গঙ্গা। রবির উত্তর মার্গ, দেবলোক। তাঁহার দক্ষিণ পথ, পিতৃলোক। ছায়াপথের অগস্ত্য নক্ষত্রকে বৈতরণীপারের নৌকা, পুনর্ব্বসুর দুইটি তারাকে যম ও তাঁহার ভগিনী, কালপুরুষ নক্ষত্রে প্রজাপতি বা ব্রহ্মা, আর্দ্রা রুদ্র, ও সূর্য্য বিষ্ণুরূপে বর্ণিত। খৃষ্ট-জন্মের আট সহস্র বৎসর পূর্ব্বে, আর্য্যজাতি চিরশরদ্-বিরাজিত মেরু সন্নিহিত প্রদেশে, ষণ্মাস-ব্যাপী দিবারাত্রির অবসানে, কয়েকদিন-ব্যাপী উষাকালে, যে দেবতার স্তুতি আরম্ভ করিয়া গিয়াছেন, আমরা প্রতিক্ষণে তাহার প্রভাব লক্ষ্য করিতেছি। পঞ্জিকাকারগণ এমন বস্তুর উদয়াস্ত নির্ণয়ে ভ্রম করিলে, নিতান্ত পরিতাপ হয়।

আমরা অশ্বধাবন উপলক্ষে, লোকযাত্রা-দর্শনেপ্সু হইয়া চলিলাম। নগরোপকণ্ঠে ক্ষুদ্র পর্ব্বত সন্নিধানে গিণ্ডি অবস্থিত। এখানে, মন্দ্রাস প্রদেশের শাসন-কর্ত্তার গ্রাম্য বাসস্থান! অনেকগুলি আলিবন্দের পরে, আমাদিগকে আদের নদীর পশ্চিমভাগে মারমেলঙ সেতু পার হইতে হইল। ধাবন-স্থানের পরিধি, সার্দ্ধ এক মাইল। দর্শকবৃন্দের মধ্যে, বিজয়নগর ও রামনাদের রাজশ্রী গজপতি ও ভাস্কর উপস্থিত হইয়াছেন। বেগবান্ ঘোটকের পৃষ্ঠে ধাবকের নাম ও সংখ্যা লিখিত ফলক আলম্বিত দৃষ্ট হইল। সহস্রমুদ্রাপরিমিত চারটি পারিতোষিকের ব্যবস্থা হইযাছে। লোকে উক্ত জয় লক্ষ্য করিয়া, কলিকাতার ন্যায়, অনর্থক পণ রাখিয়া, দ্যূত-দুর্নীতিতে ধনক্ষয় করিতে বাধ্য হইয়া থাকেন।

আমাদের প্রত্যাবর্ত্তন কাল উপস্থিত হইল। ইতিপূর্ব্বেই নগ্নপাদ-

তাড়িত দ্বিচক্র যান, ত্বরিত বহির্গত হইতে দেখিয়া, জনতা শিথিল হইয়াছে। আরোহী, স্বীয় মুণ্ডিত-শিরঃস্থ দীর্ঘ শিখাগুচ্ছ, গোল টুপীর মধ্যে লুক্কায়িত করিয়া দিয়াছেন। আমাদের "ঝটকা" ঝটিতি চলিবার নহে। বলীবর্দ্দ, তাড়নায় ভ্রূক্ষেপ করে না, ইহা আমাদের পক্ষে শ্রেয়স্কর। কারণ, ইহাতে চক্ষু অবলোকন করিবার অবসর পাইবে। ট্রাম-চালকের পশ্চাৎ দণ্ডায়মান ব্যক্তি 'অয়্' ধ্বনি করিয়া, সতর্ক করিয়া গেল। কলিকাতার মত কর্কশভাবে 'এই ও' সম্বোধন অন্যত্র নাই। শকট-চালক বামাগতি অনুসরণ করিলে, লোকসঙ্ঘ দক্ষিণবাহী হইতে সচেষ্ট হইল। পুরপ্রবেশ করিলে, প্রাণবায়ু লঘুপরিমাণে মিলিবে, তথাপি সকলে শীঘ্র যাইতে সচেষ্ট হইয়াছে। প্রশ্বাস দ্বারা, গুরু বায়ু অধিক বহির্গত করা হইতেছে। আসব-প্রিয়দিগের জন্য, নারিকেল বিটপী ইতস্ততঃ রক্ষিত, দৃষ্ট হইল। মদ্যপ ব্রীটনবাসী, মাদক দ্রব্য ব্যবহারে প্রশ্রয় দিয়া থাকেন। প্রাচীন কালে তাঁহারা আমাদের ঋষিগণের মত, ধর্ম্মোৎসবে মাতাল হইতেন। দোষবোধে, এক্ষণে আমরা উহা পরিত্যাগ করিয়াছি।

নাগম্বকম্ পল্লিসরোবর, অতি বিস্তৃত। আমরা তাহার পার্শ্ব ভেদ করিয়া, পুষ্প-বিদ্যা-প্রদর্শক উদ্যানের সম্মুখীন হইলাম। অনতিদূরে কোয়েম-তীরে সৈদাপেট কৃষিবিদ্যালয়। এদেশে যে শস্য উৎপন্ন হয়, রাজা তদর্দ্ধ গ্রহণ করেন। অতএব, ওষধির উন্নতি-কল্পে রাজকর্ম্মচারিগণের শিক্ষার জন্য, আদর্শ ক্ষেত্র প্রয়োজনীয়। এখানকার কৃষক, কৃষি-যন্ত্রের পরিবর্ত্তন করা অধর্ম্ম বোধ করে। তাহারা সার-ব্যবহার বিষয়েও অনভিজ্ঞ।

প্রান্তবর্ত্তী নিদ্রিত স্থান ত্যাগ করিয়া, আমরা ক্রমে নগরের কোলাহলে প্রবিষ্ট হইলাম। আমাদের বাসস্থান সাউকার পেট, নিকটবর্ত্তী হইল। রাজা স্যর শিবালি বামস্বামী মুদেলিকে দেখি নাই। তাঁহার নাম, স্তম্ভদীপক ও জলনালাগারে লিখিত আছে। বক্ষ্যমাণ পান্থনিবাসে কয়েক

লক্ষ টাকা ব্যয় ও নানা সৎকার্য্যে তাঁহার দান থাকিলেও, জ্ঞানপদগণ তাঁহাকে অবজ্ঞা করে। পরশ্রীকাতরতাই ইঁহার কারণ। রামস্বামী আরবুথনট্ কোম্পানীর মুৎসুদ্দি। ইনি ধনাত্যয়বশতঃ, লক্ষ্মীর আরাধনায় বারত্রয় অকৃতকার্য্য হইয়া, অধুনা বার্ষিক অযুত মুদ্রা লাভের বিষয়পতি হইয়াছেন। বাষ্পীয় শকটাশ্রয়ের সন্নিকটে, লর্ড ওয়েনলক্ সত্র উদ্‌ঘাটন করিয়াছেন। গবর্ণর-পত্নী স্বহস্তে তাহাতে বৃক্ষ রোপণ করেন। রাজা বলেন, প্রত্যহ দুইশত দরিদ্রকে আহার দিবার জন্য, দুই বৎসরের মধ্যে, সাম্রাজ্ঞীর ভাণ্ডারে অর্থ ন্যস্ত করিবেন। সম্প্রতি, বিংশতি সহস্র মুদ্রা প্রদত্ত হইয়াছে। উহার বৃদ্ধিদ্বারা, অবান্তর ব্যয় নির্ব্বাহ হইবে। দুই বৎসর পরে, নগর-শোভা-সম্বর্দ্ধিনী-সভা সত্রের ভার পাইবেন। প্রথম প্রকোষ্ঠ, মুদেলি, নায়ড়ু এবং পিল্লইদিগের জন্য। দ্বিতীয় প্রকোষ্ঠ, ব্রাহ্মণ পাচকের নিমিত্ত। তৃতীয়, সকল শ্রেণীর ব্রাহ্মণের। চতুর্থ, মাড়ওয়ারি ও চেটিদের জন্য ব্যবহৃত হইবে। পূর্ব্বদিকের শেষভাগের দুইটি প্রকোষ্ঠ, মুসলমান এবং খৃষ্টানের জন্য। সপ্তমটি, স্বকীয় বা আপন উত্তরাধিকারিগণের ব্যবহারার্থ প্রস্তুত হইয়াছে। বাঙ্গালীর মধ্যে, এরূপ কেহ করিতে পারেন নাই।

ভ্রমণাবসরে, দ্বিরাগমনোৎসব উপলক্ষে দ্রব্যসজ্জা-বাহীকে, ঐ দেখা যাইতেছে। এই প্রথা হইতে, বাল্যবিবাহের দুষ্টফল, কিয়দংশে নিবারিত হইয়া থাকে। এথানে, ঢেঁকী নাই। উদূখলের সাহায্যে, তৎকার্য্য সমাধা হইয়া থাকে। বৈদিককালে তজ্জন্য উদূখল একটি দেবতা ছিলেন। যাহা হইতে উপকৃত হইতে হয়, তাহার সম্মানার্থে আমরা ঢেঁকিতে 'বামনি' বাঁধি। বাদিত্রধ্বনি কেন শ্রুত হইল ভাবিতেছি, এমনকালে শববাহী আগত হইল। মৃত ব্যক্তির মুখাবরণ উন্মুক্ত। সে একটি স্ত্রীলোক; তাহার অধরে তাম্বূল রাগ ও ললাটে কুম্‌কুম্ দৃষ্ট হইতেছে। সে জঙ্গম

সম্প্রদায়ের লোক, অতএব প্রোথিত হইবে। প্রেতের আহারার্থ সমাধি-মধ্যে মৃৎপাত্রে খাদ্য প্রদত্ত হইতে পারে।

পল্লবরম্ সেনানিবাসের নিকট, পল্লবরাজগণের সমাধিক্ষেত্র দৃষ্ট হয়। পুরুষ হইলে, উপবিষ্ট ভাবে, নারীর পক্ষে শায়িত অবস্থায় প্রোথিত হইতে হয়। মৃত্তিকার উপর, নাত্যুচ্চ পঞ্চপদীতে প্রস্তরফলক, আদিম গৃহ নির্ম্মাণের পরিচয় দিতেছে। কোন সময়, এই রাজবংশ ওড্র হইতে পিনাকিনী নদীর মুখ পর্য্যন্ত আধিপত্য করিতেন। খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে, তাঁহাদের দ্বারা বৌদ্ধভিক্ষুগণ সিংহলে প্রেরিত হইয়াছিলেন। শ্রমণ, ব্রাহ্মণ ও অপর ধর্ম্মীরা, পল্লবরাজ্যে স্বচ্ছন্দে একত্র বাস করিতেন। নৃপতি বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য উভয় প্রভাবের বশীভূত দৃষ্ট হইয়াছেন। একাদশ শতাব্দীতে, চোলগণ কর্ত্তৃক কাঞ্চী হইতে, পল্লবগণ তাড়িত হইয়াছিল। ইহাদের শেষ অবস্থায়, অনিরুদ্ধ থের নামে এক সঙ্ঘনায়ক বাস করিতেন। তিনি পালি ও সংস্কৃত গ্রন্থকার। থের শব্দ বঙ্গদেশে জাতিদ্যোতক। ইহাতে, আমি থিয়র বুঝি। এই শ্রেণী, এক্ষণে সামাজিক সম্মানে অতি হীন। ইহাদের মধ্যে শিক্ষার সুযোগ নাই। বৌদ্ধমত হীনকে মহৎ করিতেন, তজ্জন্য তাহা সদ্ধর্ম্ম পদবাচ্য হইয়াছিল। বুদ্ধমুখ-নিঃসৃত গল্প সংগ্রহ দ্বারা, তিনটি পেটিকা পূর্ণ হয়। তন্মধ্যে উক্ত হইয়াছে, কেহ ব্রাহ্মণ জাতিতে উৎপন্ন হইলে, আমি তাহাকে ব্রাহ্মণ বলি না। কারণ, সে যদি রাগাদি মলে মলিন হয়, তবে কেবল ভোবাদী হইবে; অর্থাৎ আমি ব্রাহ্মণ, এইরূপ কথনশীল হইবে। সে আসক্তি রহিত এবং নিষ্পাপ হইলে, আমি তাহাকে ব্রাহ্মণ বলি।

নচাহং ব্রাহ্মণং ব্রূমি, যোনিজং মত্তিসম্ভবং।
ভোবাদি নাম সোহোতি, সচেহোতি সকিঞ্চনো।
অকিঞ্চনং অনাদানং তমহং ব্রূমি ব্রাহ্মণং॥ (ধম্মপদ)

যে বন্ধু, সে দুরন্ত নহে। চেন্নপট্টনের যে অংশে আমাদের বসতি, বারিধি তাহার নিকটবর্ত্তী না হইলেও, আমরা সদা তৎকর্তৃক আকৃষ্ট হইয়া থাকি; বীচিমালা, কেমন ধীরে আসিয়া, কূল-সংলগ্ন হইতেছে, দেখিতে বাঞ্ছা হয়। নীলিমার পানে চাহিয়া, পরিশ্রান্ত হইতে হয় না। ভ্রাম্যমাণ স্তম্ভ-দীপক, পৃথিবীর মধ্যে একটি অত্যুজ্জ্বল আলোক। এক-বিংশতি পাদ উচ্চ পাষাণস্তম্ভোপরি, শতঘ্নী-ধাতুময় দীপাধার রক্ষিত হইয়াছে; উহার নয় দিক স্বচ্ছ; তিন ভাগ আবদ্ধ। ক্ষণেকের মধ্যে, দর্শকের চক্ষু তীব্র জ্যোতিঃ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া, তমসাচ্ছন্ন হইতে পারে।

অর্ণববক্ষে 'লব্বয়' মুসলমান অকুতোভয়ে আম্রকাষ্ঠ-নির্ম্মিত 'মসুলা' পরিচালন করে। পারস্য ও আরবা নাবিকদ্বারা, এতদ্দেশীয় স্ত্রীর সংস্রবে এই বংশের উৎপত্তি। 'লব্বয়' নারী নির্ধন; এ জন্য 'গোসায়' (অন্তঃপুরে) আবদ্ধ থাকিতে পারে না; কিন্তু, ইহারা পীত-চিত্রাঙ্কিত রক্তবর্ণ সাড়ীর উপর, ধবল প্রাবরণী ব্যবহার করে। ভুপালের বেগম মহাশয়া, রেলষ্টেশনে লর্ড কর্জ্জনের বাহুধারণ করিয়া ভ্রমণ কালে 'বুর্কা' অবগুণ্ঠন ত্যাগ করিতে পারেন নাই। গজরে আমেরিকান প্রচারকগণ দরিদ্র মুসলমান সীমন্তিনীর জন্য শিল্পবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। মুসলমানে হিন্দী কহে; কিন্তু এদেশে তাহার প্রকার, বিকৃত। উহাই, এ দেশের একটি প্রণালী হইয়া গিয়াছে। দৃষ্টান্ত,—"ক্যাহোনা", "স্কাকর, আতে" "তুমিজ, দোঘণ্টেকো আও" ইত্যাদি।

অধুনাতন বিজয়নগরেশ, বারাণসীতে 'টাউনহল' নির্ম্মাণ করিয়া আসিয়াছেন। তিনি এখানেও সার্ব্বজনিক প্রাসাদের অভাব দূর করিবেন, বিচিত্র কি? ভিত্তি-প্রস্তর, তিনি স্বহস্তে নিহিত করিলেন। দ্বিতলের কারুকার্য্য উপভোগের সামগ্রী হইয়াছে। মইলাপুরে 'এড-

মিরেলটি' ভবনে রাজা বাস করিতেছেন। কলিকাতায় পরিদৃষ্ট বৃদ্ধ দেওয়ান বাহাদুর রঘুনাথ রাও, উক্ত বিভাগ হইতে 'মিউনিসিপ্যালিটী'র সদস্য নিযুক্ত হইয়াছেন। রঙ্গনাথম্ মুদেলি 'শেরিফ' হইয়াছেন।

ভারতের বৌদ্ধমত, অষ্টম শতাব্দীতে জাপানে বদ্ধমূল হয়। উহা কেবল ধর্ম্মে নহে, শিল্প, সাহিত্য ও রাজনীতিতে পর্য্যন্ত ব্যাপিয়া গেল। ষোড়শ শতাব্দীতে, পাশ্চাত্য জনপদের সহিত পরিচয় হইলে, খৃষ্টীয় প্রচারক তথায় প্রবেশলাভ করেন। জ্ঞানাঞ্জন-শলাকা দ্বারা জাপানিদের চক্ষু উন্মীলিত হইল। তাহার ফলে বিপ্লব উপস্থিত হয়। ২৩ বৎসর হইল, সাম্রাজ্যনীতি, জাতীয় উন্নতির পথে পরিচালিত হইয়াছে। প্রাচীন রাজবংশ শাসনকর্ত্তা হইয়াছেন। আমাদের রাজা বিদেশীয়; সুতরাং জাতি-নিরপেক্ষ। জাতীয় জীবনে কর্ম্মশীলতার উদ্যোগ ঘটিলে, ব্যবহার অপরিবর্ত্তনীয় থাকিবে না। প্রৌঢ়াবস্থা উত্তীর্ণ হইবে। নব্যভারতের ধর্ম্ম প্রাচীন তত্ত্ব রক্ষা করিয়া সময়ের উপযোগী হইতেছে। শিল্প ও সাহিত্যে পাশ্চাত্য প্রভাব লক্ষ্য হইবে। রাজনৈতিক বিষয়েও তদ্রূপ। ইংলণ্ড ও এতদ্দেশের স্বার্থ ভিন্ন হইলেও এক সূত্রে গ্রথিত। উভয়ের উন্নতি, পরস্পর-সাপেক্ষ। ইহা সকলে বুঝেন না; তজ্জন্য কষ্ট পাইতে হয়। হিন্দুর মানসিক বল প্রবল। প্রজা-বৃদ্ধি, ব্যয় বাহুল্য প্রভৃতি কারণে, এখন তাহার স্বভাব, স্ফোরক পদার্থবৎ হইয়া রহিয়াছে। সণার খৃষ্টানগণ, অপর হিন্দুর সহিত দ্রোহকালে, হিন্দু সণারের সহিত সমবেদনা প্রদর্শন করিয়াছিল; হিন্দু সণার সনাতন মতে থাকিয়াই আপনাদের অধিকার-বৃদ্ধির চেষ্টা করিতেছে।

অব্রাহ্মণ হিন্দু, লর্ড ওয়েনলক্ মহোদয়ের নিকট আবেদন করিয়াছেন যে, ব্রাহ্মণজাতি রাজকার্য্য নিজস্ব করিয়া রাখিয়াছেন, ইহা দুর্ব্বিষহ ও অন্যায়। জাতীয় সভা নামে পরিচিত মহাসমিতি, যে প্রতিনিধিত্বের কাহিনী বলেন, তাহা ব্রাহ্মণের স্বার্থে পরিচালিত।

গভর্ণমেণ্ট, পরৈয়াজাতির শিক্ষার্থ তৎপর হইয়াছেন। দেওয়ান বাহাদুর শ্রীনিবাস রাঘব আইয়ঙ্গরের মতে, তাবৎ পরৈয়াকে একৈকশঃ খৃষ্টান করিয়া দিলে উন্নতি হইবে। হিন্দু পত্রিকা অন্ত্যজ মাত্রকে খৃষ্ট ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিয়াছে। এ বিষয় আলোচনার জন্য, সংপ্রতি এক মহাসভা আহূত হয়। জনৈক ব্যবহারাজীব তদুত্তরে অভিভাষণ করেন,—অর্থাভাব উহাদের দুরবস্থার কারণ; খ্রীষ্টীয় মত কি তাহাদের করে ধনরত্ন সমর্পণ করিতে পারিবে? ঔরঙ্গজেবের সময়, কাশীস্থ তন্তুবায় জাতি মুসলমান হইয়াছে। পরন্তু, তাহাদের দারিদ্র্য পূর্ব্ববৎ বিরাজমান। জাতিভেদ, খৃষ্টানের মধ্যেও অন্যপ্রকারে বর্ত্তমান আছে। উচ্চবংশ, হীনের সহিত পানভোজন বা বৈবাহিকসূত্রে আবদ্ধ হইতে অনিচ্ছুক। হিন্দু আচার-প্রধান। মতভেদে, বাধা নাই। অন্ত্যজকে উপযুক্ত দেখিলে, হিন্দু সম্মান করিবে।

অধুনা উচ্চশ্রেণীর হিন্দুগণকে, সমাজসংস্কারে প্রবৃত্ত দেখিতেছি। স্মার্ত্তদিগের শ্রীপাট, শৃঙ্গেরী মঠের জগদ্‌গুরুকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে,—এদেশের ব্রাহ্মণ মহারাষ্ট্রীয়গণ কর্ণাটি ব্রাহ্মণের সহিত বিবাহ প্রথা প্রচলিত করিয়াছেন; অপর বর্ণ, ভিন্ন দেশ বা বিভিন্নশাখায় আদান প্রদান করিলে ক্ষতি কি?

'হিন্দু' সম্পাদক সুব্রহ্মণ্য আইয়া, স্বয়ং বিধবার পাণিগ্রহণ করিয়া প্রসিদ্ধি অর্জ্জন করিয়াছেন। তিনি এবং তদীয় পুরোহিত ও পাচক বেল্লারিবাসী। সভাপতি মুদেলির আবাসে, বালবিধবা ব্রাহ্মণ-জাতীয়া কামাক্ষী অম্মার সহিত, সুব্বারাও নামক মৃতদার যুবকের পরিণয় হইয়াছে। সুব্রহ্মণ্য, সন্মার্গ-সমাজগৃহে তৎসম্বন্ধে ব্যাখ্যান দিয়াছেন। নবমতের সত্যাসত্য পরীক্ষিত হওয়ার পক্ষে, কালবিলম্ব প্রয়োজনীয়; ইহা, তিনি ভাবেন নাই।

পরীক্ষা দ্বারা বিদ্যাসাগর মহাশয়কে নির্ণয় করিতে গেলে, দৃষ্ট হয়, মস্তকের পশ্চাৎ যে অংশ হইতে মৈত্রীভাব স্ফূর্ত্তি পায়, তাঁহার তৎস্থান উচ্চ ছিল। মানব, অভ্যাসের দ্বারা সকলই করিতে পারে সত্য, কিন্তু মস্তিষ্কের স্বভাবগুণে লোক ভাল বা মন্দ হইবে; তজ্জন্য অন্যের কুষ্ট হওয়া অবৈধ। বিদ্যাসাগর, সেইজন্য দয়ার সাগর হইয়াছিলেন। তিনি নারীজাতির কষ্টে, যাতনা বোধ করিতেন। পুনর্ব্বেদন হিতকর কি না, সে তর্ক, তাঁহার অন্তঃকরণে উদিত হইতে পারে নাই। তিনি জ্যামিতির সম্পাদ্যের মত বৃহৎ অক্ষরে লিখিয়াছেন,—পিতা বিধবা কন্যাকে পুনর্ব্বার দান করিতে পারেন। আমরা বলি, এখন নারীকে ভর্ত্তার স্বামিনী হইতে দৃষ্ট হইতেছে। দান-প্রথা রহিত হউক। ভূমি, ধেনু, প্রভৃতির ন্যায়, পত্নীতে স্বত্ব উৎপন্ন হয় না। বিদ্যাসাগর, সংযমীর পক্ষে বিবাহকে প্রশস্ত জ্ঞান করিতেন না। তদীয় রাভসিকতায়, লোক মুগ্ধ হইত। তাঁহার একটি গল্প নিম্নে লিখিত হইল;—

কোন ব্যক্তি স্বর্গের দ্বারদেশে উপনীত হইয়া, প্রবেশ লাভ করিতে পারেন নাই। দৌবারিক আসিয়া কহিল, নরক ভোগান্তে সুরলোক অধিগম্য। পরে জিজ্ঞাসা করে, তোমার কি বিবাহ হইয়াছে? তিনি কহিলেন, হাঁ। ইহাতে সে বলে, তবে প্রবেশে তোমার অধিকার জন্মিয়াছে। কষ্টভোগ হইয়া গিয়াছে। তদনন্তর অপর আগন্তুক কহিল, আমি দুইবার দারপরিগ্রহ করিয়াছি। ইহাতে, প্রহরী বলিয়া উঠিল, যাও, তোমার এখানে স্থান হইবে না। স্বর্গ, মূর্খের আবাস নহে।

ব্রাহ্মণের বিবাহ, পুরাকালের প্রথামূলক। ইহাতে বৈদিক মন্ত্র, বহুল-পরিমাণে প্রযুক্ত হয়। শূদ্রের বিবাহ, আধুনিক ব্যবহারমূলক। মন্ত্ররচনা, তখন সমাপ্ত হইয়াছে। ভূদেবগণের উদ্বাহকার্য্যে, সম্প্রদান, সপ্তপদীগমন ও হোম প্রধান অঙ্গ। দেশজ, তালিবন্ধনও আবশ্যক। শূদ্রের বিবাহে,

শেষোক্ত কার্য্যই প্রধান। ইহাতে বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ ও হোম নাই। প্রদক্ষিণা, সপ্তবার স্থলে বারত্রয় মাত্র অনুষ্ঠেয়। বিধবার পরিবেদন থাকায়, কন্যাদান অসম্ভব। বেল্লাল প্রভৃতি জাতিতে, মৃতভর্ত্তৃকার বিনাহরূপ অপ্রশস্ত কল্প প্রচলিত নহে।

বেল্লালজাতি, সামাজিক সম্মানে প্রায় আমাদের কায়স্থের মত। পাচৈপ্পা ও রাজা রামস্বামী, উক্ত বংশাবতংস। উপাধির সহিত, গৌরবার্থে যেমন "অর" যোগ করিয়া আই অর, মুদেলিয়ার বলা হয়, তদনুসরণে বেল্লালর কথিত হইয়া থাকে। অন্ধ্র, পাণ্ড্য, চোল প্রভৃতি জাতির নাম হইতে, উক্ত শব্দ দেশবাচক হইয়াছে। সে রাজজাতি কাহারা, তাহা জানি না। কেরলে চের, এক্ষণে সে জাতির অন্য নাম থাকিলেও, ক্ষত্রিয়। একমাত্র বেল্লাল রাজন্যজাতি, পূর্ব্বতন আখ্যায় পরিচিত। মহীশূরের সমীপবর্ত্তী স্থানে, চতুর্দ্দশ শতাব্দী পর্য্যন্ত তাঁহাদের প্রভাব বিদ্যমান ছিল।

বেল্লাল উদ্বাহকালে, প্রথমতঃ বরপক্ষ কন্যার গৃহে গমন করিয়া, জাতক অনুসন্ধান করেন। বিবাহ, প্রায় দিবসেই হইয়া থাকে। দিন স্থির হইলে, সর্ব্বাগ্রে হরিদ্রা ক্রেয়। শুভক্ষণে, অলঙ্কার প্রস্তুত করিতে দিতে হয়। মণ্ডপ মধ্যে, চতুষ্কোণ বেদী প্রস্তুত করা আবশ্যক। তাহাকে 'মনবরী' কহে। একটি উড়ুম্বর শাখা, উহার দক্ষিণ-পশ্চিম সীমায় প্রোথিত করিয়া দিলে, মণ্ডপের উপরিভাগ আবৃত করা বিধেয়। শিব ও বিষ্ণু-মন্দিরে, গুবাক প্রেরণ করিয়া, আত্মীয়গণের মধ্যে বিতরণ করিতে হয়। কন্যাপক্ষ, বর লইতে যান। যোষিদ্গণ কর্পূর দ্বারা আরতি করিয়া, গৃহমধ্যে কটোপরি তাঁহাকে উপবেশন করান। অতঃপর বর, দুগ্ধ ও কদলী ভোজনান্তে, বেদীতে আসিয়া পূর্ব্বাস্য হইয়া উপবিষ্ট হইলে, হরিদ্রালিপ্ত সপত্রক আম্রযষ্টি প্রোথিত করেন। অনন্তর গৃহাভ্যন্তরে যাইয়া, ক্ষৌরকর্ম্ম এবং স্নান বিধেয়। নরসুন্দর, স্বকার্য্য আরম্ভের পূর্ব্বে পিষ্টে

দেবকে, নারিকেল ও কদলী সমর্পণ করে। কন্যা, অঙ্গনাগণ কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিতা হইয়া, কোন সরোবরে স্নান করিয়া আইসে। এই সময় 'তালী'বন্ধন আরব্ধ হইয়া থাকে। 'মনবরী'র এক পার্শ্বে, পুরোহিত উপবিষ্ট হইলেন। দীপ প্রজ্বলিত হইল। গোময়ের দ্বারা প্রস্তুত পিল্লে দেবতার সম্মুখে, তণ্ডুল, কদলী ও নারিকেল রক্ষিত হইল। এতদবসরে উভয়ের মাতুলকে, তাঁহাদের প্রাপ্য প্রদত্ত হয়। অনন্তর সজ্জিত বর ব্রাহ্মণের অনুমতিক্রমে বেদীতে বসিলে, তথায় পাত্রী আনীত হয়। সখিগণ, তাহাকে কল্যাণবস্ত্র, পুষ্প ও অলঙ্কার দ্বারা ভূষিতা করেন। সে রন্ধনশালায় গমনপূর্ব্বক নব হণ্ডিকায় হরিদ্রার দ্বারা তিনটি রেখা অঙ্কিত করিয়া, তদুপরি তিনটি তাম্বূলপত্র স্থাপন করে। এই সময় হাঁড়ির কানায় ক্লমির চিহ্ন দিতে হয়। পাত্রটি জলপূর্ণ করিয়া অগ্নিতে স্থাপন করা হইলে, কুমারী বহির্গত হইয়া, 'বরণকারীর পার্শ্ববর্ত্তিনী হইয়া থাকে। অনন্তর বেদী হইতে অবতরণ করিয়া, উভয়ে অভ্যাগতদিগকে অভিবাদন করিবেন এবং আশীর্ব্বাদ লইয়া যাইবেন। গুরু বা পুরোহিত, তালীসূত্র মন্ত্রপূত করিবেন। সভাস্থ জনগণ, উহার শুভ কামনা করিবেন। তৎকালে, নাপিত শঙ্খধ্বনি করে। ভেরী তুরী বাজিয়া উঠে। ব্রাহ্মণে, পাত্রকে সমন্ত্র 'তালী' প্রদান করেন। তিনি উহা বধূর গলে শ্লথ ভাবে অর্পণ করেন। সেই সূত্র, দৃঢ় আবদ্ধ করিবার ভার, ননন্দার উপর। সে বরের গলদেশস্থ পুষ্পমাল্য, ভ্রাতৃজায়ার গলে পরাইয়া দেয়। এখন, দম্পতির স্বয়ং মাল্য পরিবর্ত্তন বিধেয়। বৈবাহিক অনুষ্ঠান সমাপ্ত হইল। পুরোহিত, হরিদ্রাখণ্ডসহ লোহার খাড়ু উভয়ের হস্তে পরিধান করাইয়া দিলেন। কন্যার পিতা, বরের পিতাকে সম্বোধন করিয়া বলেন, তোমার পুত্রের সহিত আমার কন্যার বিবাহ দিলাম। দম্পতি অন্যোন্য হস্তধারণ পূর্ব্বক বারত্রয় বেদী প্রদক্ষিণান্তে, পেষণ-শিলা পদ-দলিত করিয়া,

নভোমণ্ডলে একটি তারা দর্শন হইলে, গৃহ প্রবেশ করেন। অতঃপর কুটুম্ব ভোজন করাইতে পারা যায়।

আমাদের গাত্রহরিদ্রার মত, দ্রবিড়ে, মাঙ্গল্য কার্য্যে হরিদ্রা প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে। হাতের খাড়ু, এখানে স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই আয়ুষ্য। বন্ধনের চিহ্ন পুষ্পমালাকে, অবশেষে লৌহশৃঙ্খলে পরিণত করা হয়। ইহাতে সুন্দর শিক্ষা আছে। জন্মপত্রীর মিলন প্রথা, সর্ব্বত্র দৃষ্ট হয়।

ফলিত জ্যোতিষ যে অনুমানটির উপর নির্ভর করে, তাহা নিতান্ত অবৈজ্ঞানিক। বাল্যকাল হইতে যাহা বিশ্বাস করা যায়, তাহা ত্যাগ করা অসম্ভব। সৌরজগৎ পৃথিবীর নিয়ামক; প্রত্যেকের ব্যক্তিগত পরিণাম, প্রধানতঃ জাগতিক ক্রিয়ার ফল। কিন্তু, এই সিদ্ধান্তদ্বারা সকল ঘটনার ব্যাখ্যা হইতে পারে না। ফল-গণনার যাথার্থ্য নিরূপণ করিতে হইলে, যে প্রকার পরীক্ষার প্রয়োজন, অদ্যাপি সেরূপ করা হয় নাই। প্রকৃতি, সর্ব্বকালে সর্ব্বত্র সদৃশভাবাপন্ন। একই কারণ হইতে, এক প্রকার কার্য্য উৎপন্ন হয়, ইত্যাদি তর্ক এখানে স্থান পাইবে না।

বৈদিক সময়ে এখানে অয়ন, ঋতু ও নক্ষত্র ভেদে বিভিন্ন যাগ হইত। তদ্দ্বারা, ফল-গণনার সূত্রপাত হয়। মানব, রহস্য উদ্ঘাটনে চিরদিন ব্যস্ত। উহাতে, জ্ঞান-বৃদ্ধি ও কুসংস্কার উভয়ই লাভ করে। যবনদিগের সহিত জ্যোতিষের আদান-প্রদানে, তাহা আরও দৃঢ় হইয়াছে।

কোন কোন ললনার পক্ষে, বিবাহ সংস্কার কেবল পতির অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করিবার জন্য সাধিত হইয়া থাকে। "কল্যাণ" অকল্যাণকে আহ্বান করে। অনন্তর-কর্ম্মে, ব্রাহ্মণ দ্বাদশাহে, ক্ষত্রিয় চতুর্দ্দশ, বৈশ্য পঞ্চদশ ও শূদ্র ষোড়শ দিনে, শুদ্ধ হয়। নারীর আত্মীয়গণ সমবেত হইয়া, তাহাকে জন্মের মত বস্ত্রালঙ্কার ও পুষ্পাভরণে ভূষিতা করেন। এক বিশেষ

স্থানে যাইয়া, রোরুদ্যমান অবস্থায়, দুর্ভগাকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক, আলুলায়িত-কেশে, বক্ষে করাঘাত করিতে হয়। ভূষণ পরিত্যাগ কালে, সোহাগিনীগণ অপসৃতা হয়েন। বিধবায়, তালীসূত্র উন্মোচন করিয়া দিবে। সূত্র বিসর্জ্জনের পর, বপন কার্য্য। মৃতের আধ্যাত্মিক দেহ, প্রেত লোক না হইয়া স্বর্গে উত্তীর্ণ হইতে পারে না। প্রেতের উদ্ধারার্থ, শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠেয়। সপিণ্ডীকরণ কালে, পূর্ব্বপুরুষের সহিত সমবেত হইতে পারা যায়।

তামিল শূদ্রের মধ্যে বেল্লাল শ্রেষ্ঠ। তাহারা, সংখ্যায় ২৫ লক্ষ এবং চারি শ্রেণীতে বিভক্ত। উহাদের উপাধি, পিল্লৈ, নায়ুডু ও মুদেলি। কৃষি, বাণিজ্য ও বিদ্যা-চর্চ্চা ইহাদের উপজীব্য। পল্লব, চোল, পাণ্ড্য এবং কঙ্গু দেশে বাস-নিবন্ধন, বেল্লাল জাতি চতুর্দ্ধা বিভক্ত হইয়াছে। শবদাহান্তে, ইহাদের পঞ্চদশ দিন অশৌচ গ্রহণীয়। শৈব বৈষ্ণবে বিবাহ নিষিদ্ধ নহে। কিন্তু ব্রাহ্মণ জাতিতে, এ প্রকার বিবাহ অবৈধ। কঙ্গু বেল্লালদিগের পরিণয়ে, স্বজাতীয় সন্ন্যাসী পণ্ডারং বা তৎ-শিষ্য তম্বুরঁ পৌরোহিত্য করেন,—ব্রাহ্মণের প্রয়োজন নাই। শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া, সকল শ্রেণীতেই পণ্ডারং দ্বারা সম্পন্ন হইয়া থাকে। তৎকালে, উপাধ্যায় উপবীত ধারণ করিয়া থাকেন। ইহাদের মধ্যে সুরা সেবন গর্হিত; উপদেশ হইলে, আমিষ ত্যাগ করিতে হয়। ইহারা ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য উপজাতির অন্ন গ্রহণ করে না। বিভিন্ন শ্রেণীতে, ভোজ্যান্নতা আছে; কিন্তু, বিবাহ হইতে পারে না। নিকৃষ্ট বংশোদ্ভূত ব্যক্তি, বেল্লাল নামে পরিচিত হইতে ইচ্ছুক। মলয়ারে, নায়ার সম্বন্ধেও এই প্রকার হইতেছে। মদুরার নায়ক রাজবংশ, নায়ার হইতে ভিন্ন নহেন।

খৃষ্ট-ধর্ম্ম গ্রহণ করাইবার পক্ষে আনুকূল্য করা, খৃষ্টান সম্রাটের যেমন প্রয়োজনীয়, রাজনৈতিক কারণে, আর্য্যগণ আদিমবাসীদিগকে, তদ্রূপ

স্বমতে আনিয়াছেন। অতএব, অনার্য্যদিগকে অগ্রসর করিয়া দেওয়া এক্ষণে আবশ্যক। আদিম কৃষ্ণবর্ণ, উপনিবেশীর গৌর বর্ণে মিশ্রিত হইয়া, ব্রাহ্মণ-শূদ্র-নির্ব্বিশেষে, হিন্দু এক্ষণে ধূসর হইয়াছে, ইহা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য।

যে সিন্ধু শব্দের সেমিটিক অপভ্রংশে, আমাদের নাম হিন্দু হইয়াছে, যে সিন্ধু নদীর তীরে উপবেশন করিয়া, আর্য্যগণ যাগ করিতেন, তথাকার সিন্ধিজাতি, মুসলমান হইয়া গিয়াছে। তিন পাদের অধিক মুসলমান। অনেকে, হিন্দু ও মহম্মদীয় দ্বিবিধ মতে ক্রিয়াকলাপ করেন। শক আধিপত্য দ্বারাও, সামান্য অনুপ্রাণিত হইতে হয় নাই। লিপিকর শ্রেণীর ব্রাহ্মণ, মুসলমান-ভাবাপন্ন। সিন্ধু প্রদেশ, মরু ও পলিময়— পার্থিব সৌন্দর্য্য-বিহীন। 'রণ' প্রদেশে বৃক্ষাদি জন্মে না। স্থান-বিশেষে, মুহূর্ত্তের জন্য, ভূমি উচ্চাবচ হইতে দৃষ্ট হয়।

হিন্দু ধর্ম্ম, আচারে আবদ্ধ। সদাচার ও কদাচারের তারতম্যে জাতীয় মর্য্যাদার ইতর-বিশেষ হইয়া থাকে। এক্ষণে, রাজদণ্ড বর্ণাশ্রমের প্রতিভূ নহে। সমাজ, তজ্জন্য ব্যস্ত আছে। এতদ্বিষয়ে, মদ্রাস প্রদেশ সমধিক ক্রিয়াশীল। স্পর্শ করা দূরে থাক্, যে জাতি অশিষ্ট কর্ম্ম বা নিষিদ্ধ মাংস ভক্ষণে রত, তাহার মুখদর্শন করিলে, এখানকার ব্রাহ্মণকে অপবিত্র হইতে হয়। দক্ষিণী, হিন্দুস্থানী ও পঞ্জাবী অপেক্ষা, বঙ্গীয় অব্রাহ্মণ জাতি সদাচারী। অখাদ্য, অপেয় ও বিধবা বিবাহ, ব্রাহ্মণের পক্ষে যেমন বর্জ্জনীয়, বাঙ্গালায় অপর জাতিতেও তদ্রূপ।

কাশীতে, দীপান্বিতায় গোপ ও কর্ম্মকার গ্রাম্য-দানব "বিরতিয়া" ও ভৈরবকে প্রসন্নকরণাশয়ে, নগর হইলে গুপ্তভাবে, গ্রামে প্রকাশ্যে, শূকর-শাবক স্বহস্তে ছেদন করিয়া, মদিরাসহ উপহার দিয়া থাকে। অর্চ্চনান্তে, সেই মাংস পাক করিয়া ভোজন করে। কিন্তু স্নান করিয়া শুচি হইতে হইবে। খটিক দ্বারা বলি প্রদত্ত হইলে, উহা অখাদ্য।

তৈলঙ্গে, নিম্নশ্রেণীর শূদ্রার পক্ষে ব্যভিচার দূষ্য নহে। কিছুদিন পূর্ব্বে মহীসূরের অন্তর্গত চন্দ্রগত্তিতে যাইয়া বন্ধ্যাগণ, রেণুকাম্মার মেলায়, পরপুরুষ-সঙ্গম করিলে, পতিত হইত না।

ব্রাহ্মণের, গুণ-কর্ম্মানুসারে দুইটি শ্রেণী আছে; বৈদিক ও লৌকিক। বৈদিকেরা যাজন ও অধ্যাপন করেন। লৌকিকগণ বিষয়কর্ম্মে রত; সুতরাং তাঁহারা প্রতিগ্রহ করেন না। লোকেও, তাঁহাদিগকে দিতে ইচ্ছুক নহে। অন্ধ্র ও কলিঙ্গ, অধুনা, তেলিঙ্গানার অন্তর্গত। স্মার্ত্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে, নিয়োগী নামে একটি শ্রেণী আছে, তাঁহারা যোগাভ্যাসী। বল্লভাচার্য্য, বেলনাডু ব্রাহ্মণ। তদীয় পিতা কাশীতে যাইয়া বসতি করেন। কর্ণাটের হাবিক ও তুলবের এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ; তাঁহারা, সুপারী ও অন্য প্রকার শস্যের কৃষি, স্বয়ং করিয়া থাকেন। সাঙ্কতিগণ দ্রবিড়ে মিশ্র ব্যবসায়ে আবদ্ধ। তাঁহারা স্বাধ্যায় ও কৃষি, উভয়বিধ কার্য্য করিয়া থাকেন।

তন্তুবায়ের দ্রাবিড় নাম, 'কইকালার'। বঙ্গে, কেবল ব্রাহ্মণের বৈদিক ভাগ আসিয়াছেন, এমন নহে। তারকেশ্বরের নিকটবর্ত্তী কৈকালা নামে একখানি গ্রাম আছে। তথায়, বয়ন-কার্য্য হয়। বোধ হয়, দক্ষিণাবর্ত্তের তন্তুবায় তথায় আসিয়া পুরপত্তন করায়, গ্রামের উক্ত নিরুক্তি হইয়া থাকিবে। বঙ্গীয় তীয়র জাতি, দক্ষিণী থিয়র হইতে পারে, এমন অনুমান অসঙ্গত নহে। কৈকালার জাতির শালিয়ার শ্রেণীতে, উপবীত গ্রহণ করিবার পদ্ধতি আছে। এখানকার "পতনী" বস্ত্র, রেশম ও কার্পাস সূত্র দ্বারা নির্ম্মিত।

তৈলঙ্গে, বিশ্বকর্ম্মার সন্তান পঞ্চশিল্পী, উপবীত ধারণ করিলেও সমাজে ঘৃণিত। স্বর্ণকার, কর্ম্মকার, কাংস্যকার, সূত্রধর ও ভাস্কর, ইতঃপূর্ব্বে পাদুকা, ছত্র ও শিবিকা ব্যবহার করিতে পাইত না। পরৈয়া পর্য্যন্ত

উহাদের স্পৃষ্ট জল গ্রহণ করিত না। আচার সাধু না হইলে, যজ্ঞসূত্র ধারণে লাভ নাই। তৈলকার জাতি সূত্রের ত্রিদণ্ডী ব্যবহার করে। পেষণ যন্ত্রের প্রকারভেদে, তাহারা ত্রিবিধ নামে পরিচিত। বঙ্গের ন্যায় এখানেও উক্ত জাতিকে কলু বলা হয়। হিন্দীতে 'কলহু' অর্থে পেষণ যন্ত্র।

কর্ণাটি গোপাল, কাড়ুগোল্লদিগের কিঞ্চিৎ বিশেষত্ব আছে। উহাদের বিবাহ-মণ্ডপ এবং সূতিকাগার, গ্রামের বহির্ভাগে নির্ম্মাণ বিধেয়। প্রসূতির পীড়িতাবস্থায় পর্য্যন্ত, স্বজাতীয়েরা তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিবে না। তৎকালে, অন্য এক নির্দ্দিষ্ট জাতির লোক যাইবে।

দ্রবিড়ে, বেল্লাল ও ভাড়গারের অনেকে লিপি-ব্যবসায়ী। কাবরি জাতি, মুদিখানা করে। টোটিয়ারদের মধ্যে বহুপতিত্ব আছে; নায়কগণের দ্বারা ইহাদের যাজন ক্রিয়া নির্ব্বাহ হয়।

কর্ণাটের কৃষকগণের মধ্যে শৈব বৈষ্ণব, জৈন এবং জিনব্রাহ্মণ্যমিশ্রিত জঙ্গম সম্প্রদায়, পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। তেলিগু কৃষিজীবী, সৈনিক-ব্যবসায়ে লিপ্ত। বেঙ্কটগিরি ও পিঠাপুরের রাজা, বেল্লামা-জাতীয়। শূদ্র নামে পরিচিত হইলেও, তাঁহারা ক্ষত্রিয়োচিত আচার-সম্পন্ন। পরাধীন অবস্থায় যাহার যে বস্তু আছে, সে তাহা রক্ষা করিতে ব্যস্ত হইবে, ইহা নিশ্চিত। কিঞ্চিৎ বদান্য না হইলে চলিবে কেন? যে জাতি উপযুক্ত হইয়াছে, তাহাকে পুরস্কৃত না করিলে, লোকস্থিতি রক্ষা হইবে না। উক্ত রাজাকে শূদ্র করিয়া রাখা অন্যায়।

বঙ্গীয় বৈদ্যের মত অভিজ্ঞ চিকিৎসক জাতি কুত্রাপি নাই। অন্যত্র, ব্রাহ্মণে সে কার্য্য করিয়া থাকেন। এখানে পূর্ব্বে চারলাটাণ্ট জাতির হস্তে গ্রাম্য চিকিৎসার ভার ছিল। তাহারা মূর্খ ও অযোগ্য; ডিঙ্গলুগণও তদ্রূপ, অধিকন্তু ভিক্ষাজীবী। তাহারা ঔষধ সংগ্রহ ও বিতরণের জন্য,

নিয়ত ভ্রাম্যমাণ। ডিঙ্গলুগণ ধর্ম্ম ঠাকুরের নিকট মানত করে। ইহারা জঙ্গম, অতএব জিন ও বুদ্ধদেবতার সহিত সংশ্লিষ্ট।

চেন্নপট্টনে, "সমঃ, সমং শময়তি" প্রণালীর চিকিৎসকের অভাব। অচিরে, বাঙ্গালী-গৃহীত উক্ত পদ্ধতি, এখানে প্রকটিত হইবে। চিকিৎসা শাস্ত্র, এখন শৈশব-দশাপন্ন। উদ্ভিজ্জ জীবাণু আবিষ্কৃত হইয়া, নব চিকিৎসাতত্ত্বের সূত্রপাত হইয়াছে; সেইরূপ সূর্য্য-মণ্ডলস্থ যে প্রকৃতির বাষ্প শুষ্ক হইতেছে, পৃথিবীতে তদ্রূপ পদার্থের সত্ত্বা থাকায়, সবিতায় পরিশুষ্ক বাষ্প, যাহা কৃষ্ণবর্ণ দৃষ্ট হয়, উহা উষ্ণ হইলে উজ্জ্বল দৃষ্ট হইতেছে; এবংবিধ ক্রিয়া প্রত্যক্ষ হইয়া, নব জ্যোতিষের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছে।

আমরা শেষে, চিত্রশালিকায় প্রবেশ করিতে অভিলাষ করিলাম। প্রথমেই বুদ্ধ মূর্ত্তি, তদনন্তর তঞ্জায়ুরের মহারাষ্ট্রীয় রাজসভা ও মন্দিরের কাষ্ঠ-নির্ম্মিত অনুকৃতি; তথায় পুরাতন অস্ত্রগুলি দৃষ্ট হইল। পিত্তলের থালা ঘটীর গাত্রে, রৌপ্য-তাম্র-প্রবিষ্ট শিল্প, অতি সুন্দর। এক প্রস্থ ক্রয় করিতে ইচ্ছা হইল। অঙ্কুশের কারুকার্য্য, কাচাধার উজ্জ্বল করিয়াছে। কৃষ্ণা বিভাগের যজ্ঞপীঠ স্তূপ হইতে সংগৃহীত, দ্বিতীয় শতাব্দীতে অঙ্কিত মূর্ত্তিগুলি দেখিয়া বোধ হইল, আমরা যেন বর্ত্তমান কালের বহু অগ্রে যাইয়া উপনীত হইলাম। নগর ভ্রমণে পশুপক্ষী দৃষ্ট হয় না। আমার জ্ঞান ছিল, এ দেশে যে সকল বস্তু দেখি নাই, তাহার অধিকাংশ এখানে মিলিবে। গোদাবরীর মৃদঙ্গার ও হীরক, মদুরার রৌপ্য, বেপুরের লৌহ না রাখাই উচিত হইয়াছে। পররাষ্ট্রীয় বণিক-সম্প্রদায় দ্বারা উত্তোলিত হওয়া অপেক্ষা ভারতীয় ধনের খনি লুক্কায়িত থাকা শ্রেয়ঃ। মৃদঙ্গার ভিন্ন অন্য খনিজ দ্রব্য উত্তোলন করিবার ক্ষমতা এখনও আমাদের হয় নাই। সংগ্রহালয়ে আরণ্য হায়েনা রক্ষিত হয় নাই; অশোকের লিপি-চিত্রে ভিত্তি পূর্ণ হইয়াছে।

সমুদ্র।*

এত দিনান্তরে, আমরা চেন্নপট্টনকে অভিবাদন করিয়া, পুনরায় পোতাশ্রয়ের অভিমুখে যাত্রা করিলাম। ক্ল্যান্ ম্যাকিণ্টশে, যান্ত্রিক পতাকা বক্রশিরে অভ্যাগতকে সাদরে সম্ভাষণ করিতেছে। বিশ্রান্ত তরী, বিপুল ধূম উদ্গিরণ করিয়া তাহার দুর্ব্বিষহ বীর্য্য জ্ঞাপন করিল। পোতোপরি ময়ূর-পুচ্ছ-নির্ম্মিত ব্যজন, সূচিশিল্পান্বিত কৌষেয় বস্ত্র, রুদ্রাক্ষ ও ক্রীড়নক বিক্রয়ার্থ উপস্থিত। ঐন্দ্রজালিক আসিয়াছে। অধিকন্তু মান্দ্রাজী নরনারী জাহাজ দেখিতে আসিতেছেন। ইহাতে ইয়ুরোপাগত আরোহী বিনা অবতরণে দেশের ভাব জ্ঞাত হইতে পারিবেন।

প্রথম শ্রেণীর প্রকোষ্ঠ সজ্জিত গৃহাবলীতে পরিপূর্ণ; তর-পণ্য ৭৫৲ টাকা। উপরে সাধারণ জনাশ্রয়। ভিত্তিগাত্র খোদিত; পুষ্পপত্র-শোভিত বিস্তীর্ণ কার্পেটের উপরি অনেকগুলি কাষ্ঠাসন ও পুস্তকাধার। একপার্শ্বে পীয়ানোবাদ্য রক্ষিত হইয়াছে। তদনন্তর পোত-সম্পর্কীয় প্রধান কর্ম্মচারিগণের বাসস্থান এবং চার্ট-গৃহ। সর্ব্বোপরি পরিচালকের স্থান। জাহাজখানি লিবরপুল হইতে আসিতেছে। কর্ম্মচারীর সংখ্যা একশত। পরিচারক ও লস্করগণ, বাঙ্গালা ও বিহারের মুসলমান। পোতাধ্যক্ষ কহিলেন, "অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকার সময় যাত্রা করিব।" চারিতল পূর্ণ দ্রব্য-সম্ভার উত্তোলিত করিয়া, অবতরণ করাইতে সাতটা বাজিল। তরী লঘুতা প্রাপ্ত হইয়াছে। কিঞ্চিৎ জলাবর্ত্ত থাকায়, তরণী দোলায়মান

---

* ১। আর্য্যদর্শনে শ্রীমহেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত প্রবন্ধ।

২। মীনতত্ত্ব—শ্রীধীরেন্দ্রনাথ পাল প্রণীত।

৩। মদন পারিজাত (স্মৃতি)।

হইয়া চলিতে আরম্ভ করিল। বন্দরে তামিল ভারবাহিগণের রক্তবর্ণ উষ্ণীষারণ্য দৃষ্ট হইতেছে! ক্রমে চোলমণ্ডল উপকূল অদৃশ্য হইল।

প্রধান পরিচারক যে গৃহে আমাকে অবস্থিতি করিতে দিয়াছিলেন, তন্মধ্যে দর্পণ, জলের কল, মুখপ্রক্ষালন-পাত্র, শয্যা প্রভৃতি তাড়িত আলোকে উদ্ভাসিত হইল। ছদিতলে 'কর্ক'-নির্ম্মিত জীবনরক্ষক আবদ্ধ রহিয়াছে। জলে ভাসিতে হইলে, উক্ত শয্যা ফলপ্রদ হইবে। পাকে বিপাক বুঝিয়া, দিন চতুষ্টয় যাপনোপযোগী অপূপ, গাঢ় দুগ্ধ ও সাগরিক পীড়ায় ভেষজ মিষ্ট জম্বীর সহযাত্রিক করিয়াছি।

প্রাতঃকালে আরোহণীর মসৃণ পিত্তলদণ্ডে করমর্দ্দন করিয়া, উপরে আরূঢ় হইলাম। প্রথম দেশাটনে, জলধি সন্দর্শন-লালসায় পুরী যাত্রা করি। পর্য্যটন শেষ করিয়া, আবার সমুদ্রবক্ষে অধিষ্ঠান করিয়াছি। পুরাতন ভাব জাগ্রৎ হইতেছে। তোয়নিধি বিশাল, কিন্তু দৃষ্টি অধিক দূরগামিনী নহে। দিগ্‌বলয়ে, আকাশ ও জলধির মিলনসীমা নয়নগোচর হইতেছে। মেঘমালা রবিকরজালে বিবিধ বর্ণ গ্রহণ করিয়া, নিমজ্জিত ও উত্থিত হইতেছে। যাদঃপতির গভীরতা কোন স্থানে সার্দ্ধ দ্বি-ক্রোশের অধিক নহে।

পূর্ব্বতন ভূবেত্তার মতে, কোন কালে সুদূর উত্তরে, হিমবানে শিবালিক শৃঙ্গ পর্য্যন্ত সমুদ্র বিস্তৃত ছিল; নহিলে, তদুপরি সামুদ্রিক 'ফসিল'-যুক্ত স্তর মিলে কেন? উপত্যকা, অধিত্যকা উচ্চ ও নিম্নভূমি-সঙ্কুল ভূপৃষ্ঠ, পূর্ব্বে সাগর-গর্ভে ছিল। তাহার স্থান পরিবর্ত্তন হয় নাই। কেবল জল অপসৃত হওয়ায় বহির্গত হইয়াছে। পরন্তু, ইদানীং অনুমিত হইতেছে, ভূপৃষ্ঠ পরিবর্ত্তনশীল। উহা কদাচিৎ সমুদ্রে নিহিত, কখন বা উত্থিত হয়। ভূতল কোথাও অধোগামী, অন্যত্র উর্দ্ধগামী হইতে দেখা যায়। বঙ্গদেশ ক্রমে অধোগামী। মান্দ্রাজের তট, উপরে উঠিতেছে।

সমুদ্র আপন সীমা অতিক্রম করে না ; নদীজল যে পরিমাণে উহাতে পতিত হয়, তাহা বাষ্পে পরিণত হইয়া, সমতা রক্ষা করে, ইত্যাদি প্রসঙ্গ যথার্থ নহে।

আমাদের বাষ্পীয় পল্লীখানি জলভেদ করিয়া, ধক্‌ধক্ শব্দে একাকী অবিরাম ধাবিত হইয়াছে। নীল জলের শুভ্র ফেনা নানা প্রকারের বিভ্রম সহকারে ক্রীড়াপরায়ণ। একের পর আর একটি তরঙ্গ আসিতেছে, তাহার আকার অন্যবিধ। যত দেখি, নূতন বোধ হয়। এই সফেন, তখনি আবার ফেনহীন। আবার তরঙ্গ ঈষৎ ফেনিল হইয়া পুঞ্জীকৃত বুদ্‌বুদ্ পদার্থ আনয়ন করিল। ঐ আর নাই ; কোথায় মিলাইয়া গেল! কূল অপেক্ষা এখানে জল অধিক, বর্ণ অবশ্য গাঢ়। আলোক ছায়ার তারতম্যে ক্ষণে নীলিমা অধিকতর বিকসিত। কীট বা কর্দ্দমের বর্ণ অনুসারে, স্থানভেদে লবণাম্বুর বর্ণভেদ ঘটে।

এক বৃদ্ধ আমার নিকট উপবিষ্ট ছিলেন। তাঁহার নাম হরিচন্দ্র চিন্তামন্। তিনি সদারাপত্য লণ্ডন হইতে আসিতেছেন। তিনি "ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট"এ মরাঠী ও গুজরাতি অধ্যাপনা করিতেন। আমি মহারাষ্ট্রীয় মহিলার দ্বারা জিজ্ঞাসিত হইলাম, 'বাঙ্গলায়, এখনও কি নারীজাতির অবরোধ প্রথা বিদ্যমান আছে?" কিশোরীর নাম, যুঁথা বাই ; তিনি ইংরাজী ভাষাতে কথাবার্ত্তা বলেন। আলাপে অতি মধুরা ; নবন্যাস পড়িয়া তাঁহার দিনযাপন হইতেছে। পিতার তুরস্কশিরস্ত্রাণ, মায়ের শাড়ী, কন্যার গাউন,—ত্রিমূর্ত্তির বেশে মিশ্রভাবের দিব্য সমন্বয় দেখিলাম।

অপরাহ্ণে নীলোৎপল-সন্নিভ পয়ঃসৌষ্ঠব দর্শন করিতেছি, এমনকালে উড্ডীয়মান মৎস্য তরণীবক্ষে আসিয়া নিপতিত হইল। বর্ণ তপস্বীর ন্যায়, আকার বাটা মৎস্যবৎ। শত্রুভয়ে লম্ফ প্রদানানন্তর অধিকতর বৈরীর

নিকট উত্তীর্ণ হইল। উড্ডয়ন ও সন্তরণ কার্য্যে সক্ষম, তদীয় পক্ষপুট এক্ষণে বৃথা। আমিষ-ভোজিগণ বিবেচনা করেন, মীনজাতি আহারের জন্য সৃষ্ট। অখাদ্য মৎস্য অপেক্ষা সুখাদ্য মৎস্যের বংশবৃদ্ধি অধিক।

এই জীব মধ্যে কেহ ত্রিলোচন, কেহ বা চতুর্লোচন। তাহার চক্ষুর নিমেষ নাই, স্পর্শেন্দ্রিয়েরও অভাব। মানবধৃতি-কৌশলীর তরণ্ডক নিক্ষিপ্ত শুদ্ধ বড়িশের ঔজ্জ্বল্য দেখিয়া, সে উহা গলাধঃকরণ করে। উহার তাবৎ সামগ্রী পরিপাক করিবার ক্ষমতা নাই; তজ্জন্য সর্ব্বভুক্ এই বিড়ম্বনা-গ্রস্ত হয়। ইহারা যেমন অধিকভোজী, তেমনই জলমাত্র পান করিয়াও জীবনধারণ করিতে সমর্থ। মৎস্যের পর্য্যটন শক্তি প্রখর। তাহার ভাসমান প্রকৃতি অধিক,—নিজভার বহন করিতে হয় না।

গ্রাহ (হাঙ্গর) দেখিতে মীনবৎ। জাহাজের সহিত সমবেগে গমন করে। ভল্ল মৎস্য অতি ভয়ঙ্কর। ইহারা অর্ণবপোত সচ্ছিদ্র করিয়া মগ্ন করিতে সমর্থ। দারুভেদক করপত্র ও শিরোভুজ মৎস্যের এই প্রকার ক্ষমতা আছে। টর্পেডো মৎস্য স্পর্শ করিলে, শরীর অবসন্ন হয়। তন্মধ্যে বিদ্যুতের সত্ত্বা বশতঃ এবংবিধ লীলা ঘটে। ভেক ও নৃমৎস্যের অর্দ্ধভাগ মণ্ডুক এবং বানরের ন্যায়। 'শিল' মৎস্য তিমির ন্যায় স্তন্যপায়ী, এবং উভ-চর। ইহারা প্রতিপালকের নিকট, সারমেয়ের মত অবস্থিতি করে। ব্লীক মৎস্যের শল্ক চূর্ণ করিয়া, কৃত্রিম মুক্তা প্রস্তুত হয়। স্বর্ণ ও রৌপ্য মৎস্যের স্ত্রী পুং ভেদ উপলব্ধি হইতে পারে। তারকা মৎস্য শঙ্খের মত নির্ম্মোক্ক। উহার রস সংস্পর্শে শঙ্খশুক্তি অচৈতন্য হইয়া যায়।

তথাকথিত মৎস্য ব্যতীত, কয়েক প্রকার জলজন্তু, স্থলচর জীবের সহিত কোন প্রকার সাদৃশ্য থাকায়, সেই নামে পরিচিত। ঘোটকবৎ স্বরের জন্য সিন্ধুঘোটক, গজদন্তের জন্য জলকুঞ্জর ও উদ্‌বিড়াল প্রভৃতি

বারিশয়গণের নামকরণ হইয়াছে। মকর এদেশে আর নাই। উহারা কদাচিৎ ভারতসাগরে আইসে।

জল মধ্যে দেবতা ও যক্ষ উভয়েরই বাস। শালগ্রামশিলা শম্বুকবৎ প্রাণি বিশেষ। তাহার দেহে অনেক গুলি কোষ্ঠ (গৃহ) আছে। তদ্দর্শনে লক্ষ্মী-জনার্দ্দন, দামোদর প্রভৃতি লক্ষণ স্থিরীকৃত হইয়া থাকে।

নৃমৎস্যের দৈর্ঘ্য ছয় হস্ত। প্রথমার্দ্ধ বানরবৎ, অপরার্দ্ধ মৎস্যের ন্যায়। লোহিত সাগর ইহার প্রিয় নিকেতন। ইহারা বাগুরায় পতিত হইবার নহে; হস্ত দ্বারা জালের বন্ধন মোচন করিয়া থাকে। একদা গভীর রাত্রিকালে গঙ্গাসাগর-সঙ্গমের নিকটস্থ কোনও নদীতে এই যক্ষ দৃষ্ট হইয়াছিল। তীর-সমীপে করদ্বারা মৎস্যধারণ করিয়া ভোজন করিবার কালে, সে অস্ফুট ধ্বনি করিতেছিল। নৌকারোহিগণের নিকট উহা কথোপকথনবৎ প্রতীত হইয়াছিল। তাঁহারা ভাবিলেন, জলদেবতার সন্দর্শন পাইয়াছেন।

নটীসাল নামক যাদঃ আপনার দুই হস্ত, একটি কর্ণ বা অন্যতরকে ক্ষেপণীরূপে ব্যবহার করে। যৎকালে, ইহারা ঊর্দ্ধবাহু হইয়া সন্তরণ করিতে থাকে, বোধ হয়, যেন উড়ুপ পাইল তুলিয়া যাইতেছে। স্থলবিশেষে এই জীব কর্ত্তৃক মানব নৌকা পরিচালনের শিক্ষা পাইয়া থাকিবে। মৎস্যপুচ্ছের আকারের সহিত নৌকার কর্ণ তুলনীয়।

গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া, ছাদে যাইবার সময়, পোতাধ্যক্ষের সহিত সাক্ষাৎ হইল,—তাঁহাকে সুপ্রভাত জানাইলাম। আরোহিবর্গের অবগতির জন্য, সোপান-শিরে প্রকটিত হইয়াছে;—কল্য মধ্যাহ্ন হইতে তরী ৩১০ মাইল আসিয়াছে। অদ্য তৎকাল পর্য্যন্ত, সাকল্যে ৫০০ মাইল যাইবে। স্যাণ্ডহেডস্ হইতে দূরতা ১৬১ মাইল।

প্রতিদিন অর্দ্ধচন্দ্রাকার Sextant নামক জ্যোতিষী যন্ত্রদ্বারা, নির্দ্দিষ্ট

কালে নিরক্ষান্তর ও দ্রাঘিমা স্থির করা হয়। তদনন্তর মানচিত্র দৃষ্টে, কত অংশ উত্তর বা পূর্ব্বে যাইতে হইবে স্থির করিয়া, দিগ্‌দর্শনের সাহায্যে পোত তদভিমুখে চালিত হইয়া থাকে। Leading নামধেয়, রজ্জু-সমন্বিত, নাটায়ের মত জলেশয় মুখ্যনম্বের দড়ি নির্দ্দিষ্টকালে কি পরিমাণ বহির্গত হইতেছে দেখিয়া, প্রতি ঘটিকায় কতদূর যাওয়া হইল, অনুমিত হইয়া থাকে।

সবিতা পয়োধিজলে অবতরণ করিতে লাগিলেন। তৎসংস্পর্শে তদীয় বপুঃ যেন বিগলিত হইতেছে। এখন শীতল হইয়াছেন; দর্শনে কষ্ট নাই। তিনি এত ব্যস্ত কেন? ক্ষণকাল বিলম্ব করুন। দেখিয়া আকাঙ্ক্ষা মিটাইব। শ্যাবাশ্ব ঋষি জগতী ছন্দে স্তুতি করিয়াছিলেন;— জ্ঞানী সবিতা স্বয়ং বিশ্বরূপ ধারণ করেন; তিনি দ্বিপদ ও চতুষ্পদগণের কল্যাণ করিতেছেন। পূজনীয় দেবসবিতা স্বর্গকে সুপ্রকাশ করিতেছেন, এবং ঊষার পশ্চাৎ উদিত হইয়াছেন।

"বিশ্বারূপাণি প্রতিমুঞ্চতে কবিঃ প্রাসাবীদ্ভদ্রন্দ্বিপদে চতুষ্পদে।
বিনাকমখ্যৎ সবিতা বরেণ্যোনু প্রয়াণে মুষসো বিরাজতি॥"

(বৈশ্য-গায়ত্রী।)

রাত্রিকালে হুগলী নদীর 'পাইলট' আসিয়া, তরী-পরিচালনভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। এক্ষণে জাহাজ চলিতেছে না। শুল্ক বিভাগের জনৈক কর্ম্মচারী নৌকাযোগে উপস্থিত হইলেন। কেহ আগ্নেয়াস্ত্র আনয়ন করিয়াছে কি না, তাঁহার জিজ্ঞাস্য। আমাদের কর্ণধার সমুদ্রে অনায়াসে নৌচালন করিয়াছেন। নদীমুখে তাঁহাকে অন্যের সহায়তা লইতে হইল।

জলতলে, সৈকতভূমি অতর্কিতভাবে মস্তক উত্তোলন করিয়া থাকে। পথ ভয়ঙ্কর। যাহারা সদা পর্য্যবেক্ষণ করে, তাহারা চালক হইবার যোগ্য। কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলে দেখিলাম, অম্বুরাশির সে বর্ণ আর

নাই। নদ্যাগত মৃৎ-দ্বারা পাণ্ডু হইয়াছে। পথ-নিদর্শক "বয়া"-শ্রেণী পঙ্‌ক্তিদ্বয়ে ভাসমান। মধ্যে, কলিকাতা বন্দরের লোহিতবর্ণ ক্ষুদ্র বাষ্পীয় নৌ, সঙ্কেতার্থ দণ্ডায়মান আছে। পূর্ব্ববারে এ দিকে দুইখানি জলমগ্ন বাষ্পীয়-পোতের গুণবৃক্ষ দর্শন করিয়া গিয়াছিলাম।

এখন শৈত্যবোধ হইতে লাগিল। দক্ষিণে, ঊর্ণাবস্ত্র পেটক হইতে নিষ্কাসিত করিতে হয় নাই। বামভাগে, স্থল দৃষ্ট হইতেছে। গঙ্গাসাগর-সঙ্গমজাত এই মহাদেশ কপিলমুনির অধিষ্ঠিত। নব্য ন্যায়শাস্ত্র-প্রসূতি, তন্ত্রজননী,—বৈষ্ণব সম্প্রদায় ও নৈয়ায়িকবর্গের প্রীতি ও জ্ঞানের সঙ্গমস্থল। পূর্ব্ব পিতৃগণের উদ্ধার এখানেই সম্ভব। ঋগ্বেদের ঋষি, যাহাকে চটক সদৃশ বলিয়া গিয়াছেন, সেই বঙ্গ এক পরাক্রান্ত আর্য্যদেশ বলিয়া গণ্য হইল। বাহুবল অপেক্ষা মানবের বুদ্ধিবল শ্রেষ্ঠ। চেতনের ন্যায়, অচেতন পদার্থ সাড়া দিতে পারে, ইহা জগদীশচন্দ্র বসু প্রমাণিত করিয়া দিয়াছেন। মার্কণীর অগ্রে তিনি তারহীন তাড়িতবার্ত্তার কৌশল জ্ঞাত হইয়াছিলেন।

অদ্য মকর সংক্রান্তি; কিন্তু এখানে কেহ স্নান করিতেছে না। এই স্রোত কর্ত্তিত পথে আনীত। ইহা ভাগীরথী নহেন। গঙ্গাস্নান করিতে হইলে, কলিকাতা যাইতে হয়। বহুদিন পরে, গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন জন্য বাঙ্গালা দেখিয়া কিঞ্চিৎ আনন্দ অনুভব করিলাম।

সম্পূর্ণ।

বিষয়-বিবৃতি।

(পৃষ্ঠাঙ্ক সহ)

ওড্র।

বারাণসী।

অগ্নিষ্টোম যজ্ঞ।

সুরধুনী।

কলিকাতা।

মহাপ্রদর্শনী।

বঙ্গ।

বাঙ্গালী বৈশ্য।

কামরূপ।

হিমালয়।

কাশ্মীর।

পঞ্জাব।

হৃষীকেশ।

মুম্বই।

মহারাষ্ট্র।

দেবগিরি।

জব্বলপুর।

অন্ধ্র।

কর্ণাট।

কেরল।

আন্ত।

কালাদিপল্লি।

শারীরক মীমাংসা।

কেরল।

অস্ত্য।

দেবস্থান।

চেন্নপট্টন।

আদ্য।

আদের।

তত্ত্বসভা।

চেন্নপট্টন।

অন্ত্য।

সমুদ্র।

অবশ্য-দ্রষ্টব্য

শুদ্ধি-পত্র।

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	অশুদ্ধ।	শুদ্ধ।
		কামরূপ।	
১০০	১০	মধ্যে ভিন্ন বিধবার	মধ্যে বিধবার
		কাশ্মীর।	
১১৪	২	অলর হ্রদ	উলার হ্রদ
১৫	৬	খজ্জীরবাগ	উজ্জীর বাগ
		পঞ্জাব।	
৩৮	১১	নানক চরিত	নানক রচিত
		হৃষীকেশ।	
১৪৪	১৩	আইসে	আইসে না
১৫২	১৫	যোগশাস্ত্র ও	যোগশাস্ত্র বা
		গুর্জ্জর।	
১৮৩	১	বট্টমণ্ডল	ষট্টমণ্ডল
১৮৭	৩	দর্শন	দপ্‌ফন
১৯৩	১০	দৈনিক	দৈহিক
		মুম্বই।	
১০	৪	তত্রত্য	অত্রত্য
১৫	৫	বেহতা	মেহতা

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	অশুদ্ধ।	শুদ্ধ।
		দেবগিরি।	
২৫৭	৩	উচ্চ	নিম্ন
		মহারাষ্ট্র।	
২৪৭	১৮	সরকাস প্রদেশ	সরকার প্রদেশ
		অন্ধ্র।	
২৭১	৫	য়াইহার	ইহার
২৭৯	২৪	ট্টাচার্য্য	ভট্টাচার্য্য
		কেরল।	
৩০৪	২৩	বর্ত্তুমালা	বর্ত্তুলমালা
		দ্রবিড়।	
৩৮৩।৩৮৪	২৪।১	তিন হস্ত	তিন প্রস্থ
		আদের।	
৪১৯	১৬	পারিতেন না	পারিতেন না বলিয়া সন্দেহ হইতে পারে।
৪১৯	১৭	দুস্ত্যাজ্য	দুস্ত্যজ্য। কিন্তু আমি এ সকল কথা উল্লেখ না করিলে ভাল ছিল।

শুদ্ধি-পত্র।

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	অশুদ্ধ।	শুদ্ধ।
৭	১২	মছলন্দ ও মাদুর	মছলন্দমাদুর
২৫	৬	ধিঞ্চ্য	ধিষ্ণ্য
২৫	৭	দদোমণ্ডপ	সদোমণ্ডপ
২৯	পাদটীকা	Yagna	Yoga
৩৬	১১	কুল্কী	কুন্‌কী
৩৯	৯	গধ্র	গৃধ্র
৩৯	১১	পারপারের	পারাপারের
৪২	৭	দুধেল	দুধেলা
৪৬	১০	পড়া	পরা
৪৭	২	বসিতিস্থান	বসতিস্থান
৪৮	১	সান্ধ্যাবন্দনা	সন্ধ্যাবন্দনা
৫৩	পাদটীকা	Growth	Origin and Growth of the Religion
৫৬	৪	সংবভূখ	সংবভুথ
৬৮	১৫	সচ্ছদ্রানাস্ত	সচ্ছ্‌দ্রানাস্ত
৭৬	৬	কুমুটি	কুমটি
৭৮	২৩	নিস্ক্রয়	নিষ্ক্রয়
৭৯	১৮	ঝিল	ছিল

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	অশুদ্ধ।	শুদ্ধ।
৮০	৮	ভুবেনেশ্বরীর	ভুবনেশ্বরীর
৮২	৬	ত্রিলশৈল্য	ত্রিলশৈল
৮৮	১	পাওয়া	পাওয়া যায়
৯২	২২	কালে	কাল
৯২	২৪	সেই	এই
৯৪	১৭	তাহারা তাহারা	তাহারা
৯৭	৭	জনপদ	জানপদ
১১৬	১০	দরবারে	দরবারের
১১৮	৩	ভাবনীকে	ভবানীকে
১২৫	৭	চতুর্দ্দিকে	চতুর্দ্দিক
১২৭	২	দুরাগম	দুর্গম
১৩০	৪	ররাব	রবাব
১৩৭	১১	চতুর্দ্ধার	চতুর্দ্বার
১৫৭	১	মৌনিকারেতি	'মৌনী কি রেতি'
১৬৬	১	বলরামপুরে	বলরামপুরের
১৬৬	৯	অলঙ্কৃত। ভগ্ন	অলঙ্কৃত ভগ্ন
১৭৩	৭	গহ্বরে	গহ্বর
১৭৫	২২	নিগ্রস্থ	নিগ্রন্থ
১৮১	৫	ধূমজ্ঞান	ধূমযান
১৯০	২১	কিছুদুর	কিছুদূরে
১৯৩	৮	পরিধান	নাসিকায় পরিধান
২১১	৪	'কিংবদতি'	কিম্বদন্তি

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	অশুদ্ধ।	শুদ্ধ।
২১১	৪।৫	সরজম শেঠজী	স্যর জমশেঠজী
		জিজিবাই	জিজিভাই
২১৮	১৪	লুকায়িত	লুক্কায়িত
২২২	১০	যে পথ	যে পথে
২৩৪	৪	বেদার্থরত্ন	বেদার্থযত্ন
২৪৩	৯	মাওলিয়া	মাওলিরা
২৪৬	১৬	সন্নিবেশিতঃ	সন্নিবেশিত।
২৫০	৫	আশোক	অশোক
২৬৯	১০	অধ্বপার্শে	অধ্বপার্শ্বে
২৭২	২১	নদীগর্ত্ত	নদীগর্ভ
২৯০	১৩	দ্বারকায়	দ্বারকার
৩১৪	১০	অনুবাদককের	অনুবাদকের
৩২৭	৯	চলিয়াছে	চলিয়াছি
৩৪৯	১৫	পারে না	পার না
৩৮১	৫	শুভশংসা	শুভাশংসা
৩৮২	১	আর্যীক্রত	আর্যীকৃত
৩৮৪	৮	কাবোর্গো	কাবের্যো
৪০৮	৬	শস্ত্র প্রহরা	শস্ত্রপ্রহরী
৪২৪	পাদটীকা	যোগেন্দ্রচন্দ্র	যোগেশচন্দ্র

পূর্ব্ববর্ত্তী সংস্করণের

ফলশ্রুতি।

প্রবাসী—আশ্বিন, ১৩১০

অধিকাংশ লোকেই দেশভ্রমণ করেন না। কারণ নানাবিধ;— অর্থাভাব, অবসরের অভাব, সাহস উদ্যমের অভাব, কৌতূহল-শূন্যতা ইত্যাদি। কিন্তু দেশভ্রমণ যে অতিশয় শিক্ষাপ্রদ, আনন্দদায়ক ও মানসিক উদারতা-বর্দ্ধক, তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। এইজন্য সকলেরই যথাসাধ্য ভ্রমণ করা উচিত; নিতান্ত না পারিলে অপরের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত পড়া উচিত। শুধু শরীরটাকে নানা স্থানে বহন করিয়া লইয়া বেড়াইলেই কিন্তু দেশভ্রমণের ফললাভ হয় না। দেখিবার চোখ চাই, শুনিবার কাণ চাই, কৌতূহল চাই। বিভিন্ন পরিচ্ছদ, রং, আচার ও ভাষার অন্তরালে আমাদের সাধারণ মানবত্ব ও মানবের সদ্‌গুণ অনুভব করিবারও ক্ষমতা চাই। এই গ্রন্থের লেখকের যথেষ্ট পর্য্যবেক্ষণশক্তি ও ভ্রমণকারীর অন্যবিধ গুণ থাকায় পুস্তকখানি অতি উপাদেয় হইয়াছে। ইহা হইতে আমরা একাধারে আমোদ ও জ্ঞান লাভ করিয়াছি। ইহাতে অসার বাক্যপূর্ণ কবিত্বানুকারী বর্ণনার চেষ্টা নাই। প্রতি পৃষ্ঠা নানাবিধ কৌতূহলোদ্দীপক তথ্যে পূর্ণ। বাস্তবিক এই গ্রন্থ পড়িলে ভারতবর্ষে যে কতপ্রকার রীতি-নীতি, আচার ও পরিচ্ছদ প্রচলিত আছে, এই দেশে যে কত জাতির বাস, হিন্দুধর্ম্ম ও সমাজ যে কত বিভিন্নরূপ ধারণ করিয়াছে, তাহা বেশ বুঝা যায়।

নব্যভারত—শ্রাবণ, ১৩১০

নব্যভারতে এই পুস্তকের কতকাংশ প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাতেই পাঠকগণ গ্রন্থকারের সরল লেখার পরিচয় পাইয়াছেন। * * * অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ভাষা প্রাঞ্জল। সর্ব্বত্র এই পুস্তকের আদর হইবে, আশা করি।

কুশদহ—মাঘ, ১৩১৯

এই পুস্তকখানিতে ভ্রমণ-বৃত্তান্ত অবলম্বন করিয়া যে বহু-জ্ঞাতব্য বিষয়ের অবতারণা করা হইয়াছে তাহাতে ইহাকে এক জ্ঞান-ভাণ্ডার বলা যায়। গ্রন্থকার যত কিছু বিষয়ের সমালোচনা করিয়াছেন, তাহাতে সকল বিষয়েই যে সকলের সঙ্গে ঐকমত্য হইবে এরূপ বলা যায় না ; কিন্তু, এমন উদার অথচ রক্ষণশীলতার সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া প্রাচীন গৌরবের একটি উজ্জ্বল ভাব হৃদয়ে পোষণ করিয়া বহুল অভিজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছেন, যে, পুস্তকখানি পাঠ করিলে বাস্তবিক জ্ঞান এবং আনন্দ লাভ হয়। বিশেষতঃ যাঁহারা জাতি এবং ধর্ম্ম সম্বন্ধে অত্যন্ত গোঁড়া, তাঁহারা ইহা পাঠ করিলে সংস্কারে আঘাত লাগিবে না অথচ জ্ঞান লাভ করিতে পারিবেন।

জন্মভূমি—ফাল্গুন, ১৩১৯

ভারতবর্ষের পূর্ব্বভাগ, উত্তর ভাগ, পশ্চিম ভাগ, দক্ষিণ ভাগ, এই চারি ভাগে "ভারত-প্রদক্ষিণ" বিভক্ত। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের কীর্ত্তি-কাহিনীর নিদর্শন স্বরূপ এই গ্রন্থে ১৮ খানি সুন্দর সুদৃশ্য হাফ্‌টোন চিত্র সন্নিবেশিত হইয়াছে। চিত্রগুলি শিল্প-সৌন্দর্য্যে ও অভিনবত্বে অপূর্ব্ব। "জন্মভূমি" পত্রিকায় অন্ধ, কালাদিপল্লি, সমুদ্র প্রভৃতি বৃত্তান্ত

তিনি স্বয়ং যাহা অবলোকন করিয়াছেন, তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া সকলেই আনন্দ অনুভব করিবেন।

সময়—আশ্বিন, ১৩১৯

বাঁধাই সুরম্য। ইহার ছাপা ও কাগজ পরিপাটী। আলোচ্য গ্রন্থখানি নূতন প্রশংসার বড় একটা অপেক্ষা রাখে না। কারণ এই নভেলী-নেশা-প্রমত্ত পাঠকের দেশে যে ভ্রমণ বৃত্তান্তের দ্বিতীয় সংস্করণ হয়, সে পুস্তক যে সবিশেষ প্রশংসার যোগ্য, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। আর এই গ্রন্থ রচয়িতা যিনি, তাঁহারও নূতন করিয়া পরিচয় দিবার আবশ্যকতা দেখি না। যে পাঠক পুরাতন 'সাহিত্য', 'নব্যভারত' ও 'ভারতী' প্রভৃতি পত্রিকা পাঠ করিয়াছেন, তিনিই দুর্গাচরণবাবুর সহিত সুপরিচিত;—দুর্গাচরণবাবুর রচনাশক্তি ও পাণ্ডিত্য তাঁহার কাছে সুবিদিত। নব সংস্করণে দেখিলাম, গ্রন্থখানি সচিত্র ও পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। ভারতীয় নানা সমাজ ও ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় বিবিধ তথ্য পরিপূর্ণ এমন সুবৃহৎ ও সুখপাঠ্য ভ্রমণ-কাহিনী বঙ্গ সাহিত্যে আর আছে কিনা, জানি না। আত্মীয়-স্বজনকে বাজে নাটক নভেলের পরিবর্ত্তে এই শ্রেণীর শিক্ষাপ্রদ অথচ মনোজ্ঞ গ্রন্থ উপহার দেওয়াই কর্ত্তব্য। গ্রন্থশেষে আবার পাঠকসাধারণের সুবিধার জন্য ১৬ পৃষ্ঠা ব্যাপী পৃষ্ঠাঙ্কসহ বিষয়-বিবৃতি সন্নিবিষ্ট আছে। গ্রন্থখানিকে নিখুঁৎ করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা হইয়াছে।

THE AMRITA-BAZAR PATRIKA—Sept. 27, 1912.

This book contains 432 pages and 18 illustrations. The principal subject matters of the book, as its name

In every case the author has dealt with the history interesting places of India, some of which were already published in our vernacular magazines. Topographical accounts are generally interesting, but the accounts given in these pages have a relish of its own, while the simple style of its authoı has added a peculiar charm to the work. Besides the descriptions of the places the author had to travel over, he touched on many other points, such as historical, religious, social and even philosophical, treating these subjects with a wide know-ledge. It is to be admitted that the learned author appears to have tried his best to enrich this work with various information, and he has been successful in his aim to a very great extent. Most of the illustrations are fairly executed. We have no doubt that the book would be found, useful, interesting and instructive. The style is generally neat and lucid and in some places almost fascinating.

In every case the author has dealt with the history of the place, past and present, geographical descriptions, physical position of the place, its past traditions, its languages, its manners and customs and the condition of its people, religious, social, political and otherwise. The volume also abounds with anecdotes and folk-tales which add to its interesting features. To know all these

details of the places of much historic and Pouranic importance is indeed a temptation which few among those who take a pleasure in knowing what they ought to know about their own country. For tourists and pilgrims, the book is particularly useful as an excellent 'Vade mecum'. In addition to all these there are no fewer than 18 half-tone illustrations of important buildings, places and landscapes. The book contains 432 pages with which the author has dealt, and all that we are glad to be able to say is that the time and energy which the book has cost have been well-spent.

THE BENGALEE—Novr. 5, 1912.

This book has been lying on our table for some time. It is an account of the author's travels to most of the important cities, holy places and places of unusual places in all parts of the Indian peninsula. The narrative is divided into four sections having regard to the geographical positions of the places visited. Many people out of curiosity or under necessity widely travelled in their land of birth or abroad, but few have eyes to see and fewer still can bring a vivid picture of what they have seen, before the mind's eyes of their less fortunate brethren who have not the means or oppor-

tunity to take a wide tour in the country. Babu Durga Ch. Rakhit, it appears to us from a perusal of his book, was only a keen observer of his surrounding wherever he went ; his studied objects, animate or inanimate, with the eye of a critic, make present of his experience to countrymen in this valuable book. To the readers of Bengali periodicals these accounts are already familiar, for most of them appeared in them at one time or another and they were all read with interest at the time of their publication.

LIBRARY
CALCUTTA